মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্

তাঁর বিশাল জীবনের কতিপয় অধ্যায়

محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم

Muhammadur Rasulullah
(SM)

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

তাঁর বিশাল জীবনের কতিপয় অধ্যায়

সংকলনেঃ

আব্দুল হামীদ মাদানী

সূচীপত্র

প্রারম্ভিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين....وبعد:

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ঃ বিশ্বনবী, সর্বশেষ নবী। তাঁকে বরণ করা সারা বিশ্বের সকল মানব ও দানবের কর্তব্য। তাঁকে বিশ্বাস ও বরণ করার মানে মুখের অনুরূপ অন্তরের অন্তস্তল থেকে দৃঢ়তার সাথে এই সত্যায়ন করা যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং মানুষ ও জ্বিন উভয় সম্প্রদায়ের সকলের জন্য প্রেরিত রসূল (দূত)।

১। তিনি যে খবর বলেন, তা সত্যজ্ঞান করা।
২। তিনি যে আদেশ করেন, তা পালন করা।
৩। তিনি যা করতে নিষেধ করেন এবং ধমক দেন, তা হতে বিরত থাকা।
৪। তাঁর বিধান ছাড়া অন্য মতে আল্লাহর ইবাদত না করা।
৫। তাঁর তা'যীম করা
৬। তাঁকে ও তাঁর আদর্শকে ভালোবাসা
৭। তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পড়া।

এ সকল ক্ষেত্রে অবজ্ঞা ও অতিরঞ্জনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে এই পুস্তকে।

'মুহাম্মাদ' মানে প্রশংসিত, প্রশংসনীয়। বিশাল ব্যক্তিত্বের বহু নাম হওয়া স্বাভাবিক। যেমন যাঁর নাম বহু, তাঁর গুণও অনেক বেশি। গুণ থেকেই নামের উৎপত্তি হয়। বক্ষমাণ পুস্তকে সেই মহান ব্যক্তির নাম ও গুণাবলী পরিবেশিত হয়েছে।

তাঁর নামে বিভিন্ন বিকৃত ও অমূলক বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে বহু সমাজের বহু মানুষের মাঝে। এক দ্বীনী ভাইয়ের প্রস্তাব মতে সে সব বিশ্বাসের সংস্কারকল্পে এই পুস্তকের অবতারণা।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তওফীক দিন, আমরা যেন প্রিয় নবী ﷺ সম্পর্কে সঠিক ধারণা রেখে আনুগত্যের সাথে তাঁর প্রতি অগাধ ভালোবাসা রাখতে পারি। আল্লাহুম্মা আমীন।

বিনীত----
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব
১০/৪/৩৫হিঃ
১০/২/ ১৪খ্রিঃ

মহানবী ﷺ-এর নামাবলী

যিনি যত বড় হন, তাঁর নাম তত বেশি হয়। যেমন তাঁর সুনাম বৃদ্ধি পায়, তেমনি নামের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলা ভাষাতে যেমন চন্দ্র ও সূর্যের নাম অনেক, তেমনি আরবী ভাষাতে বাঘের নাম অনেক।

শরীয়তে মহান আল্লাহর নাম অনেক। তেমনি তাঁর প্রিয় নবী ﷺ-এর নামও অনেক।

মহানবী ﷺ-এর কোন নাম অর্থহীন নয়। তাঁর নামাবলী এক বা একাধিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। তাঁর নাম কেবল পরিচিতির জন্য নয়, তার সাথে জড়িয়ে আছে বহু মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য।

তাঁর কিছু নাম আছে, যাতে অন্য কোন নবী শরীক নেই। আর কিছু নাম এমন আছে, যাতে অন্যান্য নবীরাও তাঁর শরীক আছেন। তবে সেই নামের সার্থকতায় তিনিই পরিপূর্ণ অথবা সবার চেয়ে শীর্ষে।

যাঁর গুণ যত বেশি, তাঁর নাম তত বেশি। প্রত্যেক গুণ অনুযায়ী তাঁর এক-একটা নাম ও খেতাব প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। তাই অনেকে বলেছেন, তাঁর নাম হাজারেরও বেশি।

স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

মুহাম্মাদ

মুহাম্মাদ তাঁর যেমন ব্যক্তিবাচক নাম, তেমনি গুণবাচক নামও। এ নামটি তাঁর মূল নাম। এ নামটি আল-ক্বুরআনে মোট ৪টি স্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ} (١٤٤) سورة آل عمران

"মুহাম্মাদ রসূল ব্যতীত কিছু নয়, তার পূর্বে বহু রসূল গত হয়ে গেছে।" *(আলে ইমরানঃ ১৪৪)*

{مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (আহ্যাব ঃ ৪০)

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ} (٢) سورة محمد

"যারা বিশ্বাস করেছে, সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করেছে, আর তা তাদের প্রতিপালক হতে সত্য; তিনি তাদের পাপরাশি ক্ষমা করেছেন এবং তাদের অবস্থা ভালো ক'রে দিয়েছেন।" (মুহাম্মাদ ঃ ২)

{مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ} (٢٩) سورة الفتح

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল; আর তার সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।" (ফাত্হ ঃ ২৯)

আর খোদ মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ).

অর্থাৎ, আমার পাঁচটি নাম, আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ। আমি মাহী (নিশ্চিহ্নকারী), যার দ্বারা আল্লাহ কুফরী নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি হাশের, যার পদপ্রান্তে মানুষের হাশর হবে। আর আমি হলাম আক্বেব (সব শেষে আগমনকারী), যার পরে কোন নবী নেই। *(বুখারী ৩৫৩২, মুসলিম ৬২৫১নং)*

অর্থাৎ, তাঁর সেই পাঁচটি নাম পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং পূর্ববর্তী দ্বীনদারদের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। অথবা সেই পাঁচটি নাম ইতিপূর্বে কোন নবীর ছিল না। এ সকল নাম কেবল তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট। তার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লিখিত 'মুহাম্মাদ' সর্বশ্রেষ্ঠ নাম।

'হাম্দ' মানে প্রশংসা, 'মাহমূদ' মানে প্রশংসিত, আর 'মুহাম্মাদ' মানে বহুল প্রশংসিত।

'মুহাম্মাদ' বহু প্রশংসনীয়, অনেকানেক প্রশংসার যোগ্য।

তাঁর চরিত্র প্রশংসনীয়, তাঁর কর্ম প্রশংসনীয়, তাই তিনি প্রশংসনীয়।

তিনি বহু মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের অধিকারী, তাই তিনি অনেকানেক প্রশংসার পাত্র। বারবার প্রশংসার পাত্র।

তিনি প্রশংসনীয়, তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য, সাংসারিক ও সামাজিক সৎকর্মাবলী, তাঁর ইবাদত ও ব্যবহার সব কিছুই প্রশংসনীয়। সে সব উল্লেখ করেই তাঁর প্রশংসা হয়, ভূয়সী প্রশংসা হয়।

শেষনবী ﷺ-ই উক্ত নামের উপযুক্ত। যেহেতু সার্থক নামের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তাঁর। মহান আল্লাহ তাঁর এত প্রশংসা করেছেন যে, অন্য কারো তত করেননি। তিনি তাঁর নামকে সৃষ্টির কাছে করেছেন সুউচ্চ। তিনি বলেছেন,

{أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} (٤)

অর্থাৎ, আমি কি তোমার বক্ষকে প্রশস্ত ক'রে দিইনি? আমি তোমার উপর হতে অপসারণ করেছি তোমার সেই ভার। যা তোমার পিঠকে ক'রে রেখেছিল ভারাক্রান্ত। আর আমি তোমার খ্যাতিকে সমুচ্চ করেছি। (আলাম নাশ্রাহ ঃ ১-৪)

কোন এক সময় এমন নেই, যে সময়ে তাঁর নাম উচ্চারিত হয় না। প্রত্যেক সময় পৃথিবীর কোন না কোন দেশে আযান হচ্ছেই হচ্ছে। বরং একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে একাধিক অক্তের আযান হচ্ছে। সে আযানে ধ্বনিত হচ্ছে, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ।'

একই সাথে সর্বদা কত শত নামাযী নামায পড়ছে এবং তাতে তাঁর নামে দরূদ পড়ছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٥٦)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর। (দরূদ ও সালাম পেশ কর।) (আহ্যাব ঃ ৫৬)

উক্ত আয়াতে নবী ﷺ-এর ঐ সম্মান ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা আসমানে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ফিরিশ্তাগণের নিকট বিদ্যমান। তা এই যে আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্তাগণের নিকট নবী ﷺ-এর সুনাম ও প্রশংসা করেন এবং তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করেন। আর ফিরিশ্তাগণও নবী ﷺ এর উচ্চমর্যাদার জন্য দুআ করেন। তার সাথে সাথে

আল্লাহ তাআলা বিশ্ববাসীদেরকেও আদেশ করেছেন, যেন তারাও নবী ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করে। যাতে নবী ﷺ-এর প্রশংসায় ঊর্ধ্ব ও নিম্ন দুই বিশ্ব একত্রিত হয়ে যায়। *(আহসানুল বায়ান)*

মহান আল্লাহ তাঁকে প্রশংসাযোগ্য এত গুণাবলী দান করেছেন, যত অন্য কোন সৃষ্টিকে দান করেননি। সেই সকল গুণাবলী মানুষ জানতে পেরে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। এমনকি সে মানুষ তাঁর প্রশংসা করে, যে তাঁকে 'নবী' বলে স্বীকার করে না। অনেক সময় তাঁর শত্রুর মুখ থেকেও তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলী প্রকাশ হয়ে পড়ে। ন্যায়পরায়ণ বহু অমুসলিমও তাঁর প্রশংসা না ক'রে পারেনি। যেহেতু তিনি প্রশংসার পাত্র 'মুহাম্মাদ'। হামদের আধার 'মুহাম্মাদ'।

আর যারা তাঁকে ভালোবাসে, তারা তো তাঁর প্রশংসা করবেই। ভালোবাসার পাত্র কি প্রশংসনীয় না হয়? মনে-মুখে তাঁর প্রশংসা করে, তাঁর নামে দরূদ পড়ে, তাঁর মতো প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার চেষ্টা করে, তাঁর নামে নাম রাখে, তাঁর আদর্শে আদর্শবান হওয়ার প্রয়াস চালিয়ে যায়। কোন হতভাগা মানুষ তাঁকে ভুল বুঝে তাঁর কোন কুৎসা রটালে তার প্রতিবাদ করে। যেহেতু তারা তাঁকে পৃথিবীর সকল মানুষ, আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, এমনকি নিজেদের প্রাণ অপেক্ষাও বেশি ভালোবাসে।

অতঃপর মানুষ কাল কিয়ামতে তাঁর যোগ্যতা দেখে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করবে। মহান প্রতিপালকের দরবারে সুপারিশ করাবার জন্য মানুষ তাঁর প্রশংসা ক'রে অনুরোধ জানাবে। সেই বিভীষিকাময় দিনের ভীষণ কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের মানসে মানুষ তাঁর প্রশংসা ক'রে তাঁকে ক্রোধান্বিত আল্লাহর কাছে আবেদন জানাতে আরজি জানাবে। তিনি প্রশংসিত হয়ে প্রশংসনীয় স্থান (মাক্বামে মাহমূদ)এ যাবেন এবং সিজদায় নীত হয়ে মহান প্রশংসনীয় প্রতিপালকের সর্বাধিক বেশি প্রশংসা করবেন। অতঃপর আল্লাহুল হামীদ মাক্বামে মাহমূদে মুহাম্মাদের হামদে তুষ্ট হয়ে তাঁর সুপারিশ মঞ্জুর করবেন।

সুন্দরকে কে না ভালোবাসে? সুন্দরের প্রশংসা কে না করে? অসুন্দরও সুন্দরের ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়। ফিরিশ্তা, জ্বিন, ইনসান এবং পশুও তাঁর সুন্দরতায় মোহিত হয়েছে।

বালক শিশু মুহাম্মাদকে দেখে শৈশবে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করেছে। যৌবনে তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করেছে এবং 'আল-আমীন' তাঁর উপাধি দিয়েছে।

নবুঅত প্রাপ্তির পর মু'মিনদের নিকট তিনি আরো প্রশংসিত হয়েছেন। আর প্রশংসিত না হলে কি 'নবী' হওয়া যায়?

তিনি যে আসলে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রশংসিত। বিশ্ব-রচনার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তিনি লিখে রেখেছেন, 'মুহাম্মাদ' প্রশংসিত। আদম সৃষ্টির আগে তিনি 'নবী' বলে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। সে কথা মহান আল্লাহ আম্বিয়াগণকে জানিয়েছেন। তিনি আম্বিয়াগণের নিকটেও প্রশংসিত।

তিনি পৃথিবীর সকল জ্ঞানীর নিকট প্রশংসিত। যেহেতু সুস্থ প্রকৃতির বিবেক ও জ্ঞান সুন্দরকে চিনতে ভুল করে না। আর যখন তা চিনতে পারে, তখন তার প্রশংসা না করে থাকতে পারে না।

হামদের একটি অর্থ শুক্র। সুতরাং মুহাম্মাদ মানে হবে, অনেক অনেক শুকরিয়া ও ধন্যবাদ প্রাপ্ত। সারা জাহান যাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

মুহাম্মাদ নামেই রয়েছে এমন সব অর্থ, যার ফলে তিনি আমাদের নিকট প্রশংসনীয়, তিনি আমাদের নিকট ধন্য-মান্য, তিনি আমাদের নিকট সম্মানার্হ ও শ্রদ্ধেয়। তিনি আমাদের ভালোবাসার পাত্র ও ভক্তিভাজন।

নিশ্চয় এ নাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসার নাম। নিশ্চয় এ নাম কেবল একজন প্রিয় ব্যক্তিরই সার্থক নাম। ইতিপূর্বে সে নাম কারো ছিল না, সে নামের যোগ্যও কেউ ছিল না।

আরবী কবি আব্বাস বিন মিরদাস সুলামী বলেছেন,

يا خاتمَ النُّبَآءِ إنَّكَ مُرسلٌ ... بالحقِّ كلُّ هُدى السَّبيل هُداكا

إنَّ الإلهَ بنى عليك محبَّةً ... في خلقِهِ ومحمَّداً سمَّاكا

অর্থাৎ, হে শেষনবী! নিঃসন্দেহে আপনি সত্য-সহ প্রেরিত। সকল সৎপথই আপনার সৎপথ।

নিশ্চয় উপাস্য (আল্লাহ) তাঁর সৃষ্টির মধ্যে আপনার উপর ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আপনার নাম দিয়েছেন 'মুহাম্মাদ'।

'মুহাম্মাদ' নামে প্রশংসা ও সম্মান আছে বলেই কুরাইশের কাফেররা তাঁকে 'মুহাম্মাদ' না বলে ঘৃণা ভরে তার বিপরীতার্থক শব্দ 'মুযাম্মাম' বলত। মহানবী ﷺ একদা সাহাবাগণকে বললেন,

(أَلاَ تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ؟ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ).

অর্থাৎ, তোমরা কি অবাক হও না যে, আল্লাহ কীভাবে আমার নিকট থেকে কুরাইশের গালি ও অভিশাপকে ফিরিয়ে রেখেছেন? তারা মুযাম্মামকে গালি দেয় ও মুযাম্মামকে অভিশাপ দেয়। অথচ আমি হলাম মুহাম্মাদ। (বুখারী ৩৫৩৩নং)

শত্রুরা তাঁকে ঘৃণা ভরে 'মুযাম্মাম' (নিন্দিত) বলত। কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে তিনি 'মুহাম্মাদ' (প্রশংসিত)। মহান আল্লাহ তাঁর দাদার মনে ঐ নাম প্রক্ষিপ্ত করেছিলেন। ফলে তিনি তাঁর ঐ নামকরণ করেছিলেন। আর প্রবাদে প্রসিদ্ধ আছে,

الأَلْقَابُ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ.

অর্থাৎ, উপাধিসমূহ আসমান (আল্লাহর পক্ষ) থেকে অবতীর্ণ হয়।

সতর্কতার বিষয় যে, এর অর্থ 'তাঁর যত উত্তম লকব আছে, সবই নাযিল হতো আসমান হতে' করা আরবী না বুঝার বিভ্রাট ছাড়া অন্য কিছু নয়।

মোট কথা, তাঁর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামপ্রাপ্ত হয়ে 'মুহাম্মাদ' নাম রেখেছিলেন। আর তা ছিল গুণবাচক নাম। তাঁর মন বলছিল, এই ছেলে বহুল প্রশংসনীয় হবে।

বর্ণিত আছে যে, আব্দুল মুত্তালিবকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'এ নাম তিনি কেন রাখলেন? এ নাম তো তাঁর পূর্ব পুরুষদের কারো ছিল না।'

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমি আশা করি যে, বিশ্ববাসীর সকলে তার প্রশংসা করবে।'

সুতরাং তাঁর গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর নাম নির্বাচন করা হয়েছিল। এ ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দিকনির্দেশ। যেহেতু তাঁর নিকট তিনি আগে থেকেই 'মুহাম্মাদ' ছিলেন। আর সার্থক ছিল সে নাম।

সে নাম এসেছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে।

সে নাম মনুসংহীতায় আছে 'মহমদ' শব্দে। অনুরূপ আছে অল্পোনিষদ ৭ম পরিচ্ছেদে।
উত্তরায়ন বেদ, অনকাহি (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)এ আছে, 'মোহাম্মদম'।
কুন্তাপসূক্তে বলা হয়েছে, 'নরাশংস' (যশস্বী)। যার আরবী প্রতিশব্দ হল 'মুহাম্মাদ'।
ঋগ্বেদ ৫, ২৭, ১এ আছে 'মামহ'।
ভৌতিক পুরাণে বলা হয়েছে, 'মহামত'।
সুতরাং সে নাম পূর্ব থেকেই প্রসিদ্ধ। সে ব্যক্তিত্ব পূর্ব থেকেই প্রশংসিত।
স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

বাকী থাকল, ইবনে আব্বাস নাকি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা যখন মাখলুকাতের সৃজন, যমীনকে নিম্নে স্থাপন ও আসমানসমূহকে উর্ধ্বে স্থাপনের ইচ্ছা করলেন তিনি নিজ নূর হতে এক মুষ্টি নূর গ্রহণ করলেন। অনন্তর তিনি ঐ মুষ্টি নূরকে বললেন ঃ তুমি আমার হাবীব মুহাম্মদ হয়ে যাও। অতঃপর সে নূর-ই-মুহাম্মদ আদম সৃষ্টির পাঁচশ বছর পূর্বে আরশ তাওয়াফ করেছিল। তাওয়াফকালে তা বলছিল---আল-হামদুলিল্লাহ্। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ এ হেতু আমি তোমার নামকরণ করলাম---মুহাম্মদ।' (নুযহাতুল মাজালিস ২/৩২৬)

এ সকল কথা মীলাদী গপ্প বৈ কিচ্ছু নয়।

অনুরূপ 'ঐ মহান নাম অংকিত হলো বেহেশতের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে।

মুহাম্মদ নামটি অংকিত আছে আরশের পায়ায়। সাত আসমানে, বেহেশ্তের বালাখানা সমূহে, বেহেশ্তের প্রাসাদসমূহে, ডাগর আঁখি বিশিষ্ট হুরসমূহের কণ্ঠে (?), তুবা বৃক্ষের পত্ররাজিতে, সিদ্রাতুল-মুনতাহায় (?)। বিশাল পর্দাসমূহের প্রান্তে প্রান্তে, ফেরেশ্তাদের চক্ষুসমূহে (?)।'

এ সকল কথাও মীলাদী ওয়াযের অতিরঞ্জিত কথা। এ সবের কোন সহীহ দলীল নেই। আরো লক্ষণীয় যে, মীলাদীদের আরবী অনুবাদও ভুলে-ভ্রমে ভরা।

আহমাদ

মহানবী ﷺ-এর একটি প্রসিদ্ধ নাম হল 'আহমাদ।' এই নামের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন তাঁর পূর্ববর্তী নবী ঈসা বিন মারয়্যাম ﵇। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে সে কথা বলেছেন,

{وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُول يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ} (٦) الصف

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যখন মারয়্যাম তনয় ঈসা বলেছিল, 'হে বানী ইস্রাঈল! আমি তোমাদের প্রতি (প্রেরিত) আল্লাহর রসূল এবং আমার পূর্ব হতে (তোমাদের নিকট) যে তাওরাত রয়েছে, আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রসূল আসবেন, আমি তাঁর সুসংবাদদাতা।' পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাদের নিকট আগমন করল, তখন তারা বলতে লাগল, 'এটা তো এক স্পষ্ট যাদু।' (স্বাফ্ ঃ ৬)

আর খোদ মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي

يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ).

অর্থাৎ, আমার পাঁচটি নাম, আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ। আমি মাহী (নিশ্চিহ্নকারী), যার দ্বারা আল্লাহ কুফরী নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি হাশের, যার পদপ্রান্তে মানুষের হাশর হবে। আর আমি হলাম আক্বেব (সব শেষে আগমনকারী), যার পরে কোন নবী নেই। *(বুখারী ৩৫৩২, মুসলিম ৬২৫১নং)*

'আহমাদ' শব্দটি superlative degree ক্রিয়াবিশেষণ। এর অর্থ হল সবার চাইতে বেশি প্রশংসাকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাকারী। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর বুকে যত নবী-অলী-সহ যত মানুষের আগমন ঘটেছে ও যত মানুষ আসবে, তাদের সবচেয়ে বেশি প্রশংসাকারী হলেন নবী আহমাদ ﷺ। তিনি যত তাঁর প্রতিপালকের প্রশংসা করেছেন ও করবেন অন্য কেউ তাঁর তত প্রশংসা করতে সক্ষম হবে না।

মহান আল্লাহ প্রশংসা ভালোবাসেন। তাই কুরআন কারীমের ভূমিকাস্বরূপ প্রশংসামূলক সূরা ফাতিহা অবতীর্ণ করলেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাকারী নবী আহমাদের উপর। পাঁচ অক্তের নামায ফরয করলেন এবং তার প্রত্যেক রাকআতে ফরয করলেন সেই সূরা পাঠকে। মহান আল্লাহ সেই সূরার ব্যাপারে বলেছেন,

{وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} (٨٧) سورة الحجر

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তোমাকে দিয়েছি পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত এবং মহা কুরআন। (হিজ্‌র ঃ ৮৭)

সেই সূরার প্রথমাংশ দিয়ে মহানবী আহমাদ ﷺ তাঁর কত প্রশংসা করেছেন। ফরয-নফল কত নামাযে তিনি তাঁর যত প্রশংসা করেছেন, অন্য কোন নেক বান্দা তা করতে পারেননি।

তিনিই বলতেন,

اَلْحَمْدُ لِلّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، اَلْحَمْدُ لِلّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، اَلْحَمْدُ لِلّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، اَلْحَمْدُ لِلّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَلَى مِلءِ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ.

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রশংসা তাঁর সৃষ্টির সমান সংখ্যক, আল্লাহর প্রশংসা তাঁর সৃষ্টি পরিপূর্ণ, আল্লাহর প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তার সমান সংখ্যক, আল্লাহর প্রশংসা তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে তার সমান সংখ্যক, আল্লাহর প্রশংসা তাঁর কিতাব যা গণনা করেছে তার পরিপূর্ণ, আল্লাহর প্রশংসা সকল বস্তুর সংখ্যা পরিমাণ এবং আল্লাহর প্রশংসা সকল বস্তু পরিপূর্ণ। *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ২৬১৫নং)*

সৃষ্টির সকল কিছু তাঁর প্রশংসা করে। তিনি করেছেন সবার চাইতে বেশি। কিয়ামতেও তিনি মহান আল্লাহর সর্বাধিক প্রশংসা করবেন। তিনি বলেন, "কিয়ামতের দিন আমি হব সকল মানুষের নেতা। তোমরা কি জান, কী কারণে? কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সমগ্র মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে। (সে ময়দানটি এমন হবে যে,) সেখানে দর্শক তাদেরকে দেখতে পাবে এবং আহবানকারী (নিজ আহবান) তাদেরকে শুনাতে পারবে। সূর্য একেবারে কাছে এসে যাবে। মানুষ এতই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিপতিত হবে যে, ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। তারা বলবে, 'দেখ, তোমাদের সবার কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তোমাদের কী বিপদ এসে পৌঁছেছে! এমন কোন ব্যক্তির খোঁজ কর, যিনি পরওয়ারদেগারের

কাছে সুপারিশ করতে পারেন।' লোকেরা বলবে, 'চল আদমের কাছে যাই।' সে মতে তারা আদমের কাছে এসে বলবে, 'আপনি মানব জাতির পিতা, আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং ফুঁক দিয়ে তাঁর 'রূহ' আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর নির্দেশে ফিরিশ্তাগণ আপনাকে সিজদা করেছিলেন। আপনাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি?' আদম ﷺ বলবেন, 'আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তার নির্দেশ অমান্য করেছিলাম। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও।'

সুতরাং তারা সকলে নূহ ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে নূহ! আপনি পৃথিবীর প্রতি প্রথম প্রেরিত রসূল। আল্লাহ আপনাকে শোকর-গুজার বান্দা হিসাবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি?' নূহ ﷺ বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া আমার একটি দুআ ছিল, যার দ্বারা আমার জাতির উপর বদ্দুআ করেছি। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও।'

সুতরাং তারা সবাই ইব্রাহীম ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে ইব্রাহীম! আপনি আল্লাহর নবী ও পৃথিবীবাসীদের মধ্য থেকে আপনিই তাঁর বন্ধু। আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী যন্ত্রণার মধ্যে আছি?' তিনি তাদেরকে বলবেন, 'আমার পালনকর্তা আজ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন রাগান্বিত তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া (দুনিয়াতে) আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছি। সুতরাং আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও।'

অতঃপর তারা মূসা ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে মূসা! আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে তাঁর রিসালত দিয়ে এবং আপনার সাথে (সরাসরি) কথা বলে সমগ্র মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী দুর্ভোগ পোহাচ্ছি?' তিনি বলবেন, 'আজ আমার প্রতিপালক এত ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর আগে কখনো হননি এবং আগামীতেও আর কোনদিন হবেন না। তাছাড়া আমি তো (পৃথিবীতে) একটি প্রাণ হত্যা করেছিলাম, যাকে হত্যা করার কোন নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও।'

অতঃপর তারা সবাই ঈসা ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনি আল্লাহর সেই কালেমা, যা তিনি মারয়্যামের প্রতি প্রক্ষেপ করেছিলেন। আপনি হচ্ছেন তাঁর রূহ, আপনি (জন্ম নেওয়ার পর) শিশুকালে দোলনায় শুয়েই মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী যন্ত্রণার মধ্যে আছি?' তিনি তাদেরকে বলবেন, 'আমার পালনকর্তা আজ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন রাগান্বিত তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। (এখানে তিনি তাঁর কোন অপরাধ উল্লেখ করেননি।) আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও।'

সুতরাং তারা সবাই আমার কাছে এসে বলবে, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি আখেরী নবী। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী (ভয়াবহ) দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করছি।'

(فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي).

তখন আমি চলে যাব এবং আরশের নীচে আমার প্রতিপালকের জন্য সিজদাবনত হব। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের জন্য আমার হৃদয়কে এমন উন্মুক্ত ক'রে দেবেন, যেমন ইতোপূর্বে আর কারো জন্য করেননি।

অতঃপর তিনি বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' তখন আমি মাথা উঠিয়ে বলব, আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক!' এর প্রত্যুত্তরে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বলা হবে, 'হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে ডান দিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও। এই দরজা ছাড়া তারা অন্য সব দরজাতেও সকল মানুষের শরীক।'

অতঃপর তিনি বললেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, তাঁর কসম! জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা হচ্ছে মক্কা ও (বাহরাইনের) হাজারের মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা মক্কা ও (সিরিয়ার) বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।" *(বুখারী ৪৭১২, মুসলিম ৫০১নং)*

এটাই সেই প্রশংসার স্থান 'মাক্বামে মাহমূদ' যার কথা মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি আযান শুনে (আযানের শেষে) এই দুআ বলবে, 'আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'অতিত্ তা-ম্মাহ, অসস্বালা-তিল ক্বা-য়িমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাযীলাহ, অবআষহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অআত্তাহ।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ ﷺ-কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।

সে ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।" *(বুখারী ৬১৪নং)*

সুতরাং 'আহমাদ' তাঁর সার্থক নাম। এ নামের অধিকারী কেবল তিনিই।

তিনিই সর্বাধিক প্রশংসাকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন, যেহেতু তিনিই ছিলেন প্রশংসনীয় প্রভুর ব্যাপারে অধিক বিজ্ঞ। যে যার গুণাবলী যত বেশি জানবে, সে তার প্রশংসায় তত বেশি পঞ্চমুখ হবে। তিনি নিজ প্রতিপালকের গুণাবলী যেমন চিনেছিলেন, তেমনটি আর কেউ চেনেনি। তিনি যে বিশাল অনুগ্রহের উপহার পেয়েছিলেন প্রভুর নিকট থেকে, তাতে তাঁর সর্বাধিক প্রশংসা করার কথাই বটে।

তিনি যেমন প্রশংসিত, তেমনি প্রশংসাকারী। তিনি মুহাম্মাদ, তিনি আহমাদ। কিন্তু কোন্ নামটি আগে পরিচিত?

কুরআন কারীমে মুহাম্মাদ-আহমাদ উভয় নামই আছে। তবে আহমাদ নামটি ইঞ্জীল কিতাবে এবং ঈসা ﷺ-এর মুখে পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে।

অনেকে বলেন, বরং মুহাম্মাদ নাম তার পূর্বে তাওরাত কিতাবে উল্লিখিত হয়েছে।

সে যাই হোক, তিনি মহান প্রতিপালকের 'আহমাদ' ছিলেন, তাই তার বিনিময়ে তিনি তাকে 'মুহাম্মাদ' বানিয়েছেন। প্রতিদান সাধারণতঃ সমশ্রেণীর দানের বিনিময় হয়ে থাকে। তিনি মহান আল্লাহর সর্বাধিক প্রশংসাকারী ছিলেন, তাই মহান আল্লাহ তাঁকে বহুল প্রশংসিত রূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন।

শৈশবে তাঁর লালন-পালনকারিগণ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কৈশোর ও যৌবনে তাঁর সম্প্রদায় 'আল-আমীন' বলে প্রশংসা করেছে। অতঃপর যখন তিনি নবুঅতপ্রাপ্ত হয়েছেন, তখন তিনি মহান আল্লাহর পূর্ণ পরিচিতি ও অনুগ্রহ লাভ ক'রে তাঁর সর্বাধিক প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

এইভাবে তিনি আগে অথবা পরে আহমাদ ও মুহাম্মাদ।

অবশ্য অনেকে বলেছেন, 'আহমাদ' অর্থ সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয়, প্রশংসার্হ, প্রশংসার যোগ্য বা প্রশংসিত।

বেদগ্রন্থে তাঁকে প্রশংসাকারী ও স্তুতিপাঠক বলা হয়েছে। সামবেদে ঐ নামকে 'অহমিধি' বলা হয়েছে। স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

আবুল ক্বাসেম

এটি প্রিয় নবী ﷺ-এর উপনাম। উপনাম রাখা হয় বড় ছেলের নামের আগে 'আব' শব্দ যোগ ক'রে। সেই সূত্রে তিনি আবুল, আবাল বা আবিল ক্বাসেম নামে পরিচিত।

mrfbhD ﷺ-ˆv njt icÛ-jbAf JflDuf (vf})ˆv osHG u¦m sbb. sjht ƒhvfrDm dYstb mfdvqfr djhdkqfv osHG.

k]fv icÛ n§Àfb dYt 4de. (1) j¶fsnm; zfv k]fv bfm Lsvƒ mrfbhD ﷺ-ˆv …ibfm dYt zfhct jfsnm. dkdb z¬i jsqj dlb mfÛ lcdbqfsk sh]sy dYstb. (2) kfsrv (3) k¶fƒƒdqh W (4) ƒhvfrDm.

‰dkrfdnj k¶fhfvD zfsvf ˆjub icsÛv jKf …sïJ jsvsYb.

dkdb rstb zfèciïfr. mkf§Àsv kfsrv W k¶fƒƒdqh rt zfèciïfrvƒ …ifdL.

ƒhvfrDsmv u¦m rq mlDbfq. dkdb 22 mfn uDdhk dYstb. zk}iv mrfbhD ﷺ-ˆv ƒd§Àjfstv mfÛ 3 mfn zfso dkdb mfvf pfb. k]fvƒ mxkcAv nmq mrfbhD ﷺ-ˆv syfsJ zwa¢ dhodtk rq. zhdwó n§ÀfbW k]fv uDhÜwfq ƒrstfj kAfo jsvb. sjht Ifskmf (vfdp¶qfïfù zfbrf) k]fv ƒd§Àjfstv Yq mfn iv mfvf pfb.

j¶fsnmƒ k]fv iaKm n§Àfb. kfƒ k]fvƒ bfm Lsv mrfbhD ﷺ-sj `zfhct j¶fsnm' htf rq. zfhC ùvfƒvf hV zflshv nfsK ‰ …ibfm …sïJ j'sv rflDn hBGbf jvskb. spmb dkdb htskb,

zfhct j¶fsnm ﷺ hstsYb, ªskfmvf zfmfv bfsm bfm vfsJf, ksh zfmfv …ibfsm …ibfm svsJf bf.« (hcJfvD 3539, 6188, mcndtm 5720bQ)

zfmfsj zfmfv diaqkm zfhct j¶fsnm ﷺ hstsYb sp, ªsnƒ mdrtfv sjfb bfmfp jhct rq bf, sp kfv öfmD YfVf zbA jfsvfv ubA ncodá hAhrfv jsv; pk[B bf sn bfifjDv sofnt jvfv mk sofnt jsv sbq.« zkˆh kcdm dIsv pfW, sofnt jsv ncodá Lcsq sIt. kfviv dIsv ˆsn bfmfp isVf.' *(zfhC lf†l, bfnf„, ƒhsb mfufr, hffrfjD, dntdntfr nrDrfr 1031bQ)*

zfdm nkAdbô W dhÇh²À ˆƒ ùuvf-Wqftf zfhct j¶fsnm ﷺ-sj htsk ðsbdY sp, ªlcHGfof YfVf zbA jfsvf (r™lq) sKsj lqf, dYdbsq sbWqf rq bf.« *(zfrmfl, 2/301, zfhC lf…l 4942, dkvdmpD, ƒhsb drêfb, nrDùt ufsm' 7467bQ)*

mCnf dhb nftfmfr zft-ùpftD hstb, zfdm ƒhsb zfêfnsj duÎfnf jvtfm, `zfdm mÄfq Kfjst ˆhQ ƒmfsmv nfsK bfmfp bf iVst sjmb bfmfp iVh?' …Ùsv dkdb htstb, `lcƒ vfjzfk ; zfhct j¶fsnm ﷺ-ˆv ncâfk.' (mcndtm 1609bQ)

zf©mfv ƒhsb ƒqfdnv ﷺ rsk hdBGk, dkdb hstb, `sp hAdÙÁ ns¦lsrv dlsb svfpf vfJt, sn zhwAƒ zfhct j¶fsnm ﷺ-ˆv bfIvmfbD jvt.' *(zfhC lf†l 2334, dkvdmpD 686bQ)*

zfbfn ﷺ hstb, ˆjub ƒùlD djswfv bhD ﷺ-ˆv dJlmk jvk. sn iDdVk rst mrfbhD ﷺ kfsj slJf jvsk ˆstb ˆhQ kfv dwKfsb hsn htstb, ªƒntfm oarB jv (kcdm mcndtm rsq pfW).« k]fv ˆƒ jKf wcsb sn kfv dikfv dlsj (kfv mk ufbsk) lxdóifk jvt. kfv dikf kfv

dbjse*f* hsn dYt. sn htt, `zfhct jfsnm ﷺ-ˆv jKf kcdm smsb bfW. Ist djswfvde mcntmfb rsq sot. zk}iv bhD ﷺ ˆ*f* htsk htsk shv rsq sostb, ªsn*f* zfïfrv njt iawQnf dpdb Wsj ufrfâfm sKsj h]fdysq dbstb.« kfviv djswfvde mfvf sost dkdb njstv …sÜswA htstb, ªskfmvf skfmfslv ˆj nfKDv ufbfpf iV.« *(hcJfvD 1356bQ)*

বলা বাহুল্য, এই উপনাম সাহাবাগণের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। তবে তাঁর একটি গুণবাচক নাম ছিল 'আল-ক্বাসেম'। যেমন সে কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

আল-আমীন

নবুঅতের পূর্বে মহানবী ﷺ-কে মক্কার সবাই 'আল-আমীন' বলে আখ্যায়ন করত।

যেহেতু তাঁর কাজকর্ম ছিল সব চাইতে আকর্ষণীয়, চরিত্র ছিল সর্বোত্তম এবং মহানুভবতা ছিল সর্বযুগের সকলের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

তিনি ছিলেন সর্বাধিক শিষ্টাচারী, নম্র-ভদ্র, সদালাপী ও সদাচারী।

তিনি ছিলেন সবার চাইতে দয়ার্দ্রচিত্ত, দূরদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী, ও সত্যবাদী। মিথ্যা কখনোই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর জন্য তিনি এতই প্রসিদ্ধ ও প্রশংসনীয় ছিলেন যে, মক্কার লোকে তাঁকে 'আল-আমীন' বলেই আহবান করত। যেহেতু তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবার চাইতে নির্ভরযোগ্য আমানতদার ও বিশ্বস্ত। *(আর-রাহীকুল মাখতূম ১২ ১পৃঃ)*

লোকেরা তাঁর কাছে নিজেদের আমানত রাখত। এমনকি যে রাতে তিনি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, সে রাতেও তাঁর কাছে কিছু লোকের আমানত গচ্ছিত ছিল, যা তিনি আলী رضي الله عنه-কে তার মালিকগণকে প্রত্যর্পণ করতে আদেশ ক'রে হিজরত করেছিলেন।

মহানবী ﷺ-এর বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন কুরাইশরা কা'বাগৃহের পুনর্নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। কার্য যখন হাজারে আসওয়াদ-এর স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল, তখন তাদের মাঝে একটি সমস্যার সৃষ্টি হল। আর তা হল, হাজারে আসওয়াদটিকে কে তার যথাস্থানে স্থাপন করার মহা গৌরব অর্জন করবে তা নিয়ে।

প্রত্যেকেরই দাবী, সে নিজে বা তার গোত্রের লোকে পাথরটিকে যথাস্থানে রাখার মর্যাদা লাভ করবে। সকলের একই কথা, একই জেদ। জেদ ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হল রেষারেষিতে। রেষারেষির পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে রক্তারক্তি। এ ব্যাপারে রক্তারক্তি করতেও তারা পিছপা নয়। সকল গোত্রেই মধ্যেই শুরু হল 'সাজ-সাজ' রব। শুরু হয়ে গেল অস্ত্রের মহড়া। নরমপন্থীগণ আতঙ্কিত হয়ে উঠল, কখন যুদ্ধ বেধে যায় কে জানে।

এমনিতর বিভীষিকাময় অবস্থার প্রেক্ষাপটে এক বষীয়ান নেতা আবূ উমাইয়া মাখযূমী এই সমস্যা সমাধানের একটি সূত্র খুঁজে পেয়ে সকলের সামনে তা পেশ করলেন। সকলের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব রাখলেন, আগামী কাল ভোর সকালে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, তার ওপরেই এই বিবাদ-মীমাংসার দায়িত্বভার অর্পণ করা হবে। সকলেই এই প্রস্তাবকে একবাক্যে সমর্থন করে ক্ষান্ত হল।

আল্লাহর কী অপার মহিমা! দেখা গেল সকল গোত্রের প্রিয়পাত্র ও শ্রদ্ধেয়জন মুহাম্মাদই সর্বপ্রথম মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করছেন। সকলে তাঁকে দেখে বলে উঠল,

هذَا الأَمِينُ، رَضِينَاهُ، هذَا مُحَمَّدٌ.

অর্থাৎ, এ তো 'আল-আমীন' (বিশ্বাসভাজন), আমরা এঁর ব্যাপারে সম্মত। এ তো মুহাম্মাদ!

অতঃপর মহানবী ﷺ যখন তাদের নিকটবর্তী হলেন, তখন সমস্যা সবিস্তারে তাঁকে জানানো হল। সুতরাং এর সমাধানকল্পে তিনি এক খানা চাদর চাইলেন। চাদর আনা হলে তিনি তা মেঝের উপর বিছিয়ে দিয়ে স্বহস্তে পাথরটিকে তার উপর স্থাপন করলেন এবং বিবদমান গোত্রপতিগণকে আহবান জানিয়ে বললেন, 'আপনারা সকলে এক সঙ্গে চাদরটির এক এক প্রান্তে ধারণ করুন এবং পাথরটিকে বহন করে তার নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে চলুন।'

অতঃপর তিনি স্বহস্তে তা তুলে নিয়ে যথাস্থানে (গৃহকোণে) স্থাপন করলেন। এই মীমাংসা মক্কার সকলেই হৃষ্টচিত্তে মেনে নিল। অত্যন্ত সহজ, সুশৃঙ্খল ও সঙ্গত পন্থায় কঠিন একটি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। *(আর-রাহীকুল মাখতূম ১১৭-১১৮পৃঃ)*

মহানবী ﷺ তাঁর নবুঅত ও রিসালতের ব্যাপারেও বড় আমীন ছিলেন। তিনি আমানতের সাথে সে দায়িত্ব পালন ক'রে উম্মতকে ঋণী ক'রে গেছেন। আল্লাহর কাছেও তিনি 'আল-আমীন'।

« أَلاَ تَأْمَنُونِى وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِى السَّمَاءِ يَأْتِينِى خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ».

"তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না কি? অথচ আমি তাঁর নিকট বিশ্বস্ত যিনি আকাশে আছেন। আমার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় আকাশের খবর আসে।" *(বুখারী ৪৩৫১, মুসলিম ২৫০০নং)*

আল-হাশের

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ).

অর্থাৎ, আমার পাঁচটি নাম, আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ। আমি মাহী (নিশ্চিহ্নকারী), যার দ্বারা আল্লাহ কুফরী নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি হাশের, যার পদপ্রান্তে মানুষের হাশর হবে। আর আমি হলাম আক্বেব (সব শেষে আগমনকারী), যার পরে কোন নবী নেই। *(বুখারী ৩৫৩২, মুসলিম ৬২৫১নং)*

'হাশের' শব্দের অর্থ হল, হাশরকারী, জমায়েতকারী।

তাঁর পদপ্রান্তে মানুষের হাশর হবে, তার মানে তিনি সর্বপ্রথম কবর থেকে উত্থিত হবেন। অতঃপর সকল মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে। যেমন তিনি বলেছেন,

« أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ ».

অর্থাৎ, আমি কিয়ামতের দিন আদম-সন্তানদের সর্দার। সর্বপ্রথম আমার কবরই বিদীর্ণ হবে এবং প্রথম আমিই সুপারিশকারী ও আমার সুপারিশ গৃহীত হবে। *(মুসলিম ৬০৭৯নং)*

অথবা তাঁর নবুঅতকালে মানুষের হাশর-নাশর ও কিয়ামত হবে। তার মানে তাঁর পরে আর কারো নবুঅত নেই। তিনিই সর্বশেষ নবী। যেমন তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত ক'রে বলেছেন,

« بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ».

অর্থাৎ, আমার প্রেরণকাল ও কিয়ামত এই দুইয়ের মতো। *(বুখারী ৫৩০১, মুসলিম ২০৪২নং)*

অথবা কিয়ামতে সমস্ত মানুষ তাঁর চারিপাশে জমায়েত হবে।

অথবা সকল মানুষকে তাঁর শরীয়ত ও সুন্নাতের উপরে জমায়েত করা হবে। অর্থাৎ, তিনিই হবেন বিশ্বনবী। মানব-দানব সকলের নবী। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কারোই তাঁর পতাকার ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। কুফরী থেকে মুক্তি পেতে কাফেরকে তাঁর শরীয়ত মানতে হবে এবং বিদআত ও ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পেতে মুসলিমকে তাঁর সুন্নাহ অবলম্বন করতে হবে।

আদ্-দাঈ

দাঈ মানে দাওয়াতদাতা, আহবায়ক।

মহানবী ﷺ ছিলেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীনের দাঈ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا}

অর্থাৎ, হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। *(আহযাবঃ ৪৫-৪৬)*

বলা বাহুল্য, তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবানকারী।

তিনি ছিলেন ইসলামের দিকে মানুষকে আহবানকারী।

তিনি ছিলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দিকে মানুষকে আহবানকারী।

তিনি ছিলেন তাওহীদের দিকে মানুষকে আহবানকারী।

তিনি ছিলেন একমাত্র মহান আল্লাহর শরীকবিহীন ইবাদতের দিকে মানুষকে আহবানকারী।

তিনি ছিলেন জান্নাতের দিকে মানুষকে আহবানকারী।

আর সে আহবান ছিল মহান আল্লাহর আদেশ ও অনুমতিক্রমে।

সে আহবান নিজের দিকে বা নিজের পক্ষ থেকে ছিল না।

তিনি দ্বীনের দাঈদের সর্দার ও আদর্শ। আর দাঈর দাওয়াতের 'আহবান-বাণী' অপেক্ষা আর কোন্ কথা শ্রেষ্ঠ হতে পারে?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (٣٣) سورة فصلت

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)' তার অপেক্ষা কথায় উত্তম আর কোন্ ব্যক্তি? *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৩)*

সুতরাং সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা এহেন আহবানে সন্তুষ্ট ও উদারচিত্তে সাড়া দেয়। চির সুখের ঠিকানা তাদের জন্য, যারা এমন দাওয়াত কবুল ক'রে মহান সৃষ্টিকর্তার দাওয়াত গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (٢٢١) سورة البقرة

অর্থাৎ, ওরা আগুনের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছায় বেহেশ্ত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। *(বাক্বারাহ ঃ ২২১)*

{وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (٢٥) سورة يونس

অর্থাৎ, আল্লাহ (মানুষ)কে শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। *(ইউনুস ঃ ২৫)*

আর-রাঊফ, আর-রাহীম

রাঊফ মানে স্নেহশীল, রাহীম মানে করুণাপরায়ণ, দয়ার সাগর।

এ দু'টি মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম। কিন্তু সেই গুণ দিয়ে তিনি নিজ প্রিয়তম নবীকেও আখ্যায়ন করেছেন। তিনি বলেছেন,

{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (١٢٨)

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রসূল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ। (তাওবাহ ঃ ১২৮)

তবে নিশ্চিতভাবে সেই 'আর-রাঊফুর-রাহীম' আর এই 'আর-রাঊফুর-রাহীম' এক নয়। যেহেতু তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা, আর ইনি হলেন সৃষ্টি।

তাঁর আছে ১০০টি রহমত, আর ইনি তাঁর একটি রহমতেরই 'রাহীম' রূপ।

তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহর একশটি রহমত আছে, যার মধ্য হতে একটি মাত্র রহমত তিনি মানব-দানব, পশু ও কীটপতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই (সৃষ্টজীব) একে অপরকে মায়া করে, তার কারণেই একে অন্যকে দয়া করে এবং তার কারণেই হিংস্র জন্তুরা তাদের সন্তানকে মায়া ক'রে থাকে। বাকী নিরানব্বইটি আল্লাহ পরকালের জন্য রেখে দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের উপর রহম করবেন।" (বুখারী ৬০০০, মুসলিম ৭১৫০নং)

তিনি ছিলেন বিশ্বমানবতার শিক্ষাগুরু। সৃষ্টির প্রতি স্নেহশীল দয়াময়। শিক্ষকের চাবুকও যেমন ছাত্রের জন্য দয়াস্বরূপ, তেমনি দয়ার নবীর জিহাদও মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ। যেহেতু মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁকে রহমতের মূর্তপ্রতীক করেই এ ধরণীর বুকে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } (١٠٧) سورة الأنبياء

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি।" *(আম্বিয়াঃ ১০৭)*

তাঁর দয়ার স্পষ্ট চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় মানুষকে দোযখ থেকে মুক্তি দেওয়ার পথে তাঁর সর্বাত্মক চেষ্টার মাঝে।

তাঁর দয়ার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় এতীম, নারী ও অসহায়কে সাহায্য-সহযোগিতা করা ও করতে উদ্বুদ্ধ করার মাঝে।

তাঁর দয়ার বিকাশ নজরে আসে পশুপক্ষীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করা ও করতে আদেশ করার মাঝে।

তাঁর দয়ার প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয় তাঁর মহানুভবতা, সহমর্মিতা ও ক্ষমাশীলতার মাঝে।

আর-রাসূল

'রসূল' মানে দূত, প্রেরিত-পুরুষ। তিনি ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে প্রেরিত দূত। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ।

মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর আসল নাম ধরে ডাকতেন না। বরং তিনি তাঁকে তাঁর উপনাম ধরে ডাকতেন। অনেক সময় বলতেন, 'ইয়া আয়্যুহার রাসূল! (হে রসূল!)' যেমন ঃ-

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ} (٤١) سورة المائدة

"হে রসূল! যারা মুখে বলে, 'বিশ্বাস করেছি' কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নয় ও যারা ইয়াহুদী হয়েছে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়।" *(মায়িদাহ ঃ ৪১)*

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} (٦٧) سورة المائدة

"হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি তা না কর, তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।" (মায়িদাহ ঃ ৬৭)

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় তিনি তাঁকে 'রাসূলুল্লাহ' বলেই আখ্যায়ন করেছেন। যেমন ঃ-

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ} (١٥٨) سورة الأعراف

"বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান।" (আ'রাফ ঃ ১৫৮)

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (আহ্যাব ঃ ২১)

{مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}

"মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী।

আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (আহ্যাব ঃ ৪০)

{مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ} (٢٩) سورة الفتح

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল; আর তার সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।" (ফাত্হ ঃ ২৯)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

« أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ».

"মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ সংগ্রাম করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর নামায কায়েম করবে ও (ধনের) যাকাত আদায় করবে। যখন তারা এগুলি বাস্তবায়ন করবে, তখন ইসলামী হক (অর্থদণ্ড ইত্যাদি) ছাড়া তারা নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে সুরক্ষিত ক'রে নেবে। আর (অন্তরের গভীরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে) তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায়।" *(বুখারী ২৫, মুসলিম ১৩৮-নং)*

আন-নাবী

'নাবী' মানে সংবাদবাহী, সংবাদদাতা।

তিনি ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সংবাদদাতা। গায়বের নানা খবর, জান্নাত-জাহান্নামের খবর, মু'মিন ও কাফেরের পরিণাম সংক্রান্ত খবর, অতীতের নানা ইতিহাস ও ভবিষ্যতের নানা ঘটনা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীপ্রাপ্ত হয়ে মানুষকে জানিয়ে গেছেন।

মহান আল্লাহ তাঁকে এই উপনামেও অনেক সময় ডাকতেন। যেমন ঃ-

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٦٤) سورة الأنفال

"হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী বিশ্বাসিগণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" *(আনফাল ঃ ৬৪)*

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (١) الأحزاب

"হে নবী ! আল্লাহকে ভয় কর এবং অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (আহ্যাব ঃ ১)

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} (٤٥) سورة الأحزاب

"হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।" *(আহ্যাব ঃ ৪৫)*

আশ্-শা-হিদ, আশ্-শাহীদ

মহানবী ﷺ-এর একটি গুণবাচক উপনাম এটি। এর অর্থ প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষী। যে ব্যক্তি ঘটনা নিজ অক্ষি বা চক্ষু দ্বারা দর্শন করে।

কিয়ামতের দিন মহাবিচার অনুষ্ঠিত হবে। সে বিচারে মহান বিচারক আল্লাহ তাআলা অনায়াসে মানব-দানবের বিচার করবেন। সে বিচারে তিনি নিজেই হাকীম হয়ে হিসাব নেবেন। আর হিসাব নেওয়ার জন্য তিনিই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন,

{ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ} (٦٢) سورة الأنعام

"অতঃপর তাদের আসল প্রভুর দিকে তারা আনীত হয়। জেনে রাখ, ফায়সালা তো তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর।" (আন্‌আম ঃ ৬২)

{وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ } (٤٧) سورة الأنبياء

"কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের দাঁড়িপাল্লাসমূহ; সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওজনের হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।" (আম্বিয়া ঃ ৪৭)

সে বিচারে তিনি নিজেই উকীল। আর উকীল হওয়ার জন্য তিনিই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন,

{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} (٦٢) سورة الزمر

"আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক (উকীল)।" (যুমার ঃ ৬২)

{وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً} (١٣٢) سورة النساء

"আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই এবং কর্ম-বিধায়ক (উকীল) হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (নিসা ঃ ১৩২)

{وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً} (٦٥) سورة الإسراء

"কর্মবিধায়ক (উকীল) হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৬৫)

{وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} (٣) سورة الأحزاب

"তুমি আল্লাহর ওপর নির্ভর কর, কর্মবিধায়ক (উকীল) হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।" *(আহযাব ঃ ৩)*

উকীল ধরতে হলে বড় উকীল ধরাই উচিত। তিনিই সবচেয়ে বড় উকীল। কিয়ামতে তিনি ছাড়া আর কোন উকীল পাওয়া যাবে না। সুতরাং তাঁকে উকীল ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ। তিনি বলেছেন,

{رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا} (٩) سورة المزمل

"তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর উকীল (কর্মবিধায়ক)রূপে।" (মুয্‌যাম্মিল ঃ ৯)

{وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً} (٢) الإسراء

"আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও তা(কে) করেছিলাম বানী ইস্রাঈলের জন্য পথ-নির্দেশক; (বলেছিলাম,) তোমরা আমাকে ব্যতীত অপর কাউকেও কর্মবিধায়ক (উকীল)রূপে গ্রহণ করো না।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ২)

{أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (٣٦) الزمر

"আল্লাহ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের

ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।” *(যুমারঃ ৩৬)*

সুবিচারে তিনিই যথেষ্ট। সে বিচারে তিনিই সাক্ষী। আর সাক্ষী হওয়ার জন্য তিনিই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন,

{الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (٩) سورة البروج

“আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁর। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ের সাক্ষী।” *(বুরুজঃ৯)*

{يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (٦)

“যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তারা করত; আল্লাহ ওর হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সাক্ষী।” (মুজাদালাহ্‌ ঃ ৬)

{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (٥٣) سورة فصلت

“আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য। এ কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী?” (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৫৩)

{فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ} (٢٩) سورة يونس

“বস্তুতঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম।” (ইউনুস ঃ ২৯)

{قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا} (٩٦) سورة الإسراء

“বল, ‘আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি তাঁর দাসদেরকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।” (বানী ইস্রাঈল ঃ ৯৬)

তবুও বান্দাকে ন্যায় বিচারে সন্তুষ্ট করানোর জন্য, তাকে সুবিচারে সুনিশ্চিত করার জন্য, তার উপর নিজের হুজ্জত কায়েম করার জন্য এবং তার মিথ্যাবাদিতা প্রমাণ করার জন্য মহান বিচারক আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির মধ্য হতে অনেককেই সাক্ষী মানবেন। তিনি প্রত্যেক উম্মত থেকেই সাক্ষী উপস্থিত করবেন। আর আমাদের নবীকেও সাক্ষীর সম্মান দেবেন কাল কিয়ামত-কোর্টে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا} (٤١) سورة النساء

“তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নবী) উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?” (নিসা ঃ ৪১)

{وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلاَء} (٨٩) النحل

সেদিন প্রত্যেক জাতিতে তাদেরই মধ্য হতে তাদেরই বিপক্ষে এক একজন সাক্ষী দাঁড় করাব এবং ওদের বিষয়ে তোমাকে আমি আনব সাক্ষীরূপে। (নাহ্‌ল ঃ ৮৯)

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} (٤٥) سورة الأحزاب

“হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।” *(আহযাব ঃ ৪৫)*

{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} (٨) سورة الفتح

"নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।" *(ফাত্হ ঃ ৮)*

{إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا} (١٥) سورة المزمل

"আমি তোমাদের নিকট তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ এক রসূল পাঠিয়েছি, যেমন রসূল পাঠিয়েছিলাম ফিরআউনের নিকট।" (মুযযাম্মিল ঃ ১৫)

মহানবী ﷺ দুনিয়ার বুকে প্রতিপালকের তাওহীদের সাক্ষী ছিলেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র। আর আখেরাতে সাক্ষ্য দেবেন মানুষের ভালো-মন্দ আমলের।

আত্বা বিন য়্যাসার বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﵁-এর সাক্ষাতে বললাম, 'তাওরাতে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলী সম্পর্কে আমাকে বলুন।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! তিনি কুরআনে বর্ণিত কিছু গুণে তাওরাতেও গুণান্বিত। (যেমন,) "হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে" (আহ্যাব ঃ ৪৫) এবং নিরক্ষর (আরব)দের জন্য নিরাপত্তারূপে। তুমি আমার দাস ও রসূল। আমি তোমার নাম রেখেছি 'আল-মুতাওয়াক্কিল' (আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল)। তিনি রূঢ় ও কঠোর নন। হাটে-বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারীও নন। তিনি মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না। বরং তিনি ক্ষমা ও মার্জনা ক'রে দেন। আল্লাহ তাঁর কখনোই তিরোধান ঘটাবেন না, যতক্ষণ না তিনি তাঁর দ্বারা বাঁকা (কাফের) সম্প্রদায়কে সোজা করেছেন তথা তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তাঁর দ্বারা বহু অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ও বদ্ধ হৃদয়কে উন্মুক্ত করেছেন। *(বুখারী ২১২৫, ৪৮৩৮নং)*

বলা বাহুল্য, তাওরাতেও তিনি সাক্ষীরূপে উল্লিখিত।

তাঁর জীবদ্দশার পূর্বে বিগত ও পরে আগত সমস্ত উম্মতের আমলের সাক্ষ্য কীভাবে দেবেন? তাহলে কি তিনি 'হাযির-নাযির'?

না মহান আল্লাহও 'হাযির' নন। তিনি 'নাযির'। তিনি আছেন আরশের ওপর, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি, ইল্ম ও সাহায্য আছে সর্বত্র।

কিন্তু সচক্ষে না দেখলে 'সাক্ষী' হন কীভাবে? আল্লাহ যে বলেছেন,

{وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}

অর্থাৎ, ভবিষ্যতেও আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন। অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার কাছে যিনি অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য সকল বিষয়ই অবগত আছেন, অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা কিছু তোমরা করতে। *(তাওবাহ ঃ ৯৪)*

এ পর্যবেক্ষণ ও দেখা তাঁর জীবদ্দশায়। ইন্তিকালের পর নয়। ইন্তিকালের পর পরকালবাসী মানুষ ও দুনিয়ার মাঝে যবনিকা পড়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (١٠٠) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। *(মু'মিনূন ঃ ১০০)*

যদি ইন্তিকালের পরেও তাঁর দেখার কথা মেনে নেওয়া হয়, তাহলে নিম্নোক্ত আয়াত অনুসারে মু'মিনরাও ইন্তিকালের পর অন্যের আমল দেখতে পান। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (١٠٥) سورة التوبة

তুমি বলে দাও, 'তোমরা কাজ করতে থাক। অচিরেই তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ দেখবেন, এবং তাঁর রসূল ও মু'মিনগণও দেখবে। আর অচিরেই তোমাদেরকে অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা (আল্লাহর) দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন।' (তাওবাহ ঃ ১০৫)

বলা বাহুল্য, আমল দেখার ব্যাপারটা জীবদ্দশার ব্যাপার, মৃত্যুবরণের পর নয়। যেমন ঈসা নবী ﷺ-এর ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (١١٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ বলবেন, 'হে মারয়্যাম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর?' সে বলবে, 'তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য আদৌ শোভনীয় নয়। যদি আমি বলে থাকি, তাহলে তা তো তুমি অবশ্যই জানো। আমার মনে কি আছে তা তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার মনে যা আছে, তা আমি অবগত নই, নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ, তা ব্যতীত তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি। (এবং) তা এই যে, তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপাসনা কর। আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের ক্রিয়াকলাপের পর্যবেক্ষক। আর তুমি সর্ব বস্তুর উপর সাক্ষী। *(মায়িদাহ ঃ ১১৬-১১৭)*

তাহলে তিনি 'হাযির-নাযির' না হলে কিয়ামতে সাক্ষী দেবেন কীভাবে?

কিয়ামতে সাক্ষী দেওয়ার জন্য 'হাযির-নাযির' হওয়া আবশ্যক হলে তাঁর উম্মতীও 'হাযির-নাযির' হয়ে যাবে। যেহেতু তাঁর উম্মতীও কিয়ামতে সাক্ষ্য প্রদান করবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (١٤٣)

"এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৪৩)*

{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ}

"তোমরা সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে

মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই গ্রন্থেও; যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। (হাজ্জ ঃ ৭৮)

তাহলে তা না হলে কীভাবে তাঁরা না-দেখা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন?

কোন কোন হাদীসে এর বিশ্লেষণ এইভাবে এসেছে যে, যখন মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন নবীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমরা কি আমার আদেশ মানুষদের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলে?' তাঁরা বলবেন, 'হ্যাঁ।' আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তোমাদের কি কোন সাক্ষী আছে?' তাঁরা বলবেন, 'হ্যাঁ, মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর উম্মত।' তখন এই উম্মত সাক্ষ্য দেবে। (আহসানুল বায়ান)

আসলেই এ কথা ঠিক যে, 'প্রতি নবীকেই তাঁর উম্মত সম্বন্ধে অবগত করানো হয়ে থাকে যে, অমুকে এরূপ করেছে, অমুকে এরূপ করেছে। যেন তাঁরা রোজ কিয়ামতে সাক্ষ্যদানে সমর্থ হন।'

নবী নিজে না তাদের আমল দেখেন, না জানতে পারেন, আর না-ই তাঁদের কেউ গায়বী খবর জানেন। ঐ দেখুন না, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নসীহত করার জন্য আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন, "হে লোক সকল! তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট উলঙ্গ পা, উলঙ্গ দেহ ও খতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। (আল্লাহ বলেন,) 'যেমন আমি প্রথম সৃষ্টি করেছি আমি পুনর্বার তাকে সেই অবস্থায় ফিরাবো। এটা আমার প্রতিজ্ঞা, যা আমি পুরা করব।' *(সূরা আম্বিয়া ১০৪ আয়াত)*

জেনে রাখো! কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ইব্রাহীম ﷺ-কে বস্ত্র পরিধান করানো হবে। আরো শুনে রাখ! সে দিন আমার উম্মতের কিছু লোককে নিয়ে আসা হবে অতঃপর তাদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর আমি বলব, 'হে প্রভু! এরা তো আমার সঙ্গী।' কিন্তু আমাকে বলা হবে, 'এরা আপনার (মৃত্যুর) পর (দ্বীনে) কী কী নতুন নতুন রীতি আবিষ্কার করেছিল, তা আপনি জানেন না।' (এ কথা শুনে) আমি বলব--যেমন নেক বান্দা (ঈসা ﷺ) বলেছিলেন, "যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের ক্রিয়াকলাপের পর্যবেক্ষক। আর তুমি সর্ববস্তুর উপর সাক্ষী। তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' *(সূরা মায়েদা ১১৭ আয়াত)* অতঃপর আমাকে বলা হবে যে, 'নিঃসন্দেহে আপনার ছেড়ে আসার পর এরা (ইসলাম থেকে) পিছনে ফিরে গিয়েছিল।' *(বুখারী ৩৪৪৭, মুসলিম ৭৩৮০নং)*

নামাযের তাশাহহুদে তাঁকে 'হাযির-নাযির' জেনে 'আস্-সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু' বলে সালাম দেওয়া হয় না, দেওয়া যায় না। বরং তা 'দুআয়ে মাষূরাহ' বলে যেভাবে তাঁর জীবদ্দশায় পড়া হতো, সেইভাবে সম্বোধনসূচক শব্দে পড়া হয়। নচেৎ সাহাবাগণের অনেকে তাঁর তিরোধানের পর 'আস্-সালামু আলান নাবিয়্যি' বলতেন।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহহুদ শিখিয়েছেন, সে সময় আমার আমার হাত তাঁর দুই হাতের মাঝে ছিল। যেমন তিনি আমাকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন,

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

এমন বলতাম, যখন তিনি আমাদের মাঝে জীবিত ছিলেন। অতঃপর তাঁর ইন্তিকাল হলে বলতে লাগলাম,

السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ....

(বুখারী ৬২৬৫নং)

বলা বাহুল্য, এ ছিল মহানবী ﷺ-এর নিজের শেখানো তাশাহহুদের দুআ। তা মি'রাজের রাতে মহান আল্লাহর সাথে কথোপকথনের বাক্যাবলী নয়। আর 'তাঁর রূহ মুসলমানদের গৃহসমূহে সব সময়ে হাযির থাকে' বলে উক্তরূপ সম্বোধনসূচক বাক্যে তাঁকে সালাম দেওয়া হয় না। এমন সব ধারণা ভক্তির আতিশয্যে স্বকপোলকল্পিত রচনা ও রটনা মাত্র, যার কোন সহীহ ভিত্তি ও প্রমাণ নেই।

তথাকথিত সূফীগণ বলতেন, 'যদি পলকের জন্যও রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে দর্শন হতে অন্তর্হিত হতেন, আমরা তখন নিজেদেরকে মুসলমান বলে মনে করতাম না' বলেই প্রমাণ হয় না যে, তিনি হাযির ও নাযির। এর জন্য কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট দলীল লাগে।

চাঁদ-সূর্য ও আয়না বা পানির উদাহরণেরও কোন প্রয়োজন নেই। সহীহ প্রমাণ থাকলে মু'মিনরা উদাহরণ ও যুক্তি ছাড়াই তাঁকে 'হাযির-নাযির' বলে বিশ্বাস ক'রে নেবে।

বলা বাহুল্য, 'তাঁর নূর সৃষ্টির প্রথম হতে সব কিছু প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেছেন। দুনিয়াতেও করবেন এবং আখিরাতেও করবেন।'

'তিনি নবুঅতের নূর দ্বারা অবগত হয়ে থাকেন।'---এ সকল কথাও দলীল ও ভিত্তিহীন।

সঠিক হল, 'প্রতি নবীকেই তাঁর উম্মত সম্বন্ধে অবগত করানো হয়ে থাকে যে, অমুকে এরূপ করেছে, অমুকে এরূপ করেছে। যেন তাঁরা রোজ কিয়ামতে সাক্ষ্যদানে সমর্থ হন।'

এ জন্যই বলা হয়েছে,

أو هو مبني للشاهد للحال كأنه الناظر إليها.

অর্থাৎ, (নবীগণ নিজ নিজ উম্মতকে তবলীগ করেছেন এ মর্মে তিনি কিয়ামতে সাক্ষ্য দেবেন।) অথবা তা অবস্থা দর্শনের ভিত্তিতে, যেন তিনি তা প্রত্যক্ষ করছেন।

'যেন তিনি তা প্রত্যক্ষ করছেন', অর্থাৎ বাস্তবে নয়। অবস্থা স্পষ্ট হওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি সাক্ষ্য প্রদান করবেন, যেমন সাহাবী খুযামার সাক্ষ্য।

একদা মহানবী ﷺ সাওয়া বিন কাইস মুহারেবী বেদুঈনের নিকট থেকে একটি ঘোড়া কিনলেন। কিন্তু সে ঐ বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করে এবং বলে, 'তুমি যদি আমার কাছে ঘোড়া কিনেছ, তাহলে সাক্ষী উপস্থিত কর।' এ কথা শুনে খুযাইমাহ বিন সাবেত সাহাবী তাঁর সপক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, 'এই ঘোড়া তোমার নিকট থেকে উনি খরীদ করেছেন।' নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "তুমি তো আমাদের ঘোড়া ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উপস্থিত ছিলে না, তাহলে সাক্ষ্য দিলে কীভাবে?" তিনি বললেন, 'আপনি যা বলেন, তাতেই আমি আপনাকে সত্যবাদী বলে জানি। আরো জানি যে আপনি কখনো মিথ্যা বলবেন না।' মহানবী ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তির সপক্ষে অথবা বিপক্ষে খুযাইমাহ সাক্ষ্য দেবে, সাক্ষ্যের জন্য সে একাই যথেষ্ট।" আর তখন থেকেই তাঁর উপাধি পড়ে গেল 'ডবল সাক্ষ্য-ওয়ালা' সাহাবী। *(আবূ*

দাউদ ৩৬০৭, নাসাঈ ৪৬৬১নং, ত্বাবারানী, হাকেম ২/২২, বাইহাকী ১০/১৪৬)

আল-আক্বেব

এ উপনামের অর্থ হল, পশ্চাতে আগমনকারী। যেহেতু তিনি নবীগণের সবার শেষে এসেছেন, তাই তিনি 'আল-আক্বেব'।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ)، وَالْعَاقِبُ الَّذِى لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِىٌّ.

অর্থাৎ, আমার পাঁচটি নাম, আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ। আমি মাহী (নিশ্চিহ্নকারী), যার দ্বারা আল্লাহ কুফরী নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি হাশের, যার পদপ্রান্তে মানুষের হাশর হবে। আর আমি হলাম আক্বেব (সব শেষে আগমনকারী), যার পরে কোন নবী নেই। *(বুখারী ৩৫৩২, মুসলিম ৬২৫১নং)*

তিনিই নবীগণের শেষ নবী। তিনিই খা-তামুন নাবিয়্যীন। তাঁর পরে আর কোন নবী নেই।

আল-ক্বাসেম

'ক্বাসেম' মানে বন্টনকারী। আল্লাহর মাল পরিবেশনকারী। বায়তুল মালের মাল বিতরণকারী। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ ، وَاللَّهُ الْمُعْطِى وَأَنَا الْقَاسِمُ).

অর্থাৎ, আল্লাহ যার সাথে মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। আর আল্লাহ দাতা এবং আমি বন্টনকারী। *(বুখারী ৩১১৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

« مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِى اللَّهُ ».

অর্থাৎ, আল্লাহ যার সাথে মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। আমি বন্টনকারী মাত্র। আর আল্লাহ দান করে থাকেন। (মুসলিম ২৪৩৯নং)

অবশ্য এ বন্টন তাঁর জীবদ্দশার সাথে সম্পৃক্ত। গনীমতের মাল, যাকাত, মীরাস ইত্যাদি তিনি বন্টন করেছেন। কে কত পাবে, তা আল্লাহ বাতলে দিয়েছেন। আর তিনি বন্টন করেছেন।

আসলে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় জাগতিক সম্পদ বন্টনকারী ছিলেন। কোন আধ্যাত্মিক সম্পত্তি নয়, কারো সুখ-সমৃদ্ধি নয়। তাঁর ইন্তিকালের পর সে সম্পদ বন্টন করার কোন প্রাসঙ্গিকতাই নেই।

মালধন বিলি-বন্টনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অন্যায়াচরণ করা বৈধ নয়। আল্লাহর মাল তার যথার্থ হকদারকে দান করতে হয়। নচেৎ কিয়ামতে তার শাস্তি আছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ رِجَالا يَتَخَوَّضُونَ فِى مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) .

"কিছু লোক আল্লাহর মাল নাহক ব্যয়-বন্টন করবে। সুতরাং তাদের জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন রয়েছে।" *(বুখারী ৩১১৮-নং)*

কিন্তু তিনি অহীপ্রাপ্ত জ্ঞান ও বিবেকে কোন কোন মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য আল্লাহর মাল বেশি দান করতেন। তাতে কোন কোন মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা কুধারণা হতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি বলেছিলেন,

« إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ ».

অর্থাৎ, আমি কেবল খাজাঞ্চি মাত্র। সুতরাং যাকে আমি খুশী মনে দান করি, তাকে তাতে বর্কত দেওয়া হবে। আর যাকে আমি (তার) যাচিঞা বা লোভের কারণে দিয়ে থাকি, সে হয় সেই ব্যক্তির মতো, যে খায় কিন্তু তৃপ্ত হয় না। (মুসলিম ২৪৩৬নং)

'আল্লাহই দাতা' অর্থাৎ, আমি নিজস্ব রায় দ্বারা এ বন্টন করি, নিজের ইচ্ছামতো কাউকে দান করি, কাউকে বঞ্চিত করি, এমন নয়। বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা তাকে দেন। আমি কেবল সেই দান তার কাছে পৌঁছে দিই। এই জন্য তিনি বলেছেন,

(مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ).

"আমি তোমাদেরকে দান করি না, আর বঞ্চিত করি না। আমি কেবল বন্টনকারী মাত্র। যেখানে (মাল) রাখতে আমাকে আদেশ করা হয়, আমি সেখানেই রাখি।" (বুখারী ৩১১৭নং)

অর্থাৎ, আমি আল্লাহরই আদেশে কাউকে দান করি, তাঁরই আদেশে কাউকে বঞ্চিত করি। এর কাছাকাছি শব্দে বর্ণিত হয়েছে আবূ দাউদ (২৯৫১নং)এ। তিনি বলেছেন,

« مَا أُوتِيكُمْ مِنْ شَىْءٍ وَمَا أَمْنَعُكُمُوهُ إِنْ أَنَا إِلاَّ خَازِنٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ ».

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

(فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ).

অর্থাৎ, আমি কেবল বিতরণকারী মাত্র। তোমাদের মাঝে বিতরণ করি। *(বুখারী ৬১৯৬, মুসলিম ৫৭১০নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

« إِنَّمَا بُعِثْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ».

অর্থাৎ, আমি কেবল পরিবেশনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি। তোমাদের মাঝে পরিবেশন করি। *(মুসলিম ৫৭১১-৫৭১২, ৫৭১৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

« إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ».

অর্থাৎ, আমাকে কেবল বন্টনকারী বানানো হয়েছে। আমি তোমাদের মাঝে বন্টন করি। *(ঐ ৫৭১৪নং)*

বলা বাহুল্য, বর্তমানেও যারা তাঁকে 'ক্বাসেম' বা সুখ-সমৃদ্ধি বা আয়-উন্নতির বন্টনকারী ধারণা করে এবং তাঁর নিকট তা প্রার্থনা করে, তারা মুশরিক। সে চাওয়া চাইতে হবে কেবল মহান আল্লাহুল মু'ত্বীর কাছে। তিনিই সে সবের দাতা। বাকী গনীমতের মাল, যাকাত ও মীরাস ইত্যাদির বন্টন আল্লাহর কিতাব ও আন-নাবিয়্যুল ক্বাসেম ﷺ-এর সুন্নাহ দ্বারা হবে।

প্রকাশ থাকে যে,

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ** ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

অর্থাৎ, তিনি গৌরবর্ণ, তাঁর চেহারা দ্বারা বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। তিনি অনাথদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। *(আহমাদ ৫৬৭৩, বুখারী ১০০৮-১০০৯, ইবনে মাজাহ ১২৭২নং)*

এ কথা মহানবী ﷺ-এর চাচা আবূ তালেব তাঁর প্রশংসায় বলেছিলেন। আর এ কথাও তাঁর জীবদ্দশার সাথে সম্পৃক্ত।

তিনি ধন-সম্পদ বন্টনকারী ছিলেন তাঁর জীবদ্দশায়। ইন্তিকালের পর তিনি এ জগতের ভাগ-বন্টনের মালিক নন। একমাত্র মহান আল্লাহই মানুষের রুযী, সুখ-সমৃদ্ধি, ধন-সম্পদ দান করে থাকেন, তিনিই বন্টন করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} (٣٢) سورة الزخرف

অর্থাৎ, এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে! আমিই ওদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি ওদের পার্থিব জীবনে এবং এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি; যাতে ওরা একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং ওরা যা জমা করে, তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর। (যুখরুফ ঃ ৩২)

জীবিত মানুষ নিজ ধন-সম্পদ বন্টন করতে পারে। এ বন্টন তার এখতিয়ারভুক্ত। এ জগৎ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তার আর কোন এখতিয়ার থাকে না।

মহান আল্লাহ একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে মুনাফিকদের একটি গোষ্ঠীর কথা বলেছেন,

{يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ} (٧٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর নামে শপথ ক'রে বলে যে, তারা (গালি) বলেনি, অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছে এবং নিজেদের ইসলাম গ্রহণের পর কাফের হয়ে গেছে, আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি। আর তারা শুধু এই জন্য দোষারোপ করেছিল যে, তাদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন, অনন্তর যদি তারা তওবা করে, তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে; আর যদি তারা বিমুখ হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন এবং ভূ-পৃষ্ঠে তাদের না কোন অলী (অভিভাবক) হবে, আর না কোন সাহায্যকারী। *(তাওবাহ ঃ ৭৪)*

মুসলিমদের হিজরতের পর মদীনা শহর কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। যার কারণে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যও বড় উন্নতি লাভ করতে লাগল এবং তার ফলে মদীনাবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হয়ে উঠল। মদীনার মুনাফিক্বরাও এতে উপকৃত হল। আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে এ কথাই বলেছেন, তারা কি এই দোষ আরোপ করে অথবা এই কথায় নারাজ যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে ধনী বানিয়ে দিয়েছেন?

অর্থাৎ এটা নারাজ হওয়ার, রাগ বা দোষের কথা তো নয়। বরং তাদেরকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, তিনি তাদেরকে দরিদ্রতা থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছল ও ধনবান বানিয়ে দিয়েছেন। জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ তাআলার সাথে রসূল ﷺ-এর উল্লেখ এই জন্য করা হয়েছে যে, এই সচ্ছল ও ধনবান হওয়ার বাহ্যিক কারণ হলেন নবী ﷺ। আসলে আল্লাহই হলেন সচ্ছলতা ও ধনদাতা। এই জন্যই আয়াতে مِن فَضلِه একবচনের সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন। (আহসানুল বায়ান)

পক্ষান্তরে উক্ত সর্বনামের ইঙ্গিত নিকটবর্তী শব্দ 'রসূল' ও হতে পারে। অর্থাৎ, রসূল ﷺ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন। তার মানে মহান আল্লাহ তাঁর যোগ্য অনুগ্রহ দ্বারা তাদেরকে সচ্ছল করেছিলেন এবং তাঁর রসূল ﷺ-ও তাঁর যোগ্য অনুগ্রহ দ্বারা তাদেরকে সচ্ছল করেছিলেন। কাজ একই। রসূল ﷺ যে কাজ করেছেন, তা আল্লাহর নির্দেশেই করেছেন। মহান আল্লাহ রসূল ﷺ-এর মাধ্যমে, তাঁর বর্কত ও হিতাকাঙ্ক্ষার অনুসারে তাদেরকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করেছিলেন।

রসূল ﷺ তাদেরকে গনীমতের মালের ভাগ দিয়ে অভাবমুক্ত করেছিলেন।

তিনি একটি খুনের ঘটনায় বিচারে খুনীকে বারো হাজার 'দিয়াত' আদায় দিতে বাধ্য করে তাদেরকে ধনী করে দিয়েছিলেন। *(তফসীর আল-বাহরুল মাদীদ ৩/ ১৩৭, আযওয়াউল বায়ান ৩/ ১১০)*

উক্ত আয়াত হতে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ যেরূপ বান্দাদেরকে ধন-সম্পদ দানের অধিকার রাখেন, তেমনি তাঁর রসূলও উম্মতকে তদ্রূপ ধন-সম্পদ দানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তাঁর জীবদ্দশায়। তাঁর ইন্তিকালের পরে নয়। মুসলমানগণের অলীদের বেলায়েত ও আলিমগণের ইল্‌ম তাঁরই জীবদ্দশার দান। তিনি শিখিয়েছেন, কীভাবে অলী হওয়া যায়। তিনি সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-কে শিখিয়েছেন আল্লাহ প্রদত্ত ইল্‌ম।

যমীনের খাজিনাসমূহের যাবতীয় কুঞ্জি তাঁর হস্তে সোপর্দ করা হয়েছিল। আর তার মানে এই নয় যে, বর্তমানেও তিনি যাকে ইচ্ছা যা ইচ্ছা তাই দান করতে পারেন। বরং তিনি নিজ জীবদ্দশায় নিজ আয়ত্তাধীন বস্তু মানুষকে দান করে গেছেন। ইন্তিকালের পর তা পারেন না।

তিনি বলেছেন,

(بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي).

অর্থাৎ, বহুলার্থ বাক্য-সহ আমি প্রেরিত হয়েছি, (কাফেরদের মনে) আতঙ্ক প্রক্ষেপ দ্বারা আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি, আর এক সময় যখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন (স্বপ্নে) পৃথিবীর যাবতীয় ভান্ডারের চাবিরাশি এনে আমার হাতে রাখা হয়েছে। *(বুখারী ২৯৯৭, ৬৯৯৮, ৭২৭৩, মুসলিম ১১৯৬নং)*

উক্ত হাদীসে 'যমীনের খাজিনাসমূহের যাবতীয় কুঞ্জি তাঁর হস্তে সোপর্দ করা হয়েছিল অথবা পৃথিবীর যাবতীয় ভান্ডারের চাবিরাশি এনে তাঁর হাতে রাখা হয়েছিল', তার মানে এই নয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত তিনি তা বিলি-বন্টন করতে পারেন।

বরং তার মানে হল এই যে, স্বপ্নযোগে মহান আল্লাহ রসূল ﷺ-কে অহী করেছিলেন যে, তাঁর উম্মত সারা পৃথিবীর মালিক হবে, সারা পৃথিবীময় তাদের আধিপত্য কায়েম হবে, সারা পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে ইসলাম প্রবেশ করবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ ، فَرَأَيْت مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، فَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ : الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীকে গুটিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম (অর্থাৎ পুরোটাই) দেখেছি। নিশ্চয় আমার উম্মতের রাজত্ব ততদূর পৌঁছবে, যতদূর আমার জন্য গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ পুরোটাই)। আর আমাকে দেওয়া হয়েছে লাল ও সাদা (স্বর্ণ ও রৌপ্য-ভান্ডার)। *(আহমাদ ১৭১১৫, মুসলিম ৭৪৪০, আবূ দাউদ ৪২৫২, তিরমিযী ২১৭৬, ইবনে মাজাহ ২৯৫২নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ ، عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ).

অর্থাৎ, অবশ্যই এ দ্বীন পৌঁছবে, যেখানে রাত-দিন পৌঁছেছে। আল্লাহ কোন ঘর ও শিবিরে এ দ্বীন প্রবিষ্ট না করে ছাড়বেন না; সম্মানীর সম্মানের সাথে হোক অথবা অসম্মানীর অসম্মানের সাথে হোক। এমন সম্মান, যার দ্বারা আল্লাহ ইসলামকে সম্মানিত করবেন এবং এমন অসম্মান, যার দ্বারা আল্লাহ কুফরীকে লাঞ্ছিত করবেন। *(আহমাদ ১৬৯৫৭, ত্বাবারানীর কাবীর ৬০১, হাকেম ৮৩২৬, সিঃ সহীহাহ ৩নং)*

বুঝা গেল, 'যমীনের খাজিনাসমূহের যাবতীয় কুঞ্জি তাঁর হস্তে সোপর্দ করা'র মানে হল ইসলামের বিজয় লাভ হওয়া অথবা তার অর্থ পৃথিবীর খনিজ-সম্পদ লাভ হওয়া। স্বর্ণ-রৌপ্য ও কায়সার ও কিসরার ধন-সম্পদ হস্তগত হওয়া।

এই জন্য উক্ত হাদীস বর্ণনার পর আবূ হুরাইরা বলেছেন,

وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا.

فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَلْغَثُونَهَا أَوْ تَرْغَثُونَهَا.

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেছেন, এখন তোমরা তা নির্গত করছ। (বুখারী ২৯৯৭নং)
রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেছেন, এখন তোমরা তা বহন করে আনছ। (বুখারী ৬৯৯৮নং)
রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেছেন, এখন তোমরা তা ভক্ষণ করছ। (বুখারী ৭২৭৩নং)
তিনি বেহেশ্তীদের মাঝে বেহেশ্ত বন্টনকারীও নন। যেহেতু তা দলীলহীন দাবী।
পক্ষান্তরে তিনি বলেছেন,

((قَارِبُوا وَسَدِّدُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ)).

"তোমরা (হে মুসলমানেরা!) (দ্বীনের ব্যাপারে) মিতাচারিতা অবলম্বন কর এবং সোজা হয়ে থাক। আর জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই স্বীয়কর্মের দ্বারা (পরকালে) পরিত্রাণ পাবে না।"

সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনিও কি নন?' তিনি বললেন,

((وَلاَ أنا إلاَّ أنْ يَتَغَمَّدَنِيَ الله بِرَحمَةٍ مِنهُ وَفَضْلٍ)).

"আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ আমাকে তাঁর অনুগ্রহে ও দয়াতে ঢেকে নেন।" *(মুসলিম ৭২৯৫নং)*

অন্য এ বর্ণনায় তিনি বলেছেন,

« لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلاَ يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ وَلاَ أَنَا إِلاَّ بِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ».

অর্থাৎ, তোমাদের কাউকে তার আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না এবং জাহান্নাম থেকেও পরিত্রাণ দেবে না, আমাকেও না। তবে যদি আল্লাহর রহমত হয়। *(মুসলিম ৭২৯৯নং)*

এ হল আল্লাহর তওহীদ। তিনি যাকে যতটা ইচ্ছা তাকে ততটা মর্যাদা দিয়ে থাকেন। তিনি যে ইচ্ছাময় বাদশা। তিনি নিজ নবী ﷺ-কে মর্যাদা দিয়েছেন অন্যভাবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজায় করাঘাত করব। .....আমিই জান্নাতে প্রথম সুপারিশকারী হব।" *(মুসলিম ১৯৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমি জান্নাতের নিকট এসে তার দরজা খুলতে বলব। দারোয়ান ফিরিশ্তা বলবেন, 'কে আপনি?' আমি বলব, 'মুহাম্মাদ।' দারোয়ান বলবেন, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য দরজা না খুলি।" *(ঐ)*

সুতরাং তাঁকে তওহীদের স্বার্থে বিনা দলীলে জান্নাত-বন্টনকারী নাই-বা বললাম।

আল-মাহী

'মাহী' মানে নিশ্চিহ্নকারী। যে মুছে দেয়, মিটিয়ে দেয়, দূর ক'রে দেয়।

পূর্বে উল্লিখিত হাদীসে মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমি মাহী (নিশ্চিহ্নকারী), যার দ্বারা আল্লাহ কুফরী নিশ্চিহ্ন করবেন।"

বলা বাহুল্য, তাঁর নবুঅতের রবি কুফরীর অন্ধকার দূর ক'রে দিয়েছে। মক্কাতে উদিত হয়ে সারা বিশ্বে সে আলো ছড়িয়ে পড়ছে। এক সময় পৃথিবীর সকল জনপদে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে ইসলামের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} (٣٣)

অর্থাৎ, তিনিই পথনির্দেশ (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহ নিজ রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও অংশীবাদীরা অপ্রীতিকর মনে করে। *(তাওবাহ ৩৩, স্বাফ ৯)*

মহানবী ﷺ-এর সূর্যবৎ নবুঅত আসার পর অন্য সকল নবুঅতের চন্দ্র ও তারকা আকাশ হতে বিলীন হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর অনুসরণ ছাড়া মুক্তির অন্য পথ অবশিষ্ট নেই। আর তাঁর অনুসরণ করলেই পূর্বেকার যাবতীয় পাপরাশী মোচন হয়ে যাবে, মিটে যাবে।

ইবনে শিমাসাহ বলেন, আম্র ইবনে আ'স ﷺ-এর মরণোন্মুখ সময়ে আমরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি অনেক ক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলেন এবং দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরূপ অবস্থা দেখে তাঁর এক ছেলে বলল, 'আব্বাজান! আপনাকে কি

রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি?' এ কথা শুনে তিনি তাঁর চেহারা সামনের দিকে ক'রে বললেন, আমাদের সর্বোত্তম পুঁজি হল, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। আমি জীবনের তিনটি স্তর অতিক্রম করেছি।

(এক) আমার চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বড় বিদ্বেষী আর কেউ ছিল না। তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা অর্জন করাই ছিল আমার তৎকালীন সর্বাধিক প্রিয় বাসনা। যদি (দুর্ভাগ্যক্রমে) তখন মারা যেতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি জাহান্নামী হতাম।

(দুই) তারপর যখন আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রক্ষিপ্ত করলেন, তখন নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে নিবেদন করলাম, 'আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে বায়আত করতে চাই।' বস্তুতঃ তিনি ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি বললেন, "আম্‌র! কী ব্যাপার?" আমি নিবেদন করলাম, 'একটি শর্ত আরোপ করতে চাই।' তিনি বললেন, "শর্তটি কী?" আমি বললাম, 'আমাকে ক্ষমা করা হোক---শুধু এতটুকুই।' তিনি বললেন,

«أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ».

"তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়, হিজরত পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলে এবং হজ্জ্বও পূর্বের পাপসমূহ ধ্বংস ক'রে দেয়?"

তখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মানুষ আর কেউ নেই। আর আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাঁর দিকে নয়নভরে তাকাতে পারতাম না। যার ফলে আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর গঠনাকৃতি কিরূপ ছিল?' তাহলে আমি তা বলতে পারব না। এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, তাহলে আশা ছিল যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(তিন) তারপর বহু দায়িত্বপূর্ণ বিষয়াদির খপ্পরে পড়লাম। জানি না, তাতে আমার অবস্থা কী? সুতরাং আমি মারা গেলে কোন মাতমকারিণী অথবা আগুন যেন অবশ্যই আমার (জানাযার) সাথে না থাকে। তারপর যখন আমাকে দাফন করবে, তখন যেন তোমরা আমার কবরে অল্প অল্প ক'রে মাটি দেবে। অতঃপর একটি উট যবেহ ক'রে তার মাংস বন্টন করার সময় পরিমাণ আমার কবরের পাশে অপেক্ষা করবে। যাতে আমি তোমাদের সাহায্যে নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারি এবং আমার প্রভুর প্রেরিত ফিরিশ্তাদের সঙ্গে কিরূপ বাক্-বিনিময় করি, তা দেখে নিই। *(মুসলিম ৩৩৬নং)*

আর এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الأَوَّلِين} (٣٨)

অর্থাৎ, অবিশ্বাসীদেরকে তুমি বল, যদি তারা (কুফরী ও অবিশ্বাস থেকে) বিরত হয়, তাহলে অতীতে তাদের যা (পাপ) হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন, কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে পূর্ববর্তীদের (সাথে আমার আচরিত) রীতি তো রয়েছেই। *(আন্‌ফাল ঃ ৩৮)*

মহানবী ﷺ দ্বারা যত কুফরী মোচন করা হয়েছে, তত অন্য নবী দ্বারা হয়নি। যেহেতু

সকল নবী প্রেরিত ছিলেন সীমিত সম্প্রদায়ের প্রতি। কিন্তু শেষনবী প্রেরিত ছিলেন সারা জাহানের মানুষের প্রতি।

বলা বাহুল্য, 'আল-মাহী' উপনাম তাঁর জন্য সত্যই সার্থক।

আন্‌-নাযীর

'নাযীর' মানে সতর্ককারী, ভয় প্রদর্শনকারী।

মহানবী ﷺ যেমন বিশেষ সম্প্রদায়কে সুসংবাদদাতা, তেমনি অন্য এক সম্প্রদায়কে সতর্ককারী ও ভয় প্রদর্শনকারী। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ} (٨٩) سورة الحجر

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আমি তো প্রকাশ্য সতর্ককারী।' (হিজর ৪৮৯)

{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا } (١) سورة الفرقان

"কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরক্বান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।" (ফুরক্বান ৪ ১)

এ উপনাম যেমন আল-কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতেও বর্ণিত হয়েছে।

আত্বা বিন য়্যাসার বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ﷺ-এর সাক্ষাতে বললাম, 'তাওরাতে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলী সম্পর্কে আমাকে বলুন।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! তিনি কুরআনে বর্ণিত কিছু গুণে তাওরাতেও গুণান্বিত। (যেমন,) "হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে" (আহযাব ৪ ৪৫) এবং নিরক্ষর (আরব)দের জন্য নিরাপত্তারূপে। তুমি আমার দাস ও রসূল। আমি তোমার নাম রেখেছি 'আল-মুতাওয়াক্কিল' (আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল)। তিনি রূঢ় ও কঠোর নন। হাটে-বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারীও নন। তিনি মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না। বরং তিনি ক্ষমা ও মার্জনা ক'রে দেন। আল্লাহ তাঁর কখনোই তিরোধান ঘটাবেন না, যতক্ষণ না তিনি তাঁর দ্বারা বাঁকা (কাফের) সম্প্রদায়কে সোজা করেছেন তথা তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তাঁর দ্বারা বহু অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ও বদ্ধ হৃদয়কে উন্মুক্ত করেছেন। *(বুখারী ২১২৫, ৪৮৩৮নং)*

তিনি সতর্ককারী ৪

কাফেরদেরকে কুফরীর পরিণাম জাহান্নাম থেকে সতর্ককারী।

অবাধ্যদেরকে পাপের কুফল থেকে সতর্ককারী।

অপরাধীদেরকে অপরাধের শাস্তি থেকে সতর্ককারী।

অত্যাচারীকে অত্যাচারের পরিণাম থেকে সতর্ককারী।

পাপাচারীদেরকে আল্লাহর আযাব ও গযব থেকে সতর্ককারী।

বেঈমানদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দীদারে বঞ্চনা থেকে সতর্ককারী।

তিনি মহান আল্লাহর কিতাব দ্বারা সারা বিশ্বের মানুষকে সতর্ককারী।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا} (٩٢) الأنعام

"এ কিতাব (কুরআন) বর্কতময় ক'রে অবতীর্ণ করেছি, যা ওর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যা দিয়ে তুমি মক্কা ও ওর পার্শ্ববর্তী লোকদের সতর্ক কর। (আন্‌আম ঃ ৯২)

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ} (٧) سورة الشورى

"এভাবে আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন অহী করেছি; যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কাবাসীদেরকে এবং ওর আশেপাশের বাসিন্দাকে, আর সতর্ক করতে পার জমায়েত হওয়ার দিন (কিয়ামত) সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই; সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল প্রবেশ করবে জাহান্নামে। (শূরা ঃ ৭)

{كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} (٢) سورة الأعراف

"তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে; সুতরাং তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন প্রকার সংকীর্ণতা না থাকে। যাতে তুমি এর দ্বারা সতর্ক কর এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটি উপদেশ।" (আ'রাফ ঃ ২)

{فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا} (٩٧) سورة مريم

"আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ ক'রে দিয়েছি; যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।" *(মারয়্যাম ঃ৯৭)*

{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ}

"তবে কি ওরা বলে, এ তো তার নিজের রচনা? বরং এ তোমার প্রতিপালক হতে আগত সত্য; যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়তো ওরা সৎপথে চলবে।" (সাজদাহ ঃ ৩)

কিন্তু সতর্ক হবে কে? যে প্রতিপালককে ভয় করে, তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, পরকাল ও হিসাবকে ভয় করে, সেই সতর্ক হবে। যার হৃদয়ে ঈমানের আলো আছে, সেই সতর্ক হবে। প্রভাতের আলো তো তাদের জন্য, যারা ঘুম ছেড়ে জেগে ওঠে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} (١٨) سورة فاطر

"তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং যথাযথভাবে নামায পড়ে। যে কেউ পরিশুদ্ধ হয়, সে তো পরিশুদ্ধ হয় নিজেরই কল্যাণের জন্য। আর প্রত্যাবর্তন আল্লাহরই নিকট।" (ফাত্বির ঃ ১৮)

{إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ} (١١) سورة يــس

"তুমি কেবল তাদেরকে সতর্ক করতে পার, যারা উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখে পরম দয়াময়কে ভয় করে। অতএব তাদেরকে তুমি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দাও।" (ইয়াসীন ঃ ১১)

{قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (١٨٨) سورة الأعراف

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরই আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।' (আ'রাফ ঃ ১৮৮)

অনেক সময় মহান আল্লাহ কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ ক'রে কাফের ও মুনাফিকদেরকে অশুভ বা কুসংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে 'শুভ সংবাদ' বা 'সুসংবাদ' বলেছেন। এ হল তাদের প্রতি এক প্রকার ধমক। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (٢١) سورة آل عمران

"যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করে, নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং যে সকল লোক ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।" (আলে ইমরান ঃ ২১)

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (٣٤) التوبة

"যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।" (তাওবাহ ঃ ৩৪)

******

আল-বাশীর, আল-মুবাশ্‌শির

'বাশীর' ও 'মুবাশ্‌শির' মানে সুসংবাদদাতা।

মহান আল্লাহ প্রত্যেক নবীকেই মানুষের জন্য সুসংবাদদাতারূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ} (٢١٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, মানুষ (আদিতে) একই জাতিভুক্ত ছিল। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করে।) অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। (বাক্বারাহ ঃ ২১৩)

{وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ}

অর্থাৎ, রসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি। সুতরাং যে বিশ্বাস করবে ও নিজেকে সংশোধন করবে, তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না। *(আনআম ঃ ৪৮)*

তিনি শেষনবী ﷺ-এর ব্যাপারে বলেন,

{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ} (١١٩) سورة البقرة

"আমি তোমাকে সত্যসহ শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। জাহান্নামীদের সম্পর্কে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।" (বাক্বারাহ ঃ ১১৯)

{قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (١٨٨) سورة الأعراف

বল, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরই আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।' (আ'রাফ ঃ ১৮৮)

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (٢٨) سورة سبأ

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (সাবা' ঃ ২৮)

{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ} (٢٤) سورة فاطر

"আমি তো তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।" (ফাত্বির ঃ ২৪)

{وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} (١٠٥) سورة الإسراء

"আমি সত্য-সহই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং সত্য-সহই তা অবতীর্ণ হয়েছে; আমি তো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ১০৫)

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} (٥٦) سورة الفرقان

"আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি।" *(ফুরক্বান ঃ ৫৬)*

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} (٤٥) سورة الأحزاب

"হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।" *(আহযাব ঃ ৪৫)*

{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} (٨) سورة الفتح

"নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।" *(ফাত্হ ঃ ৮)*

আত্বা বিন য়্যাসার বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ-এর সাক্ষাতে বললাম, 'তাওরাতে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলী সম্পর্কে আমাকে বলুন।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! তিনি কুরআনে বর্ণিত কিছু গুণে তাওরাতেও গুণান্বিত। (যেমন,) "হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে" (আহযাব ঃ ৪৫) এবং নিরক্ষর (আরব)দের জন্য নিরাপত্তারূপে। তুমি আমার দাস ও রসূল। আমি তোমার নাম রেখেছি 'আল-মুতাওয়াক্কিল' (আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল)। তিনি রূঢ় ও কঠোর নন। হাটে-বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারীও নন। তিনি মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না।

বরং তিনি ক্ষমা ও মার্জনা ক'রে দেন। আল্লাহ তাঁর কখনোই তিরোধান ঘটাবেন না, যতক্ষণ না তিনি তাঁর দ্বারা বাঁকা (কাফের) সম্প্রদায়কে সোজা করেছেন তথা তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তাঁর দ্বারা বহু অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ও বদ্ধ হৃদয়কে উন্মুক্ত করেছেন। *(বুখারী ২১২৫, ৪৮৩৮নং)*

তিনি সুসংবাদদাতা ঃ

পাপীদেরকে পাপ মাফ হওয়ার সুসংবাদদাতা।

আল্লাহ ও তাঁর অনুগতকে বৃহৎ প্রতিদানের সুসংবাদদাতা।

মু'মিনদেরকে চির সুখময় জান্নাতের সুসংবাদদাতা।

ঈমানদার মুত্তাক্বীদেরকে মহান আল্লাহর দীদারের সুসংবাদদাতা।

নিজ সাহাবাগণকে বেহেশ্তের সুসংবাদদাতা।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যদাতাকে জান্নাতের সুসংবাদদাতা।

মানবমন্ডলীকে মানবের দাসত্ব থেকে মুক্তি দানের সুসংবাদদাতা।

কাফেরকে ইসলাম গ্রহণের পর তার পূর্বেকার সকল অপরাধ ক্ষমার্হ হওয়ার সুসংবাদদাতা।

তিনি দ্বীনের দাওয়াতের ব্যাপারে সাহাবাকে বলেছেন,

« بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ».

"তোমরা সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। সহজ কর, কঠিন করো না। *(বুখারী ৬৯, মুসলিম ৪৬২২নং)*

মহান আল্লাহ মহানবী ﷺ-কে মু'মিনদের সুসংবাদ দিতে আদেশ ক'রে বলেছেন,

{وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٢٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত; যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যখনই তাদের ফলমূল খেতে দেওয়া হবে, তখনই তারা বলবে, 'আমাদেরকে (পৃথিবীতে অথবা জান্নাতে) পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হত, এ তো তাই।' তাদেরকে পরস্পর একই সদৃশ ফল দান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সহধর্মিণীগণ রয়েছে, অধিকন্তু তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। (বাক্বারাহ ঃ ২৫)

{وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ} (٢) يونس

"বিশ্বাসীদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট উচ্চ মর্যাদা। অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর।" *(ইউনুস ঃ ২)*

{وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا} (٤٧) سورة الأحزاب

"তুমি বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মহা অনুগ্রহ রয়েছে।" (আহযাব ঃ ৪৭)

{وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} (٣٧) سورة الحج

"তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্মশীলদেরকে।" (হাজ্জ ঃ ৩৭)

{فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا} (٩٧) سورة مريم

“আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ ক’রে দিয়েছি; যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।” *(মারয়্যাম ঃ ৯৭)*

বলা বাহুল্য, সুসংবাদপ্রাপ্ত হল পরহেযগার মু’মিনরা। যারা ঈমানের সাথে নেক আমল করে, মহান প্রতিপালককে ভয় ক’রে চলে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে।

তাদের জন্য সুসংবাদ দুনিয়াতে ও আখেরাতে। তাদের জন্য রয়েছে মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে মহা অনুগ্রহ। তাদের জন্য রয়েছে ইহকালে স্বাচ্ছন্দ্য, সমুন্নতি, দ্বীন সহ সুউচ্চ মর্যাদা, দেশসমূহে তাদের ক্ষমতা বিস্তার, বিজয়, হিদায়াত, ক্ষমা, বিপদ-মুক্তি ইত্যাদির সুসংবাদ। আর পরকালে রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে মুক্তিলাভ, সওয়াব লাভ ও জান্নাতের বালাখানা।

সুতরাং মুবারক হোক সুসংবাদ সুসংবাদপ্রাপ্তদের জন্য।

আল-মুতাওয়াক্কিল

‘মুতাওয়াক্কিল’ মানে ভরসাকারী, নির্ভরশীল। মহান প্রতিপালকের উপর ভরসাকারী।

মহানবী ﷺ নিজ প্রতিপালকের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। আপদে-বিপদে, মানুষের চক্রান্তে, যুদ্ধে-বিগ্রহে, বিবাদে-সন্ধিতে, রোগে-রুযীতে, দ্বীনের দাওয়াতে, সর্ব ব্যাপারে তিনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখতেন। যথাসাধ্য উপায় অবলম্বনও করতেন। আর তা আল্লাহ-ভরসার পরিপন্থী নয়।

তাঁর জীবনের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁর চলার পথে প্রতি পদক্ষেপে নিজ প্রতিপালকের উপর কত নির্ভরশীল ছিলেন।

নবুঅতের প্রচারে মক্কাবাসী কাফের ও মুশরিকদের হাতে কত নির্যাতিত ও অপমানিত হয়েছেন। অপমানিত ও প্রহৃত হয়েছেন তায়েফে। হিজরতের সময় শত বিপদ, আশঙ্কা ও সংশয়ের মাঝে কত কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু সকল স্থানে মহান আল্লাহর ভরসাই তাঁকে সবল ও সমৃদ্ধ করেছে।

হিজরতের এক পর্যায়ের কথা মহান আল্লাহ তাঁর কুরআনে বলেছেন,

{إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٤٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর, তাহলে আল্লাহই (তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি) তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে, যখন অবিশ্বাসীরা তাকে (মক্কা হতে) বহিষ্কার ক’রে দিয়েছিল, যখন সে ছিল দু’জনের মধ্যে একজন; যখন উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল। সে তখন স্বীয় সঙ্গী (আবু বাকর)কে বলেছিল, ‘তুমি বিষণ্ন হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।’ অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা অবতীর্ণ করলেন এবং এমন সেনাদল দ্বারা তাকে শক্তিশালী করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি অবিশ্বাসীদের বাক্য নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইলো। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তাওবাহ ঃ ৪০)

এ স্থলে মহানবী ﷺ-এর সুদৃঢ় আল্লাহ-ভরসার কথা স্পষ্টতঃ উদ্ভাসিত হয়। আর সেই ভরসার পরিণাম ও সুফল আসে সাথে সাথে আল-মদীনা ও বিজয়ের পথে।

বদর যুদ্ধের সময়, বরং সকল যুদ্ধের সময় এবং হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তাঁর আল্লাহ-ভরসার কথা আমরা খুব ভালোভাবে জানতে পারি।

মহানবী ﷺ-এর সুবিশাল আল্লাহ-নির্ভরতার কথা আরো একটি ঘটনায় স্পষ্ট হয়।

একদা এক মরুভূমিতে মরু-বাবলা গাছের উপর নিজের তরবারি লটকে রেখে তার ছায়ার নিচে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের মহানবী ﷺ। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন দুশমন এসে তাঁর ঐ তরবারিটি হাতে নিয়ে তাঁর উপর তুলে ধরে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! তুমি কি আমাকে ভয় পাও না?'

মহানবী ﷺ নির্ভয়ে বললেন, 'না।'

বেদুঈন বলল, 'তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ।'

বেদুঈন আবার বলল, 'তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

তিনি পূর্বেকার মতই বললেন, 'আল্লাহ।'

বেদুঈন পুনরায় বলল, 'তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

তিনি পুনরায় বললেন, 'আল্লাহ।'

এরপর বেদুঈনের দেহ-মন কেঁপে উঠল। সহসা তার হাত থেকে তলোয়ারটি পড়ে গেল। মহানবী ﷺ তা তুলে নিয়ে তার প্রতি তুলে ধরে বললেন, 'এবার তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?'

বেদুঈন বলল, 'কেউ নয়।' অথবা 'তুমি।'

দয়ার নবী ﷺ তাকে মাফ ক'রে দিলেন, ফলে সে মুসলমান হয়ে গেল। অন্য বর্ণনা মতে সে মুসলমান হয়নি; কিন্তু অঙ্গীকারবদ্ধ হল যে, সে তাঁর বিরুদ্ধে কোনক্রমেই আর যুদ্ধ করবে না। *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, বাইহাক্বী, মিশকাত ৫৩০৫নং)*

মহানবী ﷺ ও তাঁর সহচরদের বিরুদ্ধে কাফেরদল ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি এক আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তাঁকেই তাদের বিরুদ্ধে 'উকীল' মেনেছিলেন। সুতরাং তাঁরা জয়ী হয়েছিলেন।

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, ইব্রাহীম ﷺ-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তখন তিনি "হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল" বলেছিলেন। আর মুহাম্মাদ ﷺ এটি তখন বলেছিলেন, যখন লোকেরা বলেছিল যে, (কাফের) লোকেরা তোমাদের মুকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছে; ফলে তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল, "হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।" অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।

মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ} (١٧٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ (কথা) তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।' তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হয়, তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। *(আলে ইমরান ঃ ১৭৩-১৭৪)*

তাঁর ঈমানে পরিপূর্ণতা ও পরিপক্বতা ছিল, তাই অগাধ বিশ্বাস ও ভরসাও ছিল প্রতিপালকের উপর। এই কারণেই মহান আল্লাহ নিজেই তাঁর নাম দিয়েছেন 'আল-মুতাওয়াক্কিল'।

আত্বা বিন য়্যাসার বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﵁-এর সাক্ষাতে বললাম, 'তাওরাতে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলী সম্পর্কে আমাকে বলুন।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! তিনি কুরআনে বর্ণিত কিছু গুণে তাওরাতেও গুণান্বিত। (যেমন,) "হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে" (আহযাব ঃ ৪৫) এবং নিরক্ষর (আরব)দের জন্য নিরাপত্তারূপে। তুমি আমার দাস ও রসূল। আমি তোমার নাম রেখেছি 'আল-মুতাওয়াক্কিল' (আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল)। ---- *(বুখারী ২১২৫, ৪৮৩৮নং)*

মহান আল্লাহ তাঁকে আদেশও করেছেন যে, তিনি যেন তাঁরই উপর ভরসা করেন এবং তাঁকেই 'উকীল' মানেন। কত শত চক্রান্তে ও কষ্টে তাঁকে 'তাওয়াক্কুল' করতে বলা হয়েছে, তা আমরা আল-কুরআনে দেখতে পারি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (١٥٩) سورة آل عمران

"তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন।" (আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

{وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً } (٨١) سورة النساء

"তারা বলে, (আমাদের কর্তব্য) আনুগত্য। অতঃপর যখন তারা তোমার নিকট থেকে চলে যায়, তখন রাত্রে তাদের একদল তারা যা বলে (বা তুমি যা বল) তার বিপরীত পরামর্শ করে। তারা রাত্রে যা পরামর্শ করে আল্লাহ তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা কর। আর কর্ম-বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।" *(নিসা ঃ ৮১)*

{وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا} (٥٨) الفرقان

"তুমি তাঁর উপর নির্ভর কর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁর দাসদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।" (ফুরক্বান ঃ ৫৮)

{وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (٦١) سورة الأنفال

"যদি তারা সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সন্ধির জন্য আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (আনফাল ঃ ৬১)

{فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ} (٧٩) سورة النمل

“অতএব আল্লাহর উপর নির্ভর কর; নিঃসন্দেহে তুমি স্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।” *(নামল ঃ ৭৯)*

{وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} (٣) سورة الأحزاب

“তুমি আল্লাহর ওপর নির্ভর কর, কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।” (আহ্যাব ঃ ৩)

{وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} (٤٨) الأحزاب

“তুমি অবিশ্বাসী ও কপটাচারীদের কথা মান্য করো না ; ওদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট।” (আহ্যাব ঃ ৪৮)

{فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} (١٢٩) التوبة

“অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলে দাও, ‘আমার জন্য তো আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি, আর তিনি হচ্ছেন অতি বড় আরশের মালিক।” (তাওবাহ ঃ ১২৯)

{وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} (١٢٣) سورة هود

“আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে, সুতরাং তুমি তাঁর উপাসনা কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক উদাসীন নন।” (হূদ ঃ ১২৩)

{وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ} (٣٠) سورة الرعد

“তারা পরম দয়াময়কে অস্বীকার করে। তুমি বল, ‘তিনিই আমার প্রতিপালক; তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে।” (রা’দ ঃ ৩০)

{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} (١٠)

“তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন -- ওর মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট। বল, ‘তিনিই আল্লাহ -- আমার প্রতিপালক ; আমি ভরসা রাখি তাঁরই ওপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।” (শূরা ঃ ১০)

{وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} (٣٨) سورة الزمر

“তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, ‘আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?’ ওরা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ বল, ‘তাহলে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে আহবান কর, তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?’ বল, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর ক’রে থাকে।” (যুমার ঃ ৩৮)

উপযুক্ত ‘উকীল’ প্রভুর উপযুক্ত ‘মুতাওয়াক্কিল’ দাস। তাই তিনিই দাসের জন্য যথেষ্ট

ছিলেন। স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

আল-মুজ্তাবা

‘মুজ্তাবা’ মানে মনোনীত, পছন্দকৃত বা নির্বাচিত।

প্রত্যেক নবী-রসূলকেই মহান আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকে মনোনীত ও নির্বাচিত করেন। তাঁরাই হন মানুষের নেতা ও পথপ্রদর্শক। তাঁরাই হন বাছাই করা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (١٧٩) سورة آل عمران

“অপবিত্র (মুনাফিক)কে পবিত্র (মু’মিন) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, আল্লাহ সে অবস্থায় বিশ্ববাসিগণকে ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা আল্লাহর (নিয়ম) নয়। অবশ্য (তার জন্য) আল্লাহ তাঁর রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বিশ্বাস কর। বস্তুতঃ তোমরা বিশ্বাস করলে ও সাবধান (পরহেযগার) হয়ে চললে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।” (আলে ইমরান ঃ ১৭৯)

{وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (٨٧) سورة الأنعام

“এদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম, তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে।” *(আন্আম ঃ ৮৭)*

{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (٥٨) سورة مريم

“নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের ও যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভূত, ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিকট পরম করুণাময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা ক্রন্দন করতে করতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত।” (মারয়্যাম ঃ ৫৮)

এই হিসাবেই আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-কে ‘মুহাম্মাদ মুজ্তাবা’ বলা হয়।

আল-মুখতার

‘মুখতার’ মানে এখতিয়ারকৃত, যাকে এখতিয়ার করা হয়েছে, যাকে শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত, মনোনীত।

মহান প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা এখতিয়ার করে থাকেন। তিনি বলেন,

{وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٦٨)

“তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে ওদের

কোন এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং ওরা যাকে অংশী করে, তা হতে তিনি উর্ধ্বে।" (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৬৮)

{وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} (٣٢) سورة الدخان

"আমি জেনে-শুনেই ওদেরকে (বানী ইস্রাঈলকে) বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।" *(দুখান ঃ ৩২)*

তিনি মূসা ﷺ-কে নবুঅত দান ক'রে বলেছিলেন,

{وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى} (١٣) سورة طه

"আমি তোমাকে মনোনীত করেছি; অতএব যে অহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করা হচ্ছে, তুমি তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর।" (ত্বা-হা ঃ ১৩)

মহান আল্লাহ শেষনবী ﷺ-কে অন্যান্য মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিয়ে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ক'রে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেছেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ فِرْقَةٍ، وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ قَبِيلَةٍ، وَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا).

অর্থাৎ, আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। মহান আল্লাহ সৃষ্টি রচনা ক'রে আমাকে সৃষ্টির সেরা (মানুষের) দলভুক্ত করেছেন। সৃষ্টিকে (আরব ও আজম) দুই দলে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে উত্তম দলে স্থান দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রে জন্ম দিয়েছেন। বিভিন্ন বাড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাড়িতে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি বাড়ির দিক দিয়ে তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্যক্তির দিক দিয়েও তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ। *(আহমাদ ১৭৮৮-নং)*

এই অর্থেই তাঁকে 'আন-নাবিয়্যুল মুখতার' বলা হয়। স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

আল-মুদ্দাষ্ষির

'দিষার' মানে দেহের উপরের লেবাস, চাদর। 'মুদ্দাষ্ষির' মানে চাদরাবৃত। চাদর গায়ে দেওয়া মানুষ।

সর্বপ্রথম যে অহী নাযেল হয়, তা হল [اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ] এরপর অহী আসা কিছু দিন বন্ধ থাকে। ফলে নবী ﷺ খুবই অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। এক দিন আবারও তিনি প্রথমবার হিরা গুহায় অহী নিয়ে আগমনকারী ফিরিশ্তাকে আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে একটি কুরসীর উপর বসা অবস্থায় দেখেন। এ থেকে রসূল ﷺ-এর মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তাই তিনি ঘরে গিয়ে ঘরের লোকদেরকে বলেন, "আমাকে কোন কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে কোন চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।" ফলে তাঁরা রসূল ﷺ-এর শরীরে একটি কাপড় চাপিয়ে দেন। ঠিক এই অবস্থাতেই সূরা মুদ্দাষ্ষির অবতীর্ণ হয়। *(বুখারী ৪৯২২, ৪৯২৪, মুসলিম ৪২৫-৪২৭নং)*

{يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} (٥)

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, সতর্ক কর এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার

পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। অপবিত্রতা বর্জন কর। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ১-৫)

মহান আল্লাহ নতুন নবীকে এই উপনাম দিয়ে সম্বোধন করেছেন। সাময়িক অবস্থার ভিত্তিতে তাঁর এ উপনাম।

আল-মুয্‌যাম্মিল

'মুয্‌যাম্মিল' মানে বস্ত্রাবৃত।

বর্ণিত আছে যে, দারুন নাদওয়াহ (ক্লাব-ঘর)এ কুরাইশগণ জমায়েত হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, 'এই লোকটার একটা এমন নাম বের কর, যার দ্বারা মানুষকে তার কাছ ঘেঁসতে বাধা দেওয়া যাবে।'

সুতরাং কেউ বলল, 'গণক।'

অন্যেরা বলল, 'কিন্তু ও গণক নয়।'

কেউ বলল, 'পাগল।'

অন্যেরা বলল, 'কিন্তু ও পাগল নয়।'

কেউ বলল, 'যাদুকর।'

অন্যেরা বলল, 'কিন্তু ও যাদুকর নয়।'

এই সব বলাবলি ক'রে তারা নিজ নিজ বাড়ি ফিরল। অতঃপর মহানবী ﷺ-এর কানে এ কথা পৌঁছলে তিনি দুঃখিত হয়ে ব্যথিত হৃদয়ে চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লেন। সেই সময় জিবরীল ﵇ অহী নিয়ে অতরণ করলেন এবং তাঁকে 'হে মুয্‌যাম্মিল!' বলে সম্বোধন করলেন,

{يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمْ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً (٢) نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (٤) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (٥) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً (٦) إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً (٧) وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَاإِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً (٩) وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً} (١٠)

অর্থাৎ, হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত। অর্ধরাত্রি কিংবা তার চাইতে অল্প। অথবা তার চাইতে বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করব গুরুভার বাণী। নিশ্চয়ই রাত্রিজাগরণ প্রবৃত্তি দলনে অধিক সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অধিক অনুকূল। দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও। তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর উকীল (কর্মবিধায়ক)রূপে। লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার ক'রে চল। *(মুয্‌যাম্মিল ঃ ১-১০, বায্‌যার ২২৭৬, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৩৪০৮-নং, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/১৩০)*

কিন্তু এ বর্ণনার সনদ সহীহ নয়।

সে যাই হোক, যখন এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়, তখন নবী ﷺ কোন এক কারণে চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর এই অবস্থার চিত্র তুলে ধরে সম্বোধন করলেন।

অর্থাৎ, এখন চাদর ছেড়ে দাও এবং রাতে সামান্য কিয়াম কর (জাগরণ কর); অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায পড়। বলা হয় যে, এই নির্দেশের ভিত্তিতে তাহাজ্জুদের নামায তাঁর উপর ওয়াজেব ছিল।

আল-মুরতাযা

'মুরতাযা' মানে সন্তোষভাজন, যাকে নিয়ে খুশী হওয়া যায়, মনোনীত।

মহান আল্লাহ বান্দাগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট হন। যাকে ইচ্ছা তাকে মনোনীত করেন। যাকে ইচ্ছা দুনিয়াতে 'নবী' বানান। যাকে ইচ্ছা তাকে কিয়ামতে সুপারিশকারী বানাবেন। তিনি বলেছেন,

{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ } (٢٨)

"তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে কেবল তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।" (আম্বিয়া ঃ ২৮)

{إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا} (٢٧) سورة الجن

"তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে তিনি রসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন।" (জ্বিন ঃ ২৭)

এই অর্থ থেকেই মহানবী ﷺ-কেও 'আল-মুরতাযা' বলা হয়। যেহেতু মহান আল্লাহর কাছে তিনি সন্তোষভাজন ও মনোনীত।

আল-মুস্ত্বাফা

'মুস্ত্বাফা' মানে বাছাইকৃত, নির্বাচিত, মনোনীত।

মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই ক'রে মর্যাদা দেন, নিজের জন্য মনোনীত করেন। তিনি বলেন,

{إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} (٣٣) سورة آل عمران

"নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন।" (আলে ইমরান ঃ ৩৩)

{اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (٧٥) سورة الحـج

"আল্লাহ ফিরিশ্তাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক (দূত) এবং মানুষের মধ্য হতেও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (হাজ্জ ঃ ৭৫)

{قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} (٥٩) سورة النمل

বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই এবং তার মনোনীত দাসদের প্রতি শান্তি! আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, নাকি ওরা যাদেরকে শরীক করে তারা?' (নামল ঃ ৫৯)

{وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ} (٤٧) سورة ص

"অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম দাসদের অন্তর্ভুক্ত।" (স্বাদ ঃ ৪৭)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ ».

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ইসমাঈলের বংশধর থেকে কিনানাকে মনোনীত করেছেন। কুরাইশকে মনোনীত করেছেন কিনানা থেকে। বানী হাশেমকে মনোনীত করেছেন কুরাইশ থেকে। আর আমাকে মনোনীত করেছেন বানী হাশেম থেকে। *(আহমাদ, মুসলিম ৬০৭৭, তিরমিযী ৩৬০৬নং)*

আওফ বিন মালেক আশজাঈ ﷺ বলেন, একদিন আমি নবী ﷺ-এর সাথে পথ চলছিলাম। পরিশেষে আমরা মদীনার ইয়াহুদীদের এক গির্জায় প্রবেশ করলাম। সেদিনটি ছিল তাদের ঈদের দিন। সুতরাং তারা সেখানে আমাদের প্রবেশ করাকে পছন্দ করল না। যাই হোক নবী ﷺ তাদেরকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "হে ইয়াহুদ সম্প্রদায়! আমাকে বারো জন লোক দেখাও, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, তাহলে আকাশের নিচে প্রত্যেক ইয়াহুদীর উপর থেকে সেই ক্রোধ আল্লাহ তুলে নেবে, যে ক্রোধ তাদের প্রতি তাঁর আছে।"

এ কথা শুনে তারা নীরব হয়ে রইল। তাদের কেউই সে কথার উত্তর করল না। অতঃপর সে কথার পুনরাবৃত্তি করা হলে তারা আবারও কোন উত্তর দিল না। অতঃপর তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন,

(أَبَيْتُمْ ، فَوَاللهِ ، إِنِّي لأَنَا الْحَاشِرُ ، وَأَنَا الْعَاقِبُ ، وَأَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ، آمَنْتُمْ ، أَوْ كَذَّبْتُمْ).

অর্থাৎ, তোমার অস্বীকার করেছ। অথচ আল্লাহর কসম! আমিই 'হাশের' (জমায়েতকারী), আমিই 'আক্বেব' (সবশেষে আগমনকারী) এবং আমিই 'নবী মুস্তাফা' (মনোনীত নবী)। তাতে তোমরা বিশ্বাস কর অথবা মিথ্যাজ্ঞান কর। *(সহীহ সীরাহ নববিয়্যাহ, আলবানী ৮০পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, 'মুস্তাফা' মানে 'যাবতীয় মানবীয় গুণাবলী হতে মুক্ত' নয়। আভিধানিক অর্থে নয়, বাস্তবেও নয়।

আল-মুক্বাফ্‌ফা

'মুক্বাফ্‌ফা' মানে পশ্চাতে আগমনকারী। এ উপনামটি 'আল-আক্বেব'-এর অনুরূপ। যেহেতু তিনি নবীগণের সিলসিলার শেষ নবী। নবী হিসাবে তিনিই সর্বশেষে আগমন করেছেন। তিনি বলেছেন,

« أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِىُّ التَّوْبَةِ وَنَبِىُّ الرَّحْمَةِ ».

অর্থাৎ, আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ, মুক্বাফ্‌ফা, হাশের, নাবিয়্যুত তাওবাহ ও নাবিয়্যুর রাহমাহ। *(আহমাদ ২৩৪৪৩, মুসলিম ৬২৫৪নং)*

'মুক্বাফ্‌ফা' অনুগমনকারীও হয়। যেহেতু তিনি ছিলেন পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীনের অনুগমনকারী।

পরে বা পিছনে আসার অর্থে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ} (٨٧) سورة البقرة

"অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব (তওরাত গ্রন্থ) দিয়েছি এবং তার পশ্চাতে পর্যায়ক্রমে রসূলগণকে প্রেরণ করেছি।" (বাক্বারাহ ঃ ৮৭)

{وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ} (٤٦) سورة المائدة

"আমি তাদের (নবীগণের) পরে পরেই মারয়্যাম-তনয় ঈসাকে তার পূর্বে অবতীর্ণ তওরাতের সমর্থকরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং সাবধানীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাকে ইঞ্জীল (ঐশীগ্রন্থ) দিয়েছিলাম, ওতে ছিল পথ-নির্দেশ ও আলো।" *(মায়িদাহ ঃ ৪৬)*

{ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ} (٢٧) سورة الحديد

"অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারয়্যাম তনয় ঈসাকে, আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল।" (হাদীদ ঃ ২৭)

পিছনে পড়ার অর্থেই মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (٣٦) سورة الإسراء

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ের পিছনে পড়ো না।" *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৬)*

একই অর্থে কবিতার শেষাংশকে 'ক্বাফিয়াহ' বলা হয় এবং মাথার পিছনের অংশকে 'ক্বাফা' বলা হয়। আর সর্বশেষ নবী ﷺ-কে বলা হয় 'আল-মুক্বাফ্‌ফা'। স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

আন-নাবিয়্যুল উম্মী

এ উপনামের অর্থ, নিরক্ষর নবী।

আমাদের মহানবী ﷺ নিরক্ষর ছিলেন। অন্যান্যের জন্য নিরক্ষরতা মর্যাদার কারণ না হলেও তাঁর জন্য তা ছিল বড় মর্যাদা ও মু'জিযার কারণ।

তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহিত্যমন্ডিত গ্রন্থ আল-কুরআন পেয়েছিলেন। লোকেরা সন্দেহ করেছিল, এটা মানুষের লেখা। কিন্তু 'তা মুহাম্মাদের লেখা'---এ কথা যেন কেউ বলতে না পারে, সেই লক্ষ্যেই তাঁকে নিরক্ষর রাখা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (٤٧) وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (٤٨) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ} (٤٩)

অর্থাৎ, এভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদের মধ্যেও কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে। কেবল অবিশ্বাসীরাই আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। তুমি তো এর পূর্বে কোন গ্রন্থ পাঠ করতে না এবং তা নিজ হাতে লিখতেও না যে, মিথ্যাবাদীরা (তা দেখে) সন্দেহ পোষণ

করবে। বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এ (কুরআন) স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল অনাচারীরাই আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে। (আনকাবূত ঃ ৪৭-৪৯)

লোকেরাও জানত, তিনি নিরক্ষর। মহান আল্লাহও তাঁকে নিরক্ষর নবী বলে আখ্যায়ন করেছেন। তিনি বলেছেন,

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٥٧) سورة الأعراف

"যারা নিরক্ষর রসূল ও নবীর অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জীল যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করে এবং যে তাদের ভার ও বন্ধন যা তাদের উপর ছিল (তা হতে) তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হবে সফলকাম।" *(আ'রাফ ঃ ১৫৭)*

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}

অর্থাৎ, বল, 'হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূল নিরক্ষর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা পথ পাও।' (আ'রাফ ঃ ১৫৮)

মহানবী ﷺ নিজেও বলেছেন, তিনি নিরক্ষর। দরূদের এক বাক্যাবলীতে আছে,

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.....

আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মিইয়ি অআলা আ-লি মুহাম্মাদ..........। *(আহমাদ ১৭০৭২, আবূ দাউদ ৯৮৩, নাসাঈ ৯৮৭৭নং)*

তিনি বলেছেন, "আমরা হলাম নিরক্ষর জাতি। আমরা লেখাপড়া জানি না এবং হিসাবও জানি না। মাস কখনো এই রকম হয়, কখনো এই রকম হয়। অর্থাৎ, কখনো ২৯ দিনে হয় এবং কখনো ৩০ দিনে।" *(বুখারী ১৯১৩নং)*

আরব জাতির মধ্যে তেমন লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। তাদের অধিকাংশ লোক 'উম্মী' ছিল। সেই জাতির প্রতি রসূল পাঠানোর ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} (٢) سورة الجمعة

অর্থাৎ, তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের একজনকে পাঠিয়েছেন রসূলরূপে, যে তাদের

নিকট আবৃত্তি করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা, যদিও ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। (জুমুআহ ঃ ২)

সেই 'উম্মাতুল আরাব'-এর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে মহানবী ﷺ-কে 'উম্মী' বলা হয়েছে।

অথবা 'উম্ম্' বা 'মা'-এর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে তাঁকে 'উম্মী' বলা হয়েছে। যেহেতু প্রত্যেক শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় নিরক্ষর থাকে।

নিরক্ষরতা তাঁর মু'জিযা। সবচেয়ে বড় মু'জিযা আল-কুরআন। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় তিনি নিজের হাতে 'বিন আব্দিল্লাহ' লিখেছিলেন। *(মুসলিম ৪৭৩ ১নং)*

পক্ষান্তরে তাঁর লেখাপড়ার প্রয়োজন ছিল না। তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী। তাঁর ছিল প্রক্ষিপ্ত জ্ঞানভান্ডার। যেহেতু তাঁর শিক্ষক ছিলেন জিবরীল আমীনের মাধ্যমে স্বয়ং পালনকর্তা মহান আল্লাহ। তিনি বলেন,

{وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (٦) وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى} (٧) سورة النجم

"শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়। এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষা দান করে চরম শক্তিশালী, (ফিরিশ্তা জিব্রাঈল)। প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে (জিব্রাঈল নিজ আকৃতিতে) স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্বদিগন্তে।" (নাজ্ম ঃ ১-৭)

কেউ কেউ বলেছেন, 'উম্মুল কুরা' (মক্কা)র প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে তাঁকে 'উম্মী' (মক্কী) বলা হয়েছে।

আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মিইয়ি অআলা আ-লি মুহাম্মাদ..........।

খাতামুন নাবিয়্যীন

এ উপনামের অর্থ হল, সর্বশেষ নবী।

'খাতাম' মানে মোহর। চিঠি লেখার সবশেষে এই মোহর লাগানো হয় এবং তাতে থাকে সমাপ্তির ঘোষণা। নবীগণের সিলসিলা শেষ হওয়ার সমাপ্তি জানিয়ে মহান আল্লাহ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' ﷺ-কে করেছেন 'খাতামুন নাবিয়্যীন'। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (আহ্যাব ঃ ৪০)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ).

অর্থাৎ, আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপমা হল এক ব্যক্তির মতো, যে একটি ঘর বানাল, অতঃপর তা সুন্দর ও সুদর্শন বানাল। কিন্তু এক কোণে একটি ইট বরাবর জায়গা

খালি রাখল। লোকেরা তা ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগল এবং মুগ্ধ হল। তারা বলতে লাগল, 'এই ইটটা কেন লাগানো হয়নি?'

(নবী ﷺ বলেন,) বলা বাহুল্য, আমি হলাম সেই ইট, আমি হলাম 'খাতামুন নাবিয়্যীন' (সর্বশেষ নবী)। *(বুখারী ৩৫৩৫, মুসলিম ৬১০১নং)*

কিয়ামতের মাঠে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' ﷺ-কে ঈসা ؑ 'খাতামুন নাবিয়্যীন' বলে আখ্যায়ন করবেন।

কিয়ামতে লোকেরা সবাই সুপারিশের জন্য আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা নবীর কাছে যাবে। ঈসা নবী ؑ বলবেন,

(لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ....)

অর্থাৎ, আমার সে যোগ্যতা নেই। বরং তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও। কারণ তিনি 'খাতামুন নাবিয়্যীন'।

অবশেষে লোকেরা শেষনবী ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি 'খাতামুন নাবিয়্যীন'। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কি (ভয়াবহ) দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করছি।' তখন তিনি চলে যাবেন এবং আরশের নীচে তাঁর প্রতিপালকের জন্য সিজদাবনত হবেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের জন্য তাঁর হৃদয়কে এমন উন্মুক্ত করে দেবেন, যেমন ইতিপূর্বে আর কারো জন্য করেননি। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, গ্রহণ করা হবে।' তখন শেষনবী ﷺ মাথা উঠিয়ে বলবেন, "আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক!" *(আহমাদ ১৩৫৯০নং)*

শেষনবী ﷺ বলেছেন,

(يَكُونُ فِي أُمَّتِي دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ ، مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ نِسْوَةٍ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ، لا نَبِيَّ بَعْدِي).

অর্থাৎ, আমার উম্মতে ২৭ জন মিথ্যুক দাজ্জাল (নবুঅতের দাবীদার) হবে। তাদের মধ্যে ৪ জন হবে মহিলা! অথচ আমিই 'খাতামুন নাবিয়্যীন' (শেষনবী), আমার পরে কোন নবী নেই। *(ত্বাবারানীর কাবীর ২৯৫৫, সিঃ সহীহাহ ১৯৯৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি (লওহে মাহফূযে) তখনও 'আব্দুল্লাহ' (আল্লাহর দাস) ও 'খাতামুন নাবিয়্যীন' (শেষনবী), যখন আদম ؑ তাঁর কাদায় পড়ে ছিলেন। *(আহমাদ ১৭১৫০, হাকেম ৩৫৬৬, ত্বাবারানীর কাবীর ৬২৯, ইবনে হিব্বান ৬৪০৪নং)*

সুতরাং 'খাতামুন নাবিয়্যীন' উপনাম দিয়ে এ কথার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, নবুঅতের সিলসিলা খতম হয়ে গেছে। তাঁর পর আর কোন নবীর প্রয়োজন নেই। তাঁর আগমনে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। রাব্বানী হিদায়তের আলো সারা বিশ্বে বিকীর্ণ হয়েছে।

যেহেতু তাঁর আগমনের পর বিশ্ব ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। সকল দূরবর্তী নিকটে হয়ে গেছে। দূরের জিনিসও ঘরে বসে দেখা যাচ্ছে। তাই সেই এক নবী ও শেষ নবী দ্বারাই সারা বিশ্বে দ্বীনের আলো বিচ্ছুরিত হবে, মানবমন্ডলীর মানবতা পরিপূর্ণ হবে, সত্য ও ন্যায়ের পতাকা উড্ডীন হবে। সারা বিশ্বে এক দ্বীন, অদ্বিতীয় সংবিধান ও অভিন্ন আইন-কানুন নিয়ে সারা জাহানের মানুষ শান্তিতে বসবাস করবে।

আব্দুল্লাহ

'আব্দ' শব্দের অর্থ দাস, বান্দা, গোলাম। এ শব্দে যদিও হীনতা রয়েছে, তবুও প্রভুর মর্যাদা হিসাবে দাসের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সুমহান প্রভুর দাসত্বের মর্যাদাও বিশাল। সেই মহান প্রতিপালকের 'দাস' হওয়ার যোগ্যতা লাভ করাও পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবের একাধিক জায়গায় মহানবী ﷺ-কে নিজ 'দাস' বলে উল্লেখ করেছেন।

{وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (٢٣) سورة البقرة

"আমি আমার দাসের প্রতি (মুহাম্মাদের প্রতি) যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর, এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষী (এ কাজে সহযোগী উপাস্যদের)কে আহবান কর।" (বাক্বারাহ ঃ ২৩)

{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٤١) سورة الأنفال

"আরো জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা কিছু তোমরা (গনীমত) লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রসূলের, রসূলের নিকটাত্মীয়, পিতৃহীন এতীম, দরিদ্র এবং পথচারীদের জন্য; যদি তোমরা আল্লাহতে ও সেই জিনিসে বিশ্বাসী হও, যা ফায়সালার দিন (বদরে) আমি আমার দাসের প্রতি অবতীর্ণ করেছিলাম; যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।" (আনফাল ঃ ৪১)

{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا} (١٩) سورة الجن

"আর এই যে, যখন আল্লাহর দাস তাঁকে ডাকবার জন্য দন্ডায়মান হল, তখন তারা তার নিকট ভিড় জমাল।" (জ্বিন ঃ ১৯)

{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١) سورة الإسراء

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি নিজ বান্দাকে রাতারাতি ভ্রমণ করিয়েছেন (মক্কার) মাসজিদুল হারাম হতে (ফিলিস্তীনের) মাসজিদুল আক্বসায়, যার পরিবেশকে আমি করেছি বর্কতময়, যাতে আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাই; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা,

সর্বদ্রষ্টা।” (বানী ইস্রাঈল ঃ ১)

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا} (١) سورة الكهف

“সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি কোন প্রকার বক্রতা রাখেননি।” (কাহফ ঃ ১)

{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا } (١) سورة الفرقان

“কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরক্বান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।” (ফুরক্বান ঃ ১)

{هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (٩) سورة الحديد

“তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে সমস্ত প্রকার অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়; পরম দয়ালু।” (হাদীদ ঃ ৯)

{فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} (١٠) سورة النجم

“তখন আল্লাহ তাঁর দাসের প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন।” (নাজ্‌ম ঃ ১০)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি (লওহে মাহফূযে) তখনও ‘আব্দুল্লাহ’ (আল্লাহর দাস) ও ‘খাতামুন নাবিয়্যীন’ (শেষনবী), যখন আদম ﷺ তাঁর কাদায় পড়ে ছিলেন। *(আহমাদ ১৭১৫০, হাকেম ৩৫৬৬, ত্বাবারানীর কাবীর ৬২৯, ইবনে হিব্বান ৬৪০৪)*

তিনি অদ্বিতীয় মা’বূদের আব্দ, মানে তিনি মা’বূদ নন। তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি ক’রে আব্দ্ থেকে মা’বূদের আসনে বসানো অবশ্যই ঠিক নয়। তিনি বলেছেন,

لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা’যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিস্টানরা (ঈসা) ইবনে মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।” *(বুখারী ৩৪৪৫, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৯৭নং)*

সুতরাং তাঁকে মীমহীন ‘আহমাদ’ (আহাদ), আইনহীন ‘আরব’ (রব) মনে করা অবশ্যই খ্রিস্টানদের মতো শির্ক।

যিনি আরশে ছিলেন, তিনিই নবী হয়ে মদীনায় এলেন---বলে যারা তাঁকে নিয়ে অতিরঞ্জন করে, তারা কি আদৌ তওহীদের কোন খবর রাখে? যারা ‘আব্দ’কে ‘মা’বূদ’-এর আসনে অধিষ্ঠিত করে, তারা ‘আব্দ’-এর সম্মান বৃদ্ধি করে ঠিকই, কিন্তু ‘মা’বূদ’-এর সম্মান কি মাথায় রাখে? নাকি উন্মাদনার অতিরঞ্জনে ভক্তিভাজনের ভক্তিতে মাত্রাধিক বাড়াবাড়ি করে তাঁর চাইতে বড় সম্মানীর সম্মানকে ধূলিসাৎ ক’রে নিজেদের ঈমান বরবাদ করে, তার খেয়াল রাখে না?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَآلُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (١٧) سورة المائدة

"নিশ্চয় তারা অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, 'মারয়্যাম-তনয় মসীহই আল্লাহ।' বল, 'মারয়্যাম-তনয় মসীহ, তার মাতা এবং পৃথিবীর সকলকে যদি আল্লাহ ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁকে বাধা দেবার শক্তি কার আছে?' আকাশ ও ভূ-মন্ডলে এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (মায়িদাহ ঃ ১৭)

{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} (٧٢)

"তারা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, 'আল্লাহই মারয়্যাম-তনয় মসীহ।' অথচ মসীহ বলেছিল, 'হে বনী ইস্রাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপাসনা কর। অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্ত্ নিষিদ্ধ করবেন ও দোযখ তার বাসস্থান হবে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।" (মায়িদাহ ঃ ৭২)

খালীলুল্লাহ

মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর 'খলীল' (খাস বন্ধু) ছিলেন। যেমন ইব্রাহীম ﵇ তাঁর 'খলীল' ছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} (١٢٥) سورة النساء

অর্থাৎ, আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম, যে বিশুদ্ধ (তওহীদবাদী) হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইব্রাহীমকে (খলীল) খাস বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। *(নিসা ঃ ১২৫)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

«إِنِّى أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِى مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِى خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِى خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً.....».

অর্থাৎ, আমি আল্লাহর নিকট এ কথার নির্লিপ্ততা ঘোষণা করছি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ আমার খলীল আছে। যেহেতু মহান আল্লাহ আমাকে খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন; যেমন তিনি ইব্রাহীমকে খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। আমি আমার উম্মতের কাউকে খলীলরূপে গ্রহণ করলে আবূ বাক্রকে খলীলরূপে গ্রহণ করতাম। *(মুসলিম ১২১৬নং)*

«لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِى قُحَافَةَ خَلِيلاً وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ».

অর্থাৎ, আমি পৃথিবীর কাউকে খলীলরূপে গ্রহণ করলে ইবনে আবী ক্বুহাফাহ (আবূ বাক্র)কে খলীলরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তোমাদের সাথী 'খালীলুল্লাহ'। *(মুসলিম ৬৩২৬নং)*

'খলীল' সেই বন্ধুকে বলা হয়, যার বন্ধুত্ব নির্ভেজাল খাঁটি। যার ভালোবাসা হৃদয়ের কণায় কণায় স্থানলাভ করে নিয়েছে।

আস্-সিরাজুল মুনীর

মহানবী ﷺ-এর এক উপনাম 'সিরাজে মুনীর'। এর অর্থ আলোদানকারী প্রদীপ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (٤٥) وَدَاعِياً إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً}

অর্থাৎ, হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। *(আহযাব ঃ ৪৫-৪৬)*

তিনি উজ্জ্বল প্রদীপ ঃ যেহেতু তাঁর নবুঅতের সত্যতা স্পষ্ট। কোন অবিমৃশ্যকারী ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।

তিনি উজ্জ্বল প্রদীপ ঃ যেহেতু তাঁর মাধ্যমে কুফরীর ঘনঘটা অন্ধকারে পথ দেখা যায়। তাঁর মাধ্যমে পাপাচারের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া চরিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

তিনি উজ্জ্বল প্রদীপ ঃ যেহেতু তাঁর আলো দ্বারা পথভ্রষ্টরা পথ পায়। শির্ক ও কুফরীর অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিতে সুপথের দিশা পায়।

তিনি উজ্জ্বল প্রদীপ ঃ যেহেতু তাঁর নবুঅতের প্রমাণ অস্পষ্ট নয়। যেহেতু তিনি নিজেই স্পষ্ট প্রমাণ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١) رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً} (٢) سورة البينة

অর্থাৎ, আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা আপন মতে অবিচলিত ছিল, যতক্ষণ না এল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ; আল্লাহর নিকট হতে এক রসূল; যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ। (বাইয়েনাহ ঃ ১-২)

তিনি উজ্জ্বল প্রদীপ ঃ তিনি যখন পৃথিবীতে এলেন, তখন চারিদিক কুফরী ও শির্কের অন্ধকার, অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের তিমির রাত্রি, অমানবতার আঁধারে মানবতার হাবুডুবু অবস্থা। সকলেই সে অমানিশার অবসান ঘটাতে আগ্রহী। তিনি এলেন নবী হয়ে। সেই সকল অন্ধকার দূরীভূত হল। তা ছিল মুহাম্মাদী নবুঅতের জ্বলন্ত ভাস্কর। আলো ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে।

মহান আল্লাহ বিশ্বজাহানের অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য মহাশূন্যে জ্বলন্ত প্রদীপ সূর্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন,

{تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا} (٦١) سورة الفرقان

কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং ওতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র। (ফুরক্বান ঃ ৬১)

{وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا} (١٦) سورة نوح

সেখানে (আকাশে) চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে। (নূহ ঃ ১৬)

{وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١٢) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا} (١٣) سورة النبأ

অর্থাৎ, আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ এবং সৃষ্টি করেছি একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ (সূর্য)। (নাবা ঃ ১২-১৩)

বলা বাহুল্য, বিশ্বে আলোদানকারী আকাশের প্রদীপের নাম দিলেন 'সিরাজে অহ্হাজ'। আর রূপকার্থে মানুষের মনের আকাশে আলোদানকারী প্রদীপের নাম দিলেন 'সিরাজে মুনীর'।

আকাশের প্রদীপ না থাকলে জীব-জগৎ ধ্বংস-কবলিত হতো। প্রাণীকূল বিলীন হয়ে যেতো। না বৃষ্টি হতো, না ফসল ফলতো।

অনুরূপ মানুষের মনের অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য নবুঅতের প্রদীপ আলোকিত না হলে মানুষই ধ্বংস হয়ে যেতো, দোযখের ইন্ধনে পরিণত হতো।

বরং মানুষ সব সময় পৃথিবীর আকাশের সূর্যের মুখাপেক্ষী নয়। রাত্রিতে বা মেঘলা দিনে সূর্য না থাকলে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু মানুষের হৃদয়াকাশে সেই প্রদীপ মুহূর্তের জন্য আলো না ছড়ালে সে বিনাশমুখী হয়। সে প্রদীপ দিবারাত্রি, আলো ও আঁধারে, গোপন ও প্রকাশ্যে, প্রত্যেক জায়গাতে মানবতার সাথী। সে প্রদীপ আলো না দিলে বিশ্ব-মানবতা অন্ধকারে হাবুডুবু খাবে।

এই সেই নবুঅতের উজ্জ্বল প্রদীপ, যা আল্লাহর নূর। সে নূরকে কাফেররা ফুঁ দিয়ে নির্বাপিত করতে চেয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেছিলেন,

{يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} (٣٢) التوبة

অর্থাৎ, তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়, অথচ আল্লাহ স্বীয় নূর (দ্বীন-ইসলাম)কে পূর্ণত্বে পৌঁছানো ব্যতীত নিরস্ত হবেন না, যদিও অবিশ্বাসীরা অপ্রীতিকর মনে করে। (তাওবাহ ঃ ৩২)

{يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} (٨) سورة الصف

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর জ্যোতিকে তাদের মুখ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর জ্যোতিকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন; যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে। (স্বাফ্ ঃ ৮)

সত্যই তো,

'ফানূস বানকে জিসকী হিফাযত হাওয়া কারে,
ওহ শামা' কিয়া বুঝে, জিসে রওশন খুদা কারে।'

মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিলেন,

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} (٦٧) سورة المائدة

"হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি তা না কর, তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে

মানুষ হতে রক্ষা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।” (মায়িদাহ ঃ ৬৭)

নাবিয়্যুত তাওবাহ

মহানবী ﷺ-এর একটি উপনাম 'নাবিয়্যুত তাওবাহ'। এর অর্থ তওবার নবী।
তিনি বলেছেন,

(أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ).

অর্থাৎ, আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ, মুক্বাফ্‌ফা, হাশের, নাবিয়্যুর রাহমাহ, নাবিয়্যুত তাওবাহ ও নাবিয়্যুল মালহামাহ। *(আহমাদ ১৯৫২৫নং)*

কখনো কখনো সলফগণ বলতেন,

حَدَّثَنِى أَبُو الْقَاسِمِ نَبِىُّ التَّوْبَةِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ.......

অর্থাৎ, আমাকে আবুল কাসেম নাবিয়্যুত তাওবাহ ﷺ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন......। *(মুসলিম ৪৪০২, আবূ দাঊদ ৫১৬৭, তিরমিযী ১৯৪৭নং প্রভৃতি)*

তিনি তওবার নবী। যেহেতু তাঁর হাতে তওবা কবুল করা হয়। মহান আল্লাহ তাঁর উম্মতের তওবা কবুল করে অপরাধ ক্ষমা করে দেন। নচেৎ পূর্ববর্তী উম্মতের তওবা ছিল আত্মহত্যা বা আপোস-হত্যা। যেমন মহান আল্লাহ বানী ইস্রাঈলের তওবার ব্যাপারে বলেছেন,

{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } (٥٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর মূসা যখন আপন সম্প্রদায়ের লোককে বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অনাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও (তওবা কর) এবং তোমরা নিজেদের (নিরপরাধ অপরাধী)কে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (বাক্বারাহ ঃ ৫৪)

কিন্তু মুহাম্মদী উম্মতের কেউ শির্ক বা কুফরী থেকে ঈমানে ফিরতে চাইলে কেবল (শর্তাবলী-সহ) তওবা করাই যথেষ্ট।

তিনি তওবার নবী। তাঁর উম্মতের মাঝে তওবাকারীর সংখ্যা বেশি হবে। যেহেতু তাঁর উম্মতের সংখ্যা সবার চাইতে বেশি হবে। এক সময় এমন আসবে, যখন সারা বিশ্বের মানুষ কুফরী থেকে তওবা করবে। এ অর্থে 'মাহী' হবে সমার্থবোধক উপনাম।

তিনি তওবার নবী। যেহেতু তিনি দিবারাত্রি অধিকাধিক তওবা করতেন। তিনি বলেছেন,

((والله إنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله وأَتُوبُ إلَيْه في اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً)).

“আল্লাহর কসম! আমি প্রত্যহ ৭০ বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করি।” *(বুখারী ৬৩০৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ».

"হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর সমীপে তওবা কর! কেননা, আমি প্রতিদিন ১০০ বার করে তাঁর নিকট তওবাহ ক'রে থাকি।" *(মুসলিম ৭০৩৪নং)*

((إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّي لأَسْتَغفِرُ اللهَ فِي اليَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ))

"আমার অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে নিমেষভর বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেহেতু আমি দিনে একশত বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই।" *(মুসলিম ৭০৩৩নং)*

ইবনে উমার ﷺ বলেন, একই মজলিসে বসে নবী ﷺ-এর (এই ইস্তিগফারটি) পাঠ করা অবস্থায় একশো বার পর্যন্ত গুণতাম,

((رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)).

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, আমার তওবা কবূল কর, নিশ্চয় তুমি অতিশয় তওবাহ কবূলকারী পরম দয়াবান (মহা ক্ষমাশীল)। *(আবূ দাউদ ১৫১৮, তিরমিযী ৩৪৩৪নং)*

আর মহান প্রতিপালক তাঁকে আদেশ দিয়ে বলেছিলেন,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} (١٩)

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই। আর ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ক্রটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান ক্ষেত্র সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। (মুহাম্মাদ ঃ ১৯)

তিনি তওবার নবী। তিনি উম্মতের কারো জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে থাকেন। যেমন তিনি বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا} (٦٤) سورة النساء

অর্থাৎ, রসূল এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে। আর যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম ক'রে (পাপ করে)ছিল, তখন যদি তারা তোমার নিকট আসত ও আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুরূপে পেত। (নিসা ঃ ৬৪)

তিনি তওবার নবী। মহান আল্লাহ পশ্চিম দিক হতে সূর্য ওঠার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর উম্মতের তওবা কবুল করবেন। দিবারাত্রি তিনি উম্মতের তওবা কবুল করার জন্য নিজ হস্ত প্রসারিত রাখেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بالليلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها)).

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নিজ হাত রাতে প্রসারিত করেন; যেন দিনে পাপকারী (রাতে) তওবা করে। এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন; যেন রাতে পাপকারী (দিনে) তওবাহ করে। যে পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে, সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে।" *(মুসলিম ৭১৬৫নং)*

নাবিয়্যুর রাহমাহ

মহানবী ﷺ-এর একটি উপনাম 'নাবিয়্যুর রাহমাহ'। এর অর্থ রহমতের নবী বা দয়ার নবী। তিনি বলেছেন,

(أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ).

অর্থাৎ, আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ, মুক্বাফ্‌ফা, হাশের, নাবিয়্যুর রাহমাহ, নাবিয়্যুত তাওবাহ ও নাবিয়্যুল মালহামাহ। (আহমাদ ১৯৫২৫নং)

তিনি দয়ার নবী, মহান আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়ে সে কথা বলেছেন,

{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (١٢٨)

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রসূল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ। (তাওবাহ ঃ ১২৮)

দয়ার নবী, তাই তিনি মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না। বরং তিনি ক্ষমা ও মার্জনা ক'রে দেন। আত্বা বিন য়্যাসার বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ-এর সাক্ষাতে বললাম, 'তাওরাতে উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলী সম্পর্কে আমাকে বলুন।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আল্লাহর কসম! তিনি কুরআনে বর্ণিত কিছু গুণে তাওরাতেও গুণান্বিত। (যেমন,) "হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে" (আহ্‌যাব ঃ ৪৫) এবং নিরক্ষর (আরব)দের জন্য নিরাপত্তারূপে। তুমি আমার দাস ও রসূল। আমি তোমার নাম রেখেছি 'আল-মুতাওয়াক্কিল' (আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল)। তিনি রূঢ় ও কঠোর নন। হাটে-বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারীও নন। তিনি মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না। বরং তিনি ক্ষমা ও মার্জনা ক'রে দেন। আল্লাহ তাঁর কখনোই তিরোধান ঘটাবেন না, যতক্ষণ না তিনি তাঁর দ্বারা বাঁকা (কাফের) সম্প্রদায়কে সোজা করেছেন তথা তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তাঁর দ্বারা বহু অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ ও বদ্ধ হৃদয়কে উন্মুক্ত করেছেন। (বুখারী ২১২৫, ৪৮৩৮নং)

তিনি 'নাবিয়্যুর রাহমাহ'। কোন কোন বর্ণনা মতে 'নাবিয়্যুল মারহামাহ'। অবশ্য উভয়ের অর্থ একই। তিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও করুণা। বরং পশু-পক্ষী ও উদ্ভিদের জন্যও রহমত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } (١٠٧) سورة الأنبياء

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি।" *(আম্বিয়া ঃ ১০৭)*

তিনি দয়ার নবী। কিয়ামতের মাঠে সকল নবী বলবেন, 'নাফসী-নাফসী।' আর আমাদের দয়ার নবী ﷺ বলবেন, 'উম্মাতী-উম্মাতী।' তিনি গোনাহগার উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন এবং সকল নবীর উম্মতের জন্যও সুপারিশ করবেন। সুপারিশ করবেন কোন কোন উম্মতীর বেহেশ্তে মর্যাদা বর্ধন করার জন্য। (আরো দ্রঃ 'তাঁর দয়ার্দ্রতা' বিষয়ক শিরোনাম।)

নাবিয়্যুল মালহামাহ

'মালহামাহ' মানে যুদ্ধ। মহানবী ﷺ যুদ্ধের নবী ছিলেন। কেবল তিনিই নন, তাঁর পূর্বেও বহু নবী যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাঁর মতো যোদ্ধা কেউ ছিলেন না। তাঁর মতো যুদ্ধ অন্য কেউ করেননি। বরং তাঁর উম্মতের মধ্যে জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। সেই জিহাদ, যে জিহাদের মধ্যে উম্মাহর প্রাণ আছে।

মহান আল্লাহ তাঁকে সরাসরি যুদ্ধের আদেশ দিয়ে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (٧٣) التوبة

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি কাফের ও মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা। *(তাওবাহ ঃ ৭৩, তাহরীম ঃ ৯)*

আর তিনি বলেছেন,

(أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا (فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ).

"মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ সংগ্রাম করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর নামায কায়েম করবে ও (ধনের) যাকাত আদায় করবে। যখন তারা এগুলি বাস্তবায়ন করবে, তখন ইসলামী হক (অর্থদণ্ড ইত্যাদি) ছাড়া তারা নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে সুরক্ষিত ক'রে নেবে। আর (অন্তরের গভীরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে) তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায়।" *(বুখারী ২৫, মুসলিম ১৩৩নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ).

অর্থাৎ, আমি (কিয়ামতের পূর্বে) তরবারি-সহ প্রেরিত হয়েছি, যাতে শরীকবিহীনভাবে আল্লাহর ইবাদত হয়। আমার জীবিকা রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে। অপমান ও লাঞ্ছনা রাখা হয়েছে আমার আদেশের বিরোধীদের জন্য। আর যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত। *(আহমাদ ৫১১৪, শুআবুল মান ৯৮, সঃ জামে' ২৮৩১নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالذَّبْحِ).

অর্থাৎ, হে কুরাইশ দল! (শোনো,) তাঁর শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট যবেহ-সহ আগমন করেছি।

সেহেতু তিনি সশরীরে অংশ গ্রহণ করে অথবা না করে বহু যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। তিনি কোন কোন যুদ্ধে রক্তাক্ত হয়েছেন।

উহুদ যুদ্ধে তিনি কেবল একজন রক্তপিয়াসী কাফেরকে হত্যা করেছিলেন।

এ সত্ত্বেও তিনি 'নাবিয়্যুর রাহমাহ' কীভাবে হলেন? এর জবাব বিভিন্ন স্থলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাঁর জিহাদ ছিল বাঁচার জন্য। তাঁর জিহাদ ছিল আল্লাহর যমীনে আল্লাহরই ইবাদতে

তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য। আর তা ছিল এক প্রকার অস্ত্রোপচারের মতো। চিকিৎসক রোগীর দেহে অস্ত্র প্রয়োগ করে রোগীর প্রতি করুণাই করে থাকেন। সেই কাটাকাটিকে বাহ্যতঃ হত্যাচার মনে হলেও আসলে তা সত্যাচার।

পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতেরা নবীর মু'জিযা ও প্রমাণাদি অমান্য করলে মহান আল্লাহ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করেছেন। তার তুলনায় শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের নবী ﷺ-এর জিহাদ করুণা নয় তো কী? যেহেতু জিহাদে তো অবশিষ্টতা আছে, কিন্তু আম আযাবে কোন অবশিষ্টতা নেই।

তবুও তাঁর জিহাদে মানুষ খুন ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ বাতিল থেকে হকে ফিরে আসুক। নচেৎ তায়েফবাসীদেরকে দুই পাহাড়ের মাঝে পিষ্ট করে সমূলে ধ্বংস করে দিতেন। সুতরাং তিনি বলেছিলেন, "বরং আশা করি, তাদের পৃষ্ঠ থেকে আল্লাহ এমন জাতির উদ্ভব ঘটাবেন, যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।" *(বুখারী ৩২৩১, মুসলিম ৪৭৫৪নং)*

বাঁচার জন্য যাঁরা যুদ্ধ করেন, তাঁরা মারা গেলেও অমর থাকেন। কবি বলেছেন,

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই-
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ সে ব্যক্তির (রক্ষণাবেক্ষণের) দায়ভার গ্রহণ করেন, যে ব্যক্তি তাঁর রাস্তায় বের হয়। (আল্লাহ বলেন,) 'আমার পথে জিহাদ করার স্পৃহা, আমার প্রতি বিশ্বাস, আমার পয়গম্বরদেরকে সত্যজ্ঞানই তাকে (স্বগৃহ থেকে) বের করে। আমি তার এই দায়িত্ব নিই যে, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব, না হয় তাকে নেকী বা গনীমতের সম্পদ দিয়ে তার সেই বাড়ির দিকে ফিরিয়ে দেব, যে বাড়ি থেকে সে বের হয়েছিল।' সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! আল্লাহর পথে দেহে যে কোন যখম পৌঁছে, কিয়ামতের দিনে তা ঠিক এই অবস্থায় আগমন করবে যে, যেন আজই যখম হয়েছে। (টাটকা যখম ও রক্ত ঝরবে।) তার রং তো রক্তের রং হবে, কিন্তু তার গন্ধ হবে কস্তুরীর মত। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে! যদি মুসলিমদের জন্য কষ্টের আশংকা না করতাম, তাহলে আমি কখনো এমন মুজাহিদ বাহিনীর পিছনে বসে থাকতাম না, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। কিন্তু আমার এ সঙ্গতি নেই যে, আমি তাদের সকলকে বাহন দিই এবং তাদেরও (সকলের জিহাদে বের হওয়ার) সঙ্গতি নেই। আর (আমি চলে গেলে) আমার পিছনে থেকে যাওয়া তাদের জন্য কষ্টকর হবে। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে! আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, আমি আল্লাহর পথে লড়াই করি এবং শহীদ হই। অতঃপর আবার (জীবিত হয়ে) লড়াই করি, পুনরায় শাহাদত বরণ করি। অতঃপর (পুনর্জীবিত হয়ে) যুদ্ধ করি এবং পুনরায় শহীদ হয়ে যাই।" *(বুখারী কিদয়ংশ ২৭৯৭নং, মুসলিম ৪৯৬৭নং)*

তাঁর অন্যান্য নামাবলী

মহানবী ﷺ-এর সমস্ত নামাবলী অর্থবোধক। তাঁর কোন নাম অর্থহীন কেবল বিশেষ্য নয়। সুতরাং ত্বাহা, ইয়াসীন তাঁর নাম নয়।

ইবনুল ক্বাইয়েম (রঃ) বলেছেন, 'যে সকল নাম রাখতে নিষেধ করা হয়, তার মধ্যে কুরআন ও তার সূরার নামে মানুষের নামকরণ করা; যেমন ত্বাহা, ইয়াসীন, হা-মীম ইত্যাদি। ইমাম মালেক স্পষ্টভাবেই 'ইয়াসীন' নাম রাখা মকরূহ বলেছেন। এ কথা উল্লেখ করেছেন সুহাইলী।

পক্ষান্তরে নবী ﷺ-এর নামসমূহের মধ্যে 'ইয়াসীন' ও 'ত্বাহা' বলে যে নাম লোকমুখে প্রচলিত আছে, তা সহীহ নয়। এ নাম কোন সহীহ, হাসান বা মুরসাল হাদীসে আসেনি। কোন সাহাবী কর্তৃক কোন আষারও বর্ণিত নেই। আসলে এগুলি 'আলিফ-লাম-মীম', 'হা-মীম', 'আলিফ-লাম-রা' ইত্যাদির মতো (আরবী পৃথক পৃথক) অক্ষর-সমষ্টি। *(তুহফাতুল মাওদূদ ১২৭পৃঃ)*

যাঁরা 'ইয়াসীন' ও 'ত্বাহা'-কে তাঁর নাম বলে ধারণা করেছেন, তাঁরা সম্ভবতঃ কুরআনী বাচন-ভঙ্গি থেকে গ্রহণ করেছেন। যেহেতু 'ত্বা-হা'-এর পরে নবী ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

( ) ( )

"ত্বা-হা-। তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।" *(ত্বা-হাঃ ১-২)*

তাঁরা ভেবেছেন, 'হে ত্বাহা! তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি।'

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

(.) ' ( )* +* ,· ( ) # $% & ( ) ! "

"ইয়া-সীন, জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ! তুমি অবশ্যই প্রেরিত (রসূল)দের অন্তর্ভুক্ত।" *(ইয়াসীনঃ ১-৩)*

তাঁরা ভেবেছেন, 'হে ইয়াসীন! জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ! তুমি অবশ্যই প্রেরিত (রসূল)দের অন্তর্ভুক্ত।'

কিন্তু তাঁদের এ ভাবনা সঠিক নয়। যেহেতু অনুরূপ সম্বোধনের শব্দ অন্যান্য ছিন্ন অক্ষরের পরেও এসেছে, অথচ সে সবকে নবী ﷺ-এর নাম বলে উল্লেখ করা হয় না। যেমন,

( ) ' 1)* 2 34& 5 67)) 9 : ;6<= >? +$" @? · A B 3 ( ) / 0

"আলিফ লা-ম মী-ম স্বা-দ। তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে; সুতরাং তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন প্রকার সংকীর্ণতা না থাকে। যাতে তুমি এর দ্বারা সতর্ক কর এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটি উপদেশ।" *(আ'রাফঃ ১-২)*

( ) <*% " J K = · #L I6 4N5 6OC · D * F + G , 9 H) ·] B 3

"আলিফ লা-ম রা। এই কিতাব এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি; যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে আলোকের দিকে; পরাক্রমশালী, সর্বপ্রশংসিতের পথে বের করে আনতে পার।" *(ইব্রাহীমঃ ১)*

সকলেই বলবেন যে, 'আলিফ-লাম-মীম-স্বাদ' ও 'আলিফ-লাম-রা' মহানবী ﷺ-এর কোন নাম নয়। যেমন 'নূন' বিছিন্ন শব্দের পরেও সম্বোধনের শব্দ এসেছে, অথচ 'নূন' তাঁর নাম নয়।

অনেকে বলেছেন, 'ইয়া-সীন' মানে 'ইয়া সায়্যিদ' অথবা 'ইয়া ইনসান' এবং 'ত্বা-হা' মানে 'ইয়া ত্বাহের ইয়া হাদী'।

কিন্তু সে সব কথার কোন দলীল নেই। আর স্বকপোলকল্পিত ধারণা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, সে সব কাল্পনিক উহ্য শব্দ তাঁর এক-একটা নাম।

আর সূরার শুরুতে যে সকল বিচ্ছিন্ন আরবী বর্ণসমষ্টি আছে, সে সকলের মর্ম একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

প্রকাশ থাকে যে, মহানবী ﷺ-এর নাম জান্নাতীদের কাছে, ফিরিশ্তার কাছে অন্য এক, আম্বিয়ার কাছে অন্য এক---বলে যে বর্ণনা নকল করা হয়, তা কোন হাদীস-গ্রন্থে নেই।

তাঁর দৈহিক গঠনাকৃতি

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৈহিক গঠনাকৃতি ছিল অতি সুন্দর। দেহের কাঠামো ছিল শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষের।

তাঁর মাথা ছিল বড় আকারের। *(সঃ জামে' ৪৮১৯নং)*

তাঁর মাথা টাক-পড়া হতে ত্রুটিমুক্ত ছিল।

জাঁকালো কৃষ্ণ কেশদাম ছিল তাঁর মস্তকে। তাঁর চুল অতিরিক্ত কোঁকড়ানো ছিল না। আবার একেবারে সোজা খাড়াও ছিল না। *(বুখারী ৩৫৪৭, ৫৯০৬নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মাথার চুলও প্রকৃতিগতভাবে সব ধরনের ছিল।

কখনো ছিল কানের অর্ধেক বরাবর লম্বা। *(মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ ২১নং)*

কখনো ছিল তার থেকে বেশী লম্বা; কানের লতি বরাবর। আর আরবীতে একে 'অফরাহ' বলা হয়।

কখনো ছিল তার থেকেও বেশী লম্বা; কানের নিচ বরাবর; কান ও কাঁধের মাঝ বরাবর। একে আরবীতে 'লিম্মাহ' বলা হয়। *(আবূ দাউদ ৪১৮৬, ইবনে মাজাহ ৩৬৩৪, ঐ ২২নং)*

আবার কখনো ছিল তার থেকেও বেশী লম্বা কাঁধ বরাবর। আরবীতে যাকে 'জুম্মাহ' বলা হয়। *(ঐ ৩নং)*

কখনো তিনি তাঁর ঐ লম্বা চুলে চারটি বেণি গেঁথে নিতেন। *(ঐ ২৩নং)*

তিনি মাথায় তেল ব্যবহার করতেন। *(মুসলিম ২৩৪৪নং)*

তিনি মাথার চুলকে আঁচড়ে সুবিন্যস্ত করে রাখতেন।

তিনি বলতেন, "যার চুল আছে, সে যেন তার যত্ন করে।" *(আবূ দাউদ ৪১৬৩নং)*

একদা তিনি এক ব্যক্তির মাথায় আলুথালু চুল দেখে বললেন, "এর কি এমন কিছুও নেই যে, তার দ্বারা মাথার এলোমেলো চুলগুলোকে সোজা করে (আঁচড়ে) নেয়?!" *(আবূ দাউদ ৪০৬২, নাসাঈ ৫২৩৬, আহমাদ ১৪৪৩৬, মিশকাত ৪৩৫১নং)*

মহানবী ﷺ প্রত্যেক দিন চুল আঁচড়াতেন না। বরং মাঝে মাঝে একদিন করে বাদ দিয়ে আঁচড়াতেন। তিনি প্রত্যহ চুল আঁচড়াতে নিষেধও করেছেন। *(নাসাঈ ৫০৫৪, মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ ২৮নং)*

তিনি নিষেধ করেছেন (বেশী বেশী তেল-শ্যাম্পু দিয়ে) চুলের বিলাসিতা করতে। *(আবূ দাউদ ৪১৬০নং, নাসাঈ)*

তিনি চুল আঁচড়াবার সময় ডান দিক থেকে শুরু করতেন। *(ঐ ২৭নং)*

তিনি তাঁর মাথার মাঝখানে সিঁথি করতেন। *(আবূ দাউদ ৪১৮৯, ইবনে মাজাহ ৩৬৩৩নং)*

তাঁর মাথার ২০টি মতো চুল সাদা হয়েছিল। (সঃ জামে' ৪৮১৮নং)

উষমান বিন আব্দুল্লাহ বলেন, 'আমি (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মে সালামার নিকট গেলে তিনি নবী ﷺ-এর কিছু কলপ করা চুল বের করে আমাদেরকে দেখালেন। (বুখারী ৫৮৯৭নং)

তাঁর ভ্রূযুগল ছিল পরস্পর সংযুক্ত চিকন।

তাঁর চক্ষুযুগল ছিল ডাগর। তিনি ছিলেন আয়তলোচন সুপুরুষ। অতি সাদার উপর নিবিড় কালো ছিল তাঁর চোখের তারা। চোখের সাদা অংশে ছিল হাল্কা রক্তিম আভা। *(সঃ জামে' ৪৮২১নং)*

সুর্মা সুশোভিত ছিল তাঁর চক্ষু। (সঃ জামে' ৪৬৩৩নং)

তাঁর চক্ষু ছিল দীর্ঘ পলকবিশিষ্ট, তাঁর চক্ষুপল্লবের লোম ছিল লম্বা। *(সঃ জামে' ৪৬২০, ৪৬২১, ৪৮১৬নং)* লোমের ডগায় ছিল বঙ্কিমতা। সুর্মাবরণ ছিল তাঁর অক্ষিদ্বয়। *(শামায়িল তিরমিযী ৩৪৭নং)*

তাঁর ললাট ছিল প্রশস্ত। তাঁর কপাল উঁচু ছিল না।

তাঁর নাক ছিল সুউন্নত।

তাঁর গন্ডদেশে মাংসের বাহুল্য ছিল না। চিবুক ক্ষুদ্রাকার ছিল না।

তাঁর মুখ ছিল প্রশস্ত ও ডাগর। (সঃ জামে' ৪৮২১নং)

তাঁর চেহারার সৌন্দর্য ছিল সবার চাইতে বেশি। (বুখারী ৩৫৪৯, মুসলিম ৬২১২নং)

তাঁর ছিল সমুজ্জ্বল মুখমন্ডল। লাবণ্যময়, অত্যন্ত সুশ্রী ও মাধুর্যমন্ডিত, গোলাকার, পূর্ণিমার চাঁদের মতো চেহারা, চন্দ্রবদন।

জাবের বিন সামুরাহ বলেন, 'আমি এক পূর্ণিমার রাতে নবী ﷺ-কে দেখলাম। আমি তাঁর চেহারার দিকে এবং চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। তাঁর পরনে ছিল এক জোড়া লাল কাপড়। বলা বাহুল্য, তিনি ছিলেন আমার নিকট পূর্ণিমার চাঁদ অপেক্ষা বেশি সুন্দর।' *(তিরমিযী ২৮১১, দারেমী, মিশকাত ৫৭৯৪নং)*

কা'ব বিন মালেক বলেন, 'যখন তিনি খুশী হতেন, তখন মনে হতো তাঁর চেহারা যেন চাঁদের একটি টুকরা।' (বুখারী ৩৫৫৬, মুসলিম ৭১৯২নং)

তিনি যখন রেগে যেতেন, তখন তাঁর চেহারা লাল হয়ে উঠত, (মনে হতো) যেন তাঁর চেহারায় বেদানার দানা নিংড়ে দেওয়া হয়েছে। *(তিরমিযী ২১৩৩, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ১৩৫নং)*

তাঁর মুখমন্ডল তলোয়ারের মতো ছিল না। ছিল চন্দ্র-সূর্যের মতো। *(বুখারী ৩৫৫২, মুসলিম ৬২৩০নং)*

তাঁর দাড়ি মুবারক ছিল ঘন সন্নিবেশিত। *(সঃ জামে' ৪৮২০, ৪৮২৫নং)* আর তিনি বলতেন,

"প্রকৃতিগত সুন্নত হল ১০টি; মোচ ছাঁটা, দাড়ি বাড়ানো, দাঁতন করা, নাকে পানি নেওয়া (নাক পরিষ্কার করা), নখ কাটা, আঙ্গুল ধোয়া, বোগলের লোম তুলে পরিষ্কার করা, নাভির নীচের লোম চেঁছে সাফ করা, প্রস্রাব-পায়খানার পর পানি ব্যবহার করা এবং কুল্লি করা।" *(মুসলিম ২৬১নং)*

"তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও, মোচ ছেঁটে ফেলো, পাকা চুল রঙিয়ে ফেলো এবং ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ১০৬৭নং)*

"তোমরা মোচ ছেঁটে ও দাড়ি রেখে অগ্নিপূজকদের বৈপরীত্য কর।" *(মুসলিম ২৬০ নং)*

পক্ষান্তরে তিনি দাড়ি ছেঁটেছেন---এ কথার কোন সহীহ প্রমাণ নেই।

মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর চুল ও দাড়ি মুবারক তেমন সাদা হয়নি। কেবল জুলফির কিছু চুল সাদা হয়েছিল এবং মাথারও কিছু কিছু। অধরের নিচের অংশে কিছু দাড়ি সাদা হয়েছিল।

তিনি তাঁর দাড়ি মুবারককে অর্স্ ও জাফরান দিয়ে (হলুদ রঙে) রঙিয়ে রাখতেন। *(আবূ দাউদ ৪২১০, নাসাঈ ৫২৪৪নং)*

তিনি বলেছেন, “ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা পাকা চুল-দাড়ি রঙায় না, তোমরা (তা রঙিয়ে) তাদের বিরোধিতা কর।” *(বুখারী, মুসলিম, সুনানে আরবাআহ, সহীহুল জামে' ১৯৯৮নং)*

অবশ্য তিনি কলপে কালো রঙ ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। *(মুসলিম ৫৬৩১নং)*

তাঁর মোছ ছিল ছাঁটা, তিনি মোছ ছেঁটে ফেলতে আদেশ করেছেন। আনাস ﷺ বলেন, ‘মোচ ছাঁটা, নখ কাটা, নাভির নিচের লোম চাঁছা এবং বোগলের লোম তুলে ফেলার ব্যাপারে আমাদেরকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে; যাতে আমরা সে সব চল্লিশ দিনের বেশী ছেড়ে না রাখি।’ *(মুসলিম ২৫৮নং)*

তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গাম্ভীর্যমন্ডিত।

তাঁর গ্রীবা ছিল দীর্ঘ ও সুউন্নত।

তিনি স্থূলোদর মানুষ ছিলেন না।

বক্ষোদর লোমশূন্য ছিল। বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত একটা সরু লোম-রেখা ছিল। *(আহমাদ ৬৮৪, তিরমিযী ৩৬৩৮নং)*

তাঁর বক্ষস্থল ছিল প্রশস্ত।

তাঁর বক্ষে সীনাচাকের দাগ ছিল। শৈশবে দুধমাতা হালীমার ঘরে অবস্থানকালে জিবরীল ﷺ তাঁকে চিৎভাবে শুইয়ে তাঁর বক্ষ বিদারণ করেন। হৃৎপিন্ড বের করে সোনার পিরিচে রেখে তার অশুভ অংশ বের করে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করে পুনরায় যথাস্থানে রেখে সিলাই করে দেন। আনাস ﷺ বলেন, ‘আমি তাঁর বুকে সিলাইয়ের চিহ্ন দেখতাম।’ *(মুসলিম ৪৩১নং)*

অনুরূপ মি’রাজের রাত্রে ইসরা গমনের আগে তাঁর আরও একবার সীনাচাক হয়। সে সময় তাঁর হৃদয়কে ঈমান ও হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়। (বুখারী ৭৫১৭নং)

অনুরূপ নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে একবার তাঁর বক্ষ বিদারণ করা হয়। (ফাতহুলবারী ১১/২১৬) অনেকে বলেন, তাঁর দশ বছর বয়সেও একবার সীনাচাক হয়। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

এ ছিল মহানবী ﷺ-এর এক মু’জিযা। সুতরাং অলৌকিক ঘটনাকে অসম্ভব বলে অস্বীকার করা মু’মিনের কাজ নয়।

তাঁর পিঠের উপরিভাগ ও সন্ধিমূলসমূহের হাড্ডি ছিল মোটা। জোড়ের হাড়গুলি ছিল ভারী ভারী। (আহমাদ ৬৮৪, তিরমিযী ৩৬৩৮নং)

তাঁর উভয় স্কন্ধের মধ্যে দূরত্ব ছিল। (সঃ জামে’ ৪৮১৬নং)

তাঁর পৃষ্ঠদেশে উভয় স্কন্ধের মধ্যভাগে ছিল নবুঅতের মোহর। লালবর্ণের উঁচু মাংস। (তিরমিযী ৩৬৪৪নং) সেটার রঙ তাঁর দেহের রঙ থেকে পৃথক ছিল না। এর আকার-আকৃতি ছিল বোতাম অথবা কবুতরের ডিমের মতো এবং তা ছিল বাম কাঁধের নিচে (ঠিক হৃৎপিন্ডের বিপরীতে)। তার উপর ছিল এক গুচ্ছ তিলের সমাহার। *(বুখারী ৩৫৪১, মুসলিম ৬২৩০, ৬২৩৪নং)*

কেউ বলেছেন, বাদাম বা কলাইয়ের মতো। (ইবনে হিব্বান ৬৩০২নং)

কেউ বলেছেন, (ক্ষুদ্র) আপেলের মতো। (আহমাদ ১৭৪৯৩, তিরমিযী ৩৬২০নং)

বলা হয়, তাঁর এই মোহর জন্মের সময় দেওয়া হয়। অনেকের মতে মোহর নিয়েই তাঁর জন্ম হয়। অনেকের মতে সীনাচাকের সময় দেওয়া হয়। (ফাতহুল বারী ১০/৩৪৯)

তাঁর ছিল ঝকঝকে গাত্রবর্ণ, তাঁর দেহের রঙ ছিল গৌরবর্ণ, লাল ও শ্যামবর্ণের মিশ্রিত রঙ, দুধে-আলতা-ঘোলা রঙ।

তিনি বেমানান দীর্ঘকায় কিংবা হ্রস্বকায় ছিলেন না। তিনি ছিলেন এ দুইয়ের মাঝামাঝি অত্যন্ত মানানসই মধ্যমদেহী পুরুষ, মাঝারি গড়নের। না মোটা, না পাতলা। *(সঃ জামে' ৪৬২২নং)*

তাঁর রঙ ছিল সাদা, যেন তিনি রূপার তৈরি। (সঃ জামে' ৪৬১৯নং)

তাঁর চাচা আবূ তালেব বলেছিলেন,

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ٭ ثمال اليتامى عصمة للأرامل

অর্থাৎ, তিনি গৌরবর্ণ, তাঁর চেহারা দ্বারা বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। তিনি অনাথদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। (বুখারী ১০০৮-১০০৯নং)

দেহ থেকে চাদর সরালে মনে হতো, যেন রূপার মূর্তি। (ঐ ৪৬৩৩নং)

তবে সে রঙ খাঁটি সাদা ছিল না। (ঐ ৪৮১৩নং)

সেই সাদার সাথে লাল রঙও মিশ্রিত ছিল। (সঃ জামে' ৪৬২০নং)

উম্মে মা'বাদ খুযায়ীর বর্ণনামতে,

غُصْن بين غُصْنَيْن، فهو أَنْضَر الثلاثة منظراً، وأحسنهم قدْرًا.

অর্থাৎ, দু'টি ডালের মাঝে একটি ডাল (তিনি)। তিনিই তিনটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সজীব দৃশ্যমান এবং তিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান। (যাদুল মাআদ ৩/৫০)

অন্য দুটি ডাল থেকে উদ্দেশ্য হিজরতসঙ্গী আবূ বাক্‌র ও ইবনে উরাইক্বিত।

মহানবী ﷺ খুব বেশি ঘামতেন। (সঃ জামে' ৪৮২৪নং)

তাঁর দেহের সমুজ্জ্বল সৌন্দর্যের উপর যখন তাঁর ঘর্মবিন্দু জমা হতো, তখন তা দেখে মনে হতো মণিমুক্তা। (সঃ জামে' ৪৭৯৮নং)

তাঁর সেই ঘাম শিশিতে ভরে রাখা হতো এবং সময়ে তা সুগন্ধি ও ওষুধরূপে ব্যবহার করা হতো।

একদা তিনি উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। তিনি ঘরে ছিলেন না। তিনি এলে তাঁকে বলা হল, 'নবী ﷺ তোমার ঘরে এসে তোমার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছেন।' তিনি ঘর্মাক্ত হলে তাঁর ঘাম বিছানার চামড়ার উপর জমে উঠেছিল। উম্মে সুলাইম তাঁর সিন্দুক খুলে শিশি বের করলেন। অতঃপর সেই ঘাম (কাপড়খন্ড দ্বারা শোষণ ক'রে তা) নিংড়ে শিশিতে রাখতে লাগলেন। নবী ﷺ অকস্মাৎ ঘাবড়ে উঠলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করছ উম্মে সুলাইম?' বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! (আপনার ঘাম। আমাদের সুগন্ধিতে মিশিয়ে দেব। তা হবে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি।) আর তাতে আমাদের শিশুদের জন্য বর্কতের আশা করব।' তিনি বললেন, "ঠিক আছে।" *(মুসলিম ৬২০১-৬২০২নং)*

তাঁর মুবারক দেহ ছিল সুগন্ধময়। তাঁর দেহনিঃসৃত ঘাম ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ আতর। *(মুসলিম ৬২০১নং)*

তিনি আগমন করলে তাঁর সৌরভেই চেনা ও জানা যেত, তিনি আসছেন। *(সহীহুল জামে'*

৪৯৮৮নং)

আনাস ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোন পুরু বা পাতলা রেশম আমি স্পর্শ করিনি। আর তাঁর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনো শুঁকিনি।' (বুখারী ১৯৭৩, মুসলিম ৬২০০নং)

জাবের বিন সামুরাহ ﷺ বলেন, 'তিনি আমার গালের উপর হাত বুলালেন। আমি তাঁর হাতে এমন শীতলতা অথবা সুগন্ধি অনুভব করলাম, যেন তিনি (সবেমাত্র) তাঁর হাতকে আতরের বাক্স থেকে বের করেছেন।' (মুসলিম ৬১৯৭নং)

তাঁর হস্তদ্বয় ছিল ভারী ও মাংসল। (সঃ জামে' ৪৮১৯নং) তাঁর হাতের তেলো বা চেটো ছিল প্রশস্ত। (বুখারী ৫৯০৭নং)

তাও ছিল মাংসল। (আহমাদ ৬৮৪, তিরমিযী ৩৬৩৮নং)

আনাস ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোন পুরু বা পাতলা রেশম আমি স্পর্শ করিনি। আর তাঁর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনো শুঁকিনি।' (বুখারী ১৯৭৩, মুসলিম ৬২০০নং)

আবূ জুহাইফা ﷺ বলেন, 'লোকেরা তাঁর হাত নিয়ে নিজেদের চেহারার উপর বুলাত। আমিও তাঁর হাত নিয়ে আমার চেহারার উপর রাখলাম; অনুভব করলাম, তা বরফ অপেক্ষা বেশি ঠান্ডা এবং কস্তুরী অপেক্ষা বেশি সুগন্ধময়।' (বুখারী ৩৫৫৩নং)

জাবের বিন সামুরাহ ﷺ বলেন, 'তিনি আমার গালের উপর হাত বুলালেন। আমি তাঁর হাতে এমন শীতলতা অথবা সুগন্ধি অনুভব করলাম, যেন তিনি (সবেমাত্র) তাঁর হাতকে আতরের বাক্স থেকে বের করেছেন।' (মুসলিম ৬১৯৭নং)

তাঁর হাতের রলা দুটি ছিল লম্বা লম্বা। (বাইহাক্বী, সঃ জামে' ৪৮১৬নং)

আল্লাহর নবী ﷺ আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার করেছেন। *(বুখারী ৫৮৭৪, মুসলিম ২০৯২নং প্রমুখ)* তাঁর আংটি ছিল রৌপ্যনির্মিত। *(মুখতাসারুশ শামায়িলিল মুহাম্মাদিয়াহ ৭৩নং)* তাতে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। অবশ্য সে আংটি তিনি শীলমোহর স্বরূপ ব্যবহার করতেন। *(ঐ ৭৪নং)*

তিনি ডান হাতে আংটি ব্যবহার করতেন। *(ঐ ৭৭-৮১নং)*

ঐ আংটি তিনি অনামিকা (কনিষ্ঠা বা কড়ে আঙ্গুলের পাশের) আঙ্গুলে পরতেন। *(বুখারী ৫৮৭৪, মুসলিম ২০৯২নং)* তিনি মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পরতে নিষেধ করতেন। *(মুসলিম ২০৭৮, আবূ দাঊদ ৪২২৫নং)*

মহানবী ﷺ কখনো কখনো বাম হাতে আংটি পরেছেন। *(মুসলিম, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৪৮৯৯নং)*

তিনি আংটির প্লেটের দিকটা হাতের তেলোর দিকে ফিরিয়ে রাখতেন। *(সঃ জামে' ৪৯১১নং)*

সে আংটি তাঁর ইন্তিকালের পর আবূ বাক্র সিদ্দীক অতঃপর উমার ফারূক অতঃপর উষমান বিন আফফান ব্যবহার করেছেন। অতঃপর তা তাঁর হাত হতে মদীনার 'আরীস' কুয়াতে পড়ে যায়।

তিনি স্বর্ণের আংটি পরতে নিষেধ করতেন। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখলেন। তিনি তার হাত হতে তা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের কেউ কি ইচ্ছাকৃত দোযখের আঙ্গারকে হাতে নিয়ে ব্যবহার করে?"

অতঃপর নবী ﷺ চলে গেলে লোকটিকে বলা হল, 'তোমার আংটিটা কুড়িয়ে নিয়ে অন্য

কাজে লাগাও। (অথবা তা বিক্রয় করে মূল্যটা কাজে লাগাও।)' কিন্তু লোকটি বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি আর কক্ষনো তা গ্রহণ করব না, যা আল্লাহর রসূল ﷺ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।" (মুসলিম ২০৯০নং)

তিনি বলেছেন,

(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ-দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে যেন রেশমবস্ত্র ও স্বর্ণ পরিধান না করে। (আহমাদ ২২২৪৮-নং)

(مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ).

অর্থাৎ, আমার উম্মতের মধ্যে যে (পুরুষ) ব্যক্তি স্বর্ণ পরিধান করবে অতঃপর তা পরিধান অবস্থায় মারা যাবে, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ বেহেশ্তের স্বর্ণ হারাম করে দেবেন। আর আমার উম্মতের মধ্যে যে (পুরুষ) ব্যক্তি রেশমবস্ত্র পরিধান করবে অতঃপর তা পরিধান অবস্থায় মারা যাবে, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ বেহেশ্তের রেশমবস্ত্র হারাম করে দেবেন। *(ঐ ৬৫৫৬নং)*

মহানবী ﷺ লোহার আংটিও ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। *(বাইহাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৪২নং)*

একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এল। তার হাতে ছিল সোনার আংটি। তা দেখে তিনি তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি তাঁর অপছন্দের কথা বুঝতে পেরে ফিরে গিয়ে সেটি খুলে ফেলে একটি লোহার আংটি পরে এল। নবী ﷺ তা দেখে বললেন, "এটি তো আরো খারাপ। এটি তো জাহান্নামবাসীদের অলংকার!" এ কথা শুনে লোকটি ফিরে গেল এবং সেটিকেও খুলে ফেলে একটি চাঁদির আংটি আঙ্গুলে নিল। তা দেখে নবী ﷺ নীরব থাকলেন। *(আল-আদাবুল মুফরাদ ১০২ ১নং)*

এখানে জ্ঞাতব্য যে, বিবাহের মোহরের জন্য এক সাহাবীকে তাঁর লোহার আংটি খুঁজতে বলা তা ব্যবহার বৈধ হওয়ার দলীল নয়। *(ফাতহুল বারী ১০/২৬৬, আদাবুয যিফাফ, আলবানী দ্রঃ)*

তাঁর পদযুগল ছিল বেশ ভারী। (সঃ জামে' ৪৮১৯নং)

পায়ের পাতা ছিল মাংসল। (আহমাদ ৬৮৪, তিরমিযী ৩৬৩৮-নং)

কিন্তু তাঁর পায়ের গোড়ালি ছিল পাতলা। তাতে বেশি মাংস ছিল না। *(সঃ জামে' ৪৮২ ১নং)*

তাঁর পদতল সমতল ছিল। তাতে কোন খাল ছিল না। পদক্ষেপে তাঁর পুরো পদতলটাই মাটি স্পর্শ করত। (সঃ জামে' ৪৬৩৩নং)

মহানবী ﷺ ছিলেন সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ। তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল নিখুঁত। সাহাবী কবি হাস্সান বিন সাবেত বলেছেন,

خُلِقت مبرأً عن كل عيب　　كأنك خلقت كما تشاء

وأجمل منك لم تر قط عين　　وأحسن منك لم تلد النساء

অর্থাৎ, আপনি প্রত্যেক ত্রুটি থেকে পবিত্ররূপে সৃষ্টি হয়েছেন। যেন আপনি নিজের ইচ্ছামত রূপ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছেন।

আপনার থেকে অধিক সুন্দর কোন চক্ষু দর্শন করেনি। আর আপনার থেকে

অধিক উত্তম (সন্তান) নারীরা জন্ম দেয়নি।

তাঁর দৈনন্দিন জীবন

তাঁর প্রসাধন

"উত্তম আদর্শ, উত্তম বেশভূষা এবং মিতাচারিতা নবুওতের ২৫ অংশের অন্যতম অংশ।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ১৯৯৩নং)*

দেহের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জার খেয়াল রাখা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষের আচরণ। আমাদের মহানবী ﷺ সে বিষয়ে উত্তম নমুনা ছিলেন। তিনি বলেছেন, "দশটি কাজ প্রকৃতিগত আচরণ; (১) গোঁফ ছেঁটে ফেলা। (২) দাড়ি বাড়ানো। (৩) দাঁতন করা। (৪) নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা। (৫) নখ কাটা। (৬) আঙ্গুলের জোড়সমূহ ধোয়া। (৭) বগলের লোম তুলে ফেলা। (৮) গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা। (৯) পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা (শৌচকর্ম) করা। (১০) কুল্লি করা। *(মুসলিম ৬২৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ ».

"প্রকৃতিগত আচরণ (নবীগণের তরীকা) পাঁচটি অথবা পাঁচটি কাজ প্রকৃতিগত আচরণ, (১) খাত্না (লিঙ্গত্বক ছেদন) করা। (২) লজ্জাস্থানের লোম কেটে পরিষ্কার করা। (৩) নখ কাটা। (৪) বগলের লোম ছিঁড়ে ফেলা। (৫) গোঁফ ছেঁটে ফেলা।" *(বুখারী ৫৮৮৯, মুসলিম ৬২০)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তিনি দাঁতন দিয়ে দাঁত মেজে নিতেন।' *(বুখারী ২৪৫, মুসলিম ৬১৬নং)*

শুরাইহ ইবনে হানি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নবী ﷺ নিজ বাড়িতে প্রবেশ ক'রে সর্বপ্রথম কী কাজ করতেন?' তিনি বললেন, 'দাঁতন করতেন।' *(মুসলিম ৬১৩নং)*

মহানবী ﷺ মাথার চুলে তেল লাগাতেন। (সিঃ সহীহাহ ৩০০৪নং)

জুমআর দিনে জুমআহ পড়তে যাওয়ার আগে বিশেষভাবে সাজসজ্জা করার তাকীদ করেছেন। তিনি বলেছেন,

(لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى).

"যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করে, যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে, তেল ব্যবহার করে অথবা ঘরের সুগন্ধি নিয়ে লাগায়। অতঃপর জুমআর উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করে দু'জনের মধ্যে পৃথক করে না। তারপর তার ভাগ্যে যতটা লেখা হয়েছে, ততটা নামায আদায় করে, তারপর যখন ইমাম খুৎবা দেয় তখন সে চুপ থাকে, তাহলে তার জন্য এক জুমআহ থেকে অন্য জুমআহ পর্যন্ত কৃত পাপরাশি ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়।" *(আহমাদ, বুখারী ৮৮৩নং)*

তিনি পাকা চুলকে কালো ছাড়া অন্য রঙ দিয়ে রঙিয়ে নিতেন। *(আবূ দাউদ ৪২১০, নাসাঈ*

৫২৪৪, মিশকাত ৪৪৫৩নং)

তিনি বলতেন, "তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও, মোছ ছেঁটে ফেলো, পাকা চুল রঙিয়ে ফেলো এবং ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ১০৬৭ নং)*

"ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা পাকা চুল-দাড়ি রঙায় না, তোমরা (তা রঙিয়ে) তাদের বিরোধিতা কর।" *(বুখারী, মুসলিম, সুনানে আরবাআহ, সহীহুল জামে' ১৯৯৮-নং)*

তিনি সুগন্ধ কাঠের ধোঁয়া দ্বারা নিজের লেবাস-পোশাক সুগন্ধিত করতেন। তাতে ন্যে কোন সুগন্ধি মিশ্রিত করতেন না। কখনো বা তার উপর কর্পূর ছড়িয়ে দিতেন। *(সহীহুল জামে' ৪৯৪৮নং)*

এমনিতে তাঁর মুবারক দেহ ছিল সুগন্ধময়। তাঁর দেহনিঃসৃত ঘাম ছিল শ্রেষ্ঠ আতর। *(মুসলিম ৬২০ ১নং)*

তিনি আগমন করলে সৌরভেই চেনা ও জানা যেত, তিনি আসছেন। *(সহীহুল জামে' ৪৯৮৮-নং)*

পরন্তু তিনি নিজের কাছ থেকে কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, এটা আদৌ পছন্দ করতেন না। *(সহীহুল জামে' ৪৯৫৫নং)*

তিনি হজ্জ করতে গিয়ে ইহরামের পূর্বেও মাথায় খোশবূ ব্যবহার করতেন। *(বুখারী ১৫৪০নং)*

তাঁর লেবাস-পোশাক

মহান আল্লাহ লেবাস-পোশাক দিয়ে মানুষকে সুসভ্য জাতিরূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সে লেবাসকে সুন্দর ও পবিত্র করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}

অর্থাৎ, হে আদমের বংশধরগণ! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। *(আ'রাফ ঃ ৩১)*

সভ্য লেবাস-পোশাক সুসভ্য জাতির পরিচয়। মহানবী ﷺ বলেন, "উত্তম আদর্শ, উত্তম বেশভূষা এবং মিতাচারিতা নবুওতের ২৫ অংশের অন্যতম অংশ।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ১৯৯৩নং)*

অবশ্য তাতে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। বিলাসবহুল লেবাস-পোশাকও ইসলামে পছন্দনীয় নয়। লেবাসে-পোশাকে সাদা-সিধে থাকা ঈমানের পরিচায়ক। *(আবূ দাউদ, মিশকাত ৪৩৪৫নং)*

লেবাস-পোশাক এমন হওয়া অবাঞ্ছনীয়, যা পরিধান ক'রে মানুষের মনে অহংকার সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্যই ইসলামের বিধান হল,

(كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ).

অর্থাৎ, তোমরা খাও, পান কর, দান কর ও পরিধান কর; তবে তাতে যেন অপচয় ও অহংকার না থাকে, (বুখারী, আহমাদ ৬৬৯৫, নাসাঈ ২৫৫৯নং)

অবশ্যই লেবাস-পোশাক পবিত্র হওয়া শর্ত। মহানবী ﷺ-কে আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٤) سورة المدثر

অর্থাৎ, তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। (মুদ্দাষ্যির ঃ ৪)

পোশাক পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যেই মহানবী ﷺ বলেছেন,

(الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ).

"তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কারণ সাদা রঙের কাপড় বেশী পবিত্র ও উত্তম। আর ঐ রঙের কাপড়েই তোমাদের মাইয়্যেতকে কাফনাও।" *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৩৩৭নং)*

এ ছাড়া সবুজ রঙের কাপড়ও তিনি ব্যবহার করতেন। *(আবূ দাউদ ৪০৬৫নং)* এবং লাল রঙেরও লেবাস পরিধান করতেন। *(আবূ দাউদ ৪০৭২, ইবনে মাজাহ ৩৫৯৯, ৩৬০০নং)*

মহানবী ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় রঙ ছিল সবুজ। (সঃ জামে' ৪৬২৩নং)

তাঁর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কাপড় ছিল রঙিন ডোরাকাটা ইয়ামানী 'হিবারাহ' নামক সুতির চাদর। (সঃ জামে' ৪৬২৪নং)

তিনি চেক-কাটা চাদর পরতে ভালোবাসতেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৩০৪নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ একদা আম্র বিন আস ؓ-এর দেহে দু'টি জাফরানী রঙের কাপড় দেখে বললেন, "এগুলো কাফেরদের কাপড়। সুতরাং তুমি তা পরো না।" *(মুসলিম, মিশকাত ৪৩২৭নং)*

পোশাক যেমন পবিত্র হবে, তেমনই পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। ময়লা কাপড় পরা মুসলিমের আচরণ নয়।

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির মাথায় আলুথালু চুল দেখে বললেন, "এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা মাথার এলোমেলো চুলগুলোকে সোজা করে (আঁচড়ে) নেয়?!" আর এক ব্যক্তির পরনে ময়লা কাপড় দেখে বললেন, "এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করে নেয়?!" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত ৪৩৫১নং)*

মহান আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামত বান্দার লেবাসে-পোশাকে দেখা যাক, তা তিনি পছন্দ করেন। (সিঃ সহীহাহ ১২৯০নং)

মহানবী ﷺ-এর ঈদ ও জুমআর জন্য বিশেষ লেবাস ছিল। তিনি বলেছেন,

« مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَىْ مَهْنَتِهِ ».

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তাদের পরিশ্রমের কাপড় ছাড়া জুমআর জন্য অন্য এক জোড়া কাপড় থাকলে কি অসুবিধা আছে? *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ১০৯৫-১০৯৬নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ এর সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় লেবাস ছিল কামীস (ফুল-হাতা প্রায় গাঁটের উপর পর্যন্ত লম্বা জামা বিশেষ)। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৪৩২৮-নং)*

তিনি মাথায় ব্যবহার করতেন পাগড়ী। *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৪৬৭৬নং)*

তিনি মাথায় কালো রঙের পাগড়ীও বাঁধতেন। *(আবূ দাউদ ৪০৭৭, ইবনে মাজাহ ৩৫৮৪নং)*

মহানবী ﷺ লুঙ্গি পরতেন। তিনি বলেন, "গাঁটের নিচের অংশ লুঙ্গির (অঙ্গ) জাহান্নামে।" *(বুখারী, মিশকাত ৪৩১৪নং)* "মু'মিনের লুঙ্গি পায়ের অর্ধেক রলা পর্যন্ত। এই (অর্ধেক রলা) থেকে গাঁট পর্যন্ত অংশের যে কোনও জায়গায় হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু এর নিচের অংশ দোযখে যাবে।" এরূপ ৩ বার বলে তিনি পুনরায় বললেন, "আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি তাকিয়েও দেখবেন না, যে অহংকারের সাথে নিজের লুঙ্গি (গাঁটের নিচে) ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়।" *(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৪৩৩১নং)*

তিনি সোনা ও রেশম ব্যবহার করেননি। তিনি বলেছেন, "সোনা ও রেশম

আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।” *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৪৩৪১নং)* “দুনিয়ায় রেশম-বস্ত্র তারাই পরবে, যাদের পরকালে কোন অংশ নেই।” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৩২০ নং)

তিনি ওযূর পর পানি মোছার জন্য বস্ত্রখন্ড ব্যবহার করতেন। (সঃ জামে’ ৪৮৩০নং)

তিনি চামড়ার লোম-ছাড়ানো জুতা ব্যবহার করতেন। (ঐ ৫০১০নং)

তাঁর জুতার দু’টি ফিতা ছিল। (ঐ ৪৮২৭নং)

তিনি কোন কোন সময় (পবিত্র) জুতা-পায়েই নামায পড়তেন। (ঐ ৪৯৬৬নং)

মহানবী ﷺ-এর দাম্পত্য-জীবন

মহানবী ﷺ ছিলেন মহামানব। মানবের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি জীবন-সঙ্গিনী ও পত্নী গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিমদের জন্য একই সময়ে প্রয়োজনে ৪টি স্ত্রী গ্রহণে অনুমতি আছে। *(সূরা নিসা ঃ ৩)*

কিন্তু মহান আল্লাহ নিজ নবীর জন্য তারও বেশি পত্নী গ্রহণে অনুমতি দিয়েছিলেন। অবশ্য এর পশ্চাতে বিভিন্ন যুক্তি ও কারণও ছিল।

তিনি ছিলেন জিতেন্দ্রিয় ও সংযমশীল। তাঁর একমাত্র কুমারী স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

অর্থাৎ, নবী ﷺ রোযা অবস্থায় (স্ত্রী) চুম্বন ও আলিঙ্গন করতেন। আর তিনি ছিলেন তোমাদের মধ্যে সব চাইতে বেশি জিতেন্দ্রিয়। (বুখারী ১৯২৭, মুসলিম ২৬৩২নং)

তাছাড়া প্রায় তিনি ইবাদত, তাহাজ্জুদ ও রোযার মাধ্যমে দিবারাত্র অতিবাহিত করতেন। তিনি সংসার-বিরাগী ছিলেন না, কামুকও ছিলেন না। কামতৃষ্ণা নিবারণার্থে বহু বিবাহ করেন নি। যদি তাই হত, তাহলে তিনি বেছে বেছে সবগুলিই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা কুমারী যুবতী বিবাহ করতেন। কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে পঁচিশ বছর বয়সে তিনি চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া সন্তানের মাতা এক বিধবাকে প্রথমা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তারপর সেই প্রেমময়ী স্ত্রীর বর্তমানে (তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত) কোন বিবাহ করেননি।

সেই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর ৭টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাঁর ইন্তিকালের পর অন্যান্য স্ত্রী গ্রহণ করেন। যখন তিনি একজন কুমারীকে স্ত্রীরূপে বরণ করেন তখন তাঁর নিজের বয়স বাহান্ন বছর!

এক সময় তিনি ৯ জন স্ত্রী ও ২ জন ক্রীতদাসী নিয়ে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন।

তিনি স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতেন। সকলের জন্য পালা অনুযায়ী দিন নির্ধারিত ছিল। এমনকি সফরে গেলেও কোন কোন স্ত্রীকে সফর-সঙ্গিনী হিসাবে সঙ্গে নিতেন। আর সে ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে তাঁর নাম নির্বাচন করতেন। (সঃ জামে’ ৪৬৬১নং)

তিনি বাইরে থেকে বাড়ি প্রবেশ করলে দাঁতন ক’রে মুখ পরিষ্কার করতেন। (সঃ জামে’ ৪৭১৭নং) যাতে স্ত্রী তাঁর মুখ থেকে কোন প্রকার দুর্গন্ধ না পায়।

তিনি স্ত্রীদেরকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন,

(حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكم النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ).

"তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে আমার কাছে স্ত্রী ও খোশবুকে প্রিয় করা হয়েছে। আর নামাযকে করা হয়েছে আমার চক্ষুশীতলতা।" *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩১২৪নং)*

তিনি বলতেন,

« الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ».

"পৃথিবী এক উপভোগ্য সামগ্রী এবং তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী হচ্ছে পুণ্যময়ী স্ত্রী।" *(মুসলিম ৩৭১৬নং)*

স্ত্রীদের মধ্যে প্রিয়তমা ছিলেন আয়েশা। অবশ্য তাঁর উপর তিনি প্রথম স্ত্রী খাদীজাকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁর ইন্তিকালের পরেও তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁর স্মৃতিতে তাঁর সখীদের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করতেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো, ততটা ঈর্ষা নবী ﷺ-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি হতো না। অথচ আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। কিন্তু নবী ﷺ অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন এবং যখনই তিনি ছাগল যবাই করতেন, তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য উপহারস্বরূপ পাঠাতেন।

আমি তাঁকে মাঝে মধ্যে (রসিকতা ছলে) বলতাম, 'মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন মেয়েই নেই।' তখন তিনি (তাঁর প্রশংসা ক'রে) বলতেন, "সে এই রকম ছিল, ঐ রকম ছিল। আর তাঁর থেকেই আমার সন্তান-সন্ততি।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'নবী ﷺ যখন বকরী যবাই করতেন, তখন খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এতটা পরিমাণে মাংস পাঠাতেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'নবী ﷺ যখন বকরী যবাই করতেন, তখন বলতেন, "খাদীজার বান্ধবীদের নিকট এই মাংস পাঠিয়ে দাও।" *(বুখারী ৩৮১৮, মুসলিম ৬৪৩১নং)*

তিনি স্ত্রীদের মাঝে সতীনের প্রতি প্রকৃতিগত ঈর্ষা লক্ষ্য করলে তা সহ্য করতেন এবং সে ব্যাপারে তাঁদেরকে উপদেশ দিতেন।

স্ত্রীগণ তাঁর সাথে জীবনযাপনে সংকীর্ণতাবোধ করলে মহান আল্লাহর ফায়সালা আসত,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (٢٩) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً (٣٠) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً (٣١) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (٣٣) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً} (٣٤)

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বল, 'তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তাহলে এস, আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা ক'রে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় দিই। পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং

পরকাল কামনা করলে, তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীলা আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।’ হে নবী-পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ কোন প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। আর আল্লাহর জন্য তা সহজ। তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি অনুগতা হবে ও সৎকাজ করবে, তাকে আমি দ্বিগুণ পুরস্কার দান করব। আর তার জন্য আমি সম্মানজনক জীবিকা প্রস্তুত রেখেছি। হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।) তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং (প্রাক-ইসলামী) জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগতা হও; হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল তোমাদের মধ্য থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে চান। আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তা তোমরা স্মরণ রাখ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সর্ববিষয়ের। *(আহযাবঃ ২৮-৩৪)*

তিনি সফর থেকে বাড়ি ফিরলে স্ত্রীদের অসতর্ক অবস্থায় রাত্রিতে বাড়ি প্রবেশ করতেন না। *(সঃ জামে’ ৪৮৬২নং)* আবার দিনে ফিরলেও সর্বাগ্রে মসজিদে প্রবেশ ক’রে ২ রাকাআত নামায পড়তেন। *(বুখারী ৪৪১৮, মুসলিম ১৬৯২নং)*

যাতে স্ত্রীগণ নিজ নিজ বাসগৃহ ও দেহের পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করতে পারতেন।

তিনি স্ত্রীগণকে চুম্বন উপহার দিতেন। বরং কখনো কখনো চুম্বন দিয়ে ওযূ না ক’রেই পূর্বের ওযূতেই নামায পড়তেন। *(সঃ জামে’ ৪৯৯৭নং)*

তিনি রোযা অবস্থাতেও স্ত্রী-চুম্বন করতেন। *(ঐ ৪৯৯৮-নং)*

তিনি কোন কোন দিনে বা রাত্রে (বিশেষ ক’রে দীর্ঘ সফর থেকে আসার পর) সকল স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাম্পত্যসুখ উপভোগ করতেন এবং পরিশেষে একবারই গোসল করতেন। *(সঃ জামে’ ৪৯৪১, ৪৯৭৭নং)*

আনাস ﵁ বলেন, ‘তিনি দিবারাত্রির একই সময়ে তাঁর (ক্রীতদাসী-সহ) ১১টি স্ত্রীর সাথে মিলন করতেন।’ তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘তিনি কি তাতে সক্ষম ছিলেন?’

আনাস ﵁ বললেন, ‘আমরা বলাবলি করতাম, তাঁকে ৩০ জন পুরুষের সমান যৌনক্ষমতা দান করা হয়েছে।’ *(বুখারী ২৬৮-নং)*

তিনি মিলনের পর গোসল করতেন। কোন কারণে গোসল পিছিয়ে দিলে ওযূ করতেন। তাতেও আলস্য এলে তায়াম্মুম ক’রে নিয়ে ঘুমাতেন। *(সঃ জামে’ ৪৭৯৪নং)*

রমযানের রাতে কখনো কখনো অপবিত্র থাকা অবস্থায় তাঁর ফজর হয়ে যেত। অতঃপর তিনি উঠে গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। *(ঐ ৪৯৩৮-নং)*

জাহেলী যুগে ইয়াহুদীদের মধ্যে মাসিক অবস্থার মহিলাকে সম্পূর্ণ অপবিত্র গণ্য করা হত। তারা তার সাথে মেলামেশা এবং খাওয়া-দাওয়া অবৈধ মনে করত। সাহাবায়ে কেরাম ﵃ এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে মহান আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٢٢٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ বর্জন কর এবং যতদিন না তারা পবিত্র হয়, (সহবাসের জন্য) তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হয়, তখন তাদের নিকট ঠিক সেইভাবে গমন কর, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপ্রার্থিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে পছন্দ করেন। *(বাক্বারাহ ঃ ২২২)*

সুতরাং তিনি নিজ আমল দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন, দাম্পত্য সুখ উপভোগ কেবল মিলনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় এবং এমনও নয় যে, অশুচির সময় স্ত্রীর সাথে শোওয়া-খাওয়া বা চুম্বন-স্পর্শ করা যাবে না। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, এ আয়াতে কেবল সহবাস করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। নিকটবর্তী না হওয়া বা দূরে থাকার অর্থ ঃ কেবল সঙ্গম করা নিষেধ।

তাই তিনি সেই অবস্থায় স্ত্রী-অঙ্গে কাপড় রেখে আলিঙ্গন করতেন। সহবাস ছাড়া অন্য সুখ উপভোগ করতেন। *(সঃ জামে' ৪৮৯১নং)*

হালালভাবে যৌনসুখ উপভোগ করাতে সওয়াব আছে। এ উপভোগ থেকে নিজকে বঞ্চিত করার মাঝে কোন সওয়াব নেই। এ ত্যাগের মাঝে কোন মাহাত্ম্য নেই।

মহানবী ﷺ স্ত্রীদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য বৈধ খেলা খেলতেন। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একদা এক সফরে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এক জায়গায় আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম এবং তাতে আমি তাঁকে হারিয়ে দিলাম। অতঃপর যখন আমি মোটা হয়ে গেলাম, তখন একবার প্রতিযোগিতা করলাম এবং তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন।' *(আবূ দাউদ ২৫৭৮নং)*

বৈধ খেলা দেখতে তাঁদেরকে সুযোগ দিতেন। মা-আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা হাবশীরা বর্শা-বল্লম নিয়ে মসজিদে খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে হুমাইরা! তুমি কি ওদের খেলা দেখতে চাও?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি আমার থুত্নিকে তাঁর কাঁধের উপর রাখলাম এবং আমার চেহারাকে তাঁর গালের সাথে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। (বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর) তিনি বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে, চল এবারে।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না।' তাই তিনি আমার জন্য আবারও দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর আবার বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে, চল এবারে।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না।' আমার যে তাদের খেলা দেখার খুব শখ ছিল তা নয়, বরং আমি কেবল তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদেরকে এ কথাটা জানিয়ে দিতে চাইছিলাম যে, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতটা মর্যাদা ছিল এবং তাঁর কাছে আমার কতটা কদর ছিল। *(নাসাঈ কুবরা ৮৯৫১, মুসলিম ২১০০-২১০১নং)*

তিনি বলতেন, "প্রতি কাজ (খেলা) যাতে আল্লাহর যিকির, (ধর্মীয় উদ্দেশ্য, শারীরিক উপকার) থাকে না, তাই (অসার) ক্রীড়া-কৌতুক, চারটি খেলা ছাড়া। তার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমখেলা (প্রমোদকৌতুক ও রসিকতাদি) অন্যতম।" *(নাসাঈ কুবরা ৮৯৩৯, সঃ জামে' ৪৫৩৪নং)*

তিনি ছিলেন রাজা-বাদশা, তিনি ছিলেন মহান নেতা। তাঁর দাস-দাসী ও খাদেমও ছিল। তবুও তিনি সংসারে স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করতেন।

'গৃহস্থালি কাজ করতেন; অর্থাৎ স্ত্রীর কাজে সহযোগিতা করতেন। অতঃপর নামাযের (সময়) হলে তিনি নামাযের জন্য বেরিয়ে যেতেন।' (বুখারী ৬৭৬নং)

তিনি অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ ছিলেন; স্বহস্তে কাপড় পরিষ্কার করতেন, দুধ

দোয়াতেন এবং নিজের খিদমত নিজেই করতেন। *(সিঃ সহীহাহ ৬৭০নং, আদাবুয যিফাফ ২৯১পৃঃ)*

তিনি বলতেন,

(أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي).

"সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর এবং ওদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।" *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১২৩২নং)*

দাম্পত্য ও সংসার জীবনও মুসলিমের ধর্ম। সেটাই ছিল মহানবী ﷺ-এর শিক্ষা। তিনি সংসার-বিরাগী হতে নিষেধ করেছেন। (সঃ জামে' ৬৮৬৭নং) তিনি বলেছেন,

«تَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي مُكَاثِر بكم الْأُمَم ، وَلَا تَكُونُوا كرهبانية النَّصَارَى» .

অর্থাৎ, তোমরা বিবাহ কর; কারণ সকল উম্মত অপেক্ষা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব। আর খ্রিষ্টানদের বৈরাগীদের মতো হয়ো না। *(বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ১৭৮২নং)*

বলা বাহুল্য, ইসলাম ত্যাগের ধর্ম, ভোগেরও ধর্ম। কিন্তু উভয়ই নিয়ন্ত্রিত।

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ--।'

তাঁর জীবন-জীবিকা

মহানবী ﷺ নবুঅতের পূর্বে জীবিকার জন্য বকরী চরিয়েছেন। উপার্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন।

মদীনায় হিজরত করার পরেও তাঁর সংসার ছিল অভাবের। অবশ্য তিনি এটা নিজেই পছন্দ ক'রে নিয়েছিলেন। তিনি বিষয়াসক্ত ছিলেন না। তিনি রাজা হতে চাননি। অথচ আল্লাহর খালীল ইচ্ছা করলে তা হতে পারতেন।

একদা জিবরীল ﷺ মহানবী ﷺ-এর নিকটে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, একজন ফিরিশ্‌তা অবতরণ করছেন। তিনি (নবী ﷺ-কে লক্ষ্য ক'রে) বললেন, 'এই ফিরিশতা যখন থেকে সৃষ্ট হয়েছেন, তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন দিন অবতরণ করেননি।' ফিরিশ্‌তা অবতরণ ক'রে (নবী ﷺ-কে) সম্বোধন ক'রে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। (তিনি জানতে চান যে,) আপনাকে কি তিনি একজন সম্রাট ও নবী ক'রে প্রেরণ করবেন, না কেবল একজন বান্দা ও রাসূল ক'রে পাঠাবেন?' জিবরীল ﷺ বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নম্র-বিনয়ী হন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(لاَ بَلْ عَبْدًا رَسُولًا).

"না, বরং আমি একজন বান্দা ও রাসূল হিসাবে প্রেরিত হতে চাই।" *(আহমাদ ৭১৬০, ইবনে হিব্বান ৬৩৬৫, আবূ য়্যা'লা ৬১০৫নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন,

« اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا ».

"হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রদান কর।" *(বুখারী ৬৪৬০, মুসলিম ২৪৭৪নং)*

একদা দু জাহানের বাদশাহ নবী ﷺ চাটাই-এর উপর হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাই-এর স্পষ্ট দাগ পড়ে গিয়েছিল। তাঁর বগলে ছিল খেজুর গাছের চোকার বালিশ! তা দেখে উমার কেঁদে ফেললেন। আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "হঠাৎ কেঁদে উঠলে কেন, হে উমার?" উমার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! পারস্য ও রোম-সম্রাট কত সুখ-বিলাসে বাস করছে। আর আপনি আল্লাহর রসূল হয়েও এ অবস্থায় কালাতিপাত করছেন? আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আপনার উম্মতকে পার্থিব সুখ-সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। পারস্য ও রোমবাসীদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী দান করেছেন, অথচ তারা তাঁর ইবাদত করে না!' এ কথা শুনে মহানবী ﷺ হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, "হে উমার! এ ব্যাপারে তুমি এমন কথা বল? ওরা হল এমন জাতি, যাদের সুখ-সম্পদকে এ জগতেই ত্বরান্বিত করা হয়েছে। ---তুমি কি চাও না যে, ওদের সুখ ইহকালে আর আমাদের সুখ পরকালে হোক?" *(বুখারী ৪৯১৩, ৫১৯১, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ১৩২৭ নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা চাটাই-এর উপর শুয়ে ছিলেন। অতঃপর তিনি এই অবস্থায় উঠলেন যে, তাঁর পার্শ্বদেশে তার দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি (আপনার অনুমতি হয়), তাহলে আমরা আপনার জন্য নরম গদি বানিয়ে দিই।' তিনি বললেন,

((مَا لِي وَلِلدُّنْيَا مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ ظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا)).

"দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো (এ) জগতে ঐ আরোহীর মতো, যে (ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রামের জন্য) কোন গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। অতঃপর পুনরায় সে চলতে আরম্ভ করে এবং ঐ গাছটি ছেড়ে চলে যায়।" *(আহমাদ, তিরমিযী ২৩৭৭, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৫১৮৮ নং)*

মু'মিনদের জননী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা চামড়ার তৈরী ছিল এবং তার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের ছোবড়া।' *(বুখারী ৬৪৫৬নং)*

তিনি কোন কোন সকালে স্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'কোন খাবার আছে নাকি?' যদি বলতেন, 'না', তাহলে তিনি বলতেন, 'তবে আমি রোযা রেখে নিলাম।' *(মুসলিম ২৭৭০নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন একদিন অথবা কোন এক রাতে (ঘর থেকে) বের হলেন, অতঃপর অকস্মাৎ আবূ বাক্র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, 'এ সময় তোমরা বাড়ী থেকে কেন বের হয়েছ?' তাঁরা বললেন, 'ক্ষুধার তাড়নায় হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বললেন,

((وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا)).

'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আমাকেও সেই জিনিস বাড়ি থেকে বের করেছে, যে জিনিস তোমাদেরকে বের করেছে। তোমরা ওঠো (এবং আমার সঙ্গে চল)।'

অতঃপর তাঁরা দু'জনে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। তারপর তিনি (আবুল হাইষাম নামক) এক আনসারীর বাড়ী এলেন। আনসারী সে সময় বাড়ীতে ছিলেন না। যখন তাঁর স্ত্রী নবী ﷺ-কে দেখলেন, তখন তাঁদেরকে অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, 'অমুক (আনসারী) কোথায়?' তিনি বললেন, 'আমাদের জন্য মিঠা পানি আনতে গেছেন।'

ইতি মধ্যে আনসারী এসে গেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথীদ্বয়কে দেখে বললেন, 'আলহামদু লিল্লাহ, আজ আমার (বাড়ীর) চেয়ে সম্মানিত মেহমান কারো (বাড়ীতে) নেই।' অতঃপর তিনি চলে গেলেন এবং খেজুরের একটা কাঁদি আনলেন, যাতে কাঁচা, শুকনো এবং সদ্যঃপাকা খেজুর ছিল। অতঃপর আনসারী বললেন, 'আপনারা খান।' অতঃপর তিনি নিজে ছুরি ধরলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, 'দুধালো ছাগল জবাই করো না।' অতঃপর তিনি (ছাগল) জবাই করলেন। তাঁরা ছাগলের (মাংস) খেলেন, ঐ খেজুর কাঁদি থেকে খেজুর খেলেন এবং পানি পান করলেন। তারপর তাঁরা যখন (পানাহার করে) পরিতৃপ্ত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)র উদ্দেশ্যে বললেন,

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ))

"সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! নিশ্চয় তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে বাড়ী থেকে বের করেছিল, কিন্তু এখন এ নিয়ামত উপভোগ ক'রে নিজেদের (বাড়ী) ফিরে যাচ্ছ।" *(মুসলিম ২০৩৮নং)*

কোন কোন সময় ক্ষুধার তাড়নায় তিনি পেটে কাপড় বা পাথর বাঁধতেন। অতঃপর কোন সাহাবী তা লক্ষ্য করলে তাঁর ক্ষুন্নিবারণ করতেন।

আনাস ﷺ বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে দেখতে পেলাম যে, তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে বসে কথা বলছেন। আর তিনি তাঁর পেটকে একটি বস্ত্রখন্ড দ্বারা বেঁধে রেখেছেন। বর্ণনাকারী উসামা বলেন, পাথর ছিল কি না, এতে আমার সন্দেহ রয়েছে। (আনাস ﷺ বলেন,) আমি তাঁর কোন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন?' তাঁরা বললেন, 'ক্ষুধার কারণে।' এরপর আমি আবূ ত্বালহা ﷺ এর নিকট গেলাম। তিনি উম্মে সুলাইমের স্বামী ছিলেন। আমি বললাম, 'আব্বা! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, তিনি কাপড় দিয়ে তাঁর পেট বেঁধে রেখেছেন। আমি তাঁর কোন কোন সাহাবীকে (পেট বেঁধে রাখার কারণ) জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বললেন, ক্ষুধার কারণে।' তারপর আবূ ত্বালহা আমার মায়ের কাছে গেলেন এবং বললেন, 'কিছু আছে কি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমার কাছে কয়েক টুক্রা রুটি আর কয়েকটি খেজুর আছে। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়ীতে একা আসেন, তাহলে তাঁকে পরিতৃপ্ত করতে পারব। আর যদি অন্য কেউ তাঁর সাথে আসে, তবে তাঁদের কম হবে।' *(মুসলিম ২০৪০নং)*

কোন কোন সময়ের খাদ্যাভাবের কথা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন,

((لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَال طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَال)).

অর্থাৎ, আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের কাজে আমাকে যেভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, অন্য কাউকে সেভাবে করা হয়নি। আমাকে যেভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অন্য কাউকে সেভাবে দেওয়া হয়নি। ত্রিশ দিন ও রাত আমার উপর এমনও অতিবাহিত হয়ে গেছে যে, আমার ও বিলালের কাছে কোন প্রাণীর খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না, কেবল সেই স্বল্প পরিমাণটুকু ছাড়া, যা বিলাল তাঁর বগলের নিচে লুকিয়ে আনত। *(আহমাদ ১১৮০২, তিরমিযী ২৪৭২, ইবনে মাজাহ১৫১নং)*

খাবার পেলেও তেমন উন্নত মানের খাবার তিনি পেতেন না। নিম্নমানের গরীবী খাবার খেয়ে তাঁর দিনপাত হতো। ক্বাতাদাহ (রঃ) বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেকের কাছে যেতাম। (একদিন তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, খাবার নিয়ে) তাঁর বাবুর্চী সেখানে উপস্থিত। তিনি বললেন, 'খাও। নবী করীম ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ময়দার পাতলা রুটি খেয়েছেন অথবা বকরীর ভুনা গোশ্‌ত চোখে দেখেছেন বলে আমার জানা নেই।' *(বুখারী ৫৪২১নং)*

কখনো এক বেলা জুটলে পরের বেলায় কিছুই জুটতো না। ফলে উপবাসেই কত কত রাত্রি অতিবাহিত হতো দু জাহানের বাদশার। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ পরস্পর কয়েক রাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। তাঁর পরিবার রাতে খাওয়ার মত কিছুই পেতেন না। আর তাদের বেশীরভাগ রুটি হতো যবের।" *(আহমাদ ২৩০৩, তিরমিযী ২৩৬০, ইবনে মাজাহ ৩৩৪৭নং)*

কখনো কেবল খেজুর-পানি ও দুধ খেয়েই তিনি কালাতিপাত করতেন। কোন পাকানো খাবার ভাগ্যে জুটতো না। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমরা দু'মাসে তিনটা চাঁদ দেখতাম। (আর এ দিনগুলোতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরগুলোতে (চুলোয়) আগুন জ্বলত না।' (উরওয়া বলেন,) 'আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কী খেয়ে দিন অতিবাহিত করতেন?' তিনি বললেন, 'দুটো কালো জিনিস খেয়ে; খেজুর ও পানি। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিছু আনসার প্রতিবেশী ছিল, যাদের ছিল কিছু দুধালো উটনী ও বকরী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সেগুলো দোহন ক'রে পাঠাতেন। আর আমরা তা-ই পান করতাম।' *(বুখারী ২৫৬৭, মুসলিম ২৯৭২নং)*

অনেক সময় নিম্নমানের এমন শুকনা খেজুরও পেতেন না, যা দিয়ে তিনি পেট পূর্ণ করেন। *(সঃ জামে' ৪৮৪৪নং)*

নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ বলেন, উমার ইবনুল খাত্ত্বাব ﷺ (পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে) লোকেরা যে দুনিয়ার (ধন-সম্পদ) অধিক জমা ক'রে ফেলেছে, সে কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি সারা দিন ক্ষুধায় থাকার ফলে পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন (যেন ক্ষুধার জ্বালা কম অনুভব হয়)। তিনি পেট ভরার জন্য নিকৃষ্ট মানের খুরমাও পেতেন না।' *(মুসলিম ৭৬৫০-৭৬৫২নং)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আরো বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার পর পর দু'দিন যবের রুটি পেট-পুরে খাননি। আর এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।' *(বুখারী ৫৪১৪, মুসলিম ২৯৭০নং)*

আনাস ইবনে মালেক ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ কখনো (টেবিল জাতীয় উঁচু স্থানে)এর উপর খাবার রেখে আহার করেননি এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত পাতলা (চাপাতি) রুটি খাননি।

(অন্য এক বর্ণনায় আছে,) আর তিনি কখনোও ভুনা (গোটা) বকরী স্বচক্ষে দেখেননি।' *(বুখারী ৬৪৫০, ৬৪৫৭নং)*

সাহ্‌ল ইবনে সা'দ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (রসূলরূপে) পাঠিয়েছেন, তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (চালুনে চালা) ময়দা দেখেননি। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হল, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কি আপনাদের আটা চালার চালুনি ছিল?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (রসূলরূপে) পাঠানোর পর থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি

আটা চালার চালুনি দেখেননি।' তাঁকে বলা হল, 'তাহলে আপনারা আচালা যবের আটা কিভাবে খেতেন?' তিনি বললেন, 'আমরা যব পিষে ফুঁক দিতাম, এতে যা উড়ার উড়ে যেত, আর যা অবশিষ্ট থাকত তা ভিজিয়ে খমীর বানাতাম।' *(বুখারী ৫৪১৩নং)*

কোন সময় রুটি পেলেও তা খাওয়ার জন্য কোন ব্যঞ্জন, তরকারি বা চাটনি পেতেন না। জাবের ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ নিজ পরিবারের কাছে তরকারি চাইলেন। তারা বলল, 'আমাদের নিকট সির্কা ছাড়া আর কিছুই নেই।' তিনি তাই চাইলেন এবং (তা দিয়ে) আহার করতে থাকলেন ও বলতে থাকলেন,

« نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ نِعْمَ الأُدُمُ الْخَلُّ ».

"সির্কা কতই না চমৎকার তরকারি। সির্কা কতই না ভাল ব্যঞ্জন।" *(মুসলিম)*

দু জাহানের বাদশা দরিদ্ররূপে কালাতিপাত ক'রে দরিদ্ররূপে ইহকাল ত্যাগ করেছেন। আম্র ইবনে হারিষ ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুকালে কোন সোনা-রূপা এবং কোন দাস-দাসী রেখে যাননি। তিনি কেবল তাঁর একটি সাদা রঙের খচ্চর রেখে গেছেন, যাতে তিনি সওয়ার হতেন। আর রেখে গেছেন তাঁর যুদ্ধাস্ত্র ও একখন্ড জমি। পরন্তু উক্ত জমিটিও তিনি মুসাফিরদের জন্য সাদক্বা করে গেছেন।' *(বুখারী ৪৪৬১নং)*

আবূ বুরদাহ ﷺ বলেন, আয়েশা (রায়িল্লাহু আনহা) আমাদের সামনে একটি তালি-দেওয়া চাদর এবং একটি মোটা ইযার (লুঙ্গি) বের করলেন এবং বললেন, 'এই দু'টির মধ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যু হয়েছে।' *(বুখারী ৩১০৮নং, মুসলিম ২০৮০নং)*

আনাস ﷺ বলেন, 'নবী ﷺ যবের বিনিময়ে তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আর আমি নবী ﷺ-এর কাছে যবের রুটি ও (নষ্ট হওয়া) দুর্গন্ধময় পুরানো চর্বি নিয়ে গেছি। আমি তাঁকে (নবী ﷺ-কে) বলতে শুনেছি যে, "মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে কোন সকাল বা সন্ধ্যায় এক সা' (প্রায় আড়াই কেজি কোন খাদ্যবস্তু) থাকে না।" (আনাস ﷺ বলেন,) তখন তাঁরা মোট নয় ঘর (পরিবার) ছিলেন।' *(বুখারী ২৫০৮নং)*

আয়েশা (রায়িল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁর লৌহবর্মখানি ত্রিশ সা' (প্রায় ৭৫ কেজি) যবের বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক ছিল।' *(বুখারী ২৯১৬নং)*

মা আয়েশা (রায়িয়াল্লাহু আনহা) আরো বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় আমার বাড়ীতে এমন কিছু ছিল না, যা কোন প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে। তবে আমার ঘরের তাকে সামান্য কিছু যব ছিল, যা থেকে আমি কিছু দিন খেয়েছি। অতঃপর যখন আমি তা মাপলাম, তখন শেষ হয়ে গেল।' *(বুখারী ৩০৯৭, মুসলিম ২৯৭৩নং)*

মিসকীন ও দরিদ্র হয়ে জীবন-যাপন করাকে তিনি পছন্দ করেছিলেন, সুতরাং তিনি তাই পেয়েছিলেন, যা চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন,

((اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে গরীব-দরিদ্র অবস্থায় জীবিত রাখ, গরীব অবস্থায় আমার মৃত্যু দিয়ো এবং কিয়ামতের দিন গরীবদের দলে আমার হাশর করো। *(তিরমিযী ২৩৫২, সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ৪১২৬নং)*

অবশ্য তা এই জন্য যে, দারিদ্র্যের পৃথক মর্যাদা আছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا)).

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন গরীব মুহাজিরগণ ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(মুসলিম ২৯৭৯নং)*

অন্য বর্ণনা মতে ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৩৩২৭নং)*

নচেৎ তিনি অভাব-অনটন ও নিঃস্বতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। *(সিঃ সহীহাহ ১৪৪৫নং)*

আর (মনের) ধনবত্তা ও অভাবশূন্যতা প্রার্থনা করতেন। *(মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সঃ জামে' ১২৭৫নং)*

এই ছিল তাঁর আড়ম্বরহীন, বিলাসিতাহীন, সরল-সাদা জীবন। মহান প্রভুর বিনয়ী দাস হয়ে তিনি মানুষের মাঝে এসেছিলেন মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে মহান প্রভুর দাসত্ব বরণ করার শিক্ষা দিতে। স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

তাঁর কথাবার্তা

মহানবী ﷺ মিতভাষী ছিলেন, মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁর কথাবর্তায় কর্কশতা ছিল না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (١٥٩) آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। (আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

এইভাবেই মহান আল্লাহ নবীগণকে নরম কথা বলার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি ফিরআউনের কাছে পাঠানোর সময় মূসা ও হারূন (আলাইহিমাস সালাম)এর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

{فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (٤٤) سورة طـه

অর্থাৎ, তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে। (ত্বা-হা ঃ ৪৪)

তিনি বলেছেন, জান্নাত অনিবার্যকারী কর্ম হল, উত্তম কথা বলা, সালাম প্রচার করা এবং অন্নদান করা। *(ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সঃ তারগীব ২৬৯৯নং)*

তিনি কথা কম বলতেন এবং হাসতেনও কম। *(সঃ জামে' ৪৮২২নং)*

এটাই হল মহাপুরুষদের নিদর্শন। তাঁরা ভাবগম্ভীর স্বরে কথা বলেন। গাম্ভীর্য তাঁদের অযথা কথন ও হাস্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর এরই ফলে তাঁরা সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হন।

পক্ষান্তরে যারা কথা বেশি বলে ও কথায় কথায় 'হা-হা' ক'রে হাসে, তাদের ওজন কমে যায়, তারা ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয় এবং অনেক সময় অনধিকার চর্চা ক'রে অপরাধও ক'রে ফেলে। আর তা কোন চিন্তাবিদ বা ভালো মানুষের আলামত নয়।

মহানবী ﷺ-এর কথা ছিল গোটা গোটা স্পষ্ট। প্রত্যেক শ্রোতাই তা বুঝতে পারত। *(সঃ*

জামে' ৪৮২৬নং)

তিনি তো নবী। তাঁর শরীয়ত-সংক্রান্ত সকল কথাই ছিল অহী। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى} (٦)

অর্থাৎ, সে মনগড়া কথাও বলে না। তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষা দান করে চরম শক্তিশালী, (ফিরিশ্তা জিব্রাঈল)। প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে (জিব্রাঈল নিজ আকৃতিতে) স্থির হয়েছিল। (নাজ্‌মঃ ৩-৬)

সাংসারিক ব্যাপারেও যে কথা বলতেন, তাও ছিল বাতিলমুক্ত, অশ্লীলতামুক্ত। তাঁর কথায় কোন অস্পষ্টতা ও জড়তা ছিল না। ফলে তাঁর কথা বুঝতে কারো অসুবিধা হতো না।

তিনি ছিলেন নিরক্ষর, কিন্তু তাঁর ভাষাশৈলী ছিল অতি চমৎকার। তাঁর বাচন-ভঙ্গি ছিল অতি সুন্দর। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর। সে জন্যেই তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী উদারচিত্ত মানুষের হৃদয়মূল স্পর্শ করত। প্রিয়-অপ্রিয় সকল মানুষের মন-প্রাণ মুগ্ধ করত।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর বাচন-পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ তোমাদের মতো এইভাবে হড়বড় ক'রে কথা বলতেন না। বরং তিনি স্পষ্টভাবে গোটা গোটা কথা বলতেন। তাঁর কাছে যে বসত, সেই তা স্মৃতিস্থ করতে পারত।' *(মুখতাসার শামাইল ১৯ নং)*

তিনি এমন ভঙ্গিমায় কথা বলতেন, যদি গণনাকারী চাইত, তাহলে তা গণনা করতে পারত। *(বুখারী ৩৫৬৭, মুসলিম ৭৭০১নং)*

(গুরুত্বপূর্ণ) কথাকে তিনি তিন-তিনবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন। যাতে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। *(তিরমিযী ৩৬৪০, সঃ জামে' ৪৯৯০নং)*

যখন তিনি ভাষণ দিতেন, তখন তাঁর চোখ লাল হয়ে যেত, তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু হত এবং তাঁর ক্রোধ বেড়ে যেত; যেন তিনি লোকেদেরকে এমন এক (শত্রু)সেনা সম্পর্কে সতর্ক করছেন, যা আজই সন্ধ্যা অথবা সকালে তাদেরকে এসে আক্রমণ করবে। *(মুসলিম ২০৪২, ইবনে মাজাহ ৪৫নং, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

কথোপকথনে তিনি যে বাক্য প্রয়োগ করতেন, তার শব্দ অল্প হতো, কিন্তু তা হতো বহুলার্থবোধক। তিনি বলেছেন,

«بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِى يَدَىَّ».

অর্থাৎ, বহুলার্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলী দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং আতঙ্ক দ্বারা আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি। একদা আমি নিদ্রাবস্থায় পৃথিবীর ধনভান্ডারের চাবিগুচ্ছ আমাকে প্রদান করা হয়, আমি তা আমার হাতে নিয়ে রাখি। (বুখারী ২৯৭৭, মুসলিম ১১৯৬নং)

মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও দুআতেও বহুলার্থবোধক সংক্ষিপ্ত শব্দাবলী ব্যবহার করতেন। *(আবূ দাঊদ ১৪৮২নং)*

বলা বাহুল্য, তিনি ছিলেন মিতভাষী। মিতাচার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অত্যন্ত আকর্ষণীয় তাঁর বচনভঙ্গি, সুমিষ্ট তাঁর ভাষা, সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত তাঁর কথাবার্তা। না অতি সংক্ষিপ্ত, না বিস্তারিত। কথা বললে মনে হয় যেন মালা থেকে মুক্তা ঝরছে।

তাঁর চলন

আল্লাহর নেক বান্দাগণের মাটির বুকের চলাফেরা হয় তেমন, যেমন তাঁদের প্রতিপালক

চান। তিনি বলেছেন,

{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} (٦٣)

অর্থাৎ, পরম দয়াময়ের দাস তারা, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'। (ফুরক্বান ঃ ৬৩)

তবে এর অর্থ রোগী বা দুর্বলদের মতো ধীরে-ধীরে চলা নয়। বরং দ্রুত চলার সাথে বিনয় থাকবে চলনে। তাতে অহংকার থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً} (٣٧) سورة الإسراء

অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না, তুমি তো কখনোই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৭)*

{وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} (١٨)

অর্থাৎ, মানুষের জন্য নিজের গাল ফুলায়ো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না; কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে ভালবাসেন না। (লুক্বমান ঃ ১৮)

মহানবী ﷺ যখন পথ হাঁটতেন, তখন দ্রুত চলতেন। (সঃ জামে' ৪৭৮৪নং)

দেখে মনে হতো তিনি যেন কোন ঢালু জায়গা থেকে নামছেন। *(আহমাদ ১৩০০, মুসলিম ৮২, তিরমিযী ৩৬৩৭, হাকেম ৪১৯৪নং)*

তিনি সবলদের মতো হাঁটতেন, দেখলে মনে হতো তিনি অক্ষম নন এবং অলসও নন। *(সঃ জামে' ৫০১৬নং)*

তিনি চলার সময় ডানে-বামে হিলতেন। ঠিক যেমন জলজাহাজ পানির ঢেউয়ে হিলতে থাকে। (ঐ ৪৭৯৮নং)

পথ চলা অবস্থায় তিনি কথা বলতেন না। শীঘ্র গতিতে হাঁটতেন। সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটতেন। (ঐ ৪৭৮৫নং)

রাস্তায় চলার সময় তিনি (অপ্রয়োজনে) পিছন ফিরে তাকাতেন না। (ঐ ৪৭৮৬নং)

যাতে একটানা পথ চলতে পারেন এবং গন্তব্যস্থলে দ্রুত পৌঁছে যেতে পারেন।

পথ চলার সময় তিনি নিজের লুঙ্গির সামনের অংশের তুলনায় পিছনের অংশকে বেশি উঠিয়ে নিতেন। (ঐ ৪৯৪৪নং)

তাঁর ঘুম

দুই জাহানের বাদশার ঘুমের জন্য বালিশ ছিল চামড়ার কভারে খেজুর গাছের চোকা দিয়ে পূর্ণ। (সঃ জামে' ৪৮৩৮নং)

তিনি বিলাসী ছিলেন না, না ভোজন-বিলাসী আর না নিদ্রা-বিলাসী। যেহেতু তিনি ছিলেন বিষয়াসক্তিহীন। তিনি আলস্য, ঔদাস্য ও অতি নিদ্রাকে অপছন্দ করতেন।

নিদ্রা হল মৃত্যুর ভাই। তাই তিনি তার পূর্বে মরণকে স্মরণ করতেন। বিছানায় শয়ন করার সময় বলতেন,

اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি।

ঘুম থেকে উঠে মহান প্রতিপালক আল্লাহর প্রশংসা করে বলতেন,

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

অর্থাৎ, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (নিদ্রা) দেওয়ার পর জীবিত করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনর্জীবন। *(বুখারী ৬৩১৪, মুসলিম ৭০৬২নং)*

বিছানায় শুয়ে তিনি নিজের হাত দু'টিকে একত্রিত করে তিন 'কুল' পড়ে ফুঁ দিয়ে যথা সম্ভব সারা শরীরে বুলিয়ে নিতেন। মাথা, চেহারা ও দেহের সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করতেন এবং এরূপ তিনি ৩ বার করতেন। *(বুখারী ৫০১৭নং)*

বিছানায় ডান কাতে শুয়ে তিনি ডান হাতকে ডান গালের নিচে রেখে (৩ বার) বলতেন,

اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে, সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো। *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সঃ জামে' ৪৬৫৬, ৪৭৯০নং)*

এ ছাড়া তিনি অন্যান্য সূরা ও দুআও পাঠ করতেন।

নিদ্রাভিভূত হলে তাঁর নাক ডাকত। (সঃ জামে' ৪৭৮৯নং)

নিদ্রায় তাঁর চক্ষু দু'টি নিদ্রাবিষ্ট হতো, কিন্তু তাঁর হৃদয় সজাগ থাকত। (ঐ ৪৮০৬নং)

যেহেতু তাঁর জীবন ছিল মহান প্রতিপালকের সাথে জোড়া। তাঁর প্রত্যাদেশ ও অহীর জন্য তাঁকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হতো।

রাত্রির একাংশে তিনি তাহাজ্জুদ পড়তেন। অসুস্থ বা অলস হয়ে পড়লেও তিনি বসা অবস্থায় পড়ে নিতেন। (ঐ ৪৮৪৯নং)

তাঁর ইন্তিকাল

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} (٥٧) سورة العنكبوت

"প্রত্যেক আত্মাই মরণের স্বাদ গ্রহণ করবে; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।" (আনকাবূত ঃ ৫৭)

{وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (٣٤) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} (٣٥) سورة الأنبياء

আমি তোমার পূর্বে কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে থাকি। আর আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (আম্বিয়া ঃ ৩৪-৩৫)

আবূ সাঈদ খুদরী ﵁ বলেন, একদা নবী ﷺ তাঁর ভাষণে বললেন, "আল্লাহ এক বান্দাকে দুনিয়া ও তাঁর কাছে যা আছে তার মাঝে এখতিয়ার দিয়েছেন। বান্দা তাঁর কাছে যা আছে, তা এখতিয়ার ক'রে নিয়েছে।" এ কথা শুনে আবূ বাক্র ﵁ কাঁদতে লাগলেন। আমি মনে মনে বললাম, এ বৃদ্ধ কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তো এক বান্দাকে দুনিয়া ও তাঁর কাছে যা আছে তার মাঝে এখতিয়ার দিয়েছেন। আর বান্দা তাঁর কাছে যা আছে, তা এখতিয়ার ক'রে নিয়েছে।

(তাতে কাঁদার কী আছে?) কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ ছিলেন সেই বান্দা। আর আবু বাক্র ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। *(বুখারী ৪৬৬নং)*

swN rÏ jsv mlDbfq dIsv mrfbhD ﷺ pct-rsÏv hfjD jsqj dlb, mcrfvGfm W nIv mfn (nc²¿ zh²¿fq) zdkhfdrk jsvb. zk}iv (29sw nIv) dkdb znc²¿ rsq isVb. ˆƒ znc²¿kfv nCybf rq mfKf hAKf dlsq. hxr±idkhfv (zKhf snfmhfv) …©mct mc'dmbDb mfqmCbf (vfdp¶qfïfù zfbrf)ˆv hfnfq k]fv hAKf ðv¢ rq. mf zfsqwf (vfdp¶qfïfù zfbrf)ˆv hfnfq k]fv ðwa™Nf sbWqfv zfwfq dkdb zbAfbA ²ÃDslv dbje sKsj zbcmdk sysq sbb. k]fvf njstƒ k]fsj zbcmdk lfb jsvb. ˆƒ hAKf k]fv mfKfq 12 zKhf 14 dlb zhAfrk Kfsj. ˆƒ zh²¿fq dkdb zfhC hfjXv dnÜDj ﷺ-sj bfmfsp ƒmfmdk jvfv zfslw ialfb jsvb. zfhC hfjXv ˆƒ nmq 17 zsÙÁv bfmfp iVfb. ˆj zsÙÁv bfmfp dkdb zfhC hfjsvv ifsw hsn hsn ƒmfm rsq zflfq jsvb.

ƒd§Àjfstv ˆjdlb iCshG dkdb k]fv lfnslvsj mcdÙÁ lfb jsvb. öBGmcûf pf dYt nh nfljfr jsv slb. z²ÃÈstf mcndtmslvsj lfb jsvb. mDvfn htsk dkdb djYcƒ hfjD vfJstb bf.

ƒd§Àjfstv dlb jbAf Ifdkmfsj jfsb jfsb k]fv dhlfq mcrCkG Odbsq zfnfv jKf ufbfst dkdb sj]sl …Estb. zk}iv k]fsj zdk nk¶v k]fv nfsK dmdtk ˆhQ dkdb ufâfkD mdrtfslv sbÛD rWqfv jKf ufbfsbf rst dkdb rfnstb.

rfnfb-ùnfƒbsj jfsY sFsj zflv jsv ycìb dlstb. ²ÃDoBsj sFsj njtsj bnDrk jvstb.

svfo hxdÝ sisk tfot. Jfqhfsvv dhN JfWqfv iadkdÛÁqfW ðv¢ rt. dkdb …©mksj nhGswN …islw dlsq hfvhfv htstb,

(الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).

ªbfmfp, bfmfp. zfv skfmfslv zLDb²¿ lfnlfnDoB (nìsá nkjG rW). *(zfrmfl 26483, zfhC lf†l, ƒhsb mfufr 2697bQ iamcJ)*

ˆj nmq dkdb dmnWqfj slsJ dmnWqfj jvfv ƒ¤Yf iajfw jvstb. mf zfsqwf dmnWqfj dbsq dydhsq bvm jsv dlst dkdb dmnWqfj jvstb.

mxkcA-p§ÃBf ðv¢ rst dkdb ifsw vfJf ifsÛv ifdbsk lcƒ rfk Fcdhsq dbu mcJmàt mcYsk mcYsk htstb, ªtf ƒtfrf ƒïfïfr.

mxkcAv vsqsY jdEb p§ÃBf.«

nhswsN dkdb rfk zKhf zfÌct …sÙftb jvstb ˆhQ …iv dlsj lxdó d²¿v vfJstb. ˆ nmq k]fv sE]fe lcde bsV …Et. ˆ nmq dkdb htstb, ªsr zfïfr! bhD, dnÜDj, wrDloB ˆhQ n{hAdÙÁoB; p]fslvsj kcdm icvõxk jsvY kcdm zfmfsj k]fslv ltHcÙÁ jv. zfmfsj [mf jsv lfW. zfmfv iadk kcdm lqf jv. sr zfïfr! zfmfsj kcdm ncmrfb hácv nfsK dmdtk jv.« (hcJfvD 4586, mcndtm 6448bQ)

zk}iv swN jKfde dkbhfv icbvfhxdÙ jsv k]fv rfk zhw rsq tcdesq isV. idvswsN druvD nsbv 11 hsNGv vhD…t zfWqft mfsnv 12 kfvDJ, smfkfshj 632 dJa±efsèv ucb mfsnv 8 kfvDsJ snfmhfv k]fv zflwG uDhsbv dyv zhnfb Ose. mxkcAv nmq k]fv hqn rsqdYt 63 hYv (4 dlb). bhczskv iCshG 40 hYv, bhD W vnCt zh²¿fq 23 hYv; ˆv msLA 13 hYv mÄfq ˆhQ 10 hYv mlDbfq jftfdkifk jsvb. ƒd§Àjft jsvb mlDbfq ²ÃD zfsqwfv hfnfq k]fv hcsj mfKf svsJ.

ˆdlsj k]fv ivstfj omsbv Jhv nfrfhfoB dhw¶fn jvsk ifvdYstb bf. …mfv ﷺ hstdYstb, `zfïfrv vnCt zhwAƒ dIsv zfnshb ˆhQ sp msb jsv sp, dkdb mfvf sosYb, dkdb kfv rfk-if sjse sItshb!'

zfv kvhfdv kcst hstdYstb, `sp htsh sp, dkdb mfvf sosYb, zfdm kfv olGfb …dVsq slh.'

dj§Â zfhC hfjXv dnÜDj mrfbhD ﷺ-ˆv syrfvf sKsj jfiV ndvsq ycìb dlsq j]flsk tfostb. hfƒsv ˆsn jcvzfb mfuDslv zfqfk ifE jvstb,

{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ } (٣٠) سورة الزمر

ªdbÇyq skfmfv mxkcA rsh ˆhQ WslvW mxkcA rsh.« (pcmfv } 30)

{وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ} (١٤٤) سورة آل عمران

“মুহাম্মাদ রসূল ব্যতীত কিছু নয়, তার পূর্বে বহু রসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা নিহত হয়, তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ যে পশ্চাদপসরণ করবে, সে কখনও আল্লাহর কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। আর অচিরেই

আল্লাহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে পুরস্কৃত করবেন।” (আলে ইমরান ঃ ১৪৪)

dkdb k]fv ƒd§Àjfstv jKf iamfB jsv …mfv ﵁-sj iajxdk²¿ jvstb.

zfhC hfjXsvv jKf ðsb njst j]flsk tfostb. mlDbfq sbsm ˆt nDmfrDb swfsjv Ob zájfv.

mÌthfv mrfbhD ﷺ-sj k]fv jfiVnr sofnt slWqf rt. k]fsj sofnt dlsk zQwoarB jvstb, zfêfn, zftD, zfêfsnv lcƒ sYst IfpXt W jcNfm, mrfbhD ﷺ-ˆv öfLDbjxk lfn wfjvfb, …nfmfr dhb pfql W zfWn dhb JfWtD ﵃.

sofnstv iv dkbde ƒqfmfbD yflv dlsq k]fsj jfIbfsbf rt. mksHslv iv k]fv mxkcA²¿st mf zfsqwf (vfdp¶qfïfù zfbrf)ˆv ùuvfq hotD jhv Jbb jvf rt. nfrfhfoB lst lst Osv iashw jsv ˆj ˆj jsv k]fv ufbfpf iVstb. ufbfpf iVstb mdrtf W dwðvfW. mÌthfv nfvf dlb ufbfpf ytt. idvswsN hcLhfv vfskv mLAHfso k]fv slr nmfdrk jvf rt.

t[t[…©mksj swfsjv nfosv Hfdnsq diaqbhD ﷺ dyv dlsbv ubA ƒrjft rsk dhlfq dbsq ncmrfb hácv jfsY si]ZsY sostb. (mrfbhDv zflwG uDhb û})

আনাস ﵁ বলেন, যখন নবী ﷺ বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাকে কষ্ট ঘিরে ফেলল, তখন (তাঁর কন্যা) ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, ‘হায়! আব্বাজানের কষ্ট!’ তিনি ﷺ এ কথা শুনে বললেন, “আজকের দিনের পর তোমার পিতার কোন কষ্ট হবে না।” অতঃপর যখন তিনি দেহত্যাগ করলেন, তখন ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, ‘হায় আব্বাজান! প্রভু যখন তাঁকে আহবান করলেন, তখন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। হায় আব্বাজান! জান্নাতুল ফিরদাউস তাঁর বাসস্থান। হায় আব্বাজান! আমরা জিবরীলকে আপনার মৃত্যু-সংবাদ দেব।’ অতঃপর যখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হল, তখন ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) (সাহাবাদেরকে) বললেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উপর মাটি ফেলতে কি তোমাদেরকে ভালো লাগল?’ *(বুখারী ৪৪৬২নং)*

তাঁর মহান চরিত্র

মহানবী ﷺ-এর চরিত্র ছিল মহান চরিত্র। যেহেতু তাঁর চরিত্র ছিল কুরআনের বাস্তব রূপ। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘তাঁর চরিত্র কেমন ছিল?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।’ (মুসলিম ১৭৭৩নং, আহমাদ, আবূ দাউদ)

অর্থাৎ, কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর চরিত্র গঠিত ছিল। তিনি কুরআনের আদেশ পালন করতেন, নিষেধ বর্জন করতেন এবং তার অঙ্গীকার ও ধমক অনুসারে নিজের জীবন

পরিচালনা করতেন। কুরআন কারীমের যে চরিত্রের নিন্দা করা হয়েছে, তিনি সেই চরিত্র থেকে দূরে থাকতেন। আর যে চরিত্রের প্রশংসা করা হয়েছে, সেই চরিত্রে চরিত্রবান ছিলেন। আল-কুরআনই ছিল তাঁর সচ্চরিত্রতার উৎস। তার বাণীই ছিল তাঁর সুন্দর চরিত্রের অলঙ্কার।

মহান চরিত্রের অধিকারী নবী ﷺ প্রেরিত হয়েছিলেন সারা বিশ্বজাহানের জন্য রহমত ও করুণা স্বরূপ। আল-ক্বুরআনও হল সারা বিশ্বজাহানের জন্য রহমত ও করুণা স্বরূপ। পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণায়ম নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল করুণারূপ মহাগ্রন্থ আল-ক্বুরআন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (٢٠٣) سورة الأعراف

"তুমি যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন (মু'জিযা) উপস্থিত কর না, তখন তারা বলে, 'তুমি নিজেই তা বেছে নাও না কেন?' বল, 'আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমাকে যে অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি। এ (কুরআন) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দলীল ও নিদর্শন এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া।" (আ'রাফ ঃ ২০৩)

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ}

"হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত (করুণা) সমাগত হয়েছে।" (ইউনুস ঃ ৫৭)

{وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (٦٤)

"আমি তো তোমার প্রতি গ্রন্থ এ জন্যই অবতীর্ণ করেছি; যাতে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে, তাদেরকে তুমি তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পার এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ নির্দেশ ও রহমত স্বরূপ।" (নাহ্ল ঃ ৬৪)

{هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } (٢٠) سورة الجاثية

এ (কুরআন) মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত। (জাষিয়াহ ঃ ২০)

সেই রহমতের কিতাবই রহমতের নবী ﷺ-কে রহমতপূর্ণ চরিত্রে অলংকৃত করেছিল। তাই "তিনি ছিলেন সকল মানুষের চাইতে বেশি চরিত্রবান।" *(বুখারী ৬২০৩, মুসলিম ৫৭৪৭নং)*

যেহেতু তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানব। মানবতার সকল সদ্‌গুণ তাঁর মাঝে একত্রিত ছিল। সকল প্রশংসনীয় গুণের আধার ছিলেন তিনি। তাইতো মহান আল্লাহর সাক্ষ্য ছিল,

{وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (٤) سورة القلم

অর্থাৎ, তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (ক্বালাম ঃ৪)

এমন বিশাল চরিত্র, যার বিশালতায় অতীতে কোন সৃষ্টি পৌঁছতে পারেনি, আর ভবিষ্যতে পারবেও না।

মহান চরিত্রের মাঝেই রয়েছে পরিপূর্ণ দ্বীনের বিধান। তিনিই ছিলেন দ্বীনের ধারক ও বাহক। আর সচ্চরিত্রতা সেই দ্বীনেরই কিছু অংশ।

সচ্চরিত্রতা চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই স্তম্ভ ছাড়া সুচরিত্রের ইমারত খাড়া থাকতে পারে না। আর তা হল, ধৈর্যশীলতা, নৈতিক পবিত্রতা, সাহসিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা। সুচরিত্রের যাবতীয় আচরণের উৎসই হল এই চারটি গুণ। *(মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ১/৬৫৮, মাদারিজুস সালিকীন ২/৩০৮)*

উক্ত চারটি গুণেরই গুণাধার ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ।

তিনি (প্রকৃতিগতভাবে কথা ও কাজে) অশ্লীল ছিলেন না এবং (ইচ্ছাকৃতভাবেও) অশ্লীল ছিলেন না। তিনি ছিলেন কোমল-হৃদয়; রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত ছিলেন না। বাজারে হৈ-হুল্লোড়কারী ছিলেন না।

তিনি ছিলেন দয়াল নবী। আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতেন, সত্য কথা বলতেন, (অপরের) বোঝা বইয়ে দিতেন, মেহমানের খাতির করতেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতেন। *(বুখারী ৩, মুসলিম ৪২২নং)*

তিনি ছিলেন (রূপে-গুণে) সবচেয়ে সুন্দর মানুষ, সবচেয়ে বড় দাতা এবং সবচেয়ে বড় সাহসী। (সঃ জামে' ৪৬৩৪নং)

তিনি ছিলেন বাআদব মানুষ। হাঁচির সময় নিজ মুখে হাত বা কাপড় রেখে নিতেন এবং শব্দ হাল্কা করতেন। (ঐ ৪৭৫৫নং) হাই তুললে মুখে হাত রাখতে বলতেন। (ঐ ৪২৬নং)

তিনি প্রয়োজনে রাগতেন। আর যখন রাগতেন তখন তাঁর গন্ডদেশ রাঙা হয়ে উঠত। *(ঐ ৪৭৫৮নং)*

তিনি ছিলেন ন্যায়ের কাছে বিনম্র, কিন্তু অন্যায়ের কাছে কঠোর।

সচ্চরিত্রতা একটি ব্যাপক বিষয়। যাতে থাকে সকল সুন্দর আচরণ। ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা, ধৈর্যশীলতা, গম্ভীরতা, নম্রতা, ভদ্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, পরার্থপরতা, পরোপকারিতা, সত্যবাদিতা, সুদৃঢ়তা, সৎশীলতা ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু তাঁর মাঝে ছিল।

তিনি অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করতেন না। তিনি সমাজের মানুষের প্রতি সমানুভূতি ও সহানুভূতি রাখতেন। যথা প্রয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

তাঁর মাঝে বিষয়াসক্তি ছিল না। ষড়্‌রিপু (কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য) তাঁর চরিত্রে স্থান পায়নি।

তাঁর মধ্যে যশ ছিল, প্রখর বুদ্ধিমত্তা ছিল, স্ফূর্তি ছিল, উদারতা ছিল, সভ্যতা ছিল, পরহিতৈষণা ছিল, বিশ্বস্ততা ছিল এবং আন্তরিকতা ছিল।

তাঁর এই সচ্চরিত্রতা ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েই বহু লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। দ্বীনের দাঈরা যদি অনুরূপ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে, তাহলে দ্বীনের প্রতি মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হবে।

মহানবী ﷺ নিজে চরিত্রবান ছিলেন এবং অন্যকে চরিত্রবান হতে আহবান ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেহেতুঃ

১। সুন্দর চরিত্র সাধারণ মুসলিমের জীবনে এবং বিশেষভাবে একজন দাঈর জীবনে ঈমানী সুদৃঢ় বন্ধন এবং পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ).

"সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর এবং তোমাদের মধ্যে

সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীদের নিকট উত্তম।" *(আহমাদ ১০১০৬, তিরমিযী ১১৬২, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১২৩২নং)*

২। সুন্দর চরিত্র সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় একটি বিষয়। মহানবী ﷺ সুন্দর চরিত্রের মানুষকে ভালোবাসতেন। যে ব্যক্তির চরিত্র সুন্দর হবে, কিয়ামতে তার মজলিস তাঁর মজলিসের কাছাকাছি হবে।

তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকট থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।" *(তিরমিযী ২০১৯নং)*

৩। সুন্দর চরিত্র মানুষকে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দেয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর। *(বুখারী ৬০২৯, মুসলিম ২৩২১নং)*

৪। সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হও---এ হল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ অনুদেশ। তিনি মুআয বিন জাবাল ﷺ-কে ইয়ামান প্রেরণকালে অসিয়ত ক'রে বলেছিলেন, "----আর লোকেদের সাথে সুন্দর চরিত্র ব্যবহার করো।" (তিরমিযী ২৩৮৯নং)

৫। সুন্দর চরিত্র মানুষকে চিরসুখময় জান্নাতের অধিবাসী করে। বরং সুন্দর চরিত্র জান্নাতের সর্বোপরি স্থান দান করে। মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্কাতর্কি বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি উপহাসছলেও মিথ্যা বলে না। আর সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের ঊর্ধ্বদেশে এক গৃহের যামিন হচ্ছি, যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করে।" *(সহীহ আবু দাউদ ৪০১৫ নং, তিরমিযী)*

৬। সুন্দর চরিত্র অধিকাংশরূপে মুসলিমকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাবে। আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, অধিকাংশ কোন্ আমল মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার ভয় (পরহেযগারী বা তাক্বওয়া) এবং সচ্চরিত্রতা।" *(তিরমিযী ২০০৫নং)*

৭। সুন্দর চরিত্রের মানুষ দ্বারা দেশ আবাদ থাকে এবং তার আয়ু বৃদ্ধি পায়। মহানবী ﷺ বলেছেন, "আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা, সুন্দর চরিত্র অবলম্বন করা এবং প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার রাখায় দেশ আবাদ থাকে এবং আয়ু বৃদ্ধি পায়।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে ৩৭৬৭নং)*

৮। কিয়ামতের বিচার-ময়দানে তিনটি জিনিস ওজন ক'রে জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারিত হবে ঃ আমল, আমলকারী ও আমলনামা। আমলের মধ্যে মীযানে সবচেয়ে বেশি ভারী হবে সুন্দর চরিত্র। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মীযানে (আমল ওজন করার দাঁড়িপাল্লায়) সচ্চরিত্রতার চেয়ে অধিক ভারী আমল আর অন্য কিছু হবে না। আর আল্লাহ অবশ্যই অশ্লীলভাষী চোয়াড়কে ঘৃণা করেন।" *(তিরমিযী ২০০৩, ইবনে হিব্বান ৫৬৬৪, আবু দাউদ ৪৭৯৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৭৬নং)*

৯। সারা সৃষ্টির সবচেয়ে সুন্দর আমল সচ্চরিত্রতা। আল্লাহর রসূল ﷺ আবু যার্রের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, "হে আবু যার্র! তোমাকে আমি এমন দুটি আচরণের কথা বলে দেব না কি? যা কার্যক্ষেত্রে অতি সহজ এবং (নেকীর) মীযানে অন্যান্য আমলের তুলনায় অধিক ভারী?" আবু যার্র رضي الله عنه বললেন, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তুমি সচ্চরিত্রতা ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। (অর্থাৎ তোমার চরিত্র সুন্দর হোক ও তুমি কথা খুবই কম বলো।) কারণ, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! সারা সৃষ্টি ঐ দুয়ের ন্যায় কোন আমলই করেনি।" *(আবু য়্যা'লা, ত্বাবারানী, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সিলসিলা সহীহাহ ১৯৩৮ নং)*

১০। সুন্দর চরিত্রের মুসলিম নফল নামাযী ও নফল রোযাদারের সওয়াব লাভ করতে থাকে। মহানবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি তার সুন্দর চরিত্রের বলে (নফল) নামাযী ও রোযাদারের মর্যাদায় পৌঁছে থাকে।" *(আহমাদ ২৫০১৩, আবূ দাউদ ৪৮০০নং)*

১১। সুন্দর চরিত্র নর ও নারীকে সুন্দর ও সুন্দরী বানায়। সুন্দর সাজার সবচেয়ে সুন্দর ও দামী অলংকার হল সুন্দর চরিত্র। মহানবী ﷺ বলেন, "তুমি সুন্দর চরিত্র ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, সারা সৃষ্টি উক্ত দুই (অলংকারের) মত অন্য কিছু দিয়ে সৌন্দর্যমন্ডিত হতে পারে না।" *(সহীহুল জামে ৪০৪৮নং)*

১২। সুন্দর চরিত্র মহান আল্লাহর কাছে প্রিয়। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম বান্দা হল সেই, যার চরিত্র সুন্দর।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ১৭৯নং)*

তিনি আরো বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। তিনি সুউচ্চ চরিত্রকে ভালবাসেন এবং ঘৃণা করেন নোংরা চরিত্রকে।" *(সহীহুল জামে ১৭৪৩নং)*

১৩। সুন্দর চরিত্রের মানুষ মহানবী ﷺ-এর কাছেও প্রিয়। তিনি বলেন, "আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি তারা, তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। যারা অমায়িক (সহজ-সরল), যারা সম্প্রীতির বন্ধনে সহজে আবদ্ধ হয়। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে অপ্রিয় ব্যক্তি তারা, যারা চুগলখোরি করে, বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটায় এবং নির্দোষ লোকেদের মাঝে দোষ খুঁজে বেড়ায়।" *(ত্বাবারানী, সঃ জামে' ১২৩১নং)*

১৪। সুন্দর চরিত্র হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। মহানবী ﷺ বলেন, "মানুষকে সুন্দর চরিত্রের চাইতে শ্রেষ্ঠ (সম্পদ) অন্য কিছু দান করা হয়নি।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ১৯৭৭নং)*

১৫। চরিত্র সুন্দর যার, সেই সবচেয়ে বড় কুলীন ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি সে, যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। আর সবচেয়ে উচ্চ বংশীয় লোক সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।" *(আল-আদাবুল মুফরাদ ৬৯৪নং)*

১৬। সুন্দর চরিত্র প্রত্যেক মুসলিমের কাম্য, প্রত্যেক দাঈর অলংকার, প্রত্যেক মু'মিনের প্রার্থনা। মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর কাছে সেই কামনা করতেন, সুন্দর চরিত্র চেয়ে প্রার্থনা করতেন,

(وَاهْدِنِيْ لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِيْ لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ).

অর্থাৎ, সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি আমাকে পথ দেখাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি পথ দেখাতে পারে না। মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট হতে দূরে রাখ, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট থেকে দূর করতে পারে না। *(মুসলিম*

৭৭১, আবূ আওয়ানাহ, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, আহমাদ, শাফেয়ী, ত্বাবারানী)

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমার সৃষ্টিকে যেমন সুন্দর করেছ, তেমনি আমার চরিত্রকেও সুন্দর কর। *(আহমাদ, সঃ জামে' ১৩০৭নং)*

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট দুশ্চরিত্র, অসৎ কর্ম, কুপ্রবৃত্তি এবং কঠিন রোগসমূহ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। *(সঃ তিরমিযী ৩/ ১৮৪, সঃ জামে' ১২৯৮নং)*

সুন্দরতম চরিত্রের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমাদের মহানবী ﷺ এ পৃথিবীর বুকে প্রেরিতই হয়েছিলেন। *(আহমাদ ৮৯৫২, হাকেম ৪২২১, বাইহাকী ২০৫৭১, বাযযার ৮৯৪৯নং)*

যেহেতু চরিত্র ছাড়া মানুষ 'মানুষ' হতে পারে না। চরিত্র ছাড়া সমাজ সভ্য ও সুশীল হতে পারে না। আরবী কবি সত্যই বলেছেন,

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ... فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا

অর্থাৎ, জাতির স্থায়িত্ব থাকে যাবৎ চরিত্র অবশিষ্ট থাকে। তাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে গেলে তারাও ধ্বংস হয়ে যায়।

তাঁর নিকট প্রিয়তম

মহানবী ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় রঙ ছিল সবুজ। *(সঃ জামে' ৪৬২৩নং)*

তাঁর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কাপড় ছিল রঙিন ডোরাকাটা ইয়ামানী 'হিবারাহ' নামক সুতির চাদর। *(সঃ জামে' ৪৬২৪নং)*

পোশাকের মধ্যে তিনি 'কামীস' বেশি পছন্দ করতেন। *(সঃ জামে' ৪৬২৫নং)*

কামীস হল পায়ের রলার অর্ধাংশ পর্যন্ত লম্বা জামা।

সেই দ্বীনদারী ও ইবাদত তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল, যেটা তার আমলকারী লাগাতার ক'রে থাকে। *(সঃ জামে' ৪৬২৬নং)*

সেই (ধরনের) আমল তাঁর অধিক পছন্দনীয় ছিল, যে আমল নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়া হয়; যদিও তা পরিমাণে কম হয়।" *(সঃ জামে' ৪৬৩০নং)*

সেই (ধরনের) আমল মহান আল্লাহরও অধিক পছন্দনীয়। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৪২নং)*

মহানবী ﷺ-এর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় পানীয় ছিল মিঠা ও ঠান্ডা। *(সঃ জামে' ৪৬২৭, ৪৯৮০নং)*

হয়তো তা ছিল ঝরনার পানি। অথবা তা ছিল মধু, খেজুর বা কিশমিশ মিশ্রিত শরবত। আর নিশ্চয় তা স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় উপকারী।

হাড্ডি-ওয়ালা গোশ্তের মধ্যে ছাগল-বকরীর ঠ্যাঙের গোশ্ত বেশি পছন্দ করতেন। *(সঃ জামে' ৪৬২৯নং)*

যেহেতু তা সাধারণতঃ নরম ও সুস্বাদু হয়।

তিনি হালোয়া ও মধু ভালোবাসতেন। *(সঃ জামে' ৪৯১৯নং)*

সবজির মধ্যে তিনি কদু বা লাউ ভালোবাসতেন। *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সঃ জামে' ৪৯২০, ৪৯৮৬নং)*

খাদ্যের মধ্যে তিনি মাখন ও খেজুর ভালোবাসতেন। *(আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, সঃ জামে' ৪৯২১নং)*

রোযা রাখার জন্য তাঁর নিকট সবচেয়ে প্রিয় মাস ছিল শা'বান মাস। *(সঃ জামে' ৪৬২৮-নং)*

তাই তিনি শা'বান মাসের অধিকাংশ দিনগুলিতে রোযা রাখতেন। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে রমযান ছাড়া অন্য কোন মাস সম্পূর্ণ রোযা রাখতে দেখিনি। আর শা'বান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসের অধিকাংশ দিনগুলিতে তাঁকে রোযা রাখতে দেখি নি।' *(আহমাদ, বুখারী ১৯৬৯, মুসলিম ১১৫৬নং)*

উসামাহ বিন যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে শা'বান মাসে যত রোযা রাখতে দেখি তত অন্য কোন মাসে তো রাখতে দেখি না, (এর রহস্য কী)?' উত্তরে তিনি বললেন, "এটা তো সেই মাস, যে মাস সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন, যা হল রজব ও রমযানের মাঝে। আর এটা তো সেই মাস; যাতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আমলসমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হোক। *(নাসাঈ, সঃ তারগীব ১০০৮-নং)*

প্রকৃতিকর্ম (প্রস্রাব-পায়খানা ত্যাগ) করার সময় তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে যেতেন। আর অন্তরালের জন্য সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন কোন উঁচু জায়গা বা দেওয়াল অথবা খেজুর ঝাড়ের আড়ালকে। *(সঃ জামে' ৪৬৩১নং)*

তাঁর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় কথা ছিল সবচেয়ে বেশি সত্য কথা। *(আহমাদ, বুখারী, সঃ জামে' ১৬১নং)*

তাঁর সংসার জীবনে সকল মানুষের চাইতে প্রিয়তম ছিলেন দুইজন। মহিলাদের মধ্যে স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এবং পুরুষদের মধ্যে তাঁর শ্বশুর আবু বাক্র সিদ্দীক ﷺ। *(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সঃ জামে' ১৭৭নং)*

সামাজিক জীবনে সবচেয়ে প্রিয়তম মানুষ ছিলেন একজন স্বাধীনকৃত দাস যায়দ বিন হারেষাহ। *(আহমাদ, ত্বাবারানী, হাকেম, সঃ জামে' ১৩৪৮-নং)* এবং তাঁর পুত্র উসামাহ বিন যায়দ। *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৯২৪নং, বুখারী, মুসলিম, সঃ জামে' ১৪১৬নং)*

মহান আল্লাহ তাঁর নবীর জন্মভূমি রূপে পছন্দ করেছিলেন মক্কাকে। তাই তাঁর প্রকৃতিগত ভালোবাসা ছিল নিজ মাতৃভূমির প্রতি। কিন্তু তাঁকে তাঁর স্বজাতির লোকেরা সেখান থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছিল। তাই তিনি সে ভূমিকে সম্বোধন ক'রে এক সময় বলেছিলেন,

(وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ).

অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় তুমি আল্লাহর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভূমি এবং আল্লাহর সকল ভূমির চাইতে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আমাকে যদি তোমার মধ্য থেকে বহিষ্কার করা না হত, তাহলে আমি বের হতাম না। *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সঃ জামে' ৭০৮৯নং)*

মহানবী ﷺ শুভসূচক কথা ও বাক্য পছন্দ করতেন। আর কোন কিছুকে অশুভ বলে ধারণা করতেন না। *(ইবনে মাজাহ, হাকেম, সঃ জামে' ৪৯৮৫নং)*

তিনি বলতেন,

(لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ).

"রোগের (নিজস্ব) সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে শুভ লক্ষণ মানা

আমার নিকট পছন্দনীয়। আর তা হল, উত্তম বাক্য।” *(বুখারী ৫৭৫৬, মুসলিম ৫৯৩৩নং)*

তিনি শুভ কথা থেকে শুভ ধারণা নিতেন। কোন অশুভ কথা থেকে অশুভ ধারণাকে মনে স্থান দিতেন না। সেই দরুন তিনি ভালো ও শুভসুন্দর নাম পছন্দ করতেন। *(আহমাদ, সঃ জামে’ ৪৯০৪নং)*

কোন প্রয়োজনে বের হলে তিনি ‘হে রাশেদ! হে নাজীহ!’ ডাক শুনতে ভালোবাসতেন। *(তিরমিযী, হাকেম, সঃ জামে’ ৪৯৭৮নং)*

‘রাশেদ’ মানে সুপথপ্রাপ্ত, সদাচারী, সুমতিসম্পন্ন। সুতরাং এই ডাক শুনে তিনি নিজ কর্মে সুপথপ্রাপ্ত, সদাচারী বা সুমতিসম্পন্ন হবেন বলে আগাম শুভ ধারণা করতেন।

আর ‘নাজীহ’ মানে সফল বা উত্তীর্ণ। সুতরাং এই ডাক শুনে তিনি নিজ কর্মে সফল ও উত্তীর্ণ হবেন বলে আগাম শুভ ধারণা পোষণ করতেন। এর ফলে তাঁর ঐ কর্মে মনোযোগিতা ও ঐকান্তিকতা বৃদ্ধি লাভ করত।

পক্ষান্তরে খারাপ বা অশুভঙ্কর কোন নাম বা ডাক শুনে মনে কোন অশুভ ধারণা স্থান দিতেন না। উদাহরণস্বরূপ ‘ফেলু’ ডাক বা নাম শুনে কোন কাজে ‘ফেল’ হওয়ার অশুভ ধারণা মনে আনতেন না।

তিনি কোন সফরে বের হলে বৃহস্পতিবার বের হতে পছন্দ করতেন। *(আহমাদ, বুখারী ২৯৪৯নং)*

অভিযানে শত্রুর মুখামুখী হতে পছন্দ করতেন সূর্য ঢলার সময়। *(ত্বাবারানী, সঃ জামে’ ৪৯৮৭নং)*

সমস্ত কাজে (যেমন) ওযূ করা, মাথা আঁচড়ানো ও জুতা পরা (প্রভৃতি সমস্ত ভাল) কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।’ *(আহমাদ, বুখারী ১৬৮, মুসলিম ৬৪০নং)*

তিনি খেজুর মোছার ডাঁটা পছন্দ করতেন। অনেক সময় তা তাঁর হাতে দেখা যেত। *(আহমাদ, আবূ দাউদ, হাকেম, সঃ জামে’ ৪৯২২, ৪৯৮৪নং)*

তিনি হাঁড়ির তলানি বা শেষাংশের খাদ্য পছন্দ করতেন। *(আহমাদ, তিরমিযীর শামায়িল, হাকেম, সঃ জামে’ ৪৯৭৯নং)*

যেহেতু হাঁড়িতে লেগে থাকা খাদ্যের স্বাদ বেশি। অথবা তিনি উপরের খাবার পরিবারের সকলকে ও মেহমানকে দিয়ে বিনয়ের সাথে নিজে হাঁড়ির নিচের অবশিষ্টাংশ খাবার খেতেন। যাতে সে খাবার বর্জিত না হয় এবং ফেলা না যায়।

ufshv dhb zfècïfr hstb, ªbhD ﷺ zfÌct W si½esj sy]se sJsk zfslw jsvsYb ˆhQ hstsYb, ªskfmvf ufb bf sp, sjfb Jfhfsv hjGk zfsY.« *(zfrmfl 13809, mcndtm 2033, ƒhsb mfufr 3270bQ)* ˆj hBGbfq zfsY sp, swsNv Jfhfsv hjGk dbdrk zfsY. *(zfhC zfWqfbfr, bfnf„, ƒhsb drêfb 1343bQ, ƒvWqf…t oftDt 7/32)*

তিনি সুস্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতেন। *(আহমাদ, নাসাঈ, সঃ জামে’ ৪৯৮২নং)*

তিনি সুগন্ধি ভালোবাসতেন। *(আবূ দাউদ, হাকেম, সঃ জামে’ ৪৯৮৩নং)*

তিনি বলেছেন,

(حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكم النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ).

“তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে আমার কাছে স্ত্রী ও খোশবুকে প্রিয় করা হয়েছে। আর নামাযকে করা হয়েছে আমার চক্ষুশীতলতা।” *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৩১২৪নং)*

প্রত্যেক সুগন্ধ তাঁকে মুগ্ধ করত। *(সহীহুল জামে’ ৪৯৮৩নং)*

সুবাস মানুষের মন ও মগজকে স্নিগ্ধ করে। সুবাস আনে হৃদয়ে আনন্দ। সুবাস পবিত্রতার শিরোনাম। তাই তিনি তা পছন্দ করতেন। অন্য কোন উপঢৌকন তিনি কোন কারণে গ্রহণ না করলেও সুগন্ধির উপঢৌকন রদ্দ করতেন না। (*সহীহুল জামে' ৪৮৫২নং)*

তিনি সুগন্ধ কাঠের ধোঁয়া দ্বারা নিজের লেবাস-পোশাক সুগন্ধিত করতেন। তাতে ন্যে কোন সুগন্ধি মিশ্রিত করতেন না। কখনো বা তার উপর কর্পূর ছড়িয়ে দিতেন। *(সহীহুল জামে' ৪৯৪৮নং)*

এমনিতে তাঁর মুবারক দেহ ছিল সুগন্ধময়। তাঁর দেহনিঃসৃত ঘাম ছিল শ্রেষ্ঠ আতর। *(মুসলিম ৬২০১নং)*

তিনি আগমন করলে সৌরভেই চেনা ও জানা যেত, তিনি আসছেন। *(সহীহুল জামে' ৪৯৮৮নং)*

পরন্তু তিনি নিজের কাছ থেকে কোন দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, এটা আদৌ পছন্দ করতেন না। *(সহীহুল জামে' ৪৯৫৫নং)*

তিনি যয়নাবের কাছে মধু পান করতেন। সপত্নী আয়েশা ও হাফসা বললেন, 'আপনি মাগাফীর খেয়েছেন। আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।'

সামান্য অপ্রিয় গন্ধযুক্ত এক প্রকার গাছের আঠাকে 'মাগাফীর' বলা হয়। তা শুনে তিনি মধু খাওয়া হারাম করলেন। যার ফলে সূরা তাহরীম অবতীর্ণ হয়েছিল। *(বুখারী ৫২৬৮, মুসলিম ৩৭৫১নং)*

মহানবী ﷺ অল্প শব্দে বিস্তর অর্থবোধক দুআ পছন্দ করতেন। এ ছাড়া অন্য (লম্বা দুআ) বর্জন করতেন। (*সহীহুল জামে' ৪৯৪৯নং)*

সেই দুআর সামান্য শব্দে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করতে তিনি পছন্দ করতেন। এই জন্য তাঁর অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুআ ছিল,

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর। *(বুখারী ৬৩৮৯, মুসলিম ৭০১৬নং)*

তাঁর নিকট ঘৃণ্যতম

তাঁর নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্যতম চরিত্র ছিল মিথ্যাবাদিতা। (সঃ জামে' ৪৬১৮-নং)

যেহেতু মিথ্যাবাদিতার অপকারিতা অনেক। বাস্তবের অপলাপ ক'রে যে মিথ্যা কথা বলে, তার কথা বিশ্বাস করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

সাধারণতঃ মিথ্যাবাদিতা মুনাফিকীর লক্ষণ। তাই তাঁর নিকট সে চরিত্র ছিল সবার চেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য। সেই কারণেই তিনি পরিবারের কারো মধ্যে সে চরিত্র লক্ষ্য করলে তার প্রতি বৈমুখ থাকতেন, যতক্ষণ না সে তওবা করার কথা প্রকাশ করত। (ঐ ৪৬৭৫নং)

অনুরূপ তাঁর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত বাক্য ছিল (অসার বা অশ্লীল) কবিতা। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৩০৯৫নং)*

তিনি ছিলেন নিরক্ষর নবী। তিনি কবিও ছিলেন না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ } (٦٩) سورة يــس

অর্থাৎ, আমি তাকে (রসূলকে) কবিতা শিখাইনি এবং এ তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। (ইয়াসীন ঃ ৬৯)

তিনি বলতেন, "কবিতা দ্বারা উদর পূর্ণ করার চেয়ে পূঁজ দ্বারা উদর পূর্ণ করা অধিক উত্তম।" *(বুখারী ৬১৫৪, মুসলিম২২৫৮নং)*

তবে তিনি এ কথাও বলতেন, "অবশ্যই কিছু কবিতায় হিকমত (জ্ঞান) আছে।" *(বুখারী ৬১৪৫নং)*

তাই কখনো কখনো কবিদের কবিতা তিনি কথার ফাঁকে পাঠও করতেন। কবি হাস্‌সানকে কবিতা বলতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

বাচাল ও বখাটে লোক তাঁর নিকট সবার চাইতে বেশি ঘৃণ্য ছিল। তিনি বলেছেন,

(إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقاً، وإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ القِيَامَةَ الثَّرثَارُونَ وَالمُتَشَدِّقُونَ وَالمُتَفَيْهِقُونَ).

"তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকট থেকে দূরতম হবে তারা, যারা অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে, এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা ক'রে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।" *(তিরমিযী, সঃ জামে' ২১৯৭নং)*

তাঁর মধ্যপন্থা

মহানবী ﷺ সকল কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। ইসলামের সরল পথ হল অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞার মাঝে মধ্যবর্তী পথ। তাই তাঁর ইবাদতের জীবনেও মধ্যপন্থা পরিদৃষ্ট হয়।

তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল, তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, 'আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন ক'রে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)।' সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।' (আর একজন বললেন, 'আমি গোশ্‌তই খাব না।') অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন,

(أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي).

"তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী ৫০৬৩,*

মুসলিম ৩৪৬৯নং)

তিনি কট্টর পথ অবলম্বন করার ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক ক'রে বলেছেন,

« هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ».

"দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল। (অথবা ধ্বংস হোক।)" এ কথা তিনি তিনবার বললেন। *(মুসলিম ৬৯৫৫নং)*

তিনি বলেন,

(إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ).

"নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দেবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।" *(বুখারী ৩৯নং)*

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা সরল পথে থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।" *(ঐ ৬৪৬৩নং)*

তিনি অন্যকে কোন ইবাদতে বাড়াবাড়ি করতে দেখলে প্রতিবাদ জানাতেন। একদা তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ দেখলেন যে, একটি দড়ি দুই স্তম্ভের মাঝে লম্বা ক'রে বাঁধা রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, "এই দড়িটা কী (জন্য)"? লোকেরা বলল, 'এটি যয়নাবের দড়ি। যখন তিনি (নামায পড়তে পড়তে) ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন এটার সঙ্গে ঝুলে যান!' নবী ﷺ বললেন,

« حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ ».

"এটিকে খুলে ফেল। তোমাদের মধ্যে (যে নামায পড়বে) তার উচিত, সে যেন মনে স্ফূর্তি থাকাকালে নামায পড়ে। তারপর সে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সে যেন বসে (অথবা শুয়ে) যায়।" *(বুখারী ১১৫০, মুসলিম ১৮৬৭নং)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা নবী ﷺ তাঁর নিকট গেলেন, তখন এক মহিলা তাঁর কাছে (বসে) ছিল। তিনি বললেন, "এটি কে?" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'অমুক মহিলা, যে প্রচুর নামায পড়ে।' তিনি বললেন, "থামো! তোমরা সাধ্যমত আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।" আর সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যেটা তার আমলকারী লাগাতার ক'রে থাকে। *(বুখারী ৪৩, মুসলিম ১৮৭০নং)*

তিনি অপরকে নিয়ে নামায পড়ার ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থার খেয়াল রাখতেন। জাবের ইবনে সামুরাহ ﷺ বলেন, 'আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়তাম। সুতরাং তাঁর নামাযও মধ্যম হত এবং তাঁর খুৎবাও মধ্যম হত।' *(মুসলিম ২০৪০নং)*

তিনি মুআয ﷺ কে এশার ইমামতিতে লম্বা ক্বিরাআত পড়তে নিষেধ করে বলেছিলেন, "তুমি কি লোকদেরকে ফিতনায় ফেলতে চাও হে মুআয? তুমি যখন ইমামতি করবে, তখন 'অশ্‌শামসি অযুহা-হা, সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, ইক্বরা বিসমি রাব্বিকা, অল্লাইলি ইযা

য়্যাগশা' পাঠ কর। কারণ তোমার পশ্চাতে বৃদ্ধ, দুর্বল ও প্রয়োজনে উদ্‌গ্রীব মানুষ নামায পড়ে থাকে। *(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত ৮৩৩ নং)*

এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-কে বলল, 'আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আমি অমুক (ইমামের) লম্বা নামাযের জন্য ফজরের জামাআতে হাযির হতে পারি না।' আবূ মাসঊদ ﷺ বলেন, আমি সেদিনকার মত আল্লাহর রসূল ﷺ-কে অন্য দিন উপদেশে অত বেশী রাগান্বিত হতে দেখিনি। অতঃপর তিনি বললেন,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ».

"তোমাদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যে (নামাযীদের মনে) বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে লোকেদের ইমামতি করবে, সে যেন নামায হাল্কা করে পড়ে। কারণ তোমার পশ্চাতে বৃদ্ধ, দুর্বল ও প্রয়োজনে উদ্‌গ্রীব মানুষ নামায পড়ে থাকে।" *(বুখারী ৭০২, মুসলিম ১০৭২, মিশকাত ১১৩২নং)*

একদা তিনি দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই ছেলের কাঁধে ভর করে (মক্কার দিকে) হেঁটে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন, "ওর ব্যাপার কী?" বলল, 'পায়ে হেঁটে কা'বা-ঘর যাওয়ার নিয়ত করেছে!' তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার এমন প্রাণকে কষ্ট দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ওহে বৃদ্ধ! তুমি সওয়ার হয়েই মক্কা যাও। কারণ, আল্লাহ তুমি ও তোমার নযরের প্রতি মুখাপেক্ষী নন।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৪৩১-৩৪৩২নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা থেকে দূরে থাকো। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জনই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম প্রমুখ)*

ইসলাম হল মধ্যপন্থী ধর্ম। এ ধর্মের মানুষ ধার্মিকতায় কট্টর হয় না। যেমন সে তাতে শিথিলও হয় না। চরম ও নরমপন্থার মাঝে হয় তার চলার পথ।

পূর্ববর্তী ইয়াহুদী ধর্মে ছিল চরম কট্টরতা ও কঠোরতা। আর খ্রিস্টান ধর্মে ছিল দারুন শিথিলতা। কিন্তু ইসলাম ধর্মের নবী প্রদর্শন করলেন উভয়ের মধ্যবর্তী পথ। মহান আল্লাহ সেই নবীর এক গুণ বর্ণনায় বলেছেন,

{وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ}

অর্থাৎ, ---যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করে এবং যে তাদের ভার ও বন্ধন যা তাদের উপর ছিল (তা হতে) তাদেরকে মুক্ত করে। *(আ'রাফ ঃ ১৫৭)*

সামাজিক জীবনে সেই মধ্যপন্থা ইসলামী শরীয়তে পরিদৃষ্ট হয়। বলাবাহুল্য, ইসলামে বিবাহ ও ঘর-সংসার করা বিধেয় তথা শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যক জীবন-সঙ্গিনী রাখা বৈধ। বিবাহ অবৈধ করেনি, আবার অনির্দিষ্ট সংখ্যক পত্নী অথবা উপপত্নী গ্রহণেও অনুমতি দেয়নি।

ইচ্ছামতো বিবাহ-বিচ্ছেদ বৈধ করেনি, আবার অসহনীয় দাম্পত্যের বিবাহ-বিচ্ছেদকে একেবারে অবৈধ ঘোষণা করেনি। তাতেও রয়েছে মধ্যপন্থা। যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করে সব শেষে 'ইমার্জেন্সি গেট' ব্যবহার করা যায়।

অর্থনীতিতেও ইসলামের পথ মধ্যবর্তী। দুই পাশে আছে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (١٤٣)

অর্থাৎ, এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।

আর সেই মধ্যপন্থী জাতির সর্দার হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

তাঁর আমানতদারী

তাঁর সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর জন্য তিনি এতই প্রসিদ্ধ ও প্রশংসনীয় ছিলেন যে, মক্কার লোকে তাঁকে 'আল-আমীন' বলেই আহবান করত। যেহেতু তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবার চাইতে নির্ভরযোগ্য আমানতদার ও বিশ্বস্ত।

লোকেরা তাঁর কাছে নিজেদের আমানত রাখত। এমনকি যে রাতে তিনি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, সে রাতেও তাঁর কাছে কিছু লোকের আমানত গচ্ছিত ছিল, যা তিনি আলী ﷺ-কে তার মালিকগণকে প্রত্যর্পণ করতে আদেশ ক'রে হিজরত করেছেন।

বানী মালেকের কাফেরদেরকে ধোঁকা দিয়ে নিশাগ্রস্ত করে অতঃপর তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের সমস্ত মাল-সম্পদ নিয়ে মিসর থেকে মুগীরা বিন শো'বাহ মুসলিম হয়ে মদীনায় এসে মহানবী ﷺ-এর খিদমতে পেশ করলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন, 'তোমার ইসলাম আমরা মেনে নিলাম। কিন্তু তোমার এ মাল, তা হল খিয়ানতের মাল। আমরা তা গ্রহণ করতে পারি না।' *(সিয়ারু আলামিন নুবালা ৩/২১)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমার কাছে যে আমানত রেখেছে, তা তাকে প্রত্যর্পণ কর এবং যে তোমার খেয়ানত করেছে, তার খেয়ানত করো না।" *(আবূ দাউদ ৩৫৩৪, তিরমিযী ১২৬৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪২৩নং)*

তিনি বলেছেন, "তোমরা তোমাদের তরফ থেকে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের জামিন হও, আমি তোমাদের জন্য বেহেশ্তের জামিন হয়ে যাব; কথা বললে সত্য বল, অঙ্গীকার করলে তা পালন কর, তোমাদের নিকটে কোন আমানত রাখা হলে তা আদায় কর, তোমাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত কর, তোমাদের চক্ষুকে (অবৈধ কিছু দেখা হতে) অবনত রাখ, আর তোমাদের হাতকে (অন্যায় ও অত্যাচার করা হতে) সংযত রাখ।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪৭০ নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ প্রায় খুতবাতে বলতেন, "যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। আর যে অঙ্গীকার পালন করে না, তার দ্বীন নেই।" *(আহমাদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৭১৭৯নং)*

মহানবী ﷺ নিজের লৌহবর্ম এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। তিনি তার কাছে ৩০ সা' (প্রায় ৭৫ কেজি) যব ধার চাইলে সে বলেছিল, 'মুহাম্মাদ আমার মাল হরফ করতে চায়!' এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বলেছিলেন, "মিথ্যা বলেছে সে।

(والله إني لأمين في الأرض أمين في السماء).

আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমি হলাম পৃথিবীতে আমানতদার, আসমানেও আমানতদার। সে যদি আমার কাছে আমানত রাখে, আমি তা অবশ্যই আদায় করে দেব। তোমরা আমার লৌহবর্ম নিয়ে যাও তার নিকট।"

অতঃপর তিনি উক্ত বর্ম বন্ধক রেখে তার কাছ থেকে ৭৫ কেজি যব সংসারে খরচ করার জন্য ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর মৃত্যুকাল অবধি আর ঐ বর্ম ছাড়াতে পারেননি। স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অআলা আ-লিহি অসাল্লাম। *(বুখারী, মুসলিম, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৯৮১, মুস্বান্নাফ আঃ রায্যাক ১৪০৯১ প্রমুখ, ইরওয়াউল গালীল ১৩৯৩, সঃ জামে' ১৩৩৭নং দ্রঃ)*

অন্য এক বর্ণনায় ধারে কাপড় ক্রয় করার কথা আছে। তিনি ইয়াহুদীর জন্য বলেছিলেন,

كَذَبَ، قَدْ عَلِمَ انِّي مِنْ اتْقَاهُمْ لِلّهِ وَادَاهُمْ لِلامَانَةِ.

"মিথ্যা বলেছে। সে অবশ্যই জানে, আমি লোকেদের মধ্যে সবার চাইতে বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং তাদের মধ্যে সবার চাইতে বেশি আমানত আদায় করি।" *(তিরমিযী ১২১৩নং)*

সে যুগেও রীতি ছিল, কোন দূত হত্যা করা যাবে না। মহা অপরাধের পরেও মহানবী ﷺ সে রীতির সম্মান করেছেন।

মিথ্যা নবুঅতের দাবীদার মুসাইলিমাহ কায্যাবের দু'জন দূত মহানবী ﷺ-এর কাছে এলে তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল?"

তারা বলল, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসাইলিমাহ আল্লাহর রসূল!'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(آمَنْتُ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا).

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। যদি আমি কোন দূত হত্যা করতাম, তাহলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। *(আহমাদ ৩৭০৮, ৩৭৬১, ৩৮৩৭, দারেমী ২৫০৩, মিশকাত ৩৯৮৪নং)*

তাঁর স্থিরমতিত্ব ও ধীরোদাত্ততা

একজন সফল দাঈর উচিত, নিজের আচরণে স্থিরমতী ও ধীরোদাত্ত হওয়া। কোন বিষয়ে চট্-জলদি ফায়সালা না নেওয়া। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ভালোরূপে বিবেক-বিবেচনা করে পরখ করা। বুঝে-সুঝে পদক্ষেপ নেওয়া। হড়বড়ে না হওয়া। হুট্ করে কোন মন্তব্য না করা। ইত্যাদি।

উদাহরণ স্বরূপ উসামা বিন যায়েদ ﷺ-এর আচরণ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের এক শাখা হুরাকার দিকে পাঠালেন। অতঃপর আমরা সকাল সকাল পানির ঝর্নার নিকট তাদের উপর আক্রমণ করলাম। (যুদ্ধ চলাকালীন) আমি ও একজন আনসারী তাদের এক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করলাম। যখন আমরা তাকে ঘিরে ফেললাম, তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল। আনসারী থেমে গেলেন, কিন্তু আমি তাকে আমার বল্লম দিয়ে গেঁথে দিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা ক'রে ফেললাম। অতঃপর যখন আমরা মদীনা পৌঁছলাম, তখন নবী ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছল। তিনি বললেন, "হে উসামা! তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও কি তুমি তাকে হত্যা করেছ?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে।' পুনরায় তিনি বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও তুমি তাকে খুন করেছ?" তিনি আমার সামনে এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আজকের পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম (অর্থাৎ, এখন আমি মুসলমান হতাম)। *(বুখারী ৬৮৭২, মুসলিম ২৮৮নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূল ﷺ বললেন, “সে কি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে এবং তুমি তাকে হত্যা করেছ?” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে কেবলমাত্র অস্ত্রের ভয়ে এই (কলেমা) বলেছে।’ তিনি বললেন, “তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে যে, সে এ (কলেমা) অন্তর থেকে বলেছিল কি না?” অতঃপর এ কথা পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আমি আজ মুসলমান হতাম।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, “কিয়ামতের দিন যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আসবে, তখন তুমি কী করবে?” উসামা বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন।’ তিনি বললেন, “কিয়ামতের দিন যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আসবে, তখন তুমি কী করবে?” (তিনি বারংবার এ কথা বলতে থাকলেন এবং) এর চেয়ে বেশী কিছু বললেন না, “কিয়ামতের দিন যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আসবে, তখন তুমি কী করবে?” (মুসলিম ২৮৯নং)

মহানবী ﷺ শত্রুর ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করতেন। যুদ্ধের পূর্বে ধীরতা অবলম্বন করতেন। ফজর পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখতেন, সে জনপদ থেকে আযান-ধ্বনি তথা ইসলামের কোন প্রতীক শোনা বা দেখা যাচ্ছে কি না। (বুখারী ৬১০নং)

যুদ্ধের পূর্বেও তিনি ধীরোদাত্ততা প্রয়োগ করতেন। তিনি প্রত্যেক অভিযানের সেনাপতিকে যুদ্ধের পূর্বে কাফেরদের নিকট ৩টি বিষয় পেশ করতে আদেশ দিয়েছেন ঃ-

১। স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ।

২। জিযিয়া প্রদান।

৩। যুদ্ধ।

ধীরতার সাথে দাওয়াত পেশ না করে হুট্ করে যুদ্ধ শুরু করতেন না। *(মুসলিম ১৩৬৫নং, যাদুল মাআদ ৩/ ১০০)*

উদাহরণ স্বরূপ নামাযের কথা বলা যায়। সে ক্ষেত্রেও মহানবী ﷺ ধীরতা ও স্থিরতার গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন,

(إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا).

“যখন নামাযের জন্য ইক্বামত (তাকবীর) দেওয়া হয়, তখন তোমরা তাতে দৌড়ে আসবে না, বরং তোমরা গাম্ভীর্য-সহকারে স্বাভাবিকরূপে হেঁটে আসবে। তারপর যতটা নামায (ইমামের সাথে) পাবে, পড়ে নেবে। আর যতটা ছুটে যাবে, ততটা (নিজে) পূরণ করে নেবে।” *(বুখারী ৯০৮, মুসলিম ১৩৮৯নং)*

(إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ).

অর্থাৎ, নামাযের ইকামত হয়ে গেলে তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না। আর তোমরা ধীরতা অবলম্বন কর। (বুখারী ৬৩৮, মুসলিম ১৩৯৫নং)

ধীরোদাত্ততার মাহাত্ম্য আছে বলেই মহান আল্লাহ তা ভালোবাসেন। আল্লাহর রসূল ﷺ আব্দুল কাইস গোত্রের সর্দার আশাজ্জ্‌কে বলেছিলেন,

« إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ ».

“তোমার মধ্যে এমন দুটি গুণ রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন; সহিষ্ণুতা ও ধীরতা।” *(মুসলিম ১২৬নং)*

কোন কাজে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়, উচিত নয় কোন কাজের ফললাভে জলদিবাজি। শুভ পরিণামের জন্য সুদীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়। আখেরাতের কাজ ছাড়া প্রত্যেক কাজের জন্য ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إلاَّ فِي عَمَلِ الآخِرَةِ).

"আখেরাতের কর্ম ছাড়া ধীরোদাত্ত প্রত্যেক কর্মে কল্যাণকর।" *(আবূ দাউদ ৪৮১০, হাকেম, বাইহাক্বী, সঃ তারগীব ৩৩৫৬নং)*

(السَّمْتُ الحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالاقْتِصَاد جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ).

"নিশ্চয় সুন্দর বেশভূষা, ধীরোদাত্ততা এবং মধ্যমপন্থা নবুঅতের চব্বিশ ভাগের একটি ভাগ।" *(তিরমিযী ২০১০নং)*

মহানবী ﷺ ছিলেন ধীরোদাত্ত মানুষ। আর সে গুণ আসলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান। তিনি বলেছেন,

(التَّأَنِّي مِن الله والعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطان).

অর্থাৎ, ধীরোদাত্ততা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর শীঘ্রতা শয়তানের পক্ষ থেকে। *(সিঃ সহীহাহ ১৭৯৫নং)*

আল্লাহর ক্ষমালাভের জন্য শীঘ্রতা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পার্থিব কোন কাজে তাড়াহুড়া করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। যে কাজে বিবেক-বিবেচনা না করে পদক্ষেপ করা হয়, তাতে অসাফল্য, লাঞ্ছনা ও হায়পস্তানি আসতে পারে। তাই মহান প্রতিপালক ঈমানদারদেরকে সতর্ক করে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (٩٤) سورة النساء

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হবে, তখন তদন্ত ক'রে নাও। আর কেউ তোমাদেরকে সালাম জানালে তাকে বলো না যে, 'তুমি বিশ্বাসী নও।' ইহজীবনের সম্পদ চাইলে আল্লাহর কাছে গনীমত (অনায়াসলভ্য সম্পদ) প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা পরীক্ষা ক'রে নাও। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (নিসা ঃ ৯৪)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (٦) سورة الحجرات

"হে বিশ্বাসিগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা ক'রে দেখবে; যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" (হুজুরাত ঃ ৬)

তাঁর রসিকতা

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বীন-দুনিয়ার সর্দার ছিলেন। তাঁকে লোকেরা সমীহ করত। তবে

তিনি সকল সময় গম্ভীর অবস্থায় থাকতেন, তা নয়। বরং তিনি অনেক সময় সঙ্গীদের সাথে রসিকতা করতেন। রসিকতা করতেন শিশুদের সাথেও।

আবু উমাইর নামক এক শিশুর খেলনা পাখী (নুগাইর) মারা গেলে সে দুঃখিত হয়। তা দেখে তিনি তাকে খোশ করার জন্য মস্করা করে বললেন, 'এই যে আবূ উমাইর! কী করেছে নুগাইর?" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৮৪নং)*

খাদেম আনাসকে তিনি কখনো কখনো রসিকতা ক'রে ডাকতেন, "ওহে দু' কান-ওয়ালা!" *(আহমাদ ১২১৬৪, আবূ দাউদ ৫০০৪, তিরমিযী ১৯৯২নং)*

একদা এক ব্যক্তি তাঁর নিকট সওয়ারী উট চাইলে তিনি বললেন, "তোমাকে একটি উটনীর বাচ্চা দেব।" লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! বাচ্চা নিয়ে কী করব?' তিনি বললেন, "উটনী ছাড়া কি উট আর কেউ জন্ম দেয়?" (অর্থাৎ সব উটই তো তার মায়ের বাচ্চা।) *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৪৮৮৬নং)*

একদা এক বৃদ্ধা এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি দুআ করে দিন, যাতে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।' তিনি মস্করা করে বললেন, 'বৃদ্ধারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" তা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান করল। তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, "ওকে বলে দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় ও জান্নাতে যাবে না।" (বরং সে যুবতী হয়ে যাবে।) *(শামায়েলুত তিরমিযী, রাযীন, গায়াতুল মারাম, মিশকাত ৪৮৮৮নং)*

এক মরুবাসী সহাবীর নাম ছিল যাহের বিন হারাম। তিনি মরু-অঞ্চল থেকে মহানবী ﷺ-এর জন্য (ফলমূল, শাক-সব্জি) উপঢৌকন নিয়ে আসতেন। আর তাঁর মরু এলাকায় যাওয়ার সময় তিনিও তাঁকে শহরের কোন কোন জিনিস প্রস্তুত করে তাঁর উপঢৌকনের বিনিময় প্রদান করতেন। একদা তিনি তাঁকে বললেন,

(إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ).

"যাহের আমাদের বেদুঈন। (অথবা যাহের আমাদেরকে মরু-অঞ্চল থেকে উপহার এনে দেয়।) আর আমরা তার শহুরে সাথী। (অথবা আমরা তাকে আমাদের শহরের প্রয়োজনীয় জিনিস উপহার দিই।)"

যাহেরকে মহানবী ﷺ ভালোবাসতেন। (ফলে তাঁর সাথে রসিকতা করতেন।) যাহের দেখতে ছিলেন কুশ্রী। একদা তিনি নিজের পণ্য বিক্রি করছিলেন। এমতাবস্থায় নবী ﷺ তাঁর কাছে এসে তাঁর পিছন থেকে বগলের নিচে হাত পার ক'রে জরিয়ে ধরলেন। (অথবা তাঁর পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে তাঁর চোখ দুটিতে হাত রাখলেন।) যাতে তিনি দেখতে না পান।

যাহের বললেন, 'কে? আমাকে ছেড়ে দিন।'

অতঃপর তিনি লক্ষ্য করলেন বা বুঝতে পারলেন, তিনি নবী ﷺ। সুতরাং নিজের পিঠকে ভালোভাবে তাঁর (অপার স্নেহময়) বুকে লাগিয়ে দিলেন।

নবী ﷺ বললেন, "কে গোলাম কিনবে?"

যাহের বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমাকে সস্তা পাবেন!'

নবী ﷺ বললেন, "কিন্তু তুমি আল্লাহর কাছে মূল্যবান।" *(আহমাদ ১২৬৪৮, আবূ য়্যালা ৩৪৫৬, শারহুস সুন্নাহ, মুখতাসার শামায়েল ২০৪, মিশকাত ৪৮৮৯নং)*

তিনি হাসি-মজাক ও রসিকতা করতেন, কিন্তু তাতে কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন না। তাছাড়া তিনি সদা-সর্বদা কথায় কথায় রসিকতা করতেন না। কারণ তাতে চিত্ত-বিকৃতি ঘটে,

বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, মানুষের গাম্ভীর্য ও ব্যক্তি-মর্যাদা বিনষ্ট হয়ে যায়। আর রসিকতায় তিনি কোন সময় অবাস্তব বা অসত্য কিছু বলতেন না।

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের সাথে রসিকতা করেন?' তিনি বললেন,

(إِنِّي لاَ أَقُولُ إِلَّا حَقًّا).

"(হ্যাঁ, কিন্তু) আমি সত্য বা বাস্তব ছাড়া অন্য কিছু বলি না।" *(বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ২৬৫, আহমাদ ৮৪৮১, তিরমিযী ১৯৯০, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী প্রমুখ)*

স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

তাঁর হাসি

আনন্দিত হলে মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি হাসতেন।

কিন্তু অট্টহাসি হাসতেন না। তিনি অধিকাংশ সময় মুচকি হাসি হাসতেন। সশব্দে খুব কমই হাসতেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, 'নবী ﷺ-কে কখনো এমন উচ্চ হাস্য হাসতে দেখিনি, যাতে তাঁর আলজিভ দেখতে পাওয়া যেত। আসলে তিনি মুচকি হাসতেন।' *(বুখারী ৪৮২৮, মুসলিম ২১২৩নং)*

জারীর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যখনই আমাকে দেখতেন, তখনই মুচকি হাসতেন।' *(বুখারী ৩০৩৫, মুসলিম ৬৫১৯নং)*

কখনো কখনো তিনি এমন হাসতেন, যাতে তাঁর চোয়ালের দাঁত দেখা যেত।

মা আয়েশা যখন ছোট ছিলেন, তখন কাপড়ের তৈরি পুতুল নিয়ে খেলা করতেন। তার মধ্যে একটি ঘোড়া ছিল, যার দু'টি ডানা ছিল। নবী ﷺ তা দেখে বললেন, 'এটা কী?' আয়েশা বললেন, 'ঘোড়া।'

তিনি বললেন, 'ঘোড়ার আবার দু'টি ডানা?' আয়েশা বললেন, 'আপনি কি শুনেনি, সুলাইমান (নবী)র ডানা-ওয়ালা ঘোড়া ছিল?'

এ কথা শুনে নবী ﷺ হাসলেন এবং সে হাসিতে তাঁর চোয়ালের দাঁত দেখা গেল। *(আবূ দাঊদ ৪৯৩৪নং)*

তিনি হাস-মুখ পছন্দ করতেন এবং মানুষের জন্য হাসমুখ হতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন, "প্রত্যেক কল্যাণমূলক কর্মই হল সদকাহ (করার সমতুল্য)। আর তোমার ভায়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভায়ের পাত্র (কলসী ইত্যাদি) ভরে দেওয়াও কল্যাণমূলক (সৎ)কর্মের পর্যায়ভুক্ত।" *(আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম)*

তিনি আরও বলেন,

« لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ ».

"কল্যাণমূলক কোন কর্মকেই অবজ্ঞা করো না, যদিও তা তোমার ভায়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করেও হয়।" *(মুসলিম ৬৮৫৭নং)*

অবশ্য তিনি অতি হাসি পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন,

(وَلَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ).

"তোমরা বেশী বেশী হেসো না। কারণ, বেশী হাসার ফলে হৃদয় মারা যায়।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ৪১৯৩, সহীহুল জামে' ৭৪৩৫নং)*

তাঁর কান্না

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ মানব-প্রকৃতির ঊর্ধ্বে ছিলেন না। দুঃখ-কষ্ট পেলে কান্না করা মানুষের এক আবেগময় প্রকৃতি। আর এ কথা ঠিক নয় যে, 'কান্না তো মহিলাদের প্রকৃতি। পুরুষদের জন্য তা শোভনীয় নয়।' অথবা 'এ নারীসুলভ স্বভাব কাপুরুষদের।'

কান্না দুর্বল ব্যক্তিত্বের পরিচয় নয়। কান্না হল নরম হৃদয়ের মহানুভবতার দলীল। মরুভূমির মতো নির্দয় হৃদয়ে দয়া-মায়ার কান্নার বৃষ্টি বর্ষে না।

দয়ার নবী কাঁদতেন। মানব-প্রকৃতির মায়ার বাঁধন আঘাতপ্রাপ্ত হলেই তিনি কাঁদতেন। মহান প্রতিপালকের ভয়ে কাঁদতেন। উম্মতের জন্য কাঁদতেন। তবে তাঁর ছিল শব্দহীন কান্না, ছিল প্রবহমান অশ্রুর বারিধারা। কখনো কখনো তাঁর বুক থেকে হাঁড়িতে ফুটন্ত পানির মতো কান্নার অস্ফুট আওয়াজ শোনা যেতো।

আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর ﵁ বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি নামায পড়ছিলেন এবং তাঁর বুক থেকে উনানে স্থিত হাঁড়ির (ফুটন্ত পানির) মত কান্নার অস্ফুট রোল শোনা যাচ্ছিল। *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

কখনো কখনো তিনি এত কান্না কাঁদতেন, তাতে মাটি পর্যন্ত ভিজে যেত! উবাইদ বিন উমাইর ﵁ বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে বললাম, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর জীবনে সবচেয়ে বড় আশ্চর্যময় ঘটনা কী দেখেছেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন, 'এক রাত্রে (নবী ﷺ) আমাকে বললেন, "আয়েশা! আজ রাতে আমাকে আমার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য ছেড়ে দাও।" আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনার নৈকট্য চাই এবং তাই চাই, যা আপনাকে আনন্দ দান করে।' সুতরা তিনি উঠে ওযূ করলেন এবং নামায পড়তে শুরু করলেন। নামাযে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তিনি বসে ছিলেন, (চোখের পানিতে) তাঁর কোল ভিজে গেল। তারপরও কাঁদতে লাগলেন। (সিজদায় গেলে অশ্রুতে) মাটি ভিজে গেল! (ফজরের আগে) বিলাল নামাযের খবর দিতে এলেন। তিনি যখন তাঁকে কাঁদতে দেখলেন, তখন বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কাঁদছেন? অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন!' তিনি বললেন, "আমি কি (আল্লাহর) শুকরগুযার বান্দা হব না? আজ রাত্রে আমার উপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ধ্বংস তার জন্য, যে তা পড়েছে, অথচ তা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা ক'রে দেখেনি।

{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (١٩١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী

লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। *(আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১৪৬৮নং)*

আল্লাহর কালাম শুনে দয়ার নবী কাঁদতেন। ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি আমার সামনে কুরআন তিলাঅত কর।" উত্তরে আমি আরজ করলাম, 'আমি আপনার সামনে তিলাঅত করব, অথচ তা আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে?' তিনি বললেন, "আমি অন্যের কাছ থেকে তা শুনতে ভালবাসি।" অতএব আমি সূরা 'নিসা' তিলাঅত করলাম। পরিশেষে যখন আমি এ আয়াতে এসে পৌঁছলাম; যার অর্থ, "তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নবী) উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?" তখন তিনি আমাকে বললেন, "যথেষ্ট, এবার থাম।" আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। *(বুখারী ৫০৫০, মুসলিম ৮০০নং)*

এ গুণ মহান আল্লাহর সকল অনুগত বান্দার। সেই শ্রেণীর বান্দাগণের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرائيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً) مريم/٥٨

অর্থাৎ, নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের ও যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভূত, ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিকট পরম করুণাময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা ক্রন্দন করতে করতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। *(মারয়্যাম ঃ ৫৮)*

কোন আত্মীয়ের বিয়োগ-ব্যথায় তিনি কাঁদতেন।

আনাস ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পুত্র ইব্রাহীমের নিকট গেলেন, যখন সে মারা যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'চোখ দিয়ে অশ্রুপাত হতে লাগল। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তাঁকে বললেন, 'আপনিও (কাঁদছেন)? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি ﷺ বললেন, "হে আওফের পুত্র! এটা দয়া।" অতঃপর দ্বিতীয়বার কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, "চোখ অশ্রুপাত করছে এবং অন্তর দুঃখিত হচ্ছে। আমরা সে কথাই বলব, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে। আর হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার বিরহে দুঃখিত।" *(বুখারী, মুসলিম কিছু অংশ)*

আনাস ﵁ বলেন, 'নবী ﷺ এর এক কন্যা (উম্মে কুলষূম)এর দাফন কার্যের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, আল্লাহর রসূল ﷺ কবরের পাশে বসে আছেন। আর তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত ছিল। অতঃপর (লাশ নামানোর সময়) তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে (গত) রাত্রে স্ত্রী সহবাস করেনি?" আবু তালহা বললেন, 'আমি আছি, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি ওর কবরে নামো।" এ কথা শুনে আবূ তালহা কবরে নামলেন। *(বুখারী ১২৮৫নং, হাকেম ৪/৪৭, বাইহাকী ৪/৫৩, আহমাদ ৩/১২৬ প্রমুখ)*

উসামাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁর নাতিকে তার মুমূর্ষ অবস্থায় আনা হল। (ওকে দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরতে লাগল। সা'দ বললেন, 'হে

আল্লাহর রসূল! এ কী?' তিনি বললেন, "এটা রহমত (দয়া); যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখেছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন।" *(বুখারী ১২৮৪, মুসলিম ২১৭৪নং)*

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বলেন, সা'দ ইবনে উবাদাহ ﷺ একবার পীড়িত হলে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবী অক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺদের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গেলেন। যখন তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কি মারা গেছে?" লোকেরা জবাব দিল, 'হে আল্লাহর রসূল! না (মারা যায়নি)।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কেঁদে ফেললেন। সুতরাং লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কান্না করতে দেখল, তখন তারাও কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন, "তোমরা কি শুনতে পাও না? নিঃসন্দেহে আল্লাহ চোখের অশ্রু ঝরাবার জন্য শাস্তি দেন না এবং আন্তরিক দুঃখ প্রকাশের জন্যও শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনি তো এটার কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন।" এই বলে তিনি নিজ জিভের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। *(বুখারী ১৩০৪, মুসলিম ২১৭৬নং)*

মা আয়েশা ﷺ বলেন, 'উষমান বিন মাযউন মারা গেলে নবী ﷺ তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি তাঁর চেহারার কাপড় খুলে ঝুঁকে তাঁকে চুম্বন করলেন। অতঃপর তিনি এমন কাঁদলেন যাতে দেখলাম, তাঁর চোখের পানি তাঁর গাল বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।' *(তিরমিযী, আবু দাউদ, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৪৫৬নং)*

প্রায় এক হাজার সাহাবা-সহ এক সফরের এক মঞ্জিলে নেমে নবী ﷺ দু'রাকআত নামায পড়লেন। অতঃর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরালে আমরা দেখলাম, তাঁর দু'টি চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। তাঁর কান্না দেখে সাহাবাগণ কাঁদতে লাগলেন। উমার ﷺ তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কী হয়েছে? (আপনি কাঁদছেন কেন?)' তিনি বললেন, "আল্লাহর নিকট আমি আমার মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে যিয়ারতের অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না। তাই আমি তাঁর উপর জাহান্নামের ভয়ে কাঁদছি!......" *(আহমাদ, মুসলিম ২৩০৩নং, প্রমুখ)*

মু'তা যুদ্ধে যায়দ, জা'ফর ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) শহীদ হলে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত খবর মহানবী ﷺ মদীনায় বলতে লাগলেন, "যায়দ পতাকা ধারণ ক'রেছিল, সে শহীদ হয়ে গেল। তারপর জা'ফর পতাকা ধারণ করেছিল, সে শহীদ হয়ে গেল। তারপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাহ পতাকা ধারণ করেছিল, সেও শহীদ হয়ে গেল। তারপর আল্লাহর এক তরবারি খালেদ বিন অলীদ পতাকা ধারণ করল এবং আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করলেন।"

এ কথা তিনি বলছিলেন, আর তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু ঝরছিল। *(বুখারী ৩৭৫৭নং)*

উহুদ যুদ্ধের পর মহানবী ﷺ ময়দানে নেমে শহীদদের খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর দেখলেন তাঁর চাচা আসাদুল্লাহ হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ শহীদ হয়ে গেছেন, তাঁর নাক ও কান কেটে নেওয়া হয়েছে! তাঁর পেট কাটা আছে, কলিজা বের ক'রে চিবানো হয়েছে! এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর করুণ কান্না দেখে সাথী সাহাবাগণও কাঁদতে লাগলেন। রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

বারা' বিন আযেব ﷺ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম।

হঠাৎ তিনি একদল লোক দেখতে পেয়ে বললেন, “কী ব্যাপারে ওরা জমায়েত হয়েছে?” কেউ বলল, ‘একজনের কবর খোঁড়ার জন্য জমায়েত হয়েছে।’ একথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ ঘাবড়ে উঠলেন। তিনি তড়িঘড়ি সঙ্গীদের ত্যাগ করে কবরের নিকট পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন। তিনি কী করছেন তা দেখার জন্য আমি তাঁর সামনে খাড়া হলাম। দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। পরিশেষে তিনি এত কাঁদলেন যে, তার চোখের পানিতে মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ তুলে বললেন, “হে আমার ভাই সকল! এমন দিনের জন্য তোমরা প্রস্তুতি নাও।” *(বুখারী, তারীখ, ইবনে মাজাহ ৪১৯৫, আহমাদ ৪/৩৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৫১ নং)*

বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফের মারা পড়ল এবং ৭০ জন বন্দী হল। এটা কাফের ও মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ ছিল। এই জন্য যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কী ধরনের আচরণ করা যেতে পারে এ ব্যাপারে পূর্ণরূপে কোন বিধান স্পষ্ট ছিল না। সুতরাং নবী ﷺ সেই ৭০ জন বন্দীদের ব্যাপারে সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, কী করা যাবে? তাদেরকে হত্যা করা হবে, না কিছু মুক্তিপণ (বিনিময়) নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে? বৈধতা হিসাবে এই দু’টি রায়ই সঠিক ছিল। সেই জন্য উক্ত দু’টি রায় নিয়ে বিবেক-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। কিন্তু কখনো কখনো বৈধতা ও অবৈধতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কাল-পাত্র ও পরিস্থিতি বুঝে অধিকতর উত্তম পন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। এখানেও অধিকতর কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বৈধতাকে সামনে রেখে অপেক্ষাকৃত কমতর কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করা হল। যে ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলার তরফ হতে ভর্ৎসনাস্বরূপ আয়াত অবতীর্ণ হল। উমার ؓ প্রভৃতিগণ নবী ﷺ-কে এই পরামর্শ দিলেন যে, কুফ্‌রের শক্তি ও প্রতাপকে ভেঙ্গে ফেলা দরকার আছে। এই জন্য বন্দীদেরকে হত্যা করা হোক। কেননা, এরা হল কুফ্‌র ও কাফেরদের প্রধান ও সম্মানিত ব্যক্তি। এরা মুক্তি পেলে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অধিকরূপে চক্রান্ত চালাবে। পক্ষান্তরে আবু বাক্‌র ؓ প্রভৃতিগণ উমার ؓ-এর রায়ের বিপরীত রায় পেশ করলেন যে, তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ (বিনিময়) নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। আর ঐ মাল দ্বারা আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হোক। নবী ﷺ এই রায়কে প্রাধান্য দিলেন। তখন এ ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হল,

{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (٦٨) الأنفال

অর্থাৎ, দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব বিধান (লিপিবদ্ধ) না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত। *(আনফাল ঃ ৬৭-৬৮, আহসানুল বায়ান)*

পরবর্তীতে উমার ؓ নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং দেখলেন, তিনি ও তাঁর সাথে আবূ বাক্‌র কাঁদছেন। উমার বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! কীসের জন্য কাঁদছেন, আমাকে বলুন। পারলে আমিও কাঁদব। আর না পারলে আপনাদের দু’জনের কান্নার কারণে আমি কান্নার ভান করব।’ *(মুসলিম ৪৬৮-৭নং)*

একদা সূর্যগ্রহণের নামায পড়া অবস্থায় তিনি সিজদায় খুব কান্না করেছেন। জাহান্নাম দর্শন

করে যাতে মহান আল্লাহ তাতে তাঁর উম্মতীকে আযাব না দেন, তার আবেদন জানিয়ে তিনি বারবার কান্না করেছেন। *(ইবনে খুযাইমা ৯০ ১নং)*

কেবল আত্মীয়জনের জন্য নয়, উম্মতীর জন্যও দয়ার নবী কাঁদতেন। একদা তিনি কুরআনের এই আয়াতগুলি পাঠ করলেন,

{رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٣٦)

অর্থাৎ, (ইব্রাহীম বলল,) হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (ইব্রাহীম ঃ ৩৬)

{إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (١١٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, (ঈসা বলল,) তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' (মায়িদাহ ঃ ১১৮)

অতঃপর তিনি নিজ দুই হাত তুলে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! আমার উম্মতী, আমার উম্মতী। (তাদেরকে রক্ষা কর।)"

মহান আল্লাহ জিবরীল ﷺ-কে বললেন, "হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও। আর তোমার প্রতিপালক বেশি জানেন। তাকে জিজ্ঞাসা কর, 'কীসের জন্য কাঁদছ তুমি?'

জিবরীল ﷺ তাঁর কাছে এলে তিনি যা বললেন, তা মহান আল্লাহকে বলা হল। আর তিনি বেশি জানেন। আল্লাহ বললেন, "হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে বল, আমরা তোমাকে তোমার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করব। তোমাকে নারাজ করব না।" *(মুসলিম ৫২০নং)*

তাঁর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন

সমাজের মানুষের মাঝে পারস্পরিক বন্ধন না থাকলে সমাজ সুদৃঢ় হয় না, সুসংহত হয় না। এ কথা আমাদের মহানবী ﷺ মানুষকে শিখিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি শতধাবিচ্ছিন্ন বিশাল সমাজের মানুষের মাঝে 'মানব-বন্ধন' কায়েম করেছিলেন। একাধিক বিবাহের মাধ্যমে তিনি বৈবাহিকসূত্রে গেঁথেছিলেন বহু মানুষকে।

মানুষে-মানুষের ভেদাভেদের প্রাচীর দূর করেছিলেন তিনি। বংশ-গোত্র নিয়ে অন্ধ পক্ষপাতিত্বের উঁচু বেড়া তুলেছিলেন তিনি। মহান আল্লাহ তারই একটা চিত্র তুলে ধরেছেন এই আয়াতে,

{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } (١٠٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি

(আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। *(আলে ইমরান ঃ ১০৩)*

তিনি মদীনায় এসে মুসলিমদের মাঝে প্রসিদ্ধ ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুললেন। তাতে আনসারী ভাই মুহাজেরী ভাইকে নিজের মালধনের অংশী বানাল, অথচ তারা সহোদর ছিল না। দু'জন স্ত্রী থাকলে একজনকে তালাক দিয়ে মুহাজেরী ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ দিতে চাইল। সমাজের মানুষ সকলে ভাই-ভাই হয়ে গেল।

ইসলাম-বিরোধী ইয়াহুদীদের সাথেও শান্তি-চুক্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

দেশ, ভাষা, গোত্র, রঙ প্রভৃতির বর্ণবৈষম্যের সকল দেওয়াল ভেঙ্গে চুরমার করলেন তিনি। কুরআন ঘোষণা দিল,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (١٣) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। *(হুজুরাত ঃ ১৩)*

আর মহানবী ﷺ ঘোষণা দিলেন, "হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক এক। তোমাদের পিতা এক। শোনো! আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার' কারণেই।" *(মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১, সিঃ সহীহাহ ২৭০০নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "লোকেরা যেন মৃত বাপ-দাদাদের নিয়ে ফখর করা অবশ্যই ত্যাগ করে। তারা তো জাহান্নামের কয়লা মাত্র। তা ত্যাগ না করলে তারা সেই গোবুরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্ট হবে, যে নিজ নাক দ্বারা মল ঠেলে নিয়ে যায়। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে জাহেলিয়াতের গর্ব ও ফখর দূর করে দিয়েছেন। (মুসলিম) তো মুত্তাকী (সংযমশীল) মুমিন অথবা পাপাচারী বদমায়াশ। মানুষ সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট।" *(সহীহুল জামে' ৫৩৫৮-নং)*

বানুল মুস্তালিক যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনো মুরাইসী' ঝর্ণার নিকট অবস্থান করছিলেন, এমন সময় কতকগুলো লোক পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে আগমন করে। আগমনকারীদের মধ্যে উমার ﷺ-এর একজন শ্রমিক ছিল, যার নাম ছিল জাহজাহ গিফারী। ঝর্ণার নিকট আরো একজন ছিল, যার নাম ছিল সিনান বিন অবার জুহানী। কোন কারণে এই দু'জনের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হতে হতে শেষ পর্যায়ে ধস্তাধস্তি ও মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে জুহানী চিৎকার শুরু ক'রে দেয়, 'হে আনসার দল! (আমাকে সাহায্যের জন্য দ্রুত এগিয়ে এস।)' অপর পক্ষে জাহজাহ আহবান করতে থাকে, 'হে মুহাজির দল! (আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমরা শীঘ্র এগিয়ে এস।)' রসূল ﷺ তা দেখে বললেন, "আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছি অথচ তোমরা অজ্ঞতার যুগের আচরণ করছ? তোমরা এসব পরিহার করে চল, এ সব হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত।" *(বুখারী ৪৯০৫, মুসলিম ৬৭৪৮, তিরমিযী ৩৩১৫নং)*

দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা থেকে নিষেধ করে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা

করেছেন তিনি। তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ করছি; যা আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন। রাষ্ট্রনেতার কথা শুনবে, তার আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরত করবে এবং (একই রাষ্ট্রনেতার নেতৃত্বে) জামাআতবদ্ধভাবে বসবাস করবে। যেহেতু যে ব্যক্তি বিঘত পরিমাণ জামাআত থেকে দূরে সরে যায়, সে আসলে ফিরে না আসা পর্যন্ত ইসলামের রশিকে নিজ গলা থেকে খুলে ফেলে দেয়। আর যে ব্যক্তি জাহেলী যুগের ডাক ডাকে, সে আসলে জাহান্নামীদের দলভুক্ত।" এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যদিও সে নামায পড়ে ও রোযা রাখে?' তিনি বললেন, "যদিও সে নামায পড়ে ও রোযা রাখে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আল্লাহর (নামে) ডাকে ডাকো, যিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন 'মুসলিম, মু'মিন'।" *(ত্বাবারানী, আবূ য়্যা'লা, ইবনে হিব্বান, তিরমিযী ২৮৬৩নং)*

ইসলাম শিখিয়েছে মানুষকে,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (١٠) سورة الحجرات

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর; যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও। *(হুজুরাতঃ ১০)*

মহানবী ﷺ-ই শিখিয়েছেন, বিচারে সবল-দুর্বল সবাই সমান। বিচারকের সন্তানও বিচার থেকে রেহাই পাবে না। একদা (এক উচ্চবংশীয়া) মাখযূমী মহিলা চুরি করার ফলে ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কুরাইশ বংশের লোকেরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। (তার হাত যাতে কাটা না হয় সেই চেষ্টায়) তারা বলাবলি করল, 'ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ এর সঙ্গে কে কথা বলবে?' পরিশেষে তারা বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামাহ বিন যায়দ ছাড়া আর কে (এ ব্যাপারে) তাঁর সাথে কথা বলার দুঃসাহস করবে?' সুতরাং (তাদের অনুরোধ মতে) উসামাহ তাঁর সাথে কথা বললেন (এবং ঐ মহিলার হাত যাতে কাটা না যায়, সে ব্যাপারে সুপারিশ করলেন)।

এর ফলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে উসামাহ! তুমি কি আল্লাহর দন্ডবিধিসমূহের এক দন্ডবিধি (কায়েম না হওয়ার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?!" অতঃপর তিনি দন্ডায়মান হয়ে ভাষণে বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চবংশীয় (বা ধনী) লোক চুরি করলে তারা তাকে (দন্ড না দিয়ে) ছেড়ে দিত। আর কোন (নিম্নবংশীয়, গরীব বা) দুর্বল লোক চুরি করলে তারা তার উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করত। পক্ষান্তরে আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করত, তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।" *(বুখারী ৬৭৮৮, মুসলিম ১৬৮৮নং, আসহাবে সুনান)*

মদীনার সেই স্বর্ণযুগের সোনার সমাজকে দেখুন, কীভাবে তারা আওসী ও খাজরাজী হয়ে, আনসারী ও মুহাজেরী হয়ে, শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় হয়ে, নারী ও পুরুষ হয়ে, মুসলিম ও অমুসলিম হয়ে, মু'মিন ও মুনাফিক হয়ে সহাবস্থান করেছে? মহান নেতার সুনেতৃত্বে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ও শান্তিময় পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়েছে।

সে সমাজে কোন ছুত-অছুত ছিল না, ছিল না কোন প্রকারের জাতপাতের ভেদাভেদ। মুসলিমরা সবাই এক জাত। সকলের মসজিদে প্রবেশের অনুমতি ছিল, সকলের আল্লাহর কিতাব পড়ার সুযোগ ছিল। সকলের ইমামতি করার বৈধতা ছিল। সাম্যের সাথে মানবিক অধিকার প্রত্যেক মানবই অনায়াসে লাভ করেছে।

সমাজের মানুষের মাঝে সম্প্রীতি ছিল ঈমানদারের কাম্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(إنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا).

"এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত ক'রে রাখে।"

তারপর তিনি (বুঝাবার জন্য) তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকালেন। *(বুখারী ৪৮১, মুসলিম ৬৭৫০নং)*

(مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى).

"মু'মিনদের আপোসের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মতো। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" *(বুখারী ৬০১১, মুসলিম ৬৭৫১নং)*

এ ছাড়া আপোসে সম্প্রীতি বজায় রাখার ব্যবস্থা ও তার বিশেষ মর্যাদা ও সওয়াব বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন হাদীসে।

আজও তারা ভালো মুসলিম হতে পারেনি, যারা ইসলামের এমন শিক্ষা থেকে দূরে আছে। যারা ইসলামকে নানা মযহাব ও দলে-উপদলে ভাগ ক'রে দিয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ } (١٥٩) سورة الأنعام

অর্থাৎ, অবশ্যই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তিনিই তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদেরকে অবহিত করবেন। (আন্‌আম ঃ ১৫৯)

তাঁর বিনয়-নম্রতা

বড় হয়েও নিজেকে ছোট জানা, ছোট মানুষকে সম্মান দেওয়া, প্রত্যেক মানুষকে তার যথার্থ সম্মান প্রদান করা, ছোটর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা ইত্যাদি মহা মানুষের একটি মহৎ গুণ।

এ গুণ যার থাকে না, বরং যে ছোট হয়েও বড় হতে চায়, মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, হক প্রত্যাখ্যান করে, সে আসলে অহংকারী। এ হল হীন মানুষের বদ গুণ।

বিনয়-নম্রতা ভদ্র ও সভ্য মানুষের সদ্‌গুণ। যারা চলনে-বলনে ও আচার-আচরণে বিনয়ী। মহান আল্লাহ এমন মানুষকে নিজের বান্দা বলে প্রশংসা ক'রে বলেছেন,

{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} (٦٣)

অর্থাৎ, তারাই পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'। (ফুরক্বান ঃ ৬৩)

তারা পথ চললে দেখেই মনে হয়, তারা ধীরশান্ত, গম্ভীর, বিনয়ী। তারা উদ্ধত নয়, গর্বিত নয়, দাম্ভিক নয়, অহংকারী নয় এবং চপল ও প্রগল্‌ভ নয়।

বিনয়ে মানুষের সম্মান বর্ধন লাভ করে। আর দাম্ভিকতায় মানুষের সম্মান লয় ও ক্ষয়

হতে থাকে।

পরন্তু অহংকার ও গর্ব একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তার সাজে। এ হল তাঁর বিশেষ গুণ। সৃষ্টি কী নিয়ে অহংকার প্রদর্শন করতে পারে?

মহা মানবের মহৎ গুণ বিনয়-নম্রতা। তাই মহানবী ﷺ ছিলেন নিতান্ত বিনয়ী।

একদা এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে কথা বলতে গিয়ে কাঁপতে শুরু করল। তিনি তাকে সাহস দিয়ে বললেন,

«هوِّن عليك نفسك فإني لستُ بِمَلِكٍ، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد»

অর্থাৎ, প্রকৃতিস্থ হও। আমি তো কোন বাদশা নই। আমি এমন মায়ের পুত, যে (মক্কার বাতহাতে) রোদে শুকানো গোশ্ত খেতো। *(সিঃ সহীহাহ ১৮৭৬নং)*

তিনি এত মর্যাদাসম্পন্ন হয়েও মিসকীনদের সাথে ওঠা-বসা করতেন, বিধবার দেখাশোনা করতেন এবং এতীমের তত্ত্বাবধান করতেন। তিনি বলতেন, "যে প্রথমে সালাম দেয়, সে দু'জনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।" *(আহমাদ, সঃ জামে' ৬১২১নং)*

তিনি অতি বিনয়ী ছিলেন, তবে তার মানে দুর্বলতা ও লাঞ্ছনা বরণ নয়। বরং মর্যাদাবানের বিনয় ছিল তাঁর মাঝে।

তিনি ছিলেন সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। অথচ তিনিই বলেছেন, "মূসার উপর আমাকে প্রাধান্য দিয়ো না।" *(বুখারী ২৪১১, মুসলিম ৬৩০২নং)*

"তোমরা বলো না যে, আমি ইউনুস বিন মাত্তা অপেক্ষা উত্তম।" *(বুখারী ৩৪১২, মুসলিম ৬৩০৯নং)*

তিনি ছিলেন জাতির নেতা, অথচ তাঁর কোন দারোয়ান ছিল না।

বাড়ির খাদেমদের প্রতিও তিনি বিনয়ী ছিলেন। তাঁর খাদেম আনাস رضي الله عنه বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করেছি। তিনি কখনোও আমার জন্য 'উঃ' শব্দ বলেননি। কোন কাজ ক'রে বসলে তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করেননি যে, 'তুমি এ কাজ কেন করলে?' এবং কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি যে, 'তা কেন করলে না?' *(বুখারী ৬০৩৮, মুসলিম ৬১৫১নং)*

মহানবী ﷺ সাক্ষাতের জন্য কারো সাথে দন্ডায়মান হলে তিনি সাক্ষাৎকারীর নিকট থেকে প্রস্থান করতেন না, যতক্ষণ না সে তাঁর নিকট থেকে প্রস্থান করত।

কেউ তাঁর সাথে মুসাফাহা করলে তিনি নিজের হাত প্রথমে টেনে নিতেন না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজ হাত তাঁর হাত থেকে সরিয়ে নিত।

কেউ তাঁর সাথে কোন গোপন কথা বলতে চাইলে তিনি তাঁর মুখের নিকট থেকে নিজ কান সরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি কথা বলে শেষ করে নিজের মুখ সরিয়ে নিত। *(সঃ জামে' ৪৭৮০নং)*

এমন আচরণ বিনয়ের এক একটি প্রকৃষ্ট নমুনা। সচ্চরিত্রতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

তিনি আহার গ্রহণের সময় হেলান দিয়ে বসতেন না। *(ঐ ৪৮৪০নং)* কারণ তা অহংকারীদের আলামত।

mrfbhD ﷺ hstb, ªzfdm srtfb dlsq Jff bf.« *(zfrmfl 18279, hcJfvD 5399 iamcJ)* dkdb srtfb dlsq sJsk dbsNLW jsvsYb. *(dntdntfr nrDrfr 3122bQ)*

spsrkc zbcv™i hnf dhbqDslv t[B bq ˆhQ srtfb dlsq sJst

shwD JfWqf rq. zfv shwD JfWqf k]fv hfÒbDq dYt bf.

একদা দুই হাঁটু ও পায়ের পাতার উপর (নামায পড়ার মতো) খেতে বসে মহানবী ﷺ বলেছিলেন, "আল্লাহ আমাকে সম্মানিত বান্দা বানিয়েছেন এবং অহংকারী ও উদ্ধত বানাননি।" *(আবূ দাউদ ৩৭৭৩, ইবনে মাজাহ ৩২৬৩নং)*

তিনি বলতেন, "দাস যেভাবে খায়, আমি সেইভাবে খাই। দাস যেভাবে বসে, আমিও সেইভাবে বসি।" *(সঃ জামে' ৭নং)*

পথ চলতে তাঁর পশ্চাতে ২ জন ব্যক্তি অনুগমন করত না। *(ঐ ৪৮৭০নং)* ২ জনের বেশিও নয়। কারণ রাজা-বাদশাদের মতো তাঁর অনুগমন করা হোক, তা তিনি চাইতেন না।

তিনি অপছন্দ করতেন যে, লোকেরা তাঁর তা'যীমে দাঁড়িয়ে থাকুক। বরং তিনি বলতেন,

« مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

"যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে লোক তার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন নিজের বাসস্থান দোযখে বানিয়ে নেয়।" *(আবূ দাউদ ৫২২৯, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৫৭নং)*

তাঁর সামনে কখনো মানুষের ভিড় জমে গেলে তাদেরকে সরানো হতো না অথবা মেরে তাড়ানো হতো না। *(সঃ জামে' ৪৮৫০নং)* যেমন রাজা-বাদশাদের সামনে ভিড় করা মানুষদেরকে সরানো ও তাড়ানো হয়।

এমন আচরণেও ছিল মানুষের প্রতি তাঁর বিনয় প্রকাশ।

মহানবী ﷺ মুসলিমদের দুর্বল শ্রেণীর গরীব মানুষদের নিকট যেতেন। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তাদের রোগী দেখতে যেতেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। কেউ মারা গেলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করতেন। *(সঃ জামে' ৪৮৭৭নং)* গরীব বা সাধারণ মানুষ বলে তার জানাযায় শরীক হতেন না, তা নয়। বিনয়বশতঃ তিনি কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করতেন না। তাঁর প্রতি প্রতিপালকের নির্দেশ ছিল,

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} (٢٨) الكهف

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর মুখমন্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে, তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী ক'রে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে। (কাহফ ঃ ২৮)

কালোবর্ণের একজন মহিলা অথবা যুবক মসজিদ ঝাড়ু দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (একদিন) দেখতে পেলেন না। সুতরাং তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, 'সে মারা গেছে।' তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন?" আসলে তাঁরা যেন তার ব্যাপারটাকে নগণ্য ভেবেছিলেন। তিনি বললেন, "আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও।" সুতরাং তাঁরা তার কবরটি দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি তার (কবরের) উপর জানাযা পড়লেন। *(বুখারী ৪৫৮, মুসলিম ২২৫৯নং)*

মহানবী ﷺ মাটিতে বসতেন, মাটিতে বসে খেতেন, ছাগল বাঁধতেন এবং ক্রীতদাস যবের রুটি খেতে দাওয়াত দিলেও তা গ্রহণ করতেন। *(সঃ জামে' ৪৯১৫নং)*

তিনি ক্রীতদাসের সাথে খেতেন। নিম্নমানের খাবার খেতে দাওয়াত দিলেও তা গ্রহণ করতেন। পুরনো তেল দিয়ে যবের রুটি খাওয়ার দাওয়াত দিলেও তা খেয়ে আসতেন। *(ঐ ৪৯৩৯নং)*

তিনি বলতেন,

(لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ).

অর্থাৎ, যদি আমাকে ছাগলাদির পা অথবা বাহু খাওয়ানোর জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা কবুল করব। আর যদি আমাকে পা অথবা বাহু উপঢৌকন দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিশ্চয় তা সাদরে গ্রহণ করব। *(বুখারী ২৫৬৮-নং)*

তিনি পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতেন। তিনি নিজের জুতা পরিষ্কার ও সিলাই করতেন, কাপড় সিলাই করতেন, তাঁর কাপড়ে তালি লাগাতেন, স্বহস্তে নিজ কাপড় পরিষ্কার করতেন, ছাগলের দুধ দোহাতেন এবং নিজের খেদমত নিজেই করতেন। অন্যান্য পুরুষরা যেমন নিজেদের বাড়িতে সংসারের কাজ করে, অনুরূপ তিনিও কাজ করতেন। *(সহীহ আদাবুল মুফরাদ ১/২ ১৫, সহীহুল জামে' ৪৯৩৭, ৪৯৪৬, ৪৯৯৬নং)*

তিনি মহান নেতা ও ইমামে আ'যম হয়েও নিজের খিদমত নিজেই করতেন। যদিও তাঁর দাস-দাসীও ছিল। কিন্তু বিনয়াপ্লুত প্রকৃতি তাঁকে এমন সকল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করত এবং সে সবকে নিজের মান-সম্মানের পরিপন্থী বলে মনে করতেন না।

তিনি গাধার পিঠে সওয়ার হতেন এবং পিছনে অন্যকে সওয়ার-সঙ্গীও করে নিতেন। (সঃ জামে' ৪৯৪৫নং) আর এ কাজকে সম্মানহানিকর ভাবতেন না। বরং তা ছিল তাঁর বিনয়ের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সহচরদের মাঝেও তিনি 'অনন্য' হয়ে থাকতে পছন্দ করতেন না। সঙ্গীদের মাঝে থাকলে অপরিচিত অনেকেই তাঁকে সহজে চিনতে পারত না। একদা এক সফরে একটি ছাগল পাকাবার কথা হল। এক সাহাবী বললেন, 'ওটা যবেহ করার দায়িত্ব আমার।'

অন্য একজন বললেন, 'ওর চামড়া ছাড়ানোর দায়িত্ব আমার।'

অন্য একজন বললেন, 'ওটা রান্না করার দায়িত্ব আমার।'

তাঁদের আমীর মহানবী ﷺ বললেন, 'জ্বালানি সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমার।'

তাঁরা বললেন, 'আমরাই যথেষ্ট। (আপনার কষ্ট করার প্রয়োজন নেই।)'

তিনি বললেন,

(قد علمت أنكم تكفوني ولكني أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه).

"আমি জানি, তোমরাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি অপছন্দ করি যে, তোমাদের মাঝে পৃথক বৈশিষ্ট্য রাখি। যেহেতু আল্লাহ তার বান্দার জন্য এটা অপছন্দ করেন যে, তিনি তাকে তার সঙ্গীদের মাঝে পৃথক বৈশিষ্ট্যবান দেখেন।"

সুতরাং তিনি উঠে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে লাগলেন। *(আর্রাহীকুল মাখতূম ৪৭৮-পৃঃ)*

তিনি মহিলাদেরকে সালাম দিতেন। (সঃ জামে' ৫০১৫নং)

আনসারদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, তাঁদের শিশুদেরকে সালাম দিতেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলাতেন। (ঐ ৪৯৪৭নং)

মদীনার ক্রীতদাসীদের মধ্যে কোন কোন ক্রীতদাসী নবী ﷺ-এর হাত ধরে নিত, তারপর

সে (নিজের প্রয়োজনে) তার ইচ্ছামত তাঁকে নিয়ে যেত। *(বুখারী ৬০৭২নং)*

বলা বাহুল্য, মহিলা বা শিশু বলে তিনি তাদেরকে তুচ্ছ করতেন না। শিশুকে তিনি সালাম দিতেন। (ঐ ৫০১৪নং) তাতে তাঁর বিনয় প্রকাশ পেত এবং শিশুদের মনে আনন্দ।

তিনি শিশুদেরকে নিয়ে খেলাতেন। আদর করে উম্মে সালামার শিশুকন্যা যয়নাবকে 'যুইয়ানাব' বলতেন। (ঐ ৫০২৫নং)

মাহমূদ বিন রাবী ﷺ-এর বয়স তখন পাঁচ বছর। মহানবী ﷺ খেলাচ্ছলে বালতি থেকে মুখে পানি নিয়ে তাঁর মুখে কুল্লি করে দিয়েছিলেন। (বুখারী ৭৭, মুসলিম ১৫৩০নং)

তিনি শিশুদের গালে হাত দিয়ে আদর করতেন। জাবের বিন সামুরাহ বলেন, 'তিনি আমার দুই গালে হাত দিলেন। তাঁর হাত ছিল ঠান্ডা ও সুবাসিত; যেন তা তিনি আতর-ওয়ালার বাক্স থেকে বের করলেন। (মুসলিম ৬১৯৭নং)

আর প্রকৃতিগত ব্যাপার যে, তিনি নিজ দৌহিত্র হাসান-হুসাইনকে নিয়ে আদর করতেন, খেলা খেলতেন।

একদা মহানবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত হাসান ও হুসাইন ﷺ পড়ে-উঠে তাঁর সামনে আসতে লাগলে তিনি মিম্বর থেকে নিচে নেমে তাঁদেরকে উপরে তুলে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন,

(إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ)

(অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনাই তো।---তাগাবুন ঃ ১৫) আমি এদেরকে পড়ে-উঠে চলে আসতে দেখে ধৈর্য রাখতে পারলাম না। বরং খুতবা বন্ধ করে এদেরকে তুলে নিলাম।" *(আহমাদ ২২৯৯৫নং, সুনানে আরবাআহ)*

শাদ্দাদ ﷺ বলেন, একদা যোহর অথবা আসরের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের মাঝে বের হলেন। তাঁর কোলে ছিল হাসান অথবা হুসাইন। তিনি সামনে গিয়ে তাকে নিজের ডান পায়ের কাছে রাখলেন। অতঃপর তিনি তকবীর দিয়ে নামায শুরু করলেন। নামায পড়তে পড়তে তিনি একটি সিজদাহ (অস্বাভাবিক) লম্বা করলেন। (ব্যাপার না বুঝে) আমি লোকের মাঝে মাথা তুলে ফেললাম। দেখলাম, তিনি সিজদাহ অবস্থায় আছেন, আর তাঁর পিঠে শিশুটি চড়ে বসে আছে! অতঃপর পুনরায় আমি সিজদায় ফিরে গেলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ নামায শেষ করলে লোকেরা তাঁকে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি নামায পড়তে পড়তে একটি সিজদাহ (অধিক) লম্বা করলেন। এর ফলে আমরা ধারণা করলাম যে, কিছু হয়তো ঘটল অথবা আপনার উপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে।'

তিনি বললেন, "এ সবের কোনটাই নয়। আসলে (ব্যাপার হল), আমার বেটা (নাতি) আমাকে সওয়ারী বানিয়ে নিয়েছিল। তাই তার মন ভরে না দেওয়া পর্যন্ত (উঠার জন্য) তাড়াতাড়ি করাটাকে আমি অপছন্দ করলাম।" *(সহীহ নাসাঈ ১০৯৩নং, ইবনে আসাকির, হাকেম)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, তিনি নামায পড়তেন, আর সিজদাহ অবস্থায় হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে চড়ে বসত। লোকেরা তাদেরকে এমন করতে মানা করলে তিনি ইশারায় বলতেন, "ওদেরকে (নিজের অবস্থায়) ছেড়ে দাও।" অতঃপর নামায শেষ করলে তাদের উভয়কে কোলে বসিয়ে বলতেন, "যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, সে যেন এদেরকে ভালোবাসে।" *(ইবনে খুযাইমা ৮৮৭নং, বাইহাক্বী ২/২৬৩)*

অনুরূপ তিনি উসামা বিন যায়দকে কোলে বসিয়ে আদর করতেন। (বুখারী ৩৭৪৭নং)

তিনি যয়নাবের কন্যা উমামাকে কোলে নিয়ে নামায পড়তেন। সিজদার সময় নামিয়ে দিতেন। অতঃপর খাড়া হলে আবার কোলে তুলে নিতেন। *(বুখারী ৫১৬, মুসলিম ১২৪০নং)*

উম্মে ক্বাইস বিন্তে মিহস্বান নিজ দুধের বাচ্চাকে নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এলেন। সে তখন মায়ের দুধ ছাড়া অন্য খাবার খেতে শেখেনি। রসূল ﷺ তাকে নিজের কোলে বসালেন। পরক্ষণেই সে তাঁর কোলে পেশাব ক'রে দিল। তিনি পানি আনিয়ে তার উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং কাপড় ধুলেন না। (বুখারী ২২৩, মুসলিম ৬৯৩নং)

অনেক সময় হাবশী ভাষা বলেও শিশুদের সাথে মজাক করতেন। উম্মে খালেদ বিন্তে খালেদ বলেন, একদা আব্বার সাথে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এলাম। আমার গায়ে হলুদ জামা ছিল। তা দেখে তিনি আমাকে (হাবশী ভাষায়) বললেন, 'সানাহ-সানাহ' (সুন্দর-সুন্দর)। অতঃপর আমি তাঁর পিঠের ওপরে নবুঅতের মোহর নিয়ে খেলতে গেলাম। তা দেখে আমার আব্বা আমাকে ধমক দিলেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'ছেড়ে দাও ওকে।' *(বুখারী ৩০৭১নং)*

আবু উমাইর নামক এক শিশুর খেলনা পাখী (নুগাইর) মারা গেলে সে দুঃখিত হল। তা দেখে তিনি তাকে খোশ করার জন্য মস্করা করে বললেন, 'এই যে আবূ উমাইর! কী করেছে নুগাইর?" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৮৪নং)*

এই শ্রেণীর আরো কত ঘটনা আছে, যার দ্বারা বুঝা যায়, মহানবী ﷺ শিশুদের সাথেও বিনয়-নম্রতা ও স্নেহ-মমতার ব্যবহার প্রদর্শন করতেন।

কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলেছেন,

« مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ ».

"দান করলে মাল কমে যায় না। ক্ষমাশীলতার কারণে আল্লাহ বান্দার সম্মান বর্ধিত করেন এবং যে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে সমুন্নত করেন।" *(মুসলিম ৬৭৫৭নং, তিরমিযী)*

তিনি আরো বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ».

"অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, 'তোমরা বিনয়ী হও; যাতে একে অন্যের উপর গর্ব না করে এবং কেউ কারো প্রতি অন্যায়াচরণ না করে।' *(মুসলিম ৭৩৮৯নং)*

আর তিনি দুআ ক'রে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, স্থবিরতা এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমার আত্মায় তোমার ভীতি প্রদান কর এবং তাকে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পবিত্রকারী। তুমিই তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সেই ইলম থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কোন উপকারে আসে না। সেই হৃদয় থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা বিনয়ী হয় না। সেই আত্মা থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা তৃপ্ত হয় না এবং সেই দুআ থেকে পানাহ চাচ্ছি, যা কবুল হয় না।" *(মুসলিম ৭০৮১নং)*

তাঁর সহজতা

দ্বীনে ইসলাম তথা আমাদের দয়ার নবী ﷺ-এর সহজতার নমুনা এই যে, শরীয়তের বহু

কঠিন আমলকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে। যার জন্য সে আমল করা কষ্টকর, তার জন্য তা লাঘব করে দেওয়া হয়েছে অথবা ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

অক্ষম মানুষকে শরীয়তের ভার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যে আমল কেউ করতে সক্ষম নয়, সে আমলকে তার জন্য হাল্কা করে দেওয়া হয়েছে অথবা মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

অনেক সময় যে জিনিস 'হারাম' ছিল, সে জিনিস প্রয়োজন-সাপেক্ষে তার জন্য 'হালাল' করে দেওয়া হয়েছে।

শুধু তাই নয়, যে আমল না করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, অনুমতি গ্রহণ ক'রে সে আমল না করাটাই মহান আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয় বলা হয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ).

"মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর অনুমতি গ্রহণ করা হোক; যেমন তিনি অপছন্দ করেন যে, তাঁর অবাধ্যতা করা হোক।" *(আহমাদ ৫৮৬৬, ৫৮৭৩নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ).

"মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর অনুমতিসমূহ গ্রহণ করা হোক; যেমন তিনি পছন্দ করেন যে, তাঁর ফরযসমূহ পালন করা হোক।" *(বাইহাক্বী, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান ৩৫৪নং, বাযযার প্রমুখ)*

মহান আল্লাহ মানব-দানব সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। কিন্তু তিনি কাউকে কষ্ট দিতে চাননি। মানুষের সুখের জন্য তিনি শরীয়তের বিধান দিয়েছেন। শরীয়তের বিধান চাপিয়ে তিনি মানুষকে অসুখী করতে চাননি। অবশ্য কেউ যদি নিজের উপর দ্বীনকে বোঝ মনে করে অথবা বোঝা স্বরূপ চাপিয়ে নেয়, তাহলে সে কথা ভিন্ন। যেমন অনুমতি সত্ত্বেও কেউ যদি তা গ্রহণ না করে অথবা নযর ইত্যাদি মেনে নিজের ওপর কোন আমলকে ওয়াজেব করে নেয়, তাহলে তা শরীয়তে বাঞ্ছনীয় নয়।

পবিত্রতার বিধান হাল্কা ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

(٦) سورة المائدة

"আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।" (মায়িদাহ ঃ ৬)

দ্বীনের বিধান দান ক'রে মহান স্রষ্টা মানুষকে কষ্ট দিতে চাননি। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা,

{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} (٧٨) سورة الحج

অর্থাৎ, সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন

'মুসলিম' এবং এই গ্রন্থেও; যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! (হাজ্জ ঃ ৭৮)

আদেশ মাত্রই তা পালন করা ফরয, তা নয়। তা পালন করার ক্ষমতা থাকতে হবে। কেউ পালন করতে অক্ষম হলে, তা পালন করা তার জন্য আবশ্যক নয়। সে কথাও মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٦) سورة التغابن

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর এবং শোনো, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর, তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণ হবে। আর যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত, তারাই সফলকাম। *(তাগাবুন ঃ ১৬)*

দ্বীন কঠিন নয়। তাকে কঠিন বানানো উচিত নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ).

"নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন প্রবল হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।" *(বুখারী ৩৯নং)*

মহান আল্লাহর নিকট সেই দ্বীনদারী পছন্দ, যাতে সরলতা ও সহজতা আছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللهِ الْحَنَفِيَّةُ السَّمْحَةَ).

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় দ্বীন হল একনিষ্ঠ সরল। *(আহমাদ ২১০৮, আল-আদাবুল মুফরাদ বুখারী ২৮৩, সিঃ সহীহাহ ৮৮১নং)*

ক্ষমতার বাইরে কষ্টসাধ্য কাজ করা ইসলামে পছন্দ নয়। দয়ার নবী ﷺ সে কথাও বলেছেন,

« عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا».

"তোমরা সাধ্যমতো আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।" আর সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যেটা তার আমলকারী লাগাতার ক'রে থাকে। *(বুখারী-মুসলিম)*

আমল করতে বা আমল করতে মানুষকে বলতেও কঠোরতা অবলম্বন করা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ মুআয ও আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)কে দাওয়াতের কাজে ইয়ামান পাঠাবার সময় বলেছিলেন,

(يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا).

"তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। পরস্পর মেনে-

মানিয়ে চলো, মতবিরোধ করো না।" *(বুখারী ৩০৩৮, মুসলিম ৪৫২৬নং)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখনই দু'টি কাজের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হত, তখনই তিনি সে দু'টির মধ্যে সহজ কাজটি গ্রহণ করতেন; যদি সে কাজটি গর্হিত না হত। কিন্তু তা গর্হিত কাজ হলে তিনি তা থেকে সকলের চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য কখনই কোন বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু (কেউ) আল্লাহর হারামকৃত কাজ ক'রে ফেললে তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন।' *(বুখারী ৩৫৬০, মুসলিম ৬১৯০নং)*

যে দ্বীনদারীতে সরলতা ও মধ্যমপন্থা আছে, সেই দ্বীনদারী হল সর্বোত্তম। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ).

"সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন হল, যা (পালন করা) সহজ।" *(সঃ জামে' ৩৩০৯নং)*

নবী ﷺ বলেন, "দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল। (অথবা ধ্বংস হোক।)" এ কথা তিনি তিনবার বললেন। *(মুসলিম ৬৯৫৫নং)*

তিনি বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِى مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِى مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا ».

"আমাকে আল্লাহ নিজের ব্যাপারে ও অপরের ব্যাপারে কঠোর ক'রে পাঠাননি। বরং তিনি আমাকে সরল শিক্ষক ক'রে পাঠিয়েছেন।" *(মুসলিম ৩৭৬৩নং)*

তিনি চেষ্টা করতেন, যাতে কোন আমল উম্মতের উপর বহাল করা হয় অতঃপর তা তাদের জন্য কঠিন না হয়ে পড়ে। এই আশঙ্কায় তিনি জামাআত সহকারে তিন দিন তারাবীহর নামায পড়েছিলেন। তারপর তা ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে বর্জন করেছিলেন। *(বুখারী ৭২৯০, মুসলিম ১৮১৯নং)*

তিনি সহজ করার মানসেই চাইতেন না যে, লোকেরা তাঁকে অযথা প্রশ্ন করুক। তিনি বলেছেন,

(إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ).

অর্থাৎ, মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হল সেই ব্যক্তি, যে এমন কোন জিনিসের ব্যাপারে প্রশ্ন করল, যা হারাম ছিল না। অতঃপর তার প্রশ্ন করার ফলে তা হারাম ক'রে দেওয়া হল। *(বুখারী ৭২৮৯, মুসলিম ৬২৬৫নং)*

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে ভাষণ দানকালে বললেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর (বায়তুল্লাহর) হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব তোমরা হজ্জ পালন কর।" একটি লোক বলে উঠল, 'হে আল্লাহর রসূল! প্রতি বছর তা করতে হবে কি?' তিনি নিরুত্তর থাকলেন এবং লোকটি শেষ পর্যন্ত তিনবার জিজ্ঞাসা করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি আমি বলতাম, হ্যাঁ। তাহলে (প্রতি বছরে) হজ্জ ফরয হয়ে যেত। আর তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হতে।" অতঃপর তিনি বললেন,

« ذَرُونِى مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ ».

“তোমরা আমাকে (আমার অবস্থায়) ছেড়ে দাও, যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে (তোমাদের স্ব স্ব অবস্থায়) ছেড়ে রাখব। কেননা, তোমাদের পূর্বেকার জাতিরা অতি মাত্রায় জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের পয়গম্বরদের বিরোধিতা করার দরুন ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন করবে। আর যা করতে নিষেধ করব, তা বর্জন করবে।” *(মুসলিম ৩৩২ ১নং)*

তিনি সরল-সহজ চরিত্রের শিক্ষক ছিলেন। এমন চরিত্রের কথা তাওরাত-ইঞ্জীলেও লেখা আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٥٧) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যারা নিরক্ষর রসূল ও নবীর অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জীল যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করে এবং যে তাদের ভার ও বন্ধন যা তাদের উপর ছিল (তা হতে) তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হবে সফলকাম। (আ’রাফ ঃ ১৫৭)

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানধর্মে এমন কিছু ভার ও বন্ধন ছিল, তা ইসলামে নেই। ইসলাম হল সরল ও সহজ ধর্ম। ইসলামে কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের অতীত ভার দেওয়া হয় না। এ কথা মহান আল্লাহ অনেক স্থানে বলেছেন,

{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} (٢٨٦) سورة البقرة

“আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না।” (বাক্বারাহ ঃ ২৮৬)

{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (٧) سورة الطلاق

“সামর্থ্যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দান করবেন।” *(ত্বালাক্ব ঃ ৭)*

{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٤٢) سورة الأعراف

“আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারাই হবে জান্নাতবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।” (আ’রাফ ঃ ৪২)

মহান সৃষ্টিকর্তা পরম দয়ালু। দ্বীনের নবী মু’মিনদের প্রতি স্নেহশীল দয়ার্দ্র-হৃদয়। তাই শরীয়তের কোন জিনিস পালন করা কঠিন নয়। কোন নির্দেশের ক্ষেত্রেই কঠোরতা অবলম্বন

করতে বলা হয়নি। বরং মহান আল্লাহ স্পষ্টই বলেছেন,

{ يُرِيد الله بِكُم اليُسْر ولا يُرِيدُ بِكُم العُسْر } [البقرة: ١٨٥] .

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তিনি তোমাদের কষ্ট চান না। *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)*

মুহাম্মাদী শরীয়তে অনেক কঠিন জিনিস যে সহজ, তার কিছু নমুনা নিম্নরূপ ঃ-

নির্দিষ্ট সময়ে নামায কায়েম করা ফরয। (নিসা ঃ ১০৩)

কিন্তু কেউ নামায পড়তে ঘুমিয়ে অথবা ভুলে গেলে অপরাধ হবে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى ».

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে ঘুমিয়ে যায় অথবা ভুলে যায়, সে যেন (জাগা ও) স্মরণ হওয়া মাত্র তা পড়ে নেয়। যেহেতু আল্লাহ বলেন, "তুমি আমার স্মরণের জন্য নামায পড়।" (মুসলিম ১৬০১নং)

কোন বৈধ কারণে ও সফরে যোহর-আসর ও মাগরিব-এশা একটি অন্যের সময়ে একত্রে জমা ক'রে পড়া সুন্নত।

নামায দাঁড়িয়ে পড়তে না পারলে বসে, তাও না পারলে শুয়ে এবং ইশারাতেও নামায হয়ে যায়।

মহিলাদের জন্য কষ্টকর, তাই তাদের জন্য জুমআহ ও জামাআতের নামায ওয়াজেব নয়।

শিশু, জ্ঞানশূন্য ও ঘুমন্ত ব্যক্তিকে শরীয়তের ভার থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

রসূল ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তির নিকট হতে (কিরামান কাতেবীনের পাপ-পুণ্য লিখার) কলম তুলে নেওয়া হয়েছে; শিশু হতে, যতদিন না সে সাবালক হয়েছে, ঘুমন্ত ব্যক্তি হতে যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়েছে এবং পাগল ব্যক্তি হতে যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়েছে।" *(আহমাদ ১/১৪০, আবু দাউদ ৪৩৯৯নং, হাকেম ৪/৪৩০)*

এতীমের মাল ভক্ষণ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু অভাবী হলে ন্যায়ভাবে ভক্ষণ বৈধ করা হয়েছে। (নিসা ঃ ৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ».

"যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রতিটি নামাযের সাথে দাঁতন করার আদেশ দিতাম।" *(বুখারী, মুসলিম ৬১২নং)*

অনুরূপ বলেছেন এশার নামাযকে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে। *(মুসলিম ১৪৭৭নং)*

তাঁর অনুসরণ করে মু'মিনদের কষ্ট হবে বলেই তিনি প্রত্যেক অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি। *(বুখারী ২৭৯৭, মুসলিম ৪৯৭৩নং)*

হজ্জ করতে গিয়ে কুরবানীর দিন সকালে পাথর মেরে কুরবানী করতে হয়। অতঃপর চুল কামিয়ে মক্কায় গিয়ে তওয়াফ ও সাঈ করতে হয়।

কিন্তু সেদিনকার কোন আমল কেউ আগা-পিছা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, "কোন সমস্যা নেই।" *(বুখারী ৮৩, ১৭৩৭, মুসলিম ৩২১৬নং)*

একদা এক নামাযের পর সাহাবাগণ তাঁকে নানা সমস্যার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। প্রত্যেক সমস্যার ব্যাপারে তিনি সহজ ক'রে উত্তর দিয়ে বললেন,

(لاَ ، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي يُسْرٍ).

"সমস্যা নেই। হে লোক সকল! নিশ্চয় আল্লাহ আযযা অজাল্লার দ্বীন রয়েছে সহজতায়।" *(আহমাদ ২০৬৬৯, ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৩৭২, আবূ য়্যা'লা ৬৮৬৩নং)*

হারাম জিনিস খেতে বাধ্য হলে তা হালাল হয়ে যায়, এ কথা কুরআনের একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} (١١٩) سورة الأنعام

"তোমাদের কি হয়েছে যে, যার যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তোমরা তা ভক্ষণ করবে না? অথচ তোমরা নিরুপায় না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমা লংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।" (আন্‌আম ঃ ১১৯)

{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٧٣) سورة البقرة

"নিশ্চয় (আল্লাহ) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে সব জন্তুর উপরে (যবেহ কালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (বাক্বারাহ ঃ ১৭৩)

{فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٣) سورة المائدة

(তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে---) তবে যদি কেউ ক্ষুধার তাড়নায় (নিষিদ্ধ জিনিষ খেতে) বাধ্য হয়; কিন্তু ইচ্ছা ক'রে পাপের দিকে ঝুঁকে না, তাহলে (তার জন্য) আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (মায়িদাহ ঃ ৩)

{قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

"বল, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে, তাতে আহারকারী যা আহার করে, তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না। তবে মৃতপ্রাণী, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস; কেননা তা অপবিত্র। অথবা (যবেহকালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে যা অবৈধ। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে বাধ্য হলে, তোমার প্রতিপালক অবশ্যই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (আন্‌আম ঃ ১৪৫)

ফজর উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস থেকে রোযা রাখার বিধান দিয়ে যাদের জন্য তা কষ্টকর হয়, তাদের জন্য বলেছেন,

{أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) شَهْرُ

رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (١٨٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, (রোযা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফর অবস্থায় থাকলে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না (যারা রোযা রাখতে অক্ষম), তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। পরন্তু যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণপ্রসূ; যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার। রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন তাতে রোযা পালন করে। আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির থাকে, তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের (জন্য যা) সহজ (তা) করতে চান, তিনি তোমাদের কষ্ট চান না। যেন তোমরা (রোযার) নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করে নিতে পার এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন, তার জন্য তোমরা আল্লাহর তকবীর পাঠ (মহিমা বর্ণনা) কর এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৪-১৮৫)

বরং মহান আল্লাহর অনুমতি, সফরে রোযা না রাখাই উত্তম। আনাস ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ (সাহাবা সহ) এক সফরে ছিলেন। তাঁদের কিছু লোক রোযা রাখল এবং কিছু রাখল না। যারা রোযা রাখেনি তারা বুদ্ধি করে রোযা ভাঙ্গল এবং কাজ করল। আর যারা রোযা রেখেছিল তারা কিছু কাজ করতে দুর্বল হয়ে পড়ল। তা দেখে তিনি বললেন, “আজ যারা রোযা রাখেনি তারাই সওয়াব কামিয়ে নিল।” *(বুখারী ২৮৯০, মুসলিম ১১১৯নং, নাসাঈ)*

mrfbhD ﷺ mÄf-dhuq zdHpfsb svfpf svsJdYstb. dj§Â k]fv jfsY Jhv ˆt sp, stfsjvfW svfpf svsJsY, zfv ˆv Ist kfvf jó HcosY ˆhQ dkdb jD jvsYb, kf ufbfv zsi[f jvsY. nckvfQ zfnsvv iv dkdb ˆj ifÛ ifdb zfdbsq ifb jvstb. stfsjvf ˆ lxwA kfdjsq slJsk tfot. k]fsj htf rt, djYc stfj svfpf zh²¿fq zfsY. dkdb htstb, ªkfvf bfIvmfb, kfvf zhfLA.« *(mcndtm 1114bQ)*

ufshv ؓ hstb, ˆjlf zfïfrv vnCt ﷺ ˆj nIsv dYstb. dkdb slJstb stfsjvf ˆjde stfjsj dOsv umf rsqsY ˆhQ stfjdev …iv Yfqf jvf rsqsY. dkdb htstb, ªjD rsqsY Wv?« stfsjvf htt, `stfjde svfpf svsJsY.' dkdb htstb, ªnIsv skfmfslv svfpf vfJf Hft jfu bq.« *(hcJfvD 1946, mcndtm 1115bQ)*

সফরের চার রাকআতবিশিষ্ট নামাযকেও অর্ধেক ক’রে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ওযূতে পা না ধুয়ে স্বগৃহে অবস্থানকারীর জন্য ১ দিন এবং মুসাফিরের জন্য ৩ দিন মোজার ওপর শর্তসাপেক্ষে মাসাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে ওযূ-গোসলের বদলে মাটি

দ্বারা তায়াম্মুম করার বিধান রয়েছে শরীয়তে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (٤٣) النساء

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ, তা বুঝতে পার এবং অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যদি তোমরা পথচারী না হও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা (শৌচস্থান) হতে আসে অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; (তা) মুখে ও হাতে বুলিয়ে নেবে। নিশ্চয় আল্লাহ পরম মার্জনাকারী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (নিসা ঃ ৪৩)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٦)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর এবং তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত কর। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তাহলে বিশেষভাবে (গোসল ক'রে) পবিত্র হও। যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রী-সহবাস কর এবং পানি না পাও, তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর; তা দিয়ে তোমাদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (মায়িদাহ ঃ ৬)

মহানবী ﷺ বলেন, "দশ বছর যাবৎ পানি না পাওয়া গেলে মুসলিমের ওযুর উপকরণ হল পাক মাটি। পানি পাওয়া গেলে গোসল করে নেওয়া উচিত। আর এটা অবশ্যই উত্তম।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, মিশকাত ৫৩০নং)*

জাবের ﷺ বলেন, একদা আমরা কোন সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় পাথরের আঘাত লেগে ক্ষত হয়েছিল। এরপর তার স্বপ্নদোষও হল। সে সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জন্য কি তায়াম্মুম বৈধ মনে কর?' সকলে বলল, 'তুমি পানি ব্যবহার করতে অক্ষম নও। অতএব তোমার জন্য আমরা তায়াম্মুম বৈধ মনে করি না।' তা শুনে লোকটি গোসল করল এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সে মারা গেল। অতঃপর আমরা যখন নবী ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম তখন তাঁকে সেই লোকটার ঘটনা খুলে বললাম। তা শুনে তিনি বললেন, "ওরা ওকে মেরে ফেলল, আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুক! যদি ওরা জানত না, তবে জেনে নেয়নি কেন? অজ্ঞতার ওষুধ তো জিজ্ঞাসাই।" *(সঃ আবূ দাউদ ৩২৫, ইবনে মাজাহ, দারাকুত্বনী, মিশকাত ৫৩১নং)*

আম্র বিন আস ﷺ বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধ–সফরে এক শীতের রাতে আমার

স্বপ্নদোষ হল। আমার ভয় হল যে, যদি গোসল করি, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করে সঙ্গীদেরকে নিয়ে (ইমাম হয়ে) ফজরের নামায পড়লাম। আমার সঙ্গীরা একথা নবী ﷺ-এর নিকটে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "হে আম্র! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের ইমামতি করেছ?" আমি গোসল না করার কারণ তাঁকে বললাম। আরো বললাম যে, আল্লাহ তাআলার এ বাণীও আমি শুনেছি, তিনি বলেছেন,

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (٢٩) سورة النساء

"তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় দয়াশীল।" *(নিসা ঃ ২৯)* এ কথা শুনে নবী ﷺ হাসলেন এবং কিছু বললেন না। *(আহমাদ ১৭৮১২, বুখারী, আবূ দাউদ ৩৩৪নং)*

যেখানে কষ্ট, সেখানে আমল হাল্কা হয়ে যায়। বাঁচার জন্য হারাম হালাল হয়ে যায়। জান বাঁচানোর জন্য কুফরীও বাহ্যতঃ ক্ষমার্হ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (١٠٦) سورة النحل

অর্থাৎ, কেউ বিশ্বাস করার পরে আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং অবিশ্বাসের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে অবিশ্বাসে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার চিত্ত বিশ্বাসে অবিচল। (নাহ্ল ঃ ১০৬)

শরীয়তে হত্যার বিধান আছে, তা কিন্তু জীবনের জন্য মরণ। ঐ মরণের মধ্যে মানুষের জীবন আছে।

মহান স্রষ্টা জিহাদের বিধান দিয়েছেন বাঁচার জন্য। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ} (٢٤) سورة الأنفال

"হে বিশ্বাসিগণ! রসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করে, যা তোমাদেরকে প্রাণবন্ত করে, তখন আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া দাও ।" *(আনফাল ঃ ২৪)*

ক্বিস্বাস্বের বিধান দিয়েছেন জীবনের জন্য। তিনি বলেছেন,

{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٧٩) سورة البقرة

"হে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমাদের জন্য ক্বিস্বাসে (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধানে) জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।" (বাক্বারাহ ঃ ১৭৯)

আর বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য হত্যার বিধান আছে মানুষের মান-সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য। তাও তাতে চারজন সাক্ষীর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। অনুরূপ সামান্য সন্দেহে দন্ডবিধান স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরল শরীয়তে।

এ হল দয়ার নবীর দয়াময় বিধান। সহজ-সরল শরীয়তের বিধান। অজ্ঞ ছাড়া কেউ সে শরীয়তকে কঠিন বলে না, কঠিন বানায় না।

তাঁর সংগ্রাম ও জিহাদ

মহানবী ﷺ ছিলেন বীর মুজাহিদ। তিনি জিহাদের সকল ময়দানে জিহাদ করেছেন।

প্রথমতঃ জিহাদুন নাফ্স্ বা মন ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ।

এ জিহাদের জন্য তিনি বলেছেন,

(أَفضَلُ الجِهَادِ أَن تُجَاهِدَ نَفسَكَ وَهَوَاكَ فِي ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল আল্লাহ আযযা অজাল্লাহর সত্তায় তোমার নাফ্স্ (মন) ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ। (সিঃ সহীহাহ ১৪৯৬নং)

এ জিহাদের চারটি পর্যায় ঃ-

১। আল্লাহর দ্বীন শিখতে নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

২। দ্বীনের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করতে মন ও নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

৩। দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

৪। দাওয়াতের পথে নানা কষ্টে ধৈর্যধারণ ক'রে নাফ্সের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

দ্বিতীয়তঃ শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ।

এর রয়েছে দুটি পর্যায় ঃ-

১। শয়তান মনে যে সন্দিহান সৃষ্টি করে, তা প্রতিহত করতে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

২। শয়তান মনে যে কুপ্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়লিপ্সা প্রক্ষেপ করে, তা প্রতিহত করতে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

তৃতীয়তঃ কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

এর রয়েছে চারটি পর্যায় ঃ-

১। হৃদয় দ্বারা জিহাদ করা।

২। জিভ দ্বারা জিহাদ করা।

৩। মালধন দ্বারা জিহাদ করা।

৪। শক্তি ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করা।

মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (٧٣) التوبة

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি কাফের ও মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা। *(তাওবাহ ঃ ৭৩, তাহরীম ঃ ৯)*

অবশ্য মুনাফিকদের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম তিন পর্যায়ের জিহাদ করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে তরবারির জিহাদ করেননি।

চতুর্থতঃ যালেম ও পাপাচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

এর তিনটি পর্যায় ঃ-

১। সামর্থ্য থাকলে শক্তি দ্বারা জিহাদ করা।

২। নচেৎ জিভ বা কথা দ্বারা জিহাদ করা।

৩। নচেৎ হৃদয় দ্বারা ঘৃণা ক'রে জিহাদ করা।

জিহাদের এই হল সর্বমোট ১৩টি পর্যায়। উক্ত সকল পর্যায়ের জিহাদ করেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। সুতরাং তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মুজাহিদ। তিনি পেয়েছিলেন শক্তি, পেয়েছিলেন জিহাদের আসল ময়দান। প্রত্যেক ময়দানে তিনি নিজ হৃদয়-মন, মুখ ও জিভ, হাত ও শক্তি এবং মাল ও ধন দ্বারা জিহাদ করেছেন। এই জন্য তিনিই ছিলেন সারা বিশ্বের

একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং আল্লাহর নিকট সব চাইতে বেশি বড় মর্যাদাসম্পন্ন। *(দ্রঃ যাদুল মাআদ ৩/৫, ১০, ১২)*

তাওহীদবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পতাকা উত্তোলিত হয়েছিল। তিনি নিজে ২৭টি অভিযানে সশরীরে সেনাপতি হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে ৯টি যুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। সেগুলি হল যথাক্রমে, বদর, উহুদ, মুরাইসী', খন্দক, কুরাইযাহ, খাইবার, মক্কা বিজয়, হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধ। আর যে সকল অভিযানে তিনি সশরীরে অংশগ্রহণ করেননি, তার সংখ্যা ছিল ৫৬টি। *(শারহুন নাওয়াবী ১২/৯৫, ফাতহুল বারী ৭/২৭৯-২৮১, ৮/১৫৩)*

মহানবী ﷺ-এর জিহাদে যে সব লোক হত্যা করা হয়েছিল, তারা সবাই ছিল সামরিক লোক। কিন্তু সব ছেড়ে যদি হিরোশিমার যুদ্ধের কথাই ধরি, তাহলে সে শহরের যে সব মানুষ হতাহত হয়েছে এবং বর্তমান কালের যুদ্ধে যেখানে মানুষ হতাহত হচ্ছে তাদের অধিকাংশই বেসামরিক লোক।

মহানবী ﷺ সর্বমোট যুদ্ধ করেছেন ৬৩টি, মতান্তরে ৮৩টি। আর তাতে বিরোধী পক্ষের লোক মরেছে ৭৫৯টি, নিজেদের লোক মরেছে ২৫৯টি। বন্দী করেছেন ৬৫৬৬টি। মুক্তি দিয়েছেন ৬৫৬৩টি। প্রাণদন্ড দিয়েছেন মাত্র ২টির।

মতান্তরে বিরোধী পক্ষের লোক মরেছে ৮৩৮টি, নিজেদের লোক মরেছে ৪২২টি।

পক্ষান্তরে কেবল ১টি যুদ্ধে হিরোশিমার উপর আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) মানুষ।

কিন্তু তিনি 'শান্তির দূত' হয়েও অস্ত্র ধারণ করলেন কেন?

যেহেতু শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেও অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। শান্তির দুশমনদেরকে ভক্তি দিয়ে জয় করতে না পারলে শক্তি প্রয়োগ করেও শান্তি আনয়ন করতে হয়।

মক্কায় নবীরূপে প্রকাশ পেতে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হল। কিন্তু তাঁর প্রতিপালক তাঁকে রক্ষা করলেন।

{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} (٣٠) سورة الأنفال

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা অথবা নির্বাসিত করার জন্য। তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আর ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ। (আনফাল ঃ ৩০)

তিনি হিজরত করতে বাধ্য হলেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি ঘর-বাড়ি ছেড়ে মদীনায় আগমন করলেন। সেখানে তিনি নিরাপদ ইসলামী জনপদ প্রতিষ্ঠা করলেন। সারা বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রাণকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠল মদীনা। ধীরে ধীরে তা ইসলামী রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করল। আশেপাশের জনপদ ও গোত্রের লোকেরা তার স্বীকৃতি দিতে লাগল।

তা কি আর সহ্য হয় ইসলাম-বিরোধী পৌত্তলিকদের? গোপনে গোপনে শত্রুতা বৃদ্ধি পেতে থাকল। মক্কা থেকে মুহাজেরীনদের সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করতে থাকল। কুরাইশরা মুসলিমদের ছেড়ে আসা ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নিজেদের কুক্ষিগত করতে লাগল।

অন্য দিকে মুসলিমদের প্রয়োজন ছিল অর্থের, অস্ত্রের এবং নিরাপত্তার। আত্মরক্ষা ও শত্রুনিধন করা ইসলামী দাওয়াতের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াল। নিজেরা অর্থশালী হওয়া

সত্ত্বেও অত্যাচারীদের হাতে তা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন সকলে। তার কিছু বিনিময় লাভের আশা ছিল সকলের। কিন্তু অত্যাচারীর হাত থেকে নিজেদের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার অনুমতি ছিল না। পরবর্তীতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান এল,

{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} (٣٩) سورة الحج

অর্থাৎ, যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তারা অত্যাচারিত। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সক্ষম। (হাজ্জ ঃ ৩৯)

পরন্তু যুদ্ধের এ বিধান কেবল শেষনবীর জন্যই ছিল না। পূর্বেও বহু নবীকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ}

অর্থাৎ, তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী-ইস্রাঈল প্রধানদের দেখনি? যখন তারা নিজেদের নবীকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত কর, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি।' সে বলল, 'বোধ হয় যদি তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা তা করবে না?' তারা বলল, 'আমরা যখন আপন ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব না কেন?' অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন তাদের স্বল্পসংখ্যক ব্যতীত অধিকাংশই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। আর আল্লাহ অপরাধিগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (বাক্বারাহ ঃ ২৪৬)

কিন্তু শেষমেষ যুদ্ধ হয়েছিল এবং তালূত বাদশার সেনাপতিত্বে দাঊদ ﷺ অত্যাচারী জালূতকে হত্যা করেছিলেন।

অহিংসা পরম ধর্ম। কিন্তু যে অহিংসাতে অধিকার হৃত হয়, সে অহিংসা ধর্ম থাকে কীভাবে? যে ত্যাগ স্বীকারে অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যায়, সে ত্যাগ স্বীকারে লাভ কী? যে অহিংসা মানুষকে বাঁচতে দেয় না, সে অহিংসা বজায় রেখে জীবনের অস্তিত্ব কোথায়?

সুতরাং বাঁচার জন্য যুদ্ধে প্রয়োজন ছিল। তাই একাধিক কারণে মহানবী ﷺ-কে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল।

১। মুসলিমদের ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা ও ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করে কুক্ষিগত করা হয়েছিল।

২। কাফেরদের তরফ থেকে উদীয়মান ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা অব্যাহত ছিল।

৩। চারিদিকে মুসলিমদের নিরাপত্তার অভাব ছিল।

অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিধান ছিল না, যারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা 'জিযিয়া' দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করতে সম্মত ছিল।

মানুষের পরিত্রাণের জন্য ইসলামের আলো এল। মানুষ তাকে ভুল বুঝল। মানুষের কুফরীর রোগ সারাবার জন্য ইসলামী চিকিৎসা এল, কিন্তু মানুষ ইসলামের ঔষধকে তিক্ত মনে করে সেবন করতে চাইল না। প্রয়োজন হল তারই বাঁচার জন্য অপারেশনের। ইসলামী জিহাদ মানবতার দেহে অস্ত্রোপচারের মতো। উদ্দেশ্য মানবতাকে উজ্জীবিত করা। আল্লাহর যমীনে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা। জিহাদের উদ্দেশ্য মানুষ ধ্বংস করা নয়।

আর খুন হয়ে 'শহীদ' হওয়াও নয়। জিহাদও মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানবতার জন্য এক প্রকার রহমত। তাই তিনি রহমতের নবীকেও অস্ত্র ধরার আদেশ দিয়েছিলেন।

না, জিহাদ আর সন্ত্রাস এক নয়। ইসলামী জিহাদের বিভিন্ন শর্ত আছে। ঈমানী ও অস্ত্রশক্তি প্রধান শর্ত। মুসলিম ইমাম থাকা আরও একটি শর্ত। তাছাড়া

১। জিহাদের নিয়ত কেবল 'আল্লাহর কালেমা উন্নত' করা হতে হবে। ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে বা গদি দখলের উদ্দেশ্যে বা কোন ব্যক্তি অথবা দলের প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ববশে করা জিহাদ, জিহাদ নয়।

২। জিহাদে কোন প্রকার খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা চলবে না।

৩। পরিবেশ তথা গাছপালা ও ফল-ফসল নষ্ট করা যাবে না।

৪। বেসামরিক লোক তথা বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশু হত্যা করা যাবে না।

৫। বিধর্মীদের উপাসনালয় তথা পাদরী-পুরোহিত হত্যা করা যাবে না।

এ ছিল মুহাম্মাদী জিহাদ। এ জিহাদের সাথে সন্ত্রাসের নিকটতম অথবা দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। আর সন্ত্রাসের কোন জাত-ধর্ম নেই। সব ধর্মের মানুষদের মাঝেই সন্ত্রাস আছে। যেমন সন্ত্রাসকে কোন ইলাহী ধর্ম সমর্থন করে না।

তাঁর দানশীলতা

মহানবী ﷺ দানবীর ছিলেন। তাঁর বদান্যতা ছিল নযীরবিহীন।

বদান্যতা একটি মহৎ গুণ। যা সাধারণতঃ অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমে হয়ে থাকে। তা ছাড়াও ১০টি জিনিস দান করার মাধ্যমে বদান্যতা হয়ে থাকে।

১। জান কুরবানী করে বদান্যতা। আর এ হল সবার চাইতে বড় বদান্যতা।

২। নেতৃত্ব দ্বারা বদান্যতা। নেতৃত্বের প্রতাপ ও প্রভাব দ্বারা মানুষের উপকার করা।

৩। নিজের আরাম কুরবানী করে বদান্যতা। নিজের আরামকে হারাম করে পরোপকার করা।

৪। নিজ ইল্‌ম ও শিক্ষা দ্বারা বদান্যতা। আর এ দান অর্থদান করা অপেক্ষা অনেক উচ্চ।

৫। নিজ পদাধিকার দ্বারা বদান্যতা। পদমর্যাদার মাধ্যমে সুপারিশ আদি করে মানুষের উপকার করা।

৬। কায়িক শ্রম দ্বারা বদান্যতা।

"দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা ক'রে দেওয়াটাও সাদকাহ, কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, ভাল কথা বলা সাদকাহ, নামাযের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও সাদকাহ।" *(বুখারী ২৯৮৯, মুসলিম ২৩৮২নং)*

৭। নিজ মান-সম্ভ্রম দ্বারা বদান্যতা। কেউ গালি দিলে অথবা গীবত বা চুগলী করলে তাকে মাফ করে দেওয়া।

৮। পরের কষ্টদানে ধৈর্য ধারণ করা, পরের মূর্খামি সহ্য করে নেওয়া ও রাগ সংবরণ করার মাধ্যমে বদান্যতা।

৯। সচ্চরিত্রতা, হাস-মুখ ও ভদ্র ব্যবহার দ্বারা বদান্যতা।

১০। লোকের হাতে যা আছে, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে লোভ, পরশ্রীকাতরতা ও হিংসা বর্জনের মাধ্যমে বদান্যতা।

উক্ত সকল প্রকার বদান্যতা ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে। তবে মালধন ব্যয় করার মাধ্যমে তাঁর দানশীলতা ছিল তুলনাবিহীন।

আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট ইসলামের উপর কিছু চাওয়া হলে তিনি না দিয়ে পারতেন না। একদা এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এলে তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী (উপত্যকা) পরিমাণ ছাগল-ভেড়া দান করলেন। অতঃপর সে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। যেহেতু মুহাম্মাদ এমন দান করেন যে, অভাবকে ভয় করেন না।' *(মুসলিম ৬১৬০নং)*

হুনাইন যুদ্ধে জয়লাভ হলে সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে তিনি প্রথমতঃ ১০০টি উট দান করলেন। তারপর আরো ১০০টি, তারপর আরো ১০০টি। সাফওয়ান বলেন, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আমাকে যা দান করার দান করলেন, তখন তিনি আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু যখন আমাকে দিতে থাকলেন, তখন তিনি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে গেলেন। *(মুসলিম ৬১৬২নং)*

দানবীর নবী ﷺ কোনক্রমেই বখীল ছিলেন না।

উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু মাল বন্টন করলেন। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! অন্য লোকেরা এদের চেয়ে এ মালের বেশি হকদার ছিল।' তিনি বললেন,

((إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسأَلُونِي بِالفُحْشِ، أَوْ يُبَخِّلُونِي، وَلَسْتُ بِبَاخِلٍ)).

"এরা আমাকে দু'টি কথার মধ্যে একটা না একটা গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। হয় তারা আমার নিকট অভদ্রতার সাথে চাইবে (আর আমাকে তা সহ্য ক'রে তাদেরকে দিতে হবে) অথবা তারা আমাকে কৃপণ আখ্যায়িত করবে। অথচ, আমি কৃপণ নই।" *(মুসলিম ২৪৭৫নং)*

জুবাইর ইবনে মুত্বইম ﷺ বলেন, তিনি হুনাইনের যুদ্ধ থেকে ফিরার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আসছিলেন। (পথিমধ্যে) কতিপয় বেদুঈন তাঁর নিকট অনুনয়-বিনয় ক'রে চাইতে আরম্ভ করল, এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে বাধ্য ক'রে একটি বাবলা গাছের কাছে নিয়ে গেল। যার ফলে তাঁর চাদর (গাছের কাঁটায়) আটকে গেল। নবী ﷺ থেমে গেলেন এবং বললেন,

((أَعْطُونِي رِدَائِي ، فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هذِهِ العِضَاهِ نَعَماً ، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لاَ تَجِدُونِي بَخِيلاً وَلاَ كَذَّاباً وَلاَ جَبَاناً)).

"তোমরা আমাকে আমার চাদরখানি দাও। যদি আমার নিকট এসব (অসংখ্য) কাঁটা গাছের সমান উঁট থাকত, তাহলে আমি তা তোমাদের মধ্যে বন্টন ক'রে দিতাম। অতঃপর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যুক বা কাপুরুষ পেতে না।" *(বুখারী ২৮২১, ৩১৪৮নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। আর মাহে রমযানে যখন জিব্রাঈল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরো বেশী বদান্যতা প্রদর্শন করতেন। জিব্রাঈল মাহে রমযানের প্রত্যেক রজনীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর কাছে কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিব্রাঈলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে অবশ্যই কল্যাণবাহী মুক্ত বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন।' *(বুখারী ৬, মুসলিম ৬১৪৯নং)*

তিনি এতই বদান্য ছিলেন যে, আগামীর জন্য কিছু জমা করে রাখতেন না। *(সঃ জামে'*

৪৮-৪৬নং)

তিনি বলেছেন,

(لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ).

"যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এতে আনন্দিত হতাম যে, ঋণ পরিশোধের জন্য পরিমাণ মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে খরচ ক'রে ফেলি।" *(বুখারী ২৩৮৯, মুসলিম ২৩৪৯নং)*

কোন সময় ভুলবশতঃ কিছু জমা থেকে গেলে মনে পড়া মাত্র তা দান করে দিতেন। আবূ সিরওয়াআহ উক্ববাহ ইবনে হারেস ﷺ বলেন যে, আমি নবী ﷺ-এর পিছনে মদীনায় আসরের নামায পড়লাম। অতঃপর সালাম ফিরে তিনি অতি শীঘ্র দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর লোকদের গর্দান টপকে তাঁর কোন এক স্ত্রীর কামরায় চলে গেলেন। লোকেরা তাঁর শীঘ্রতা দেখে ঘাবড়ে গেল। অতঃপর তিনি বের হয়ে এলেন; দেখলেন লোকেরা তাঁর শীঘ্রতার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। তিনি বললেন,

(ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ).

"(নামাযে) আমার মনে পড়ল যে, (বাড়ীতে সোনা অথবা চাঁদির) একটি টুকরা রয়ে গেছে। আমি চাইলাম না যে, তা আমাকে আল্লাহর স্মরণে বাধা দেবে। যার জন্য আমি (দ্রুত বাড়ীতে গিয়ে) তা বন্টন করার আদেশ দিলাম।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমি বাড়ীতে সাদকার একটি স্বর্ণখন্ড ছেড়ে এসেছিলাম। অতঃপর আমি তা রাতে নিজ গৃহে রাখা পছন্দ করলাম না।" *(বুখারী ১২২১নং)*

তিনি দানশীল ছিলেন। কেউ কিছু চাইলেই তিনি তা দান করতেন। *(সঃ জামে' ৪৮৬৮নং)*

কোন জিনিস কেউ তাঁর কাছে চাইলে তিনি 'না' বলতেন না। *(ঐ ৪৮৭১নং)*

দান করাতে চরম আনন্দ আছে, মনের পরম তৃপ্তি আছে। দান পেয়ে গ্রহীতা যতটা না খুশী হয়, তার চাইতে বেশি খুশী হয় দানশীল ব্যক্তি। যেহেতু আজকে যা দেওয়া হয়, কালকে তা বহুগুণ বর্ধিত আকারে পাওয়া যাবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا}

অর্থাৎ, ---তোমরা আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। আর তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে, তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর পাবে। আর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (মুয্যাম্মিল ঃ ২০)

তাঁর হিকমত

মানবিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে মহানবী ﷺ বড় হিকমতের সঙ্গে কাজ নিয়েছেন। সুতরাং তিনি সুকৌশলে মানুষ তৈরি করেছেন।

'হিলফুল ফুযূল' নামক একটি ন্যায়নীতির হলফনামা সম্পাদিত হয় মক্কায়। তিনি তাতে শরীক হয়েছিলেন। তাতে ছিল ঃ-

(ক) দেশের অশান্তি দূর করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(খ) বিদেশী লোকদিগের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

(গ) দরিদ্র, দুর্বল ও অসহায় লোকেদের সহায়তা দানে আমরা কখনই কুণ্ঠাবোধ করব না।

(ঘ) অত্যাচারী ও অনাচারীর অত্যাচার ও অনাচার থেকে দুর্বল দেশবাসীদের রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব। *(আর-রাহীকুল মাখতূম বাংলা ১১২পৃঃ)*

হাজারে আসওয়াদ স্বস্থানে স্থাপন করা নিয়ে কুরাইশদের মাঝে যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তা তিনি বড় হিকমতের সাথে তা বাধতে দেননি। জ্ঞান ও হিকমতে পরিপূর্ণ সেই ব্যক্তিত্ব সমাজের প্রতি কাজে তিনি অগ্রণী। তিনি যেন মনুষ্য-সমাজের হৃদয়ে-হৃদয়ে সুদৃঢ় বন্ধন চেয়েছিলেন। মানব মনে চির ঐক্য ও সংহতি চেয়েছিলেন।

মক্কায় তাঁকে রাজা করতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি রাজা হতে চাননি।

মদীনায় আগমন করলেন। তখন মদীনাবাসী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। আকীদা ও বিশ্বাসে একদল অন্য দলের সাথে একমত নয়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সবাই যেন ভিন্ন-ভিন্ন। দুনিয়ার ব্যাপারে যেমন পৃথক পৃথক, তেমনি দ্বীনের ব্যাপারেও তারা অভিন্ন নয়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ছিল। গোত্রে-গোত্রে বিদ্বেষ ছিল। বহু পুরাতন মতোবিরোধ ছিল। কিছু নূতন বিবাদ ছিল।

তারা সাধারণতঃ ৩ দলের মানুষ ছিল ঃ-

১। মুসলিম ঃ আনসার---আওস ও খাযরাজ এবং মুহাজেরীন।

২। মুশরিক ঃ আওস ও খাযরাজ।

৩। ইয়াহুদী ঃ বানূ নাযীর ও বানূ কুরাইযাহ---আওস গোত্রের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ এবং বানূ ক্বাইনুক্বা'---খাযরাজ গোত্রের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ।

আওস ও খাযরাজের মধ্যে পুরনো শত্রুতা তখনও বর্তমান ছিল। সর্বশেষ বুআয যুদ্ধের কথা সকলের মনে দাগ কেটেছিল।

মহানবী ﷺ মদীনায় এসে সেখানকার অধিবাসীদের মাঝে সম্প্রীতি, মিলন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করলেন। পুরনো শত্রুতা সকলের মন থেকে মুছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

মহান আল্লাহ মুসলিমদের সে মিলনের কথা কুরআনে বলেছেন,

{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } (١٠٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। *(আলে ইমরান ঃ ১০৩)*

মহানবী ﷺ নিজ হিকমত ও পারদর্শিতা অনুসারে মদীনায় ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কয়েকটি কর্ম করলেন ঃ-

১। একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করলেন। আর তার নির্মাণকার্যে সকল মুসলিমকে সোৎসাহে

অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। তাতে তিনি নিজেও শরীক হলেন।

সেখানে প্রত্যহ পাঁচবার মুসলিমদের জমায়েত হওয়ার ব্যবস্থা হল। পাঁচবার পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও উপদেশ দেওয়া-নেওয়ার সুব্যবস্থা কায়েম হল।

সপ্তাহান্তে একবার জুমআর দিন আম জনতার সাধারণ সমাবেশের ব্যবস্থা করা হল।

ইসলামের পূর্বে মদীনাবাসীর বিভিন্ন ক্লাব ও প্রতিষ্ঠান ছিল, যেখানে তারা জমায়েত হয়ে নানা কর্মকান্ড করত, কবিতা পাঠ করত, রাত্রি জাগরণ করত ইত্যাদি। আর তাতে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হত। কিন্তু মসজিদ নির্মাণের পর তাদের জমায়েতের একটি মাত্র কেন্দ্র হল। যা তাদের শিক্ষাকেন্দ্র, হিদায়াতের প্রাণকেন্দ্র।

তারই বদৌলতে সকল ক্লাব এক হয়ে গেল, মহল্লায়-মহল্লায় ঐক্য প্রতিষ্ঠা হল, গোত্রে-গোত্রে সম্প্রীতি কায়েম হল, বিচ্ছিন্নতা ঐক্যে পরিণত হল, বিভিন্ন দল ও জামাআত এক জামাআতে পরিবর্তিত হল, ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্ব এক নেতার অধীনে বশ্যতা স্বীকার করল। একজন মাত্র নেতা হলেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

তিনি মহান প্রতিপালকের প্রত্যাদেশে নেতৃত্ব দিতে থাকলেন। আদেশ ও নিষেধ করতে থাকলেন। মুসলিম উম্মাহকে শিক্ষা দিতে ব্যাপৃত হলেন। উম্মাহর আমীর ও গরীব, শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ, দাস ও প্রভু এক কাতারে দন্ডায়মান হলেন। সকল ভেদাভেদের প্রাচীর নিজেদের হাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন।

২। মদীনায় ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বী মানুষ বসবাস করত। মহানবী ﷺ তাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, দু-একজন ছাড়া তাদের অন্য কেউ ইসলামে আগ্রহ দেখাল না। তবে তাদের সঙ্গে সহাবস্থানের চুক্তি করে নিলেন।

৩। মুহাজেরীন ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। এমন ভ্রাতৃত্ব যেমন সহোদর ভাই। একজন ইন্তিকাল করলে অপরজন ওয়ারেস হবে। অবশ্য পরবর্তীতে এমন ভ্রাতৃত্বের মীরাস-রীতি রহিত হয়ে যায়। *(সূরা আনফাল ৭৫ আয়াত দ্রঃ)*

মুসলিম সমাজ ভাই-ভাই সুদৃঢ় বন্ধনে সুসংহত হয়ে উঠল। বলা বাহুল্য, সে ভ্রাতৃত্ব কেবল কোন মৌখিক অঙ্গীকার ছিল না। কাগজের উপর কলমের কালি ছিল না। বরং তা ছিল হৃদয়ে-হৃদয়ে মজবুত বন্ধন। সে ভ্রাতৃত্ব ছিল কথা ও কাজের, জান ও মালের, সুখ ও দুঃখের।

এমনকি আনসারী ভাই তাঁর মুহাজেরী ভাইকে বলেছিলেন, 'আমার মালধন দুইভাগে ভাগ করে অর্ধেক তোমার রইল। আর আমার দুই স্ত্রী, তোমার যেটা পছন্দ, আমি সেটাকে তালাক দিয়ে দেব। অতঃপর তার ইদ্দত অতিবাহিত হলে তুমি তাকে বিবাহ কর!' *(বুখারী ৩৭৮০নং)*

৪। আসমানী অহী দ্বারা সমাজের তরবিয়ত করতে শুরু করলেন। যে তরবিয়তের ফলে সমাজের মানুষ একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি, সমানুভূতি, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা বজায় রাখে। সুখে ও সম্প্রীতিতে সকলে গৌরবময় সমাজ ও সংসার গড়ে তুলতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ তাঁর কিছু বাণী প্রনিধানযোগ্য ঃ-

(ক) "তোমরা তিন দিনের বেশি যেন কুরবানীর গোশ্ত জমা না রাখো।"

আর তা ছিল কেবল গরীবদের মাঝে বেশি রূপে বিতরণ করার উদ্দেশ্যে। পরবর্তীতে মুসলিমদের অবস্থা ভাল হলে তিনি বললেন, "তোমরা (ইচ্ছামতো) খাও ও জমা রাখো।" *(আহমাদ ২৪২৪৯, আল-আদাবুল মুফরাদ ৫৬৩, নাসাঈ ৪৪৩১নং)*

(খ) "আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, 'আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরস্পরকে যারা ভালবেসেছিল তারা কোথায়? আজকের দিন আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব, যেদিন আমার (আরশের) ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া নেই।" *(মুসলিম)*

(গ) "সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; যতক্ষণ না তোমরা মু'মিন হবে। এবং তোমরা মু'মিন হতে পারবে না; যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরে ভালবাসা রাখবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যখন তোমরা তা করবে, তখন তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচার কর।" *(মুসলিম ২০৩নং)*

(ঘ) "হে লোক সকল! তোমরা সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ এবং লোকে যখন (রাতে) ঘুমিয়ে থাকে, তখন তোমরা নামায পড়। তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(তিরমিযী ২৪৮৫নং)*

(ঙ) বারা ইবনে আযেব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাতটি (কর্ম করতে) আদেশ করেছেন ঃ (১) রোগী দেখতে যাওয়া, (২) জানাযার অনুসরণ করা, (৩) হাঁচির (ছিঁকের) জবাব দেওয়া, (৪) দুর্বলকে সাহায্য করা, (৫) নির্যাতিত ব্যক্তির সাহায্য করা, (৬) সালাম প্রচার করা, এবং (৭) শপথকারীর শপথ পুরা করা।' *(বুখারী ২৪৪৫, মুসলিম ৫৫১০নং)*

(চ) "প্রকৃত মুসলিম সেই, যার মুখ ও হাত হতে মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির (দ্বীন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে স্বদেশ ত্যাগকারী) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কর্মসমূহ ত্যাগ করে।" *(বুখারী ৯নং)*

(ছ) "যে পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার দেখায়, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(মুসলিম ৪৮৮২নং)*

(জ) "তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ো না, পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ো না, পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ছেদন করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে তিনদিনের বেশি কথাবার্তা বলা ত্যাগ করে।" *(বুখারী ৬০৬৫, মুসলিম ৬৬৯০নং)*

(ঝ) "এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি অট্টালিকার মত; যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।" *(বুখারী ৪৮১, মুসলিম ৬৭৫০নং)*

(ঞ) "মু'মিনদের আপোসের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মত। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" *(বুখারী ৬০১১, মুসলিম ৬৭৫১নং)*

(ট) "তোমরা এক অপরের প্রতি হিংসা করো না, কেনা-বেচাতে জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে এক অপরকে ধোকা দিয়ো না, এক অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, এক অপর থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ ফিরায়ো না এবং এক অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার উপর কেনা-বেচা করো না। আর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। আল্লাহভীতি

এখানে রয়েছে। (তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা তিনবার বললেন।) কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং তার মর্যাদা অপর মুসলিমের উপর হারাম।" *(মুসলিম ৬৭০৬নং)*

(ঠ) "তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(বুখারী ১৩, মুসলিম ১৭৯-১৮০নং)*

(ড) "মুসলিমকে গালাগালি করা ফাসেকী কর্ম এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী কাজ।" *(বুখারী ৬০৪৪, মুসলিম ৬৪নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

লক্ষণীয় যে, ইসলামের পূর্বের যুগ ছিল অসভ্যতা, মূর্খতা, বর্বরতা ও অন্ধকারের যুগ। সে যুগের অসভ্যতা, মূর্খতা, বর্বরতা ও অন্ধকার দূর করার জন্য মহানবী ﷺ এমন ঈমানী আলোক-বর্তিকা উজ্জ্বল করলেন যে, সে সমাজ হয়ে উঠল সুসভ্যতা ও সুচরিত্রের বেনযীর দৃষ্টান্ত।

৫। শান্তিতে বাস করার লক্ষ্যে মহানবী ﷺ মুসলিম ও ইয়াহুদীদের মাঝে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করলেন। যাতে শান্তির সাথে মদীনায় সকলেই সহাবস্থান করতে পারে।

এর পরেও ইসলামের দুশমনরা কি ক্ষান্ত ছিল? কক্ষনই না। বাইরের দুশমন থেকে ভিতরের দুশমন বেশি যন্ত্রণাদায়ক ছিল। ঘরের ঢেঁকি কুমীর। এরা কিন্তু নামে-কামে মুসলমান ছিল, অথচ ভিতরে কপটচারী মুনাফিক। মহানবী ﷺ এদের সাথেও বড় হিকমত অবলম্বন করেছেন। তারা ইসলামের কত ক্ষতি চেয়েছে। আর তার ফলে তাঁর সাহাবাগণ তাদের বিনাশ চেয়েছেন। সমাজ থেকে এমন আগাছার নির্মূল চেয়েছেন। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার খাতিরে তিনি তাতে অনুমতি দেননি, যাতে লোকে না বলে যে, 'মুহাম্মাদ নিজ সহচরদেরকে হত্যা করছে।' *(বুখারী ৪৯০৫, ৪৯০৭, তিরমিযী ৩৩১৫নং)*

একজন নেতার মধ্যে যদি হিকমত, সুকৌশল, পারদর্শিতা ও দূরদর্শিতা না থাকে, তাহলে তিনি 'মহান নেতা' হবেন কীভাবে? আমার নবী ছিলেন সেই মহান নেতা।

স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

তাঁর সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা

মহানবী ﷺ-এর সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা ছিল দৃষ্টান্তের পরাকাষ্ঠা। মূর্খ, নির্বোধ ও অসভ্যদের বর্বর ব্যবহারে তিনি চরম সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াতের পথে তিনি কত কষ্ট বরণ করেছেন!

প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নেওয়ার নাম হল ক্ষমাশীলতা। তিনি তাঁর জীবনে সেই ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করেছেন।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কাউকে স্বহস্তে মারেননি, না কোন স্ত্রীকে না কোন দাস-দাসীকে। কারো দিক থেকে তিনি কোন কষ্ট পেলে কষ্টদাতার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেননি। হ্যাঁ, যদি আল্লাহর হারামকৃত কোন জিনিস লংঘন করা হত (অর্থাৎ কেউ চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি কাজ ক'রে ফেলত), তাহলে আল্লাহর জন্যই তিনি প্রতিশোধ নিতেন (শাস্তি দিতেন)।' *(মুসলিম ৬১৯৫নং)*

তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ ছিল,

{فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (١٣) سورة المائدة

"তুমি ওদেরকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন।" *(মায়িদাহঃ ১৩)*

১। তিনি প্রতিশোধ নিতে তায়েফবাসীদেরকে মারতে চাননি, তাঁর বদ্দুআ ছিল এ্যাটম-বোমার চাইতেও বেশি শক্তিশালী; কিন্তু তিনি তা প্রয়োগ করেননি। তাঁর দুই ডানা চাচা আবূ তালেব ও স্ত্রী খাদীজা (রাঃ) হারানোর পর যখন তাঁর উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল, তখন তিনি নিরাশার অন্ধকারে আশার আলোর সন্ধানে তায়েফ সফর করলেন। সেখানে পৌঁছে সাকীফ গোত্রের লোকদিগকে ইসলামের দিকে আহবান করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সেখানেও তিনি তাদের নিকট থেকে ঔদ্ধত্য, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কষ্ট ছাড়া অন্য কিছু পেলেন না। সেখানে তিনি (১০ অথবা) ৩০ দিন অবস্থান করলেন। পরিশেষে তারা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে আঘাত করল। এমনকি তাতে তাঁর পায়ের গোড়ালীদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে গেল। এক্ষণে তিনি মক্কায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফিরার পথে তিনি তায়েফ থেকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত এক আঙ্গুরের বাগানে আশ্রয় নেন এবং সেখানে দুই হাত তুলে এক প্রসিদ্ধ দুআ করেন।

তিনি বলেন, "আমি তায়েফ থেকে প্রস্থান করলাম। সে সময় আমি নিদারুন বেদনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। 'ক্বারনুয ষাআলিব' (বর্তমানে আস-সাইলুল কাবীর; যা রিয়ায ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেদের মীকাত)-এ এসে পরিপূর্ণ চৈতন্যপ্রাপ্ত হই। মাথা তুলে উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে আছে। লক্ষ্য করে দেখি তাতে জিবরীল ﷺ রয়েছেন। তিনি আমাকে আহবান জানিয়ে বললেন, 'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে, আল্লাহ তার সবকিছুই শুনেছেন ও দেখেছেন। এক্ষণে তিনি পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তাকে আপনার খিদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদের ব্যাপারে তাঁকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন।' অতঃপর পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তা আমাকে আহবান জানিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে নিশ্চয় আল্লাহ তা শুনেছেন। আর আমি পর্বতের ফিরিশ্তা। আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদের ব্যাপারে আমাকে যা ইচ্ছা তাই নির্দেশ দিন। যদি আপনি চান যে, আমি মক্কার দুই পাহাড়কে একত্রিত করে ওদেরকে পিষে ধ্বংস করে দিই, তাহলে তাই হবে।' কিন্তু আমি বললাম,

« بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ».

"না, বরং আমি এই আশা করি যে, আল্লাহ ঐ জাতির পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন; যারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। *(বুখারী ৩২৩১, মুসলিম ৪৭৫৪নং)*

২। তুফাইল বিন আম্র দাওসী ইসলামে দীক্ষিত হলেন। অতঃপর তিনি ফিরে গিয়ে নিজ গোত্রের লোককে ইসলামের দিকে আহবান করলেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে তাঁর আব্বা ও স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলেন। বাকী লোকেরা ঈমান আনতে অস্বীকার করল। তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! দাওস গোত্র অবাধ্য, তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের উপর বদ্দুআ করুন।' এ কথার পর লোকেরা ভাবল যে, তিনি এবার তাদের উপর বদ্দুআ করবেন। কিন্তু তিনি দুআ করে বললেন,

« اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ ».

"হে আল্লাহ! তুমি দাওস গোত্রকে হেদায়াত কর এবং তাদেরকে (আমার নিকট) আনয়ন কর।" *(বুখারী ২৯৩৭, ৪৩৯২, মুসলিম ৬৬১১নং)*

সুতরাং সহিষ্ণুতার সাথে সেই দুআর ফলে দাওস গোত্রের ৮০/৯০ ঘরের লোক মুসলমান হয়ে গেল।

৩। অত্যাচারের নিদারুন আঘাতের শিকার হয়ে তাঁর সাহাবীগণ তাঁকে আল্লাহর নিকট মুশরিকদের উপর বদ্দুআ (অভিশাপ) করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন,

« إِنِّى لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً ».

"আমি অভিশাপকারীরূপে প্রেরিত হইনি। আমি তো করুণারূপে প্রেরিত হয়েছি।" *(মুসলিম ৬৭৭৮নং)*

৪। উহুদ যুদ্ধে তাঁর চেহারা রক্তাক্ত করা হলে তিনি রক্ত মুছতে মুছতে দুআ করে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দাও। কারণ, তাদের জ্ঞান নেই।" *(বুখারী ৩৪৭৭, ৬৯২৯, মুসলিম ৪৭৪৭নং)*

৫। একদা মহানবী ﷺ ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে এক বাবলা গাছে নিজের তরবারি লটকে রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় এক কাফের বেদুঈন এসে সেই তরবারি নিয়ে (তাঁর উপর তুলে ধরে) বলল, 'এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?' মহানবী ﷺ বললেন, "আল্লাহ।" এ কথা শোনামাত্র তরবারি তাঁর হাত হতে পড়ে গেল। তিনি তা উঠিয়ে নিয়ে (তার উপর তুলে ধরে) বললেন, "এখন তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?" বেদুঈন বলল, 'কেউ না।' অথবা 'তুমি।'

দয়ার নবী ﷺ তাকে মাফ ক'রে দিলেন। ফলে সে মুসলমান হয়ে গেল। অন্য বর্ণনা মতে সে মুসলমান হয়নি; কিন্তু অঙ্গীকারবদ্ধ হল যে, সে তাঁর বিরুদ্ধে কোনক্রমেই আর যুদ্ধ করবে না। *(মিশকাত ৫৩০৫নং)*

৬। মক্কা-বিজয়ের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর তিনি ইচ্ছা করলে বহু পুরাতন ক্রোধ মিটাতে পারতেন এবং কাফের মক্কাবাসীকে এক ইশারায় ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ তাঁর তো ব্যক্তিগত কোন ক্রোধ ছিল না এবং তিনি তো ধ্বংসের জন্য প্রেরিত হননি। তাই তিনি ক্ষমা ঘোষণা ক'রে বলেছিলেন,

(مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِى سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ ومن ألقى السلاح فهو آمن).

অর্থাৎ, যে আবূ সুফিয়ানের ঘরে ঢুকবে, সে নিরাপদ। যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে নেবে, সে নিরাপদ। যে মসজিদে ঢুকবে, সে নিরাপদ। যে অস্ত্র বর্জন করবে, সে নিরাপদ। *(মুসলিম ৪৭২৪, আবূ দাউদ ৩০২৩নং)*

৭। মক্কা বিজয়ের দিন আলী ﷺ আবূ সুফিয়ানকে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সম্মুখে গিয়ে সেই কথা বল, যে কথা ইউসুফের ভাইগণ ইউসুফকে বলেছিলেন,

{تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ} (٩١) سورة يوسف

'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নিঃসন্দেহে আমরাই ছিলাম অপরাধী।' (ইউসুফ ঃ ৯১)

নিশ্চয় তিনি চাইবেন না যে, অন্য কেউ উত্তরে তাঁর চাইতে বেশি সুন্দর হোক।

সুতরাং আবূ সুফিয়ান সেই মতো করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

{لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (٩٢) سورة يوسف

'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। *(ইউসুফঃ ৯২) (ফিক্বহুস সীরাহ ৩৭৬পৃঃ, আর-রাহীকুল মাখতূম ৩৭৬পৃঃ)*

৮। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মাল বন্টনে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোককে (তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য) প্রাধান্য দিলেন (অর্থাৎ, অন্য লোকের তুলনায় তাদেরকে বেশী মাল দিলেন)। সুতরাং তিনি আক্বরা' বিন হাবেসকে একশত উট দিলেন এবং উয়াইনা বিন হিস্‌নকেও তারই মতো দিলেন। অনুরূপ আরবের আরো কিছু সম্ভ্রান্ত মানুষকেও সেদিন (মাল) বন্টনে প্রাধান্য দিলেন। (এ দেখে) একটি লোক বলল, 'আল্লাহর কসম! এই বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তোষ লাভের ইচ্ছা রাখা হয়নি!' আমি (ইবনে মাসউদ) বললাম, 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এই সংবাদ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে পৌঁছে দেব।' অতএব আমি তাঁর কাছে এসে সেই সংবাদ দিলাম, যা সে বলল। ফলে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে এমনকি লালবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন,

(فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ).

"যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইনসাফ না করেন, তাহলে আর কে ইনসাফ করবে? আল্লাহ মূসাকে রহম করুন, তাঁকে এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।"

অবশেষে আমি (মনে মনে) বললাম যে, 'আমি এর পরে কোন কথা তাঁর কাছে পৌঁছাব না।' *(বুখারী ৩১৫০, মুসলিম ২৪৯৪নং)*

৯। একদা জিইর্রানাতে মহানবী ﷺ গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি ন্যায়ভাবে বন্টন করুন। ঐ বন্টন ন্যায্য হচ্ছে না!' মহানবী ﷺ তার এ কথা শুনে বললেন,

(وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ).

"দূর হতভাগা! আমি ন্যায্য বন্টন না করলে আর কে করবে? ইনসাফ না করলে আমি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হব।" উমার ﷺ বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন। আমি ঐ মুনাফিকের গর্দানটি উড়িয়ে দিই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ওর কিছু সহচর আছে, যারা কুরআন পড়ে। কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী পার হয় না। তারা ইসলাম থেকে ঐভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়।" *(বুখারী ৩৬১০, মুসলিম ২৪৯৬নং)*

মহানবী ﷺ-এর তীব্র সমালোচনা করা হলে উমার ﷺ সমালোচককে হত্যা করতে চাইলেন। কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার খাতিরে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না, যাতে লোকে না বলে যে, মুহাম্মাদ নিজ সহচরদেরকে হত্যা করছে। সুতরাং তিনি এ ক্ষেত্রে মহা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেছেন।

১০। আবূ মূসা ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পাশে ছিলাম তখন তিনি মক্কা-মদীনার মাঝে জিইর্রানাতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল। ইতি মধ্যে এক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা কি পালন করবেন না?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "সুসংবাদ নাও।" বেদুঈন তাঁকে বলল, 'আপনি আমাকে সুসংবাদ বহুবার বলেছেন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত অবস্থায় আবূ মূসা ও বিলালের দিকে ফিরে বললেন,

« إِنَّ هَذَا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلاَ أَنْتُمَا ».

"এ তো সুসংবাদ রদ্দ করে দিল, তোমরা তা গ্রহণ কর।"

তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা তা গ্রহণ করলাম।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পাত্রে পানি আনতে বললেন। অতঃপর তিনি তাতে নিজ দুই হাত ও চেহারা ধুলেন এবং কুল্লি ক'রে (কুল্লির পানি) তাতে দিলেন। তারপর বললেন,

« اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا ».

"এ থেকে পান কর এবং তোমাদের চেহারা ও বুকে ঢেলে নাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর।"

তাঁরা পাত্রটি নিয়ে তাই করলেন, যা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে আদেশ করেছিলেন। পর্দার আড়াল থেকে উম্মে সালামাহ ডাক দিয়ে বললেন, 'তোমাদের পাত্রে যা আছে, তার কিছু তোমাদের আম্মার জন্য বাঁচিয়ে রাখ।' সুতরাং তাঁরা তাঁর জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখলেন। *(বুখারী ৪৩২৮, মুসলিম ৬৫৬১নং)*

এ বেদুঈনের অশালীন ব্যবহারেও তিনি রাগ হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য ধরলেন।

১১। মহানবী ﷺ এক ব্যক্তির নিকট ঋণী ছিলেন। তার নিকট থেকে একটি উটের বাচ্চা ধার নিয়েছিলেন। লোকটি ঋণ আদায় করতে এসে মহানবী ﷺ-কে কর্কশ ভাষায় কটু কথা শোনাতে শুরু করে দিল। তা দেখে সাহাবাগণ তাকে (ধমক দিয়ে) বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ বললেন, "হকদারের কথা বলার অধিকার আছে। তোমরা ওর ঋণ শোধ করে দাও। ওর জন্য একটি উট ক্রয় কর।"

সুতরাং তার জন্য উট কিনতে যাওয়া হল। অথবা তাঁর নিকট যখন সদকার উট এল তখন তিনি ঐ লোকটির উটের বাচ্চা পরিশোধ করতে সাহাবাকে আদেশ করলেন। বলা হল, 'উটগুলোর মধ্যে সবগুলোই বড় বড় উট রয়েছে, উটের কোন বাচ্চা ওদের মধ্যে নেই।' তখন নবী ﷺ বললেন,

« أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ».

অর্থাৎ, ঐ বড় উটটই দিয়ে দাও। কারণ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে (ঋণ) পরিশোধের ব্যাপারে উত্তম।" *(মুসলিম ৪১৯২-৪১৯৬নং, আহমাদ ৯৩৯০নং)*

১২। আর এক মরুবাসী (বেদুঈন) লোকের কাছে তিনি কিছু খেজুর ধার করেছিলেন। সে তাঁর নিকট নিজের পাওনা আদায় করতে এসে তাঁকে কটু কথা শুনাতে লাগল। এমনকি সে তাঁকে বলল, 'আপনি আমার ঋণ পরিশোধ না করলে, আমি আপনাকে মুশকিলে ফেলব!' এ কথা শুনে সাহাবাগণ তাকে ধমক দিলেন ও বললেন, 'আরে বেআদব! জানো তুমি কার সাথে কথা বলছ?' লোকটি বলল, 'আমি আমার হক আদায় চাচ্ছি।' মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা হকদারের সঙ্গ দিলে না কেন?" অতঃপর তিনি খাওলাহ বিন্তে কাইসের নিকট বলে পাঠালেন যে, "যদি তোমার কাছে খেজুর থাকে, তাহলে আমাকে ধার দাও। অতঃপর আমাদের খেজুর এলে তোমাকে পরিশোধ করে দেব।" খাওলাহ বললেন, 'অবশ্যই দেব। আমার আব্বা আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল!' অতঃপর তিনি খেজুর দিলে মহানবী ﷺ লোকটির ঋণ পরিশোধ করলেন এবং আরো কিছু বেশী খেতে দিলেন। লোকটি বলল, 'আপনি আমার হক পূরণ করলেন, আল্লাহ আপনার হক পূরণ করুক।' মহানবী ﷺ

বললেন, "ওরাই হল ভাল লোক, (যারা সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।) সে জাতি পবিত্র হবে না (বা না হোক), যে জাতির দুর্বল ব্যক্তি নিজ অধিকার অনায়াসে আদায় না করতে পেরেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২৬, বাযযার, ত্বাবারানী, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ২৪২১ নং)*

আল্লাহু আকবার! এমন সহিষ্ণু চরিত্র না হলে কী দাঈ হওয়া যায়? নযীরবিহীন ব্যবহারের ফলেই লোকেরা তাঁর প্রতি মুগ্ধ ছিল। তাঁর আকর্ষণীয় চরিত্র দেখেই উদার মনের কাফেররা মুসলমান হয়েছিল।

১৩। কিন্তু কপটচারী মুসলিম, সুবিধাবাদী মুনাফিকরা তাঁর চরিত্রে আকৃষ্ট ছিল না। তারা ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে ঘরের মানুষের ক্ষতি করেছে। ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়ে ঘরের ছেলে ধরে খেয়েছে। তাদের সাথে কী আচরণ করেছেন সহ্যশীল নবী ﷺ ?

যে মুনাফিকরা ইসলামকে পছন্দ করেনি, কিন্তু স্বার্থের তরে মুসলমান হওয়ার সঙ সেজেছিল, যারা ছদ্মবেশে গোপনে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল, দ্বীনের নবীকে কত শত কষ্ট দিয়েছিল, মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুদেরকে গোপন সহযোগিতা করেছিল, তাদের সাথে সেই মহানুভব নবীর আচরণ কী ছিল?

তাদের যেমন দুরভিসন্ধি ছিল, তাঁর তেমনি হিকমত, সুকৌশল ও দূরদর্শিতা ছিল। তাদের মনে সংকীর্ণতা ছিল, কিন্তু তাঁর মনে উদারতা ছিল। তাদের মনে হিংসা ছিল, কিন্তু তাঁর মনে ক্ষমাশীলতা ছিল।

উদাহরণ স্বরূপ মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কথা বলা যায়।

(ক) ইয়াহুদী গোত্রগুলোর সাথে মুসলিমদের শান্তির সাথে সহাবস্থানের চুক্তিনামা ছিল। বদর যুদ্ধের পর বানূ ক্বাইনুকা' সে চুক্তি ভঙ্গ করার একটি কান্ড করে বসল। তাদের একজন বাজারের মধ্যে এক মুসলিম মহিলার কাপড় খুলে দিল। অন্য একজন জনৈক মুসলিম ব্যক্তিকে খুন করল।

সুতরাং আল্লাহর রসূল ﷺ হিজরীর বিশতম মাসের শওয়ালের পনেরো তারীখে শনিবার সাহাবাগণকে নিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করলেন। পনেরো দিন নিজেদের দুর্গে অবরোধে থেকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের মনে মুসলিমদের প্রতি আতঙ্ক প্রক্ষিপ্ত হল। অবশেষে তারা মহানবী ﷺ-এর বিচার মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে দুর্গ থেকে অবতরণ করল। তিনি তাদেরকে বন্দী করলেন। তারা ছিল সাত শত জন যোদ্ধা।

আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের হৃদয় দয়ার্দ্র হল তাদের প্রতি। মহানবী ﷺ-এর কাছে লাগল সুপারিশ করতে। তিনি তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে মুক্ত করতে অস্বীকার করলে সে তাঁর লৌহবর্মের বুকের খোলা অংশে ধরে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। পরিশেষে তিনি তার সুপারিশ গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাদেরকে মদীনা ছেড়ে চলে যেতে বললেন। আর তিনি মুনাফিকের ঐ ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণকে ক্ষমা করে দিলেন। *(সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪২৮, আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ ৪/৪, রাহমাতুল লিল-আলামীন ১২/৯)*

(খ) উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলিম সেনাদের মাঝে মতভেদ হল, মদীনার ভিতরে থেকে শত্রুর মোকাবেলা করা যায়, নাকি বাইরে থেকে? মুনাফিক-সর্দারের মত ছিল প্রথম মতাবলম্বীদের অনুরূপ।

পরিশেষে মদীনার বাইরে থেকে শত্রুর মোকাবেলা করার মতটি প্রাধান্য পেল। সেই ওজরে

আব্দুল্লাহ বিন উবাই এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে উহুদের পথ থেকে মদীনা ফিরে এল। জাবের ﷺ-এর পিতা আব্দুল্লাহ বিন আম্র তাকে কত বুঝাল, কত তিরস্কার করল, কিন্তু সে মদীনা ছাড়তে রাযী হলো না। মহান আল্লাহ সেই মুনাফেকীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

{وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ} (١٦٧)

অর্থাৎ, তাদেরকে বলা হয়েছিল, এস, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরক্ষা কর। তারা বলেছিল, যদি আমরা যুদ্ধ জানতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা বিশ্বাস (ঈমান) অপেক্ষা অবিশ্বাসের (কুফরীর) অধিক নিকটতম ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তা তারা মুখে বলে। আর তারা যা গোপন রাখে, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত। (আলে ইমরান ঃ ১৬৭)

বলা বাহুল্য, আব্দুল্লাহ বিন উবাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল না, বহু লোককে অংশগ্রহণ করতে বাধা দিল। পরন্তু অপর দলটিকে গালাগালি করল।

মহানবী ﷺ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিলেন না। বড় সহিষ্ণুতার সাথে এত বড় অপরাধ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলেন। সহাবস্থানকারী মুসলিমদেরকে অসহায় অবস্থায় বর্জন করার মতো ঘৃণ্য আচরণের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ করলেন না। *(যাদুল মাআদ ৩/১৯৪, সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/৮, ৫৭, আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ ৪/৫১, রাহমাতুল লিল-আলামীন ১২/১০)*

(গ) আব্দুল্লাহ বিন উবাই মহানবী ﷺ-এর দাওয়াতী কাজেও বাধা দেওয়ার অপচেষ্টা চালিয়েছে। একদা তিনি সওয়ার হয়ে সা'দ বিন উবাদার নিকট যাচ্ছিলেন। পথে আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার চারিপাশে উপবিষ্ট তার গোত্রের লোকের সঙ্গে দেখা। তিনি সওয়ারী থেকে নেমে সালাম দিয়ে তাদের নিকট কিছুক্ষণ বসলেন। তাদেরকে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে শুনালেন, উপদেশ দিলেন, সতর্ক করলেন, ভীতি প্রদর্শন করলেন ও সুসংবাদ দিলেন। অতঃপর তিনি যখন নিজের বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলল, 'আরে ভাই! তোমার মতো এত সুন্দর কথা আমি বলতে পারি না। তবে তা যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি তোমার ঘরে গিয়ে বসো। অতঃপর যে তোমার কাছে আসে, তার কাছে তা বয়ান কর। আর যে তোমার কাছে আসে না, তাকে তা শুনিয়ে কষ্ট দিয়ো না। যে তা শুনতে অপছন্দ করে, তার মজলিসে এসো না। (সীরাতে ইবনে হিশাম ২/২১৮-২১৯)

মহানবী ﷺ আল্লাহর পথে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করলেন। তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিলেন না। যেহেতু তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল,

{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} (١٩٩) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। (আ'রাফ ঃ ১৯৯)

(ঘ) বানু নাযীর যখন মদীনা-চুক্তি ভঙ্গ করে, তখন মহানবী ﷺ তাদেরকে মদীনা থেকে বের হয়ে যেতে আদেশ করেন। তখনও আব্দুল্লাহ বিন উবাই তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলে, তাদেরকে আশ্বাস দেয়, তাদের সপক্ষে থেকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে। মহান আল্লাহ সে কথা কুরআনে বলেছেন,

{أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ

مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١١) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ} (١٢) الحشر

অর্থাৎ, তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি? তারা আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের সেই ভাইদেরকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব।' কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। বস্তুতঃ তারা বহিষ্কৃত হলে, (মুনাফিক্বরা) তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং তারা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না। (হাশ্‌র ঃ ১১-১২)

এ ক্ষেত্রেও মহানবী ﷺ তাকে মাফ করে দেন। আর বানূ নাযীরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেন। *(যাদুল মাআদ ৩/১২৭, সীরাতে ইবনে হিশাম ৩/১৯২, আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ ৪/৭৫, রাহমাতুল লিল-আলামীন ১২/১১)*

(ঙ) মুরাইসী' বা বানু মুস্তালিক যুদ্ধে তার কর্মকান্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে যুদ্ধে মহানবী ﷺ-এর সফর-সঙ্গিনী ছিলেন মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। ফিরার পথে প্রাকৃতিক কর্ম সারতে গিয়ে তিনি পিছনে থেকে গেলে তাঁর পবিত্র চরিত্রে কলঙ্ক লাগে। আর সে কালিমা লেপনের মূলে ছিল আব্দুল্লাহ বিন উবাই। তাতে মহানবী ﷺ অন্যান্যকে আশি চাবুক মেরে শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু তাকে রেহাই দিয়ে বিশাল সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

(চ) বানুল মুস্তালিক যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনো মুরাইসী' ঝর্ণার নিকট অবস্থান করছিলেন, এমন সময় কতকগুলো লোক পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে আগমন করে। আগমনকারীদের মধ্যে উমার ؓ-এর একজন শ্রমিক ছিল, যার নাম ছিল জাহজাহ গিফারী। ঝর্ণার নিকট আরো একজন ছিল, যার নাম ছিল সিনান বিন অবার জুহানী। কোন কারণে এই দু'জনের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হতে হতে শেষ পর্যায়ে ধস্তাধস্তি ও মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে জুহানী চিৎকার শুরু ক'রে দেয়, 'হে আনসার দল! (আমাকে সাহায্যের জন্য দ্রুত এগিয়ে এস।)' অপর পক্ষে জাহজাহ আহবান করতে থাকে, 'হে মুহাজির দল! (আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমরা শীঘ্র এগিয়ে এস।)'

রসূল ﷺ তা দেখে বললেন, "আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছি অথচ তোমরা অজ্ঞতার যুগের আচরণ করছ? তোমরা এসব পরিহার করে চল, এ সব হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত।"

আব্দুল্লাহ বিন উবাই উক্ত ঘটনা অবগত হয়ে ক্রোধে একদম ফেটে পড়ল এবং বলল, 'এর মধ্যেই এই রকম কার্যকলাপ শুরু করেছে? আমাদের অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা আমাদের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছে এবং আমাদের সমকক্ষ হতে চাচ্ছে? আল্লাহর কসম! আমাদের এবং তাদের উপর সেই উদাহরণ প্রযোজ্য হতে যাচ্ছে, যা পূর্বযুগের লোকেরা বলেছে, "নিজের কুকুরকে লালন-পালন ক'রে হৃষ্টপুষ্ট কর, যেন সে তোমাকে ফেড়ে খেতে পারে।" (অর্থাৎ, আমরা যেন দুধ দিয়ে কালসাপ পুষছি!) শোন, আল্লাহর কসম! যদি আমরা ফিরে যেতে পারি, তাহলে দেখবে যে, আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিগণই হীন ব্যক্তিদেরকে মদীনা থেকে অবশ্যই বহিষ্কার করবে।'

অতঃপর উপস্থিত লোকজনদেরকে লক্ষ্য ক'রে সে বলল, 'এই বিপদ তোমরা নিজেরাই ক্রয় করেছ। তোমরা তাদেরকে নিজ শহরে স্থান দিয়েছ এবং আপন আপন সম্পদ বন্টন করে দিয়েছ। দেখ! তোমাদের হাতে যা কিছু আছে তা দেওয়া যদি বন্ধ করে দাও, তাহলে সে তোমাদের শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।'

ঐ সময় উক্ত বৈঠকে যায়েদ বিন আরক্বাম নামক এক যুবক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি এসে তাঁর চাচাকে ঐ সমস্ত কথা বলে দিলেন। তাঁর চাচা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সবকিছু অবহিত করলেন। সে সময় সেখানে উমার ؓ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আব্বাদ বিন বিশ্‌রকে নির্দেশ দিন, সে ওকে হত্যা করুক।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "উমার! এ কাজ কী করে সম্ভব? লোকে বলবে যে, মুহাম্মাদ নিজের সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করছে। না, তা হতে পারে না। তবে তোমরা কুচ করার কথা ঘোষণা করে দাও।"

সময় ও অবস্থাটা তখন এমন ছিল, যে সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুচ করতেন না। সুতরাং লোকজনেরা কুচ করতে শুরু করল। এমন সময়ে উসাইদ বিন হুযাইর ؓ নবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে সালাম জানানোর পর আরজ করলেন, 'আজ এমন অসময়ে যাত্রা আরম্ভ করা হল (কী ব্যাপার)?'

নবী ﷺ বললেন, "তোমাদের সাথী (অর্থাৎ, ইবনে উবাই) যা বলেছে, তার সংবাদ কি তুমি পাওনি?" জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কী বলেছে?' নবী ﷺ বললেন, "তার ধারণা হচ্ছে এই যে, সে যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হীন ব্যক্তিবর্গকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দেবে।"

তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি চান, তাহলে আমরা তাকেই মদীনা থেকে বের করে দেব। আল্লাহর কসম! সেই হীন এবং আপনি পরম সম্মানিত।'

অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তার সঙ্গে সহনশীলতা ব্যবহার করুন। কারণ, আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি আপনাকে আমাদের মাঝে এমন এক সময়ে নিয়ে আসেন, যখন তার গোত্রীয় লোকেরা তাকে মুকুট পরানোর জন্য মণিমুক্তার মুকুট তৈরী করছিল। এ কারণে এখন সে মনে করছে যে, আপনি তার নিকট থেকে তার রাজত্ব কেড়ে নিয়েছেন।'

অতঃপর তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত পূর্ণ দিবস এবং সকাল পর্যন্ত পূর্ণ রাত্রি পথ চলতে থাকেন। এমনকি পরবর্তী দিনের পূর্বাহ্নে ঐ সময় পর্যন্ত ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন, যখন রৌদ্রের প্রখরতা বেশ কষ্টদায়ক অনুভূত হচ্ছিল। এরপর এক জায়গায় অবতরণপূর্বক শিবির স্থাপন করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সফরসঙ্গীগণ এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, ভূমিতে দেহ রাখতে না রাখতেই সকলে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েন। এই একটানা দীর্ঘ ভ্রমণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, লোকজনেরা যেন আরামে বসে গল্প-গুজব ও ঘটনার আলোচনা-সমালোচনা করার সুযোগ না পায়।

এদিকে আব্দুল্লাহ বিন উবাই যখন জানতে পারল যে, যায়েদ বিন আরক্বাম তার সমস্ত কথাবার্তা প্রকাশ করে দিয়েছে, তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হল এবং বলল যে, 'আল্লাহর শপথ! যায়েদ আপনাকে যে সকল কথা বলেছে, আমি তা কখনই বলিনি এবং এমন কি মুখেও আনিনি।'

ঐ সময় আনসার গোত্রের যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এখন ও নাবালক ছেলেই আছে এবং হয়তো ওর শুনতে ভুল হয়েছে। ইবনে উবাই যা বলেছিল, তা হয়তো ও ঠিক-ঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পারেনি।'

এ কারণে নবী ﷺ ইবনে উবাইয়ের কথা সত্য বলে মেনে নিলেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যায়েদ ؓ বলেন, এরপর এই ব্যাপারে আমি এতই দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম যে, ইতিপূর্বে আর কখনই কোন ব্যাপারে আমি এতটা দুঃখিত হইনি। সেই চিন্তাজনিত দুঃখে আমি বাড়িতেই বসে রইলাম। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা সূরা মুনাফিকূন অবতীর্ণ করলেন, যার মধ্যে উভয় প্রসঙ্গেই উল্লেখ রয়েছে ঃ-

"----তারাই বলে, আল্লাহর রসূলের কাছে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না; যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। বস্তুতঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভান্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা বুঝে না।) তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে। বস্তুতঃ যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রসূল ও মু'মিনদের। কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা জানে না।" *(১-৮ আয়াত)*

যায়েদ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং এই আয়াতগুলি পাঠ করে শোনালেন। অতঃপর বললেন, "আল্লাহ তাআলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন।" *(বুখারী, ইবনে হিশাম ২/২৯০-২৯২ পৃঃ)*

উল্লিখিত মুনাফিকের সন্তানের নামও ছিল আব্দুল্লাহ। সন্তান ছিলেন পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত, অত্যন্ত সৎ স্বভাবের মানুষ এবং উত্তম সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে মদীনার প্রবেশ-দ্বারে দন্ডায়মান হলেন। যখন তার পিতা সেখানে গিয়ে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি এখান থেকে আর এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবে না; যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি না দিবেন। কারণ, তিনিই পবিত্র ও সম্মানিত এবং তুমিই হীন ও নিকৃষ্ট।'

এরপর নবী করীম ﷺ যখন সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে মদীনা প্রবেশের অনুমতি দিলেন, তখন পুত্র পিতার পথ ছেড়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ঐ ছেলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই বলে আরজ করলেন, 'আপনি তাকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করলে আমাকে নির্দেশ প্রদান করুন। আল্লাহর কসম! আমি তার মস্তক কেটে এনে আপনার খিদমতে হাযির করে দেব। *(আর-রাহীকুল মাখতূম ২/ ১৩৮- ১৪১)*

কিন্তু নিতান্ত দূরদর্শী ও প্রজ্ঞার অধিকারী নবী তাঁকেও সে কাজে অনুমতি না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন।

যেহেতু বাহ্যিকভাবে তারা মুসলিম এবং তাদেরকে হত্যা করলে অমুসলিমরা নিজেদের সাথী-সঙ্গী হত্যা করা হচ্ছে মনে করবে, তাই তাদেরকে হত্যা না করাই ছিল যুক্তিযুক্ত।

(ছ) সেই মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই যখন মারা গেল, তখন মহানবী ﷺ-কে তার জানাযা পড়ার জন্য আহবান করা হল। তার ছেলে কাফনের জন্য তাঁর কামীস চাইলেন। দয়ার নবী ﷺ নিজ কামীস তাঁকে দান করলেন এবং তাঁর বাপের জানাযা পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। উমার বিন খাত্তাব ؓ তাঁর কাপড় ধরে বাধা দিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি ওর জানাযা পড়বেন, অথচ আল্লাহ আপনাকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন?!'

আল্লাহর রসূল ﷺ মুচকি হেসে বললেন, “আমাকে ছেড়ে দাও হে উমার!” কিন্তু উমার ؓ বাধা দিতেই থাকলে তিনি বললেন, “আমাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমি একটি এখতিয়ার গ্রহণ করেছি। আমাকে বলা হয়েছে, ‘তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান); যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না।’ সুতরাং আমি যদি জানতাম যে, সত্তর বারের অধিক ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা ক’রে দেবেন, তাহলে আমি সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।”

উমার ؓ বললেন, ‘সে একজন মুনাফিক।’

কিন্তু মহানুভব মহানবী ﷺ উমার ؓ-এর সে বাধা উপেক্ষা ক’রে সকরুণ হৃদয় নিয়ে তার জানাযা পড়লেন। সাহাবাগণও সেই জানাযায় অংশগ্রহণ করলেন। অতঃপর নবী ﷺ তার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাকে দাফন করার কাজ শেষ হলে তিনি ফিরে এলেন। অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশ নিয়ে আয়াত অবতীর্ণ হল,

{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ } (٨٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, ওদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বে না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবে না; তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা অবাধ্য অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। *(সূরা তাওবাহ ৮৪ আয়াত)*

এই নির্দেশের পর মহানবী ﷺ আজীবন আর কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াননি। *(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ)*

ঘরের শত্রুদের সাথে এমনভাবে চলা সহজ ব্যাপার নয়। তবুও দাওয়াতী স্বার্থে দাঈদেরকে সেই কৌশল নিয়ে পথ চলতে হয়। প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা নেওয়া যায় না।

১৪। আবূ হুরাইরাহ ؓ হতে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ ‘নাজ্দ’ অভিমুখে এক অশ্বারোহী দলকে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর তাঁরা বনূ হানীফা বংশের একজন লোককে ধরে আনলেন। যার নাম, ‘সুসামাহ বিন উসাল।’ য়্যামামা (বর্তমানে রিয়ায) শহরবাসীর তিনি ছিলেন একজন নেতা। তাঁকে মসজিদের স্তম্ভসমূহের মধ্যে একটি স্তম্ভে সাহাবীরা বেঁধে দিলেন। অতঃপর রসূল ﷺ তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপের জন্যে বের হলেন। তিনি বললেন, مَاذَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟

অর্থাৎ, হে সুমামাহ! আমাদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

উত্তরে তিনি বললেন,

عِنْدِى يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ.

অর্থাৎ, আমার কাছে আপনার সম্পর্কে ধারণা খুব উত্তম। যদি আমাকে আপনি হত্যা করেন, তবে আমি তার যোগ্য (অর্থাৎ, আমার মতো অপরাধীকে হত্যা করতে পারেন। অথবা আমাকে খুন করলে সে খুনের বদলা নেওয়া হবে।) আর যদি হত্যা না করে সৌজন্য প্রদর্শন করেন, তবে আপনি একজন কৃতজ্ঞের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করবেন। আর যদি

মাল-ধন চান, তাহলে আপনি যতটা চাইবেন, আপনাকে দেওয়া হবে। এই উত্তর শুনে তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। (আর কোন কথা বললেন না।)

আবার আগামী কাল নবী ﷺ এসে ঐ একই প্রশ্ন করলেন। সুমামাও উত্তরে তাই বললেন, যা তিনি প্রথম দিনে বলেছিলেন। এ দিন নবী ﷺ আর কিছু না বলে চলে গেলেন। তৃতীয় দিন আবার নবী ﷺ এসে প্রথম দু'দিনের মতো প্রশ্ন করলেন। সুমামাও উত্তরে প্রথম দু'দিনের উত্তর পুনরাবৃত্তি করলেন। আজকে মহানবী ﷺ সাহাবীদেরকে বললেন, সুমামার বাঁধনটা খুলে দাও।

সুতরাং বাঁধনমুক্ত হয়ে সুমামা মসজিদের নিকটবর্তী খেজুর বাগানে গেলেন এবং গোসল করলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে পাঠ করলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবূদ (পূজ্য) নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রসূল। অর্থাৎ, তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন।

তারপর মন্তব্য করলেন, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আপনার মুখমন্ডল আমার কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় ছিল, কিন্তু আজ আপনার মুখমন্ডল আমার নিকট সব থেকে প্রিয় মনে হচ্ছে। আল্লাহর কসম! আপনার দ্বীন আমার নিকটে সবচেয়ে অপ্রিয় ছিল, কিন্তু আজ আপনার দ্বীনই সব থেকে প্রিয় বলে মনে হচ্ছে। আল্লাহর কসম! আপনার শহর আমার নিকট সব থেকে বেশী অপ্রিয় ছিল, কিন্তু আজ আপনার শহর আমার নিকটে সব চেয়ে বেশী প্রিয় মনে হচ্ছে। আপনার অশ্বারোহী দল যখন আমাকে গ্রেফতার করে, তখন আমি উমরা উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। এক্ষণে এ ব্যাপারে আপনার রায় কী? নবী ﷺ তাঁকে শুভ সংবাদ দিলেন এবং তাঁকে উমরা করার অনুমতি প্রদান করলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন এবং যখন মক্কায় উপস্থিত হলেন, তখন একজন ব্যক্তি বলল, আপনি শেষ কালে বিধর্মী হয়ে গেছেন? উত্তরে বললেন, না, বরং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর শোনো! আল্লাহর কসম! আগামীতে আমার এলাকা থেকে গমের একটা দানাও তোমাদের এখানে আসবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে অনুমতি না পাওয়া যাবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৪৫ পৃঃ)*

১৫। আনাস ﷺ বলেন, (একদা) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পথ চলছিলাম। সে সময় তাঁর উপর মোটা পেড়ে একখানি নাজরানী চাদর ছিল। অতঃপর পথে এক বেদুঈনের সঙ্গে দেখা হল। সে তাঁর চাদর ধরে খুব জোরে টান দিল। আমি নবী ﷺ-এর কাঁধের এক পাশে দেখলাম যে, খুব জোরে টানার কারণে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। পুনরায় সে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহর যে মাল আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার আদেশ কর।' তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। অতঃপর তাকে (কিছু মাল) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। *(বুখারী ৩১৪৯, মুসলিম ২৪৭৬নং)*

সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা এক মহৎ গুণ। যে গুণ আল্লাহ ভালোবাসেন, তাঁর নবীও পছন্দ করেন। সে গুণে কী লাভ হয়, তার কথা মহান আল্লাহ নিজ নবীকে বলেছেন,

{ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ} (٩٦) سورة المؤمنون

"তুমি ভালো দ্বারা মন্দের মুকাবিলা কর। তারা যা বলে, আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ

অবহিত।" (মু'মিনূন ঃ ৯৬)

{وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} (٣٤) سورة فصلت

"ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৪)

{وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} (٤٠)

"মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। আর যে ক্ষমা ক'রে দেয় ও আপোস-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" *(শূরা ঃ ৪০)*

নিজের খাদেম ও দাস-দাসীদের প্রতি তিনি ক্ষমাশীলতা ও সহিষ্ণুতা প্রয়োগ করেছেন।

তাঁর খাদেম আনাস বলেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোন রেশমবস্ত্র কখনো স্পর্শ করিনি এবং ﷺ-এর দেহের সুগন্ধি অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কখনো আঘ্রাণ করিনি। আমি দশ বছর রসূল ﷺ-এর খিদমত করেছি, কিন্তু কখনো তিনি আমার উপর 'উঃ' বলেননি। যা আমি স্বেচ্ছায় করেছি তার উপর তিনি আমাকে বলেননি যে, 'তা কেন করলে?' আর যা করিনি তার জন্যও বলেননি যে, 'কেন করলে না?" *(বুখারী ৬০৩৮, মুসলিম ৬১৫১নং)*

আনাস ﷺ আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের মানুষ ছিলেন। একদা তিনি কোন প্রয়োজনে আমাকে পাঠালেন। আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি যাব না।' অথচ আমার মনে ছিল আল্লাহর নবী ﷺ যে কাজের আদেশ দিয়েছেন, তার জন্য আমি যাব। সুতরাং আমি বের হলাম। এক সময় কিছু শিশুদের পাশ দিয়ে পার হলাম। তারা বাজারে খেলা করছিল। (আমি সেখানে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলাম অথবা তাদের সাথে খেলতে লাগলাম।) ইতি মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পিছন দিক থেকে এসে আমার ঘাড়ে ধরলেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হাসছেন। তিনি বললেন,

« يَا أُنَيْسُ ! أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ ؟»

"হে উনাইস! আমি তোমাকে যেখানে যেতে আদেশ করেছিলাম, সেখানে গিয়েছিলে?"

আমি বললাম, 'এখন যাচ্ছি হে আল্লাহর রসূল!' *(মুসলিম ৬১৫৫নং)*

এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার চাকরকে কতবার ক্ষমা করব?' উত্তরে তিনি বললেন, "প্রত্যহ ৭০ বার।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ২২৮৯নং)*

তাঁর লজ্জাশীলতা

লজ্জাশীলতার প্রকৃতত্ব হল এমন সৎচরিত্রতা, যা অশ্লীলতা বর্জন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে এবং অধিকারীর অধিকার আদায়ে ত্রুটি প্রদর্শন করতে বিরত রাখে।

মহানবী ﷺ অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ অন্তঃপুরবাসিনী কুমারীর চেয়েও বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কোন জিনিস অপছন্দ করতেন আমরা তাঁর চেহারায় তা বুঝতে পারতাম।' *(বুখারী ৩৫৬২, মুসলিম ৬১৭৬নং)*

মহান আল্লাহর কাছে তিনি ছিলেন লজ্জাশীল। তিনি মানুষকেও লজ্জা করতেন। এমন লজ্জা, যা প্রকৃতিগতভাবে একজন পুরুষের পক্ষে বেশি।

লজ্জা নারীর ভূষণ। তবুও সেই নারীর লজ্জা অপেক্ষাকৃত কম, যার বিবাহ হয়েছে এবং স্বামী-সংসার করছে। আর সে নারীরও লজ্জা অপেক্ষাকৃত কম, যে বেপর্দা থাকে ও ঘরের বাইরে যাওয়ায় অভ্যস্ত। পক্ষান্তরে যে নারী অবিবাহিতা, কুমারী ও পর্দানশীন, সে নারীর লজ্জাশীলতা সবার চাইতে বেশি।

মহানবী ﷺ এমন পর্দানশীন কুমারী অপেক্ষা বেশি লজ্জাশীল ছিলেন।

তিনি যখন গোসল করতেন, তখন পর্দার ভিতরে লোকচক্ষুর অন্তরালে করতেন। তিনি বলতেন,

« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِىٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ ».

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আয্যা অজাল্ল লজ্জাশীল, মহা গোপনকারী। তিনি লজ্জশীলতা ও গোপনীয়তাকে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন গোসল করবে, তখন সে যেন গোপনীয়তা অবলম্বন (পর্দা) করে। *(আহমাদ ১৭৯৭০, আবূ দাঊদ ৪০১৪, নাসাঈ ৪০৬, সঃ জামে' ১৭৫৬নং)*

তিনি নিজ দৃষ্টি অবনত রাখতেন। কেউ কোন লজ্জাকর কর্ম করে ফেললে এমন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার সময় তার নাম ধরে বলতেন না। বরং সভায় আমভাবে বলতেন, যাতে সে লজ্জিত না হয়। অধিকাংশ সময়ে বলতেন, "লোকেদের কী হয়েছে যে, তারা এমন কাজ করে? লোকেদের কী হয়েছে যে, তারা এমন কথা বলে?" *(সঃ জামে' ৪৬৯২নং, উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্যঃ বুখারী ৪৫৬, ৭৫০, ৬১০১, মুসলিম ৩৪৬৯, ৬২৫৭নং)*

মহানবী ﷺ যয়নাবের ওলীমাতে সাহাবায়ে কিরামগণকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। খাওয়ার পরেও কিছু লোক সেখানেই বসে আপোসে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিল। যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ কষ্ট অনুভব হচ্ছিল। তিনি লজ্জা-সংকোচবশতঃ তাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য কিছুই বলতে পারছিলেন না। তাঁর লজ্জাশীলতার কথা উল্লেখ করে কুরআন অবতীর্ণ হল,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} (٥٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না ক'রে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করা হলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন-শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ এ নবীর জন্য কষ্টদায়ক; সে তোমাদেরকে উঠে যাবার জন্য বলতে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। (আহ্যাব ঃ ৫৩)

তাঁর লজ্জাশীলতার এমন সৌন্দর্য ছিল যে, তাঁর ব্যাপারে কবি ফারাযদাকের এই কবিতা-ছত্র যথাযোগ্য,

يغضي حياء ويغضي من مهابته ⁂ فلا يكلم إلا حين يبتسم

অর্থাৎ, লজ্জাশীলতার কারণে তিনি দৃষ্টি অবনত রাখেন। তাঁর ভয়ে (অন্যান্যরা) দৃষ্টি অবনত রাখে। সুতরাং যখন মুচকি হাসেন তখন ছাড়া তাঁর সাথে কথা বলা যায় না।

তিনি লজ্জাশীলতার উত্তম আদর্শ, তাঁর আচরণও এবং তাঁর বাণীও। তিনি বলেছেন,

"অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে।" *(সহীহ তিরমিযী ১৬০৭ নং, ইবনে মাজাহ)*

"প্রথম নবুঅতের বাণীসমূহের যা লোকেরা পেয়েছে তার মধ্যে একটি বাণী এই যে, তোমার লজ্জা না থাকলে যা মন তাই কর।" *(আহমাদ, বুখারী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ২২৩০নং)*

"প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হল লজ্জাশীলতা।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ২ ১৪৯নং)*

"লজ্জার সবটুকুই মঙ্গলময়।" "লজ্জা কেবল মঙ্গলই আনয়ন করে।" *(বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জামে ৩১৯৬, ৩২০২নং)*

"ঈমান সত্তরাধিক অথবা ষাঠাধিক শাখাবিশিষ্ট। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাখা (কান্ড) হল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলা এবং সবচেয়ে ছোট শাখা হল পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীভূত করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখাবিশেষ।" *(বুখারী ৯ নং মুসলিম ৩৫ নং)*

"অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।" *(হাকেম, মিশকাত ৫০৯৪, সহীহুল জামে ১৬০৩নং)*

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﵄ বলেন, একদা এক আনসারী তাঁর ভাইকে লজ্জা ত্যাগ করার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন; তা দেখে মহানবী ﷺ বললেন, "ওকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। কারণ, লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ।" *(বুখারী, মুসলিম)*

অবশ্য লজ্জাকর বিষয়ে দ্বীনের বিধান জানার ব্যাপারে লজ্জাশীলতা প্রশংসনীয় নয়। মহানবী ﷺ সে বিষয়ে প্রয়োজনে স্পষ্ট কথা বলতেন, নচেৎ ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতেন।

স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

তাঁর দয়ার্দ্রতা

মহান আল্লাহ পরম দয়াবান। তাঁর ১০০টি দয়ার মাত্র একটি পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন বলেই সকল জীব পরস্পরকে দয়া করে থাকে। সেই একটি দয়ারই শাখা দয়ালু নবী ﷺ-এর দয়া। রহমান ও রহীম তাঁকে বিশ্বজাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } (١٠٧) سورة الأنبياء

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি।" *(আম্বিয়াঃ ১০৭)*

বিশ্বের মানুষ তাঁর করুণায় করুণাসিক্ত। তাঁর দয়ার মাধ্যমে উপকৃত।

যাঁরা তাঁর অনুসারী, তাঁরা তো ইহ-পরকালে তাঁর দয়াপ্রাপ্ত হয়ে সম্মানিত হয়।

তাঁর রক্তপিয়াসী শত্রুরাও তাঁর দয়া দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে যাকে হত্যা করা হয়েছে, তারা অতিরিক্ত পাপাচার তথা পারলৌকিক শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে। যেহেতু তারা বেঁচে থাকলে তাদের পাপ বৃদ্ধি হতো এবং সেই অনুসারে শাস্তিও।

তাঁর ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী শান্তিপ্রিয় কাফেররা তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও দয়ার্দ্রতা দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

মুনাফিকরাও তাঁর দয়াশীলতার কারণে ইহকালে হত্যা থেকে রক্ষা পেয়েছে।

আর তাঁর রাষ্ট্রায়ত্তের বাইরে বসবাসকারী কাফেররাও তাঁর রহমতের ছায়া পেয়ে মহান স্রষ্টার আম আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছে।

পূর্ববর্তী নবীদের ব্যাপারে এমন বিধান ছিল যে, তাঁদের উম্মত কুফরী ও অবাধ্যতা করলে তাদেরকে ব্যাপক ও গণ-আযাবে ধ্বংস করে দেওয়া হত। কিন্তু রহমতের নবীর আগমনের পর সেই আম আযাব বন্ধ হয়ে গেছে। আর এ হল বর্তমানের কাফেরদের প্রতি রহমতের নবীর রহমতের একটি প্রভাব। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (٣٣) الأنفال

অর্থাৎ, আল্লাহ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তিনি এরূপ নন যে, তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। *(আনফাল ঃ ৩৩)*

সা'দ ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বনী মুআবিয়ার মসজিদে প্রবেশ ক'রে দু' রাকআত নামায পড়লেন। আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট সুদীর্ঘ দুআ করলেন। অতঃপর ঘুরে বসে বললেন,

«سَأَلْتُ رَبِّى ثَلاَثًا فَأَعْطَانِى ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّى أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا».

"আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তিনটি জিনিস প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দু'টি জিনিস দান করলেন এবং একটি জিনিস দিলেন না। আমি প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ-কবলিত ক'রে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে বন্যা-কবলিত ক'রে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব না রাখেন, তিনি আমাকে তা দিলেন না।" *(মুসলিম ৭৪৪২, মিশকাত ৫৭৫১নং)*

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়া বা উপঢৌকন ছিল রহমতের নবীর আগমন। মু'মিনগণ তা সাদরে গ্রহণ ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর কাফেররা অনীহা প্রকাশ ক'রে তা প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু গ্রহণকারীদের বদৌলতেই প্রত্যাখ্যানকারীরা ব্যাপক আযাবের পাকড়াও থেকে রেহাই পেয়েছে।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রহমত লিপিবদ্ধ হবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অবিশ্বাস করেছে, তাকে সেই শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে, যে শাস্তি পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ভূমি-ধস ও প্রস্তর-বর্ষণ আকারে এসেছিল।' *(তফসীর ত্বাবারী ১৮/৫৫২)*

মূসা ﷺ তাঁর মনোনীত সত্তর জন লোক-সহ যখন বলেছিলেন,

{وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ}

'----আর আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারণ কর, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি।'

তখন মহান আল্লাহ বলেছিলেন,

{عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} (١٥٦) سورة الأعراف

'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা সাবধান হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে।' *(আ'রাফঃ ১৫৬)*

সর্বশেষ নবী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তিনি ছিলেন বিশ্বনবী, তিনি ছিলেন সারা বিশ্বের জন্য করুণা। বিশ্বাসীদের জন্য তো বটেই, অবিশ্বাসীদের জন্যও করুণা। তাঁকে বলা হল, '(মুশরিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে এত অত্যাচার চালাচ্ছে) আপনি মুশরিকদের উপর বদ্দুআ করুন।' তিনি বললেন,

«إني لم أُبعث لَعَّاناً وإنما بُعِثْتُ رحمةً».

অর্থাৎ, আমি অভিশাপকারীরূপে প্রেরিত হইনি, আমি রহমতরূপে প্রেরিত হয়েছি। *(মুসলিম, ২৫৯৯নং)*

তিনি মহান আল্লাহর কাছে দুআ ক'রে বলেছেন,

(اللَّهُمَّ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي سَبَبْتُهُ سَبَّةً أَوْ لَعَنْتُهُ لَعْنَةً فِي غَضَبِي ، فَإِنَّمَا أَنَا مِنْ وَلَدِ آدَمَ ، أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ ، وَإِنَّمَا بَعَثْتَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ، فَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ صَلَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

হে আল্লাহ! আমার উম্মতের যে ব্যক্তিকে রাগান্বিত হয়ে আমি কোন গালি দিয়েছি অথবা অভিশাপ করেছি, তুমি কিয়ামতে তার জন্য রহমত বা দুআর রূপ দান করো। কারণ আমি একজন আদম-সন্তান, আমি রাগান্বিত হই, যেমন তারা রাগান্বিত হয়। আর তুমি তো আমাকে বিশ্বজাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছ। *(আহমাদ ২৩৭৫৭, আল-আদাবুল মুফরাদ, বুখারী ২৩৪, আবূ দাউদ ৪৬৫৯নং)*

তিনি বলেছেন,

(إنَّما أنا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ).

অর্থাৎ, আমি তো (মানুষের জন্য) উপহাররূপ রহমত। *(হাকেম, বাইহাক্বী ৬১, ইবনে আবী শাইবাহ, সিঃ সহীহাহ ৪৯০নং)*

মহানবী ﷺ-এর একটি উপনাম 'নাবিয়্যুর রাহমাহ'। এর অর্থ রহমতের নবী বা দয়ার নবী। তিনি বলেছেন,

(أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ).

অর্থাৎ, আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ, মুক্বাফফা, হাশের, নাবিয়্যুর রাহমাহ, নাবিয়্যুত তাওবাহ ও নাবিয়্যুল মালহামাহ। (আহমাদ ১৯৫২৫নং)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِى ».

"আমার ও তোমাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো, যে আগুন প্রজ্বলিত করল। অতঃপর

তাতে উচ্চুঙ্গ ও পতঙ্গ পড়তে আরম্ভ করল, আর সে ব্যক্তি তা হতে তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাচ্ছি, আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে (জাহান্নামের আগুনে) পতিত হচ্ছ।” *(বুখারী ৬৪৮৩, মুসলিম ৬০৯৮নং)*

তিনি নিখিল বিশ্বের জন্য করুণার উপঢৌকন। করুণা তাঁর ব্যক্তিত্বে, করুণা তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষাতে, করুণা তাঁর দ্বীনে ও বিধানে।

তাঁর সেই করুণা কোন বিশেষ গোষ্ঠির জন্য নয়, কোন জাতি-বিশেষের জন্য নয়, কোন বর্ণ-বিশেষের জন্য নয়, কেবল আরব বা আজমের জন্য নয়, কেবল প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের জন্য নয় এবং কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের জন্য নয়। বরং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য। এমনকি পশু-পক্ষীর জন্যও তিনি রহমত।

“তিনি দয়ালু ছিলেন। তাঁর কাছে এসে কেউ কিছু চাইলে তিনি তা তাকে দান করতেন, তা না থাকলে তাকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেন।” *(সঃ জামে’ ৪৮১৫নং)*

তিনি দয়ালু ছিলেন বলেই শত্রুকেও ক্ষমা করেছেন। যাদের জন্য তিনি গৃহহারা ও মাতৃভূমি-ছাড়া হতে বাধ্য হয়েছিলেন, যারা তাঁর বিরুদ্ধে কত যুদ্ধ করল এবং তাঁর কত সাথী হত্যা করল, তাদেরকে আয়ত্তে পেয়েও মক্কা-বিজয়ের দিন ক্ষমা ক’রে দিয়েছিলেন।

জিহাদের ময়দানে গিয়েও শত্রুর সাথে তিনি দয়া প্রদর্শন করেছেন। সে দয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তাদের সাথে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করার মাঝে, তাদেরকে সত্য পথের দিকে আহবান করার মাঝে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করতে আগ্রহ প্রকাশের মাঝে। তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের প্রতি প্রতিপালকের নির্দেশ ছিল,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, তবে বাড়াবাড়ি (সীমালংঘন) করো না, নিশ্চয় আল্লাহ বাড়াবাড়িকারীদেরকে পছন্দ করেন না। *(বাক্বারাহ ঃ ১৯০)*

উক্ত সীমালংঘনের শামিল ছিল, জিহাদে কোন প্রকার খিয়ানত করা যাবে না। শিশু, নারী, বৃদ্ধ, পাদরী-পুরোহিত, রোগী, অন্ধ প্রভৃতি বেসামরিক লোককে হত্যা করা যাবে না।

অপ্রয়োজনে শত্রুপক্ষের পশুহত্যা করা যাবে না, গাছপালা বা ফল-ফসল নষ্ট করা যাবে না। পানি বা তার উৎস্য ধ্বংস করা যাবে না, ঘর-বাড়ি ধ্বংস করা যাবে না ইত্যাদি।

মহান করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল, খুন-খারাবি করার পূর্বে দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাদের ইহ-পরকালে মুক্তির জন্য ইসলামের দিকে আহবান জানাও।

ইসলাম গ্রহণ না করলে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করার জন্য জিযিয়া প্রদান করার আদেশ দাও। যেমন মুসলিমদের নিকট থেকে তাদের অর্থ ও ফল-ফসল থেকে যাকাত নেওয়া হয়, তেমনি অমুসলিমদের নিকট থেকে রাষ্ট্রের উন্নয়নের স্বার্থে তা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু জিযিয়া দিতেও অস্বীকার করলে আল্লাহর নাম নিয়ে জিহাদ শুরু কর।

তবে শোনো,

« إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ».

"অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ (জরুরী) করেছেন। সুতরাং যখন (জিহাদ বা হদ্দে) হত্যা কর, তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে হত্যা কর এবং যখন যবেহ কর, তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে যবেহ কর। তোমাদের উচিত, ছুরিকে ধারালো করা এবং বধ্য পশুকে আরাম দেওয়া।" *(মুসলিম ১৯৫৫নং)*

মহানবী ﷺ-এর দয়ার্দ্র হৃদয়ের দয়ার বিকাশ স্বরূপ তিনি শত্রুর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা বা খিয়ানত করতেন না। তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ ছিল,

{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ } (٥٨) الأنفال

অর্থাৎ, যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা কর, তাহলে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথভাবে বাতিল কর। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদেরকে পছন্দ করেন না। *(আনফাল ঃ ৫৮)*

শত্রুপক্ষ খিয়ানত করলে তখন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মুসলিমরা বাধ্য। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে খিয়ানতের আশঙ্কা না থাকলে চুক্তি ভঙ্গ করা বৈধ নয়।

দয়ার নবী ﷺ শত্রুপক্ষের ধ্বংস চাননি, বরং তাঁদের হিদায়াত চেয়েছেন। মানুষ গড়ার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, মানুষ ধ্বংস করার জন্য নয়।

তিনি তায়েফ থেকে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ফিরে এলেন। তিনি বলেন, 'ক্বারনুষ যাআলিব'-এ মাথা তুলে উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে আছে। লক্ষ্য করে দেখি তাতে জিবরীল ﷺ রয়েছেন। তিনি আমাকে আহবান জানিয়ে বললেন, 'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে আল্লাহ তার সবকিছুই শুনেছেন ও দেখেছেন। এক্ষণে তিনি পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তাকে আপনার খিদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদের ব্যাপারে তাঁকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন।' অতঃপর পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তা আমাকে আহবান জানিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে নিশ্চয় আল্লাহ তা শুনেছেন। আর আমি পর্বতের ফিরিশ্তা। আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদের ব্যাপারে আমাকে যা ইচ্ছা তাই নির্দেশ দিন। যদি আপনি চান যে, আমি মক্কার দুই পাহাড়কে একত্রিত ক'রে ওদেরকে পিষে ধ্বংস করে দিই, তাহলে তাই হবে।' কিন্তু আমি বললাম,

« بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ».

"না, বরং আমি এই আশা করি যে, আল্লাহ ঐ জাতির পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন; যারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না।" *(বুখারী ৩২৩১, মুসলিম ৪৭৫৪নং)*

যথাসম্ভব তিনি চেষ্টা করতেন, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায়। দয়ার্দ্র মনেই আন্তরিকতার সাথে তিনি বলতেন,

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله تُفْلِحُوا).

অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বল, সফল হবে। *(ত্বাবারানীর কাবীর ৮০৫-৮০৬নং)*

আনাস ﷺ বলেন, একজন ইহুদী কিশোর নবী ﷺ-এর খিদমত করত। সে পীড়িত হলে

মহানবী ﷺ তাকে দেখা করতে এলেন এবং তার শিথানে বসে বললেন, "ইসলাম গ্রহণ কর (তুমি মুসলিম হয়ে যাও)।" তাঁর এই কথা শুনে সে তার পিতার দিকে (তার মত জানতে) দৃষ্টিপাত করল। তার পিতা তার নিকটেই বসে ছিল। সে বলল, 'আবুল কাসেম ﷺ-এর কথা তুমি মেনে নাও। ফলে কিশোরটি মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর নবী ﷺ এই বলতে বলতে বের হয়ে গেলেন, "সেই আল্লাহর সকল প্রশংসা, যিনি ওকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।" তারপর কিশোরটি মারা গেলে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা তোমাদের এক সাথীর উপর (জানাযার) নামায পড়।" *(বুখারী ১৩৫৬নং)*

বিশেষ ক'রে মু'মিনদের জন্য তিনি ছিলেন বিশেষ রহমত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٦١) سورة التوبة

"তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত ক'রে থাকে।' তুমি বলে দাও, 'সে কর্ণপাত তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং মু'মিনদের (কথাকে) বিশ্বাস করে। আর সে তোমাদের মধ্যে ঈমানদার লোকদের জন্য করুণাস্বরূপ। যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।" (তাওবাহ ঃ ৬১)

{لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ}

"অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রসূল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ।" (তাওবাহ ঃ ১২৮)

{مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ} (٢٩) سورة الفتح

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল; আর তার সহচরগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।" (ফাত্হ ঃ ২৯)

দয়ার নবী ﷺ মুসলিমদের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, সর্বদা তাদের মঙ্গল কামনা করতেন, তাদের কষ্টে তিনি কষ্ট পেতেন, তাদের আনন্দে আনন্দিত হতেন, তাদের ব্যাপারে তাদের পিতামাতা অপেক্ষা অধিক দয়ার্দ্র ছিলেন। এই জন্য তারাও তাঁকে নিজেদের পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি এবং নিজেদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালোবাসতেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (٦) سورة الأحزاب

"নবী, মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা-স্বরূপ।" (আহ্যাব ঃ ৬)

তাঁর করুণার বহিঃপ্রকাশে তিনি ছিলেন বিনম্র হৃদয়, অতিশয় বিনয়ী। তিনি মুসলিমদের জন্য সদা-সর্বদা কল্যাণ কামনা করতেন, তাদের জন্য দুআ করতেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আল্লাহর রহমতে তিনি রহমতের সে সকল কাজ করতে সফল হয়েছিলেন, যাতে মানুষ আল্লাহর পথে আকৃষ্ট হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। (আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

দয়াল নবী ﷺ দুআ ক'রে বলতেন,

« اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ ».

"হে আল্লাহ! যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলো। আর যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদের সাথে নম্রতা করবে, তুমি তার সাথে নম্রতা করো।" *(মুসলিম ৪৮-২৬নং)*

তিনি উম্মতীর প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে বলতেন,

«أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ».

"মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চাইতে আমিই অধিক হকদার (দায়িত্বশীল।) সুতরাং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে, তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর এবং যে সম্পদ রেখে মারা যাবে, তার অধিকারী হবে তার ওয়ারেসীনরা।" *(মুসলিম ১৬১৯নং)*

একদা দয়ার নবী ﷺ মানুষকে উপদেশ দিতে খাড়া হয়ে বললেন, "হে লোক সকল! তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট উলঙ্গ পা, উলঙ্গ দেহ ও খতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। (আল্লাহ বলেন,)

{كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } (١٠٤) سورة الأنبياء

'যেমন আমি প্রথম সৃষ্টি করেছি আমি পুনর্বার তাকে সেই অবস্থায় ফিরাবো। এটা আমার প্রতিজ্ঞা, যা আমি পুরা করব।' *(সূরা আম্বিয়া ১০৪ আয়াত)*

জেনে রাখো! কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ইব্রাহীম ﷺ-কে বস্ত্র পরিধান করানো হবে। আরো শুনে রাখো! সে দিন আমার উম্মতের কিছু লোককে নিয়ে আসা হবে অতঃপর তাদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর আমি বলব, 'হে প্রভু! এরা তো আমার সঙ্গী।' কিন্তু আমাকে বলা হবে, 'এরা আপনার (মৃত্যুর) পর (দ্বীনে) কী কী নতুন নতুন রীতি আবিষ্কার করেছিল, তা আপনি জানেন না।' (এ কথা শুনে) আমি বলব--যেমন নেক বান্দা (ঈসা ﷷ) বলেছিলেন,

{وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (١١٧) إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (١١٨)

"যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাদের ক্রিয়াকলাপের পর্যবেক্ষক। আর তুমি সর্ববস্তুর উপর সাক্ষী। তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' *(সূরা মায়েদা ১১৭-১১৮ আয়াত)*

অতঃপর আমাকে বলা হবে যে, 'নিঃসন্দেহে আপনার ছেড়ে আসার পর এরা (ইসলাম থেকে) পিছনে ফিরে গিয়েছিল।' *(বুখারী ৩৩৪৯, মুসলিম ৭৩৮০নং)*

উম্মতের প্রতি করুণাসিক্ত হয়ে দয়ার নবী ﷺ একদা পুরো রাত্রি এই আয়াত পড়তে থাকলেন,

{إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (١١٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(সূরা মায়েদা ১১৭ আয়াত)*

আমাদের দয়ার নবী ﷺ এমন কান্না উম্মতের জন্য কেঁদেছেন। একদা তিনি ইব্রাহীম ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহর এ বাণী পাঠ করলেন,

{رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

"হে আমার প্রতিপালক! এ সব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" *(ইব্রাহীম ঃ ৩৬)*

এবং ঈসা ﷺ-এর উক্তি (এ আয়াতটি পাঠ করলেন),

{إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (١١٨) سورة المائدة

"যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর, তবে তারা তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি অবশ্যই প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" *(মায়েদাহ ঃ ১১৮)*

অতঃপর তিনি তাঁর হাত দু'খানি উঠিয়ে বললেন,

« اللَّهُمَّ أُمَّتِى أُمَّتِى ».

"হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত।" অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বললেন, 'হে জিব্রীল! তুমি মুহাম্মাদের নিকট যাও---আর তোমার রব বেশী জানেন---তারপর তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা কর?' সুতরাং জিব্রীল তাঁর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সে কথা জানালেন, যা তিনি (তাঁর উম্মত সম্পর্কে) বলেছিলেন---আর আল্লাহ তা অধিক জানেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বললেন, 'হে জিব্রীল! তুমি (পুনরায়) মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বল, আমি তোমার উম্মতের ব্যাপারে তোমাকে সন্তুষ্ট ক'রে দেব এবং অসন্তুষ্ট করব না।' *(মুসলিম ৫২০নং)*

একদিন সূর্যে গ্রহণ লাগলে মহানবী ﷺ নামায পড়তে খাড়া হলেন। তাতে তিনি সুদীর্ঘ ক্বিরাআত ক'রে প্রত্যেক রাকআতে লম্বা লম্বা দু'টি ক'রে রুকূ করলেন। এই নামাযে তিনি উম্মতের উপর আযাবের ভয়ে কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন,

« رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِى أَنْ لاَ تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ أَلَمْ تَعِدْنِى أَنْ لاَ تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ».

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি আমাকে ওয়াদা দাওনি যে, আমি ওদের মাঝে থাকা অবস্থায় তুমি ওদেরকে আযাব দেবে না? তুমি কি আমাকে ওয়াদা দাওনি যে, ওদের ক্ষমাপ্রার্থনা করতে থাকা অবস্থায় তুমি ওদেরকে আযাব দেবে না? এই তো আমরা তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।" *(সহীহ আবূ দাউদ ১০৭৯নং)*

দয়ার নবী অপরের প্রতি দয়াশীল ছিলেন, তিনি অপরকেও দয়াশীলতার প্রতি অনুপ্রাণিত

করতেন। মানুষকে দয়াবান হতে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন,

"যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।" *(বুখারী ৬০১৩, মুসলিম ৬১৭০নং)*

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করবে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করবেন না।" *(বুখারী ৭৩৭৬, মুসলিম ৬১৭২নং)*

"দয়ার্দ্র মানুষদেরকে পরম দয়াময় (আল্লাহ) দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, যিনি আকাশে আছেন।" *(তিরমিযী, সহীহ আবু দাউদ ৪১৩২ নং)*

"দুর্ভাগা ছাড়া অন্য কারো (হৃদয়) থেকে দয়া, ছিনিয়ে নেওয়া হয় না।" *(আহমাদ, ২/৩০১, আবূ দাউদ ৪৯৪২, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৭৪৬৭নং)*

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার মাঝে রয়েছে মানুষের দয়ার্দ্রতার বিকাশ। দয়ার নবী আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলতেন,

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় আমল হল, আল্লাহর প্রতি ঈমান। অতঃপর আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা। অতঃপর সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা। আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত আমল হল, তাঁর সাথে শির্ক করা। অতঃপর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।" *(সহীহুল জামে ১৬৬নং)*

"যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার রুযী প্রশস্ত হোক এবং আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি হোক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।" *(বুখারী ৫৯৮৬, মুসলিম ৬৬৮৮নং)*

দয়ার নবী ﷺ সফরে সঙ্গীদের সাথে চলাকালে তাদের পিছনে চলতেন। তাতে তিনি পিছনে পড়া দুর্বল সফর-সঙ্গীকে সাহায্য করে কাফেলার সঙ্গে রাখতেন, কাউকে তিনি নিজের সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নিতেন এবং তাদের জন্য দুআ করতেন। *(সঃ জামে' ৪৯০১নং)*

দয়ার নবী ﷺ শিশুদের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াবান ছিলেন। *(ঐ ৪৭৯৭, ৪৮১৪নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি নামায পড়তে দাঁড়াই এবং আমার ইচ্ছা হয় তা দীর্ঘ করি। অতঃপর আমি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি। ফলে আমি তার মায়ের কষ্ট হওয়াটা অপছন্দ মনে ক'রে নামায সংক্ষিপ্ত করি।" *(বুখারী ৭০৭নং)*

তিনি বলেন, "সে ব্যক্তি আমার উম্মত নয়, যে আমাদের বড়কে শ্রদ্ধা করে না, ছোটকে স্নেহ করে না এবং আলেম (জ্ঞানীর) মর্যাদা রক্ষা করে না।" *(সহীহ তারগীব ৯৩ নং)*

শিশুদের মধ্যে তিনি কন্যার প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের গুরুত্ব বেশি বর্ণনা করেছেন।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমার নিকট একটি মহিলা তার দুটি কন্যাকে সঙ্গে করে ভিক্ষা করতে (গৃহে) প্রবেশ করল। কিন্তু সে আমার নিকট খেজুর ছাড়া আর কিছু পেল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলে সে সেটিকে দুই খন্ডে ভাগ করে তার দু'টি মেয়েকে খেতে দিল। আর নিজে তা হতে কিছুও খেল না! অতঃপর সে উঠে বের হয়ে গেল। তারপর নবী ﷺ আমাদের নিকট এলে আমি ঐ কথা তাঁকে জানালাম। ঘটনা শুনে তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি এই একাধিক কন্যা নিয়ে সঙ্কটাপন্ন হবে, অতঃপর সে তাদের প্রতি যথার্থ সদ্ব্যবহার করবে, সেই ব্যক্তির জন্য ঐ কন্যারা জাহান্নাম থেকে অন্তরাল (পর্দা) স্বরূপ হবে।" *(বুখারী ১৪১৮, মুসলিম ২৬২৯নং)*

দয়ার নবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ)).

"যে ব্যক্তি দু'টি কন্যার লালন-পালন তাদের সাবালিকা হওয়া অবধি করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু'টি আঙ্গুলের মত পাশাপাশি আসব।" অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলি মিলিত ক'রে (দেখালেন)। *(মুসলিম)*

প্রকৃতিগতভাবে নারী বড় দুর্বল। তাই তার প্রতিও দয়ার নবীর দয়াময় বাণী হল,

((اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ : اليَتِيم وَالمَرْأةِ)).

"হে আল্লাহ! আমি লোকদেরকে দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের অধিকার সম্বন্ধে পাপাচারিতার ভীতিপ্রদর্শন করছি; এতীম ও নারী।" *(নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ৩৬৭৮-নং)*

তিনি বলেছেন, "তোমরা নারীদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হও। কারণ, নারী জাতি বঙ্কিম পঞ্জরাস্থি হতে সৃষ্ট। (সুতরাং তাদের প্রকৃতিই বঙ্কিম ও টেরা।) অতএব তুমি সোজা করতে গেলে হয়তো তা ভেঙ্গেই ফেলবে (তালাক দেবে)। আর নিজের অবস্থায় উপেক্ষা করলে তা বাঁকা থেকেই যাবে। অতএব তাদের জন্য মঙ্গলকামী হও।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩২৩৮-নং)*

"শোন! তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে মঙ্গলকামী হও। তারা তো তোমাদের নিকট বন্দিনী মাত্র। এ ছাড়া তোমরা তাদের অন্য কিছুর মালিক নও।" *(তিরমিযী ১১৬৩নং)*

দয়ার নবী ﷺ অনাথ-এতীমদের জন্য বড় দয়ালু ছিলেন। তিনি বলেছেন, "তুমি কি চাও, তোমার হৃদয় নরম হোক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হোক? এতীমের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তার মাথায় (সস্নেহে) হাত বুলাও, তাকে তোমার নিজের খাবার খাওয়াও, তাহলে তোমার হৃদয় নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৮০নং)*

দয়ার নবী ﷺ আরো বলেন "আমি এবং নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে (পাশাপাশি) থাকব। আর বিধবা ও দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহুল জামে' ১৪৭৬নং)*

বিধবা নারী ও মিসকীনদেরও দেখাশোনা করতেন। তাদের মরুভূমিসম অন্তরাকাশেও তাঁর দয়ার্দ্র হৃদয় দয়াবারি বর্ষণ করত।

দয়ালু নবী ﷺ বলেন, "বিধবা ও দুঃস্থ মানুষকে দেখাশুনাকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য।" এক বর্ণনাকারী বলেন, আর আমার মনে হচ্ছে যে, তিনি এ কথাও বললেন, "বিরামহীন নামাযী ও বিরতিহীন রোযাদারেরও সমতুল্য।" *(বুখারী ৬০০৭নং মুসলিম ২৯৮২নং)*

আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ বেশি বেশি যিক্র করতেন, অসার ক্রিয়াকলাপ করতেন না, নামায লম্বা করতেন, খুতবা সংক্ষেপ করতেন এবং বিধবা ও মিসকীনদের সাথে গিয়ে তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে উন্নাসিকতা প্রদর্শন করতেন না।' *(নাসাঈ ১৪১৫নং)*

বিধবা যুবতী হলে তার সবচেয়ে বড় সম্পদ হল তার যৌবন। সে জন্য তার অতিরিক্ত নিরাপত্তার দরকার থাকে। মহানবী ﷺ তার সকল নিরাপত্তা ও অভাব পূরণের ব্যবস্থা করতেন। এই জন্য তাঁর চাচা আবূ তালেব কবিতায় তাঁর প্রশংসায় বলেছিলেন,

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ** ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

অর্থাৎ, তিনি গৌরবর্ণ, তাঁর চেহারা দ্বারা বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। তিনি অনাথদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। *(আহমাদ ৫৬৭৩, বুখারী ১০০৮- ১০০৯, ইবনে মাজাহ ১২৭২নং)*

বিধবার কষ্টে দয়ার্দ্র হয়েই তাঁর শরীয়ত বিধবা-বিবাহকে বৈধ করেছে।

তিনি মিসকীনকে কিছু না কিছু দান করতে উৎসাহিত করেছেন।

উম্মে বুজাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! অনেক সময় মিসকীন আমার দরজায় দাঁড়ায়, কিন্তু আমি তাকে দেওয়ার মতো কোন জিনিস পাই না।' মহানবী ﷺ বললেন, "যদি একটি পোড়া খুর ছাড়া দেওয়ার মত আর কিছু না পাও, তাহলে তার হাতে তাই দিয়েই বিদায় দাও।" *(আবূ দাউদ ১৬৬৭নং, তিরমিযী)*

বাইরে থেকে বহু সাহাবী তাঁর নিকট ইল্‌ম শিখতে আসতেন। ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে নিশ্চয় তাঁদের কষ্ট হতো। তা অনুভব ক'রেও তিনি তাঁদের প্রতি সহানুভূতি ও দয়ার্দ্রতা প্রকাশ করতেন।

মালেক বিন হুওয়াইরিস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা প্রায় সমবয়স্ক কতিপয় নব যুবক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বিশ দিন অবস্থান করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহপরবশ ছিলেন। তাই তিনি ধারণা করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছি। সেহেতু তিনি আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন যে, আমরা আমাদের পরিবারে কাকে ছেড়ে এসেছি? সুতরাং আমরা তাঁকে জানালাম। আর তিনি ছিলেন বিনম্র দয়াশীল। তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝেই বসবাস কর। তাদেরকে শিক্ষা দান কর এবং তাদেরকে (ভাল কাজের) আদেশ দাও। অমুক নামায অমুক সময়ে পড়। অমুক নামায অমুক সময়ে পড়। সুতরাং যখন নামাযের সময় হবে, তখন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।" *(বুখারী ৬০৮, ৭২৪৬, মুসলিম ১৫৬৭নং)*

তিনি দ্বীন শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সকলকে অসিয়ত করেছেন। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْنُوهُمْ).

অর্থাৎ, অদূরে বহু লোক তোমাদের নিকট ইল্‌ম অনুসন্ধান করতে আসবে। সুতরাং যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে, তখন বলো, 'মারহাবা মারহাবা! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসিয়ত।' আর তাদেরকে শিক্ষা দাও। *(ইবনে মাজাহ ২৪৭, সঃ জামে' ৩৬৫১নং)*

দয়ার নবী ﷺ বন্দীদের প্রতিও দয়ার্দ্র ছিলেন। তিনি বন্দী মুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ ক'রে বলেছেন,

(أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ).

"তোমরা ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, রোগী দেখতে যাও এবং বন্দীকে মুক্ত কর।" *(বুখারী ৫৩৭৩নং)*

দয়ালু নবী ﷺ রোগীর ব্যাপারে বড় দয়ার্দ্রতার সাথে যত্ন নিয়েছেন।

"কোন মুসলিম যখন তার অন্য কোন মুসলিম ভাইয়ের রোগ জিজ্ঞাসা করতে যায়, সে না ফিরা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে সর্বদা অবস্থান করে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! খুরফাহ কী?' তিনি বললেন, "জান্নাতের ফল-পাড়া।" *(মুসলিম ৬৭১৯নং)*

"যে কোন মুসলিম অন্য কোন (অসুস্থ) মুসলিমকে সকাল বেলায় কুশল জিজ্ঞাসা করতে যাবে, তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা কল্যাণ কামনা করবেন। আর যদি সে সন্ধ্যা বেলায় তাকে কুশল জিজ্ঞাসা করতে যায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশ্তা

তার মঙ্গল কামনা করে। আর তার জন্য জান্নাতের মধ্যে পাড়া ফল নির্ধারিত হয়।" *(তিরমিযী ৯৬৯নং)*

"এক মুসলমানের অধিকার অপর মুসলমানের উপর পাঁচটি ঃ সালামের জবাব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযার সঙ্গে যাওয়া, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচলে তার জবাব দেওয়া।" *(বুখারী ১২৪০, মুসলিম ৫৭৭৭নং)*

দয়ার নবী ﷺ শুধু মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র-চিত্ত ছিলেন না, বরং পশু-পক্ষীর প্রতিও তাঁর দয়ার দরিয়া উপচীয়মান ছিল। দয়াবান নবী ﷺ পশু-পক্ষীর কষ্টতেও কষ্ট পেতেন।

একদা রহমতের নবী ﷺ একটি উটকে দেখলেন, (ক্ষুধায়) তার পিঠের সাথে পেট লেগে গেছে। তা দেখে তিনি বললেন, "তোমরা এই অবলা জন্তুদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। সুতরাং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা অবস্থায়) তাতে সওয়ার হও এবং উত্তমভাবে (সুস্থ থাকা অবস্থায়) তা খাও (বা তার পিঠ থেকে নেমে যাও)।" *(আবূ দাঊদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ২২৭৩নং)*

এক ব্যক্তি তার উটকে ঠিকমত খেতে দিত না, উপরন্তু কষ্ট দিত। তার পাশ দিয়ে রহমতের নবী ﷺ-কে পার হতে দেখে উটটি আওয়াজ দিল এবং তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। তিনি উটের মালিককে ডেকে বললেন, "তুমি এই জন্তুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না কেন, আল্লাহ তোমাকে যার মালিক বানিয়েছেন? ও তো আমার কাছে অভিযোগ করছে যে, তুমি ওকে ক্ষুধায় রাখ এবং (বেশি কাজ নিয়ে) ক্লান্ত ক'রে ফেলো!" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০নং)*

অবোলা ও অবলা পাখীর প্রতিও দয়া প্রদর্শন ছিল দয়ার নবীর দয়াশীল আচরণ।

ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পেসাব-পায়খানা করতে চলে গেলেন। অতঃপর আমরা একটি লাল রঙের (হুম্মারাহ) পাখী দেখলাম। পাখীটির সাথে তার দুটো বাচ্চা ছিল। আমরা তার বাচ্চাগুলোকে ধরে নিলাম। পাখীটি এসে (আমাদের) আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। এমতাবস্থায় নবী ﷺ ফিরে এলেন এবং বললেন, "এই পাখীটিকে ওর বাচ্চাদের জন্য কে কষ্টে ফেলেছে? ওকে ওর বাচ্চা ফিরিয়ে দাও।" *(আবূ দাঊদ ২৬৭৫নং)*

তিনি পশুর প্রতি দয়াস্নিগ্ধ আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ ক'রে বলেছেন, "এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন,

«نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».

"প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।" *(বুখারী ২৪৬৬, মুসলিম ২২৪৪নং)*

আর এক বর্ণনায় আছে, "কোন এক সময় একটি কুকুর একটি কূপের চারিপাশে ঘোরা-ফিরা করছিল। পিপাসা তাকে মৃতপ্রায় ক'রে তুলেছিল। (এই অবস্থায়) হঠাৎ বনী

ঈস্রাঈলের বেশ্যাদের মধ্যে এক বেশ্যা তাকে দেখতে পেল। অতঃপর সে তার চামড়ার মোজা খুলে তা (ওড়নায় বেঁধে কূপ থেকে) পানি উঠিয়ে তাকে পান করাল। সুতরাং এই আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করা হল।” *(বুখারী ৩৩২১নং)*

দয়ার নবী ﷺ পানির পাত্রকে বিড়ালের জন্য কাত ক'রে দিতেন। বিড়াল পানি পান করত। অতঃপর তিনি সেই পানিতেই উযূ করতেন। *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৭৯৪৯, বাইহাক্বী ১২০৭, সঃ জামে' ৪৯৫৮নং)*

পশুকে কষ্ট দিলে শাস্তি পেতে হবে। দয়াসুন্দর হৃদয়ের নবী ﷺ বলেছেন, “এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে।” *(বুখারী ২৩৬৫, মুসলিম ৫৯৮৯নং)*

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ একবার কুরাইশ বংশের কতিপয় নবযুবকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় লক্ষ্য করলেন যে, তারা একটি পাখীকে বেঁধে (হাতের নিশানা ঠিক করার মানসে তার উপর নির্দয়ভাবে) তীর মারছে। তারা পাখীর মালিকের সাথে এই চুক্তি করেছিল যে, প্রতিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর তার হয়ে যাবে। সুতরাং যখন তারা ইবনে উমার ﷺ-কে দেখতে পেল, তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। ইবনে উমার ﷺ বললেন, 'এ কাজ কে করেছে? যে এ কাজ করেছে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ব্যক্তির উপর অভিশাপ করেছেন, যে কোন এমন জিনিসকে (তার তীর-খেলার) লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে, যার মধ্যে প্রাণ আছে।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

আনাস ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ জীব-জন্তুদের বেঁধে রেখে (তীর বা বন্দুকের নিশানা ঠিক করার ইচ্ছায়) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী ৫৫১৪, মুসলিম ৫১৭৫নং)*

দয়াসিক্ত অন্তরের নবী ﷺ বলেছেন,

(لَعَنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ).

অর্থাৎ, আল্লাহর অভিশাপ সেই ব্যক্তির উপর, যে পশুর অঙ্গহানি ঘটায়। *(নাসাঈ ৪৪৪২, ইবনে হিব্বান ৫৬১৭, বাইহাকী ১৮৬০০নং)*

অহেতুক প্রাণী হত্যা নিষেধ করতে তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি অধিকার ছাড়া (অযথা) একটি বা তার বেশী চড়ুই হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সে চড়ুই সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন।” বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! অধিকারটা কী (যে অধিকারে তাকে হত্যা করা বৈধ হবে)? তিনি বললেন, “অধিকার হল এই যে, তা যবাই করে (তার গোশ্ত) খাওয়া হবে এবং মাথা কেটে (হত্যা করে) ফেলে দেওয়া হবে না।” *(নাসাঈ, সহীহ তারগীব ২২৬৬নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ দেখলেন, পিঁপড়ের গর্তসমূহকে আমরা পুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি তা দেখে বললেন, “কে এই (পিঁপড়েগুলি)কে পুড়িয়ে ফেলেছে?” আমরা বললাম, 'আমরাই।' তিনি বললেন, আগুনের মালিক (আল্লাহ) ছাড়া আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া আর অন্য কারো জন্য সঙ্গত নয়।” *(আবূ দাউদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫নং)*

পশুর যথার্থ অধিকার আদায় করার মানসে দয়ালু মনের নবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا سَافَرْتُمْ فِى الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِى السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا

السَّيْرَ....)

অর্থাৎ, যখন ঘাসযুক্ত ভূমিতে সফর করবে, তখন ভূমি থেকে উটকে তার অধিকার প্রদান কর। (চরতে দাও।) আর যখন ঘাস-পানিহীন ভূমিতে সফর কর, তখন তা শীঘ্র পার হয়ে যাও। *(মুসলিম ৫০৬৮-নং, আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

(إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ).

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের সওয়ারীর পিঠকে (বক্তৃতার) মেম্বর বানিয়ে নেওয়া থেকে বিরত হও। যেহেতু আল্লাহ তা কেবল তোমাদেরকে দূর দেশে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন; যেথায় প্রাণান্তকর কষ্ট ব্যতীত তোমরা পৌঁছতে পারতে না। তিনি তোমাদের জন্য মাটি সৃষ্টি করেছেন, তার উপর দাঁড়িয়ে প্রয়োজন সারো। *(আবূ দাঊদ ২৫৬৭, সিঃ সহীহাহ ২২নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً وَاتَّدِعُوها سَالِمَةً، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ).

অর্থাৎ, এই পশুগুলি আরোহণ কর (কষ্ট) থেকে নিরাপদ রাখা অবস্থায় এবং (নেমে) বর্জন কর নিরাপদ করে। আর তাদেরকে চেয়ার বানিয়ে নিয়ো না। *(আহমাদ, ত্বাবারানী, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ২১নং)*

এমনকি বধ্য পশুর প্রতিও দয়া প্রদর্শন? হ্যাঁ, দয়ার নবী ﷺ যবেহ করার সময়ও পশুর প্রতি দয়াশীলতা প্রদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন,

(إنّ الله تَعالى كَتَبَ الإِحْسانَ على كلِّ شَيْءٍ فإذا قَتَلْتُمْ فأَحْسِنُوا القِتْلَةَ وإذا ذَبَحْتُمْ فأَحْسِنوا الذِّبْحَةَ ولْيُحِدَّ أَحَدُكمْ شَفْرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبيحَتَهُ).

অর্থাৎ, "অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ (জরুরী) করেছেন। সুতরাং যখন (জিহাদ বা হদ্দে) হত্যা কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে হত্যা কর এবং যখন যবেহ কর তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে যবেহ কর। তোমাদের উচিত, ছুরিকে ধারালো করা এবং বধ্য পশুকে আরাম দেওয়া।" *(আহমাদ, মুসলিম ১৯৫৫নং প্রমুখ)*

বধ্য পশুর সম্মুখেই ছুরি শান দেওয়া নির্দয়তার কাজ। দয়াময় নবী ﷺ ছুরি শান দিতে এবং তা পশু থেকে গোপন করতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ যবেহ করবে, তখন সে যেন তাড়াতাড়ি করে।" *(মুসনাদ আহমাদ ২/১০৮, ইবনে মাজাহ ৩১৭২নং, সহীহ তারগীব ১/৫২৯)*

এক ব্যক্তি পশুকে শুইয়ে রেখে তার ছুরি শান দিচ্ছিল। তা দেখে মহানবী ﷺ তাকে বললেন,

(أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوتَتَينِ هَلاَّ أَحْدَدتَ شُفْرَتَكَ قَبلَ أَن تُضجِعَهَا؟)

"তুমি কি ওকে দুইবার মারতে চাও? ওকে শোয়াবার আগে ছুরিতে শান দাওনি কেন?" *(ত্বাবারানীর কাবীর, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ২৪নং)*

দয়াবানকে পরম দয়াবান দয়া করেন। এমনকি বধ্য পশুর প্রতি দয়া করলেও পরকালে পরম করুণাময়ের করুণা লাভ হবে। দয়ার সাগর নবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ رَحِمَ وَلَو ذَبِيحَةً رَحِمَهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করবে, যদিও যবেহযোগ্য পশু (বা চড়ুই)র প্রতি হয়, কিয়ামতে আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন। *(বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৭৯, সিঃ সহীহাহ ২৭নং)*

তিনি এক সাহাবীকে বলেছেন, "তুমি যদি তোমার বকরীর প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।" *(হাকেম, সহীহ তারগীব ২২৬৪নং)*

মানবতার প্রতি দয়া প্রদর্শনে দয়ার নবী ﷺ দাস-প্রথাকে উচ্ছেদ করার জন্য নানাবিধ প্রয়াস চালিয়েছেন।

তিনি স্বাধীন মানুষকে দাস বানাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

(قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ).

"তিন প্রকার লোক এমন আছে, কিয়ামতের দিন যাদের প্রতিবাদী স্বয়ং আমি; (১) সে ব্যক্তি, যে আমার নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল, পরে তা ভঙ্গ করল। (২) সে ব্যক্তি, যে স্বাধীন মানুষকে (প্রতারণা দিয়ে) বিক্রি ক'রে তার মূল্য ভক্ষণ করল। (৩) সে ব্যক্তি, যে কোন মজুরকে খাটিয়ে তার নিকট থেকে পুরাপুরি কাজ নিল, কিন্তু তার মজুরী দিল না।" *(বুখারী ২০৭৫নং)*

তিনি দাসত্বমুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

« مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ ».

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন মু'মিন দাস মুক্ত করবে, আল্লাহ তার প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে তার প্রত্যেক অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। *(মুসলিম ৩৮৬৮নং)*

তিনি বহু অবাধ্যাচরণের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ক্রীতদাস স্বাধীন করাকে জরিমানা বা শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। যেমন ভুল করে হত্যা করার কাফ্ফারা, যিহার করার কাফ্ফারা, রমযানের রোযা অবস্থায় সহবাস করার কাফ্ফারা, কসমের কাফ্ফারা ইত্যাদিতে দাসমুক্ত করার নির্দেশ আছে।

তিনি দাস-দাসীর প্রতি আজীবন দয়ার্দ্র-হৃদয় ছিলেন। তাই তাঁর শেষ জীবনের অন্তিমশয্যায় অন্তিম উপদেশ ছিল,

(الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ).

অর্থাৎ, নামায, নামায, আর তোমাদের দাসদাসীদের ব্যাপারে সতর্ক হও। *(আহমাদ২৬৪৮৩, নাসাঈ কুবরা ৭০৯৪, ইবনে মাজাহ ১৬২৫নং)*

দয়ার নবী ﷺ উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যাতে ঘরের পুরুষরা দাসকে নিজেদের সঙ্গে বসিয়ে এবং মহিলারা দাসীকে নিজেদের সঙ্গে বসিয়ে আহার করে। তা না পারলে যে খাবার তারা তৈরি করে, সে খাবার যেন তারা খেতে পায়। তিনি বলেছেন,

((إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ)).

"যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির খাদেম (দাস-দাসী) তার নিকট খাবার নিয়ে আসে, তখন যদি তাকে নিজ সঙ্গে (খেতে) না বসায়, তাহলে সে যেন তাকে (কমপক্ষে তার হাতে) এক

খাবল বা দু’ খাবল অথবা এক গ্রাস বা দু’ গ্রাস (ঐ খাবার থেকে) তুলে দেয়। কেননা, সে (খাদেম) তা পাক (করার যাবতীয় কষ্ট বরণ) করেছে।” *(বুখারী)*

দয়ালু নবী ﷺ বলেছেন,

((هُمْ إِخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ الله تَحْتَ أَيدِيْكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأكُلُ ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ)).

অর্থাৎ, ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ এবং তোমাদের সেবক। আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায় এবং তাই পরায় যা সে নিজে পরে। আর তোমরা ওদেরকে এমন কাজের ভার দিয়ো না, যা করতে ওরা সক্ষম নয়। পরন্তু যদি তোমরা এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেল, তাহলে তোমরা ওদের সহযোগিতা কর।” *(বুখারী ৩০, ২৫৪৫, মুসলিম ৪৪০৫নং)*

দাস-দাসীকে খাবার দিতে উদ্বুদ্ধ করে দয়ার নবী ﷺ বলেছেন,

(ما أطعَمْتَ نَفْسَكَ فهو صدقةٌ وما أطعمْتَ ولدك وزوجتَك وخادمك فهو صدقةٌ)

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে যা খাইয়েছ, তা (তোমার জন্য) সদকাহ, তুমি তোমার সন্তান, স্ত্রী ও খাদেমকে যা খাইয়েছ, তা (তোমার জন্য) সদকাহ। *(আহমাদ, ত্বাবারানী, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সিঃ সহীহাহ ৪৫২নং)*

কাজের লোককে কাজ শেষে তার মজুরী সত্বর আদায় করে না অনেকে। তাতে সেই মেহনতি মানুষদের ক্ষতি হয়, যাদের রোজ আনা, রোজ খাওয়া। মালিকের টালবাহানার ফলে শ্রমিকদের চুলোয় হাঁড়ি চড়ে না। তাদের রোগী চিকিৎসা ও ওষুধ পায় না। তা দেখে গরীব-দরদী মানুষের মন কাঁদে। আর দয়ার নবী ﷺ বলেন,

أَعْطُوا الأَجِيرَ أجْرَهُ قَبْلَ أنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

অর্থাৎ, শ্রমিককে তার ঘাম শুকাবার পূর্বে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। *(ইবনে মাজাহ ২৪৪৩, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে’ ১০৫৫নং)*

zsbsj spbskbiajfsvB wadmsjv Ofm-sItfv lfm smsv sJsk zfb¦lshfL jsv. dj§Â lqft bhD ﷺ hstsYb,

(إنّ أعْظَمَ الذُّنوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْها طَلَّقَها وَذَهَبَ بِمَهْرِها ورَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بأُجْرَتِهِ وآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبثاً).

ªzfïfrv dbje nh yfƒsk hV ifdiô snƒ hAdÙÁ, sp sjfb mdrtfsj dhhfr jsv, zk}iv kfv dbje sKsj muf tcse dbsq kfsj kftfj slq ˆhQ kfv smfrvW zfk¹nf{ jsv. (däkDq rt) snƒ hAdÙÁ, sp sjfb stfjsj mucv Jfefq, zk}iv kfv mucvD zfk¹nf{ jsv ˆhQ (kxkDq rt) snƒ hAdÙÁ, sp JfsmfJf ið rkAf jsv.« *(rfsjm, hffrfjD, nrDùt ufsm' 1567 bQ)*

lfn-lfnDv …iv zkAfyfv rq, kf slsJ lqft bhDv mb j]fsl. kfslv

jsó k]fv mb jó ifq. jKfq sJ]fef slWqf rq, ofdt slWqf rq. dkdb kfvW iadkhfl jsvb.

mf'v™v dhb ncqfƒl hstb, ˆjlf zfhC pfvG ؓ-sj (mlDbfv dbjehkDG ˆjde ufqof) vfhfpfq slJtfm, k]fv ofsq dYt smfef yflv. zfv k]fv softfsmv ofsqW dYt zbcv™i yflv. kf slsJ njst htt, `sr zfhC pfvG! zfidb pdl softfsmv ofsqv ‰ yflvefW dbskb ˆhQ lc'desj ˆjsÛ jvskb, kfrst ˆjde sufVf rsq spk. zfv softfmsj zbA ˆjde jfiV dlsq dlskb.'

zfhC pfvG ؓ htstb, `zfdm ˆjub (softfm)sj ofdt dlsqdYtfm. kfv mf dYt zbfvhDq. ‰ mf Lsv kfsj dhla™i jsvdYtfm. sn zfïfrv vnCt ﷺ-ˆv dbje zfmfv dhv¢sÝ bfdtw jvt. ˆv Ist dkdb zfmfsj htstb, ªsr zfhC pfvG! dbÇyq kcdm ˆmb stfj; pfv msLA ufsrdtqfk zfsY!« zk}iv dkdb htstb, ªWvf (lfnoB) skf skfmfslv Hfƒ. (skfmfslv mkƒ mfbcN.) zfïfr Wslv …iv skfmfslvsj swaôk¶ lfb jsvsYb. zkˆh sp lfn skfmfslv msbfmskf rsh bf, kfsj dhÛÁq jsv lfW. zfv zfïfrv nxdósj jó dlsqf bf.« *(zfhC lf…l 5157bQ)*

দয়ালু নবী ﷺ খাদেমের দোষত্রুটিকে দৃষ্টিচ্যুত করতেন। সে কোন ভুল করলে ক্ষমা করে দিতেন।

তাঁর খাদেম আনাস ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোন পুরু বা পাতলা রেশম আমি স্পর্শ করিনি। আর তাঁর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনো শুঁকিনি। আর আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করেছি। তিনি কখনোও আমার জন্য ‘উঃ’ শব্দ বলেননি। কোন কাজ ক’রে বসলে তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করেননি যে, ‘তুমি এ কাজ কেন করলে?’ এবং কোন কাজ না করলে তিনি বলেননি যে, ‘তা কেন করলে না?’ *(বুখারী ৬০৩৮, মুসলিম ৬১৫১নং)*

আব্দুল্লাহ বিন আম্র ؓ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা দাস-দাসীকে কতবার ক্ষমা করব?’ এ কথা শুনে তিনি নীরব থাকলেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি পুনরায় একই প্রশ্ন করল। কিন্তু এবারেও তিনি চুপ থাকলেন। অতঃপর তৃতীয়বারে উত্তরে তিনি বললেন, “প্রত্যহ তাকে সত্তর বার ক্ষমা কর!” *(আবূ দাঊদ ৫১৬৪, তিরমিযী ১৯৪৯, সিঃ সহীহাহ ৪৮৮নং)*

Jfslsmv shkb bf dlsq, kfsj kfv psKó Jfhfv bf dlsq, kfsj [cLfkG svsJ ˆhQ snƒ nfsK kfv idvhfvsj [cLfkG svsJ W kfslv jfsY kfsj sYfe jsv kfsj jó slq zsbj sö¤YfyfvD zkAfyfvD mfbcN. kfslv hAfifsvW lqft bhD ﷺ …©mksj nkjG jsvsYb.

zfècïfr dhb …mfv ؓ-ˆv dbje k]fv JfufÑD ˆst dkdb kfsj

duÎfnf jvstb, ªsoftfmslvsj kfslv zfrfv dlsqsY dj?' JfufÑD htt, `bf.' dkdb htstb, `pfW, kfslvsj kf dlsq lfW. zfïfrv vnCt ﷺ hstsYb, ªmfbcsNv ifiD rWqfv ubA ˆkecjcƒ psKó sp, sn pfv zfrfsvv lfdqk¶wDt, kfsj kf (bf dlsq) zfesj vfsJ.« *(mcndtm 996bQ)*

অত্যাচারের চরম সীমায় পৌঁছে অত্যাচারী নিজ দাস-দাসীকে মারধর করে! তা দেখেও দয়ার নবী ﷺ-এর প্রাণ কাঁদে।

আবূ মাসঊদ বাদরী ﷺ বলেন, আমি একদা আমার একটি গোলামকে চাবুক মারছিলাম। ইত্যবসরে পিছন থেকে এই শব্দ শুনতে পেলাম 'জেনে রেখো, হে আবূ মাসঊদ!' কিন্তু ক্রোধান্বিত অবস্থায় শব্দটা বুঝতে পারলাম না। যখন সেই (শব্দকারী) আমার নিকটবর্তী হল, তখন সহসা দেখলাম যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলছিলেন, 'জেনে রেখো আবূ মাসঊদ! ওর উপর তোমার যতটা ক্ষমতা আছে, তোমার উপর আল্লাহ তাআলা আরো বেশি ক্ষমতাবান।' তখন আমি বললাম, 'এরপর থেকে আমি আর কখনো কোন গোলামকে মারধর করব না।'

এক বর্ণনায় আছে, তাঁর ভয়ে আমার হাত থেকে চাবুকটি পড়ে গেল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ওকে স্বাধীন ক'রে দিলাম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "শোন! তুমি যদি তা না করতে, তাহলে জাহান্নামের আগুন তোমাকে অবশ্যই দগ্ধ অথবা স্পর্শ করত।" *(মুসলিম ৪৩৯৬-৪৩৯৮নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« مَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ».

"যে ব্যক্তি নিজ গোলামকে এমন অপরাধের সাজা দেয়, যা সে করেনি অথবা তাকে চড় মারে, তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত হল, সে তাকে মুক্ত ক'রে দেবে।" *(মুসলিম)*

দয়ার নবী ﷺ সমাজের পঙ্গু মানুষদের প্রতিও দয়াশীল ছিলেন। তাদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। অন্ধের ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

(إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ).

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি আমার বান্দাকে যখন তার দুই প্রিয় বস্তু (চক্ষু)কে ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করি, আর সেও এতে ধৈর্য ধারণ করে, তখন ঐ দুয়ের বিনিময়ে তাকে বেহেশ্ত্ দান করি।" *(বুখারী ৫৬৫৩নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَهَ الْأَعْمَى عَنْ السَّبِيل).

অর্থাৎ, আল্লাহর অভিশাপ তার উপর, যে কোন অন্ধকে পথচ্যুত করে। *(আহমাদ ২৮১৬, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ৬৮৯, হাকেম ৮০৫২, সঃ জামে' ৫৮৯১নং)*

দয়ার নবী ﷺ বয়োবৃদ্ধ মানুষদের প্রতি দয়া প্রকাশ করে গেছেন। তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছেন,

(إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ).

"বৃদ্ধ মুসলিম, কুরআনে অতিরঞ্জনকারী ও অবহেলাকারী নয় এমন হাফেয এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাকে সম্মান প্রদর্শন করলে এক প্রকার আল্লাহকেই সম্মান প্রদর্শন করা হয়।" *(আবূ দাউদ ৪২০৩, আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৫৭, বাইহাক্বী ২৫৭৩নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا).

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না এবং আমাদের বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে না, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(আহমাদ ৬৯৩৭, তিরমিযী ১৯১৯, সিঃ সহীহাহ ২১৯৬নং)*

বৃদ্ধ ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের উপরে শরীয়তের ভার হাল্কা করা হয়েছে। নামায সুবিধামতো পড়তে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, রোযার বদলে কাফ্ফারার বিধান দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি।

ইমাম সাহেবকেও সতর্ক করা হয়েছে, যাতে নামায দীর্ঘ করে তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া হয়। তিনি মুআয ﷺ-কে এশার ইমামতিতে লম্বা ক্বিরাআত পড়তে নিষেধ ক'রে বলেছিলেন, "তুমি কি লোকদেরকে ফিতনায় ফেলতে চাও হে মুআয? তুমি যখন ইমামতি করবে তখন 'অশ্শামসি অযুহা-হা, সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, ইক্বরা বিসমি রাব্বিকা, অল্লাইলি ইযা য়্যাগশা' পাঠ কর। কারণ তোমার পশ্চাতে বৃদ্ধ, দুর্বল ও প্রয়োজনে উদগ্রীব মানুষ নামায পড়ে থাকে।" *(বুখারী ৬৬৪, মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত ৮৩৩ নং)*

মৃত মানুষের প্রতিও তাঁর দয়ার দরিয়া উথলে পড়ত।

মৃত অমুসলিম হলেও লাশ দেখে তিনি উঠে খাড়া হতেন। *(বুখারী ১২২৯, মুসলিম ১৫৯৬নং)*

তিনি মৃতব্যক্তির জন্য দুআ করতেন।

নিজে সশরীরে মৃতের কাফন-দাফন কর্মে শরীক হতেন।

নিজে কবরে নামতেন, দুশমন হলেও তাকে কাফনের জন্য নিজের কামীস দান করতেন।

তার জানাযা পড়তেন, তাতে তার জন্য দুআ করতেন এবং কারো জানাযা ছুটে গেলে তার কবরের উপরে জানাযা পড়তেন।

কবর যিয়ারত করতেন এবং সেখানে কবরবাসীর জন্য দুই হাত তুলে দুআ করতেন।

তিনি বলতেন,

(كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا).

অর্থাৎ, মৃতের হাড় ভাঙ্গা, জীবিতের হাড় ভাঙ্গার মতো (সমান অপরাধ)। *(আহমাদ ২৪৭৩৯, আবূ দাউদ ৩২০৭, ইবনে মাজাহ ১৬১৬নং)*

তিনি মৃত ও কবরের কাছে কাঁদতেন।

এ সব ছিল তাঁর দয়ার্দ্র-চিত্তের দয়া-মায়ার বহিঃপ্রকাশ। স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

পরিশেষে জ্ঞাতব্য যে, তাঁর দয়াশীলতা মানে দুর্বলতা নয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি দয়ার সাগর ছিলেন, তা বলে তিনি দুর্বল-চিত্ত ছিলেন না। তিনি বিনয়ী ও বিনম্র ছিলেন, তা বলে তিনি লাঞ্ছনা স্বীকার করতেন না। তিনি যেমন দয়ার্দ্র-হৃদয় ছিলেন, তেমনি প্রয়োজনে কঠোর-হৃদয়ও ছিলেন।

তিনি নবুঅতের পূর্বে দয়ালু ছিলেন, নবুঅতের পরেও দয়ালু ছিলেন। ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পূর্বে দয়াশীল ছিলেন, ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পরেও দয়াশীল ছিলেন। শান্তিকালে দয়ালু ছিলেন, যুদ্ধকালেও তিনি দয়ালু ছিলেন। হারলেও দয়াবান ছিলেন, জিতলেও দয়াবান

ছিলেন। দুঃখের সময় দয়াময় ছিলেন, সুখের সময়ও দয়াময় ছিলেন। ঘরে-বাইরে, শহরে-সফরে সকল স্থানে সকলের জন্য ছিল তাঁর দয়ার বহিঃপ্রকাশ। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } (١٠٧) سورة الأنبياء

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি।" *(আম্বিয়াঃ ১০৭)*

তাঁর নম্রতা ও অমায়িকতা

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন অত্যন্ত নম্র ও অমায়িক ব্যবহারের মানুষ। প্রত্যেক বিষয়ে তিনি নম্রতা পছন্দ করতেন। ব্যবহার ও আচরণে ডাঁট-ধমক, কর্কশতা-পৌরুষতা, রূঢ়তা-কঠোরতা ইত্যাদি পছন্দ করতেন না। মহান আল্লাহর নির্দেশ ছিল,

{وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٢١٥) سورة الشعراء

"তোমার অনুসারী মু'মিনদের প্রতি তুমি সদয় হও।" (শুআ'রাঃ ২১৫)

{لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ}

"আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি তুমি কখনো তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না এবং তাদের জন্য তুমি ক্ষোভ করো না। আর বিশ্বাসীদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ।" (হিজ্‌রঃ ৮৮)

তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর একটি খাস রহমত ছিল যে, তিনি নম্র-হৃদয় ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} (١٥٩) آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। (আলে ইমরানঃ ১৫৯)

বলা বাহুল্য, তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে বিনম্র ব্যবহার প্রদর্শন করেছেন। আর তার ফলে তাঁর দাওয়াতী কাজ সহজ হয়েছে এবং তাঁর মধুর ব্যবহারের ফলে বহু মানুষ মুগ্ধ হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে।

১। শিক্ষার্থীদের সাথে বিনম্রতা

কিছু মানুষ তাঁর কাছে দ্বীন শিক্ষার জন্য এসে ভুল করে বসত। তিনি সে ভুলের জন্য রাগান্বিত হতেন না। তাকে কথার চাবুকও হানতেন না। বরং বড় নম্রতার সাথে প্রভাবশালী ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে শিক্ষা দিতেন। ফলে সে প্রভাবান্বিত হয়ে তাঁর প্রতি মুগ্ধ হতো।

মুআবিয়া বিন হাকাম বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি নামাযে হাঁচি দিল (ছিঁকি মারল)। আমি নামাযের অবস্থাতেই ঐ ব্যক্তির জন্য 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলে দুআ করলাম। লোকেরা তা শুনে আমার দিকে তাকাতে লাগল। আমি

বললাম, 'বিপদ বটে! তোমরা আমার দিকে তাকাচ্ছ কেন?' তারা নিজেদের জানুতে আঘাত করে তাঁকে চুপ করাতে চাইল। আমি চুপ হয়ে গেলাম।

অতঃপর নামায শেষ হলে রসূল ﷺ আমার সাথে কথা বললেন। আমার পিতামাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! আমি ইতিপূর্বে এবং তাঁর পরে তাঁর চাইতে বেশি সুন্দর শিক্ষক দর্শন করিনি। আল্লাহর কসম! (এত বড় ভুল করার পরেও) তিনি আমাকে ধমক দেননি, প্রহার করেননি এবং গালিও দেননি। বরং তিনি বললেন,

« إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ».

"এই নামাযে লোক-সমাজের কোন কথা বলা বৈধ (সঙ্গত) নয়। এতে যা বলতে হয় তা হল; তসবীহ, তকবীর ও কুরআন পাঠ।" *(মুসলিম ১২২৭, মিশকাত ৯৭৮-নং)*

২। অজ্ঞদের সাথে বিনম্রতা

জাহেল জাহেলই। তাঁকে শিক্ষা দিতে হয়। কিন্তু অনেকে তার সাথে নম্রতার ব্যবহার বজায় রাখতে পারে না। তার কথায় খোঁটা লাগে, ব্যবহারে রুক্ষতা থাকে, ফলে সম্মানে আঘাত পড়ে। অথচ মহানবী ﷺ জাহেলদের সাথেও বিনম্র ব্যবহার বজায় রেখেছেন। যেহেতু মহান আল্লাহর নির্দেশ ছিল,

{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} (١٩٩) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। (আ'রাফ ঃ ১৯৯)

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, এক বেদুঈন মসজিদের ভিতরে প্রস্রাব ক'রে দিল। সুতরাং লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'এ কী? এ কী!' নবী ﷺ বললেন, "ওর পেসাব আটকে দিয়ো না, ওকে ছেড়ে দাও।"

সুতরাং তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। সে প্রস্রাব করে শেষ করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন,

« إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَّمَا هِىَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ».

অর্থাৎ, এই মসজিদগুলো কোন প্রকার পেসাব বা নোংরা জিনিসের জন্য নয়। এ হল কেবল আল্লাহ আযযা অজাল্লার যিক্র, নামায ও কুরআন পড়ার জন্য। *(মুসলিম ৬৮৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

(دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ).

অর্থাৎ, ওকে ছেড়ে দাও এবং ওর প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়নি।" *(বুখারী ২২০, ৬১২৮-নং)*

এই সেই বেদুঈন, যে নামাযের দুআতে বলেছিল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতি ও মুহাম্মাদের প্রতি রহম কর। আর আমাদের সাথে কাউকে রহম করো না।'

তা শুনে মহানবী ﷺ তাকে বলেছিলেন, "তুমি তো প্রশস্ত (আল্লাহর রহমত)কে সংকীর্ণ করে দিলে!"

এত ভুলের পরেও মহানবী ﷺ-এর নম্রতা ও অমায়িকতা দেখে সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে বলেছিল, 'আমার পিতামাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক। তিনি আমাকে গালি দেননি, বকাবকি করেননি এবং প্রহারও করেননি।' *(আহমাদ ১০৫৩৩, বায্যার ১০৫৪০নং)*

অন্য একটি ঘটনায় মহানবী ﷺ-এর বিনম্রতার নমুনা স্পষ্ট হয়।

আনাস ؓ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ এক মহিলার পাশ দিয়ে পার হলেন। সে (তার মৃত শিশুর) কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি তাকে বললেন, "আল্লাহকে ভয় কর, আর ধৈর্য ধর।" মহিলাটি (যেন রেগে উঠে) বলল, 'সরে যাও আমার কাছ থেকে আমার যা মুসীবত, তা তোমার কাছে আসেনি!'

আসলে মহিলাটি তাঁকে চিনতে পারেনি। পরে কেউ তাকে বলল যে, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ! এ কথা শুনে তার যেন মরণদশা উপস্থিত হল। মহিলাটি আল্লাহর রসূল ﷺ এর দরজায় এল। দেখল, দরজায় কোন দারোয়ান নেই। সুতরাং সরাসরি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি!' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন,

(إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى).

"বিপদের প্রথম চোটেই ধৈর্য ধরা হল আসল ধৈর্য।" *(বুখারী ১২৮৩, মুসলিম ২১৭৯নং)*

আর কিছু বললেন না। কারণ তিনি জানতেন, সে জানত না। জানত না যে, তিনি নবী ﷺ। জানত না যে, অধৈর্য হয়ে কবরের পাশে বসে কাঁদতে হয় না। তাই তো মহানবী ﷺ তার ব্যবহারে ধৈর্য ধরলেন এবং অসঙ্গত কথাকে এড়িয়ে গেলেন।

৩। কাফের ও ধৃষ্টদের সাথে বিনম্রতা

বিরোধী মানুষরা বিপক্ষের হিংসা করে, বিপদ কামনা করে, মৃত্যু প্রার্থনা করে। তা জেনে-শুনেও স্বাভাবিক কথা বলা, নরম ভাষায় উত্তর দেওয়া বিশাল হৃদয়ের মানুষের কাজ। তাঁর পক্ষ থেকে বিপক্ষকে কেউ গরম কথা বললে তাকেই নসীহত করা মহানুভব মানুষের মহৎ গুণ।

একদা ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করে বলল, 'আস্-সা-মু আলাইকুম।' তারা সালামের বদলে 'সা-ম' দিয়ে বলল, তোমাদের উপর মৃত্যু হোক।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রেগে গেলেন। তিনি বলেন, আমি তাদের কথা বুঝে গিয়েছিলাম। তাই আমিও তাদের উত্তরে বললাম, 'অআলাইকুমুস সা-মু অললা'নাহ।' অর্থাৎ, তোমাদের উপরেও মৃত্যু ও অভিশাপ হোক।

(অন্য এক বর্ণনায়, 'বাল আলাইকুমুস সা-ম অয-যাম।' তোমাদের উপরেও মৃত্যু ও গ্লানি হোক।) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ).

অর্থাৎ, থামো হে আয়েশা! আল্লাহ তাআলা কোমল; তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে কোমলতা ও নম্রতাকে ভালবাসেন। (তুমি ঠোঁটকাটা হয়ো না হে আয়েশা!)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'ওরা কী বলল, আপনি কি শুনেননি?'

তিনি বললেন, (শুনেছি বলেই তো) বললাম, 'অআলাইকুম।' *(বুখারী ৬০২৪, মুসলিম ৫৭৮৪, ৫৭৮৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

« يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ ».

অর্থাৎ, "হে আয়েশা! নিশ্চয় মহান আল্লাহ নম্র, তিনি নম্রতাকে ভালবাসেন। তিনি নম্রতার উপরে যা দেন, তা তিনি কঠোরতা এবং অন্য কোন জিনিসের উপর দেন না।" *(মুসলিম ৬৭৬৬নং)*

৪। পাপাচারীদের সাথে বিনম্রতা

অনেক সময় পাপাচারীরা ভালো মানুষের সাথে এমন ব্যবহার করে, যাতে তাঁর সম্মানে আঘাত লাগে, রাগ হয়, ফলে তিনি কড়া কথা বলতে উদ্যত হন। কিন্তু মহানবী ﷺ-এর বিনম্র ব্যবহার পাপাচারীকেও মুগ্ধ করত, ফলে সে পাপ বর্জনে উদ্বুদ্ধ হতো।

একদা এক যুবক আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহ রসূল! আপনি আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন!'

এ কথা শুনে লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'থামো, থামো! (এ কী বলছ তুমি?)'

কিন্তু মহানবী ﷺ তাকে বললেন, "আমার কাছে এসো।"

সে তাঁর কাছে এসে বসলে তিনি তাঁকে বললেন, "তুমি কি নিজ মায়ের জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের মায়েদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের মেয়েদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার বোনের জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের বোনেদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার ফুফুর জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের ফুফুদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কি তোমার খালার জন্য তা পছন্দ কর?"

সে বলল, 'না, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন।'

তিনি বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো তাদের খালাদের জন্য তা পছন্দ করে না।"

অতঃপর তিনি তার বুকে হাত রাখলেন এবং তার জন্য দুআ ক'রে বললেন,

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَحَصِّنْ فَرْجَهُ).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি ওর গোনাহ মাফ করে দাও, ওর হৃদয়কে পবিত্র করে দাও এবং ওকে ব্যভিচার থেকে রক্ষা কর।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সেই যুবক আর ব্যভিচারের দিকে ভ্রূক্ষেপও করেনি। *(আহমাদ ২২২১১, ত্বাবারানীর কাবীর ৭৬৭৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৫৪১৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৭০নং)*

৫। প্রজা ও জনগণের সাথে বিনম্রতা

মহানবী ﷺ ছিলেন সে ব্যাপারেও অগ্রণী। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমার এই ঘরে বলতে শুনেছি,

« اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ ».

"হে আল্লাহ! যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলো। আর যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদের সাথে নম্রতা করবে, তুমি তার সাথে নম্রতা করো।" *(মুসলিম ৪৮২৬নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ».

"নিকৃষ্ট রাখাল হল সেই, যে রাখালিতে বড় কঠোর।" *(মুসলিম ৪৮৩৮নং)*

উদ্দেশ্য হল, মানুষের নেতাকে বিনম্র হওয়া জরুরী। নচেৎ সে নিকৃষ্ট ও অযোগ্য নেতা।

৬। ফতোয়া জিজ্ঞাসাকারীর সাথে বিনম্রতা

আলেম-উলামার কাছে অনেকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে তাঁর ইল্‌ম আন্দাজ করার জন্য, সমালোচনা করার জন্য, দোষ ধরার জন্য অথবা বিতর্ক করার জন্য। তাতে আলেমকে ধৈর্যধারণ করতে হয় এবং প্রকৃতিস্থ থেকে জিজ্ঞাসকের সাথে বিনম্র ব্যবহার করতে হয়।

সালামাহ বিন স্বাখ্‌র বায়াযী বলেন, আমি এমন পুরুষ ছিলাম, যে স্ত্রী-সহবাস বেশি করে। আমার মনে হয় না যে, আমি যতটা পারতাম ততটা অন্য কেউ পারত। সুতরাং রমযান প্রবেশ করলে আমি স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করলাম, যাতে রমযান পার হয়ে যায় (এবং দিনে সহবাসে লিপ্ত না হয়ে পড়ি)। একদা রাত্রে সে আমার সাথে কথা বলছিল, এমন সময় তার দেহের এমন কিছু অংশ আমার জন্য খুলে গেল, যার ফলে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং সঙ্গম করে ফেললাম। অতঃপর সকাল হলে আমি আমার গোত্রের লোকেদেরকে আমার খবর বললাম। আমি তাদেরকে বললাম, 'আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে (ফতোয়া) জিজ্ঞাসা কর।'

তারা বলল, 'আমরা তা পারব না। কারণ আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল কুরআন অবতীর্ণ করবেন অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে কোন উক্তি করা হবে, অতঃপর তার লজ্জা আমাদের ঘাড়ে থেকে যাবে। বরং আমরা তোমার অপরাধ তোমাকেই সোপর্দ করছি। তুমিই গিয়ে তোমার নিজের ব্যাপার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ কর।'

সুতরাং আমি বের হলাম এবং তাঁর কাছে এসে আমার খবর খুলে বললাম।

তিনি বললেন, "তুমিই এ কাজ করেছ?"

আমি বললাম, 'জী, আমিই এ কাজ করে ফেলেছি। আর এই যে আমিই আল্লাহর ফায়সালা মেনে নিতে ধৈর্যধারণ করব হে আল্লাহর রসূল!'

তিনি বললেন, "তাহলে একটি গর্দান (ক্রীতদাস) স্বাধীন কর।"

আমি বললাম, 'সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য-সহ প্রেরণ করেছেন! এই সকালে আমি আমার নিজের এই গর্দান ছাড়া অন্য কিছুর মালিক নই।'

তিনি বললেন, "তাহলে একটানা দুই মাস রোযা রাখো।"

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার উপর যে মসীবত এল, তা কি রোযা ছাড়া অন্য কিছুর কারণে এল?'

তিনি বললেন, "তাহলে ষাটজন মিসকীনকে সাদকা কর অথবা অন্নদান কর।"

আমি বললাম, 'সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য-সহ প্রেরণ করেছেন! গত রাত্রে আমাদের রাতের খাবারও ছিল না!'

তিনি বললেন, "তাহলে বানী যুরাইকের সাদকা-ওয়ালার কাছে যাও এবং তাকে বল, তোমাকে সাদকা দেবে। অতঃপর তুমি তা থেকে ষাটজন মিসকীন খাইয়ে দাও এবং অবশিষ্টাংশ দ্বারা তুমি উপকৃত হও।"

সুতরাং আমি আমার গোত্রের লোকেদের কাছে ফিরে এলাম এবং বললাম, 'তোমাদের কাছে সংকীর্ণতা ও খারাপ রায় পেলাম। আর নবী ﷺ-এর নিকট পেলাম প্রশস্ততা ও ভালো রায়। তিনি তোমাদেরকে আমার জন্য সাদকা দিতে আদেশ করেছেন। সুতরাং আমাকে তা দাও।' *(আহমাদ ১৬৫৩৫, আবূ দাউদ ২২১৩, তিরমিযী ৩২৯৯, ইবনে মাজাহ ২০৬২নং প্রমুখ)*

প্রকাশ থাকে যে, বায়াযাহ গোত্র বানী যুরাইকেরই একটি শাখা।

মহানবী ﷺ তার প্রতি কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করেননি, তাকে কোন মন্দ কথাও বলেননি এবং কোন কড়া কথাও বলেননি, বরং প্রত্যেক ধাপে নম্রতার সাথে তিনি তাকে দিক-নির্দেশ করেছেন।

৭। শিশুদের সাথে বিনম্রতা

মহানবী ﷺ শিশুদের ভুলেও ধৈর্যধারণ করতেন এবং নম্রতার সাথে তাদেরকে শিক্ষা দিতেন।

উমার ইবনে আবী সালামা বলেন, 'একদা আমি ছোট হিসাবে নবী ﷺ-এর কোলে ছিলাম। খাবার (সময়) বাসনে আমার হাত ঘুরছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন,

« يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ».

"ওহে কিশোর! 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছ থেকে খাও।"

তারপর থেকে আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করে আসছি।' *(বুখারী ৫৩৭৬, মুসলিম ৫৩৮৮নং)*

৮। পশু-পক্ষীর সাথে বিনম্রতা

এমনকি যবেহযোগ্য পশুর প্রতিও নম্রতা প্রদর্শন করতে নির্দেশ দিয়েছেন মহানবী ﷺ। তিনি বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ».

"অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর অনুগ্রহ লিপিবদ্ধ (জরুরী) করেছেন। সুতরাং যখন (জিহাদ বা হদ্দে) হত্যা কর, তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে হত্যা কর এবং যখন যবেহ কর, তখন উত্তমরূপে অনুগ্রহের সাথে যবেহ কর। তোমাদের উচিত, ছুরিকে ধারালো করা এবং বধ্য পশুকে আরাম দেওয়া।" *(মুসলিম ১৯৫৫নং)*

৯। নম্রতার প্রতি তাঁর অনুপ্রেরণা

মহানবী ﷺ উম্মতকে নম্রতার প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নানা নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, নম্রতা হল সার্বিক কল্যাণ।

(إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمْ الرِّفْقَ).

অর্থাৎ, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল যখন কোন পরিবারের জন্য মঙ্গল চান, তখন তাদের মাঝে নম্রতা প্রবিষ্ট করেন। *(আহমাদ ২৪৪২৭, শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ৬৫৬০নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ ».

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে ব্যক্তি সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। *(মুসলিম ৬৭৬৩নং)*

নম্রতা মানুষকে সুন্দর করে, বিনম্র ব্যবহার দূরের মানুষকে নিকট করে। মানুষ যতই সুন্দর হোক, তার চরিত্র ও ব্যবহারে নম্রতা না থাকলে সে কুৎসিত। তিনি বলেছেন,

« إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ ».

"নম্রতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যমন্ডিত (মনোহর) করে তোলে। আর যে বিষয় থেকে তা তুলে নেওয়া হয়, সে বিষয়কে সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে।" *(মুসলিম ৬৭৬৭, আবূ দাঊদ ৪৮০৮নং)*

দাওয়াতের কাজেও বিনম্র ব্যবহার প্রয়োজন। মহানবী ﷺ দাঈ প্রেরণের সময় বলতেন,

« يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا ».

"তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না এবং (লোকেদেরকে) শান্ত রাখো, (সুসংবাদ দাও)। তাদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করো না।" *(বুখারী ৬১২৫, মুসলিম ৪৬২৬নং)*

দাওয়াতের কাজে দর্স-তাদরীসের সময় শিক্ষার্থীদের প্রতি সেই নম্রতা বজায় রাখতেন।

শাক্বীক্ব ইবনে সালামা (রঃ) বলেন, ইবনে মাসঊদ رضي الله عنه প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আমাদেরকে নসীহত শুনাতেন। একটি লোক তাঁকে নিবেদন করল, 'হে আবূ আব্দুর রহমান! আমার বাসনা এই যে, আপনি আমাদেরকে যদি প্রত্যেক দিন নসীহত শুনাতেন (তো ভাল হত)।' তিনি বললেন, 'স্মরণে রাখবে, আমাকে এতে বাধা দিচ্ছে এই যে, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে অপছন্দ করি। আমি নসীহতের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি ঠিক ঐভাবে লক্ষ্য রাখছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বিরক্ত হবার আশংকায় উক্ত বিষয়ে আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।' (অর্থাৎ মাঝে-মধ্যে বিশেষ প্রয়োজন মাফিক নসীহত শুনাতেন।) *(বুখারী ৭০, মুসলিম ৭৩০৭নং)*

যেমন তিনি জুমআর খুতবা সংক্ষেপ করতেন। ইমামতিতে লম্বা কিরাআত পড়ে মানুষকে কষ্ট দিতে নিষেধ করতেন। শিশুর কান্না শুনে তিনি নামায সংক্ষেপ করতেন। দাস-দাসী ও স্ত্রী-পরিজনের সাথেও বিনম্র ব্যবহার প্রদর্শন করতেন।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কাউকে স্বহস্তে মারেননি, না কোন স্ত্রীকে, না কোন দাস-দাসীকে। কারো দিক থেকে তিনি কোন কষ্ট পেলে কষ্টদাতার নিকট থেকে প্রতিশোধ নেননি। হ্যাঁ, যদি আল্লাহর হারামকৃত কোন জিনিস লংঘন করা হত (অর্থাৎ কেউ চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি কাজ ক'রে ফেলত), তাহলে আল্লাহর জন্যই তিনি প্রতিশোধ নিতেন (শাস্তি দিতেন)।' *(মুসলিম ২৩২৮নং, নাসাঈ প্রমুখ)*

তিনি সব কিছুতেই নম্রতা পছন্দ করতেন। স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

তাঁর বিষয়াসক্তিহীনতা

মহানবী ﷺ মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মনোনীত ও প্রেরিত মহাপুরুষ। তিনি ইচ্ছা করলে 'রাজা' হয়ে কালাতিপাত করতে পারতেন, যেমন পূর্ববর্তী কোন কোন নবী 'রাজা'রূপে নবুঅতের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তিনি চেয়েছেন বিনয়ী গরীবরূপে কালাতিপাত করতে।

একদা জিবরীল ﷺ মহানবী ﷺ-এর নিকটে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, একজন ফিরিশ্তা অবতরণ করছেন। তিনি (নবী ﷺ-কে লক্ষ্য ক'রে) বললেন, 'এই ফিরিশতা যখন থেকে সৃষ্ট হয়েছেন, তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন দিন অবতরণ করেননি।' ফিরিশ্তা অবতরণ ক'রে (নবী ﷺ-কে) সম্বোধন ক'রে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। (তিনি জানতে চান যে,) আপনাকে কি তিনি একজন সম্রাট ও নবী ক'রে প্রেরণ করবেন, না কেবল একজন বান্দা ও রাসূল ক'রে পাঠাবেন?' জিবরীল ﷺ বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নম্র-বিনয়ী হন।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(لاَ بَلْ عَبْدًا رَسُولًا).

"না, বরং আমি একজন বান্দা ও রাসূল হিসাবে প্রেরিত হতে চাই।" *(আহমাদ ৭১৬০, ইবনে হিব্বান ৬৩৬৫, আবূ য়্যা'লা ৬১০৫নং)*

তিনি চেয়েছেন পরকালের অনন্ত সুখ। এ জগতের ভোগ-বিলাস তাঁর কাম্য ছিল না।

একদা দু-জাহানের বাদশাহ নবী ﷺ চাটাইয়ের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাই-এর স্পষ্ট দাগ পড়ে গিয়েছিল। তাঁর বগলে ছিল খেজুর গাছের চোকার বালিশ! তা দেখে উমার কেঁদে ফেললেন। আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "হঠাৎ কেঁদে উঠলে কেন, হে উমার?" উমার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! পারস্য ও রোম-সম্রাট কত সুখ-বিলাসে বাস করছে। আর আপনি আল্লাহর রসূল হয়েও এ অবস্থায় কালাতিপাত করছেন? আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আপনার উম্মতকে পার্থিব সুখ-সম্পদে সমৃদ্ধ করেন। পারস্য ও রোমবাসীদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী দান করেছেন, অথচ তারা তাঁর ইবাদত করে না!' এ কথা শুনে মহানবী ﷺ হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, "হে উমার! আমার ব্যাপারে কি সন্দেহ কর? এ ব্যাপারে তুমি এমন কথা বল? ওরা হল এমন জাতি, যাদের সুখ-সম্পদকে এ জগতেই ত্বরান্বিত করা হয়েছে। ---তুমি কি চাও না যে, ওদের সুখ ইহকালে আর আমাদের সুখ পরকালে হোক?" *(বুখারী ৪৯১৩, ৫১৯১, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ১৩২৭ নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা চাটাই-এর উপর শুয়ে ছিলেন। অতঃপর তিনি এই অবস্থায় উঠলেন যে, তাঁর পার্শ্বদেশে তার দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি (আপনার অনুমতি হয়), তাহলে আমরা আপনার জন্য নরম গদি বানিয়ে দিই।' তিনি বললেন,

(مَا لِي وَلِلدُّنْيَا مَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا كَرَاكِبٍ ظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا).

"দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো (এ) জগতে ঐ আরোহীর মতো, যে (ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রামের জন্য) কোন গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। অতঃপর পুনরায় সে চলতে

আরম্ভ করে এবং ঐ গাছটি ছেড়ে চলে যায়।” *(আহমাদ, তিরমিযী ২৩৭৭, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৫১৮৮ নং)*

গরীব-দরদী নবী ﷺ গরীবদের দুঃখে দুঃখী ছিলেন। তিনি নিজের সুখ ভুলে পরের সুখ চাইতেন। দরিয়া-দিলে তিনি সর্বদা অভাবীদের মাঝে দান করতে চাইতেন। তিনি বলেছেন,

(لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ).

“যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড় সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি এতে আনন্দিত হতাম যে, ঋণ পরিশোধের জন্য পরিমাণ মত বাকী রেখে অবশিষ্ট সবটাই তিন দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহর পথে খরচ ক'রে ফেলি।” *(বুখারী ২৩৮৯, মুসলিম ২৩৪৯নং)*

দুনিয়ার প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল না, সংসারের পান-ভোজন ও বিলাস-ব্যসনে তাঁর লোভ ছিল না বলেই তাঁর সংসারে অভাব থাকত।

কখনো টানা তিন দিন তৃপ্তি সহকারে আহার করতে পেতেন না। *(বুখারী ৫৩৭৪নং)*

মাঝে-মধ্যে আহারে অতৃপ্তি থেকেই যেত, পেটপূর্ণ আহার মিলত না, পেটে ক্ষুধা বর্তমান থাকত। কারণ যথেষ্ট খাদ্য ঘরে থাকত না। আবার থাকলেও অন্যকে দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মিটত না। *(ঐ ৫৩৭৪, ৫৪১৬নং)*

মহানবী ﷺ এমন অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করেছেন যে, যবের রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হননি। *(ঐ ৫৪১৪নং)*

তাঁর পরিবার এক দিনে দুই বেলা আহার করলে এক বেলার খাবার হতো খেজুর। *(ঐ ৬৪৫৫নং)*

কখনো কখনো টানা দুই মাস ধরে তাঁর গৃহে চুলো জ্বলত না! কেবল খেজুর, দুধ ও পানি খেয়ে জীবনধারণ করেছেন। *(বুখারী ২৫৬৭, মুসলিম ২৯৭২নং)*

কখনো খাদ্যাভাবে ও ক্ষুধার তাড়নায় তিনি পেটের উপর ঝুঁকে থাকতেন। *(মুসলিম ৭৬৫০-৭৬৫২নং)* কখনো তিনি পেটে পাথর বেঁধেছেন। *(ঐ ২০৪০নং)*

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানা চামড়ার তৈরী ছিল এবং তার ভিতরে ছিল খেজুর গাছের ছোবড়া। *(বুখারী ৬৪৫৬নং)*

তিনি চাইতেন আড়ম্বরহীন ও বিলাসহীন জীবন। তাই তিনি আল্লাহর কাছে দুআ ক'রে বলতেন,

((اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে গরীব-দরিদ্র অবস্থায় জীবিত রাখ, গরীব অবস্থায় আমার মৃত্যু দিয়ো এবং কিয়ামতের দিন গরীবদের সাথে আমার হাশর কর। *(তিরমিযী ২৩৫২, সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ ৪১২৬নং)*

পরিমিত রুযীর জন্য তিনি দু'আ করতেন,

« اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا ».

“হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রদান কর।” *(বুখারী ৬৪৬০, মুসলিম ২৪৭৪নং)*

সেই রুযী তিনি চেয়েছিলেন, যাতে খেয়ে-পরে উদ্বৃত্ত কিছু না থাকে। যাতে ধনবত্তা ও নিঃস্বতার ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

জ্ঞাতব্য যে, তাঁর বিষয়াসক্তিহীনতা মানে কোনক্রমেই বৈরাগ্যবাদ নয়। কেননা,

'বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।'

এই ছিল তাঁর পার্থিব জীবনের সারকথা।

তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা

বীর নবী, সৎ সাহসিক নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ। যুদ্ধের ময়দানে ধৈর্যের সাথে অবস্থান করে নির্ভয়ে শত্রুর মোকাবেলা করা হল বীরত্ব। ভীতি ও ত্রাস থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা হল সাহসিকতা। এ সদ্‌গুণ ছিল মহানবী ﷺ-এর। ভীরু-কাপুরুষদের দুর্বল স্বভাব থেকে তাঁর জীবন ছিল বহু দূরে।

মহানবী ﷺ জিহাদ করেছেন, হৃদয়, জিহ্বা ও তরবারি দ্বারা সংগ্রাম করেছেন। যে সব যুদ্ধে তিনি সশরীরে অংশগ্রহণ করেছেন, সে সব যুদ্ধের সেনাপতিরূপে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

বদর যুদ্ধে তিনি কী ভীষণ সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন! অল্প সংখ্যক যোদ্ধা ও যুদ্ধাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি মহান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে শত্রুর মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

বদর যুদ্ধের প্রাথমিক নিয়ত যুদ্ধ ছিল না। অতঃপর মক্কার কুরাইশদল যখন আসতে লাগল এবং যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল, তখন অবস্থার এই আকস্মিক ভয়াবহ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চ পর্যায়ের এক সামরিক পরামর্শ সভার আয়োজন করলেন। উক্ত সভায় তিনি বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পূর্বক নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে মত বিনিময় করলেন। অবস্থার এই আকস্মিক মোড় পরিবর্তনের ফলে আসন্ন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কথা অবগত হয়ে একটি দলের হৃৎকম্প উপস্থিত হল। এই দলটি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করলেন,

{كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٥) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ} (٦) الأنفال

অর্থাৎ, (যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারটা ওরা পছন্দ করেনি) যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার গৃহ হতে ন্যায়ভাবে বের করেছিলেন, অথচ মু'মিনদের একদল সেটা পছন্দ করেনি। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, (মনে হচ্ছে) তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে এবং তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে। *(আনফাল ঃ ৫-৬)*

কিন্তু সামরিক বাহিনীর নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে আবু বাকর ؓ উঠে দাঁড়ালেন এবং অতি চমৎকার কথা বললেন। অতঃপর উমার ؓ উঠলেন এবং তিনিও অতি উত্তম কথা বললেন। তারপর মিকদাদ ইবনু আম্র ؓ উঠে দাঁড়িয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে পথ প্রদর্শন করেছেন, সে পথে আপনি চলতে থাকুন। আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে রয়েছি আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে ঐ কথা বলব না,

যে কথা বনী ইস্রাঈল মূসাকে বলেছিল,

{اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} (٢٤) المائدة

"তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব।" *(মায়েদাহ ২৪ আয়াত)*

কিন্তু আমাদের ব্যাপার ভিন্ন। আমরা বরং বলব 'আপনি ও আপনার প্রভু যুদ্ধ করুন, আমরা সর্বাবস্থায় আপনাদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব।' যিনি আপনাকে এক মহা সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! যদি আপনি আমাদেরকে (দূরবর্তী এলাকা) 'বার্কুল গিমাদ' পর্যন্ত নিয়ে যান তবুও আমরা পথরোধকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আপনার সঙ্গে সেখানেও গমন করব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের সম্পর্কে উত্তম কথা বললেন এবং তাদের জন্য দুআ করলেন। এই তিনজন নেতাই ছিলেন মুহাজির। সেনাবাহিনীতে আনসারদের তুলনায় মুহাজির সৈন্যের সংখ্যা ছিল অনেক কম। রাসুলুল্লাহ ﷺ আনসারদেরও মতামত জানার প্রয়োজন বোধ করলেন। কেননা, সেনাবাহিনীতে সংখ্যায় তাঁরাই ছিলেন অধিক এবং যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের চাপও ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ওপরেই বেশী। অবশ্য আকাবার বাইআতের স্বীকৃতি মুতাবিক মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা তাদের জন্য অপরিহার্য ছিল না। উক্ত প্রেক্ষিতে তিনি উপরি-উক্ত তিন মহান নেতার বক্তব্য শোনার পর পুনরায় বললেন, "উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ! বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।"

আনসারদের উদ্দেশ্যেই তিনি এই কথাগুলি বললেন। আনসার অধিনায়ক ও পতাকাবাহক নেতা সা'দ ইবনু মুআয رضي الله عنه রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন পূর্বক আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! মনে হয় আপনি আমাদের মতামতই জানতে চাচ্ছেন?'

প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হ্যাঁ।"

তখন তিনি বললেন, 'আমরা তো আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনার সত্যতা স্বীকার করেছি এবং এ সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সবই সত্য এবং সে সব শোনা ও মান্য করার পর আমরা আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যা ইচ্ছা করছেন, তা পূরণার্থে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যান। যিনি আপনাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ! আপনি আদেশ করলে আমরা উত্তাল সাগরেও ঝাঁপ দিতে পারি। জগতের দুর্গমতম স্থানকেও পদদলিত করতে পারি। ইনশাআল্লাহ! আমাদের একজন লোকও পিছনে থাকবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহে আপনি আমাদেরকে প্রত্যক্ষ করবেন সাহসী ও নির্ভীক বীর পুরুষের ভূমিকায়। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাদের মাঝে এমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করবেন, যা প্রত্যক্ষ করে আপনার চক্ষুদ্বয় শীতল হয়ে যাবে। সুতরাং যেখানে ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে নিয়ে চলুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের কাজেকর্মে বরকত দান করুন।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, সা'দ ইবনু মুআয رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরজ করলেন, 'আপনি হয়তো আশংকা করছেন যে, আনসারগণ তাদের শহরে থেকেই শুধু আপনাকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে করছে? এ কারণে আমি তাদের পক্ষ থেকে বলছি এবং তাদের পক্ষ থেকেই উত্তর দিচ্ছি যে, আপনার যেখানে ইচ্ছা হয় চলুন, যার সঙ্গে ইচ্ছা সম্পর্ক ঠিক

রাখুন এবং যার সঙ্গে ইচ্ছা সম্পর্ক ছিন্ন করুন। আমাদের ধন সম্পদ হতে যে পরিমাণ ইচ্ছা গ্রহণ করুন এবং যা ইচ্ছা ছেড়ে দিন। তবে যেটুকু আপনি গ্রহণ করবেন, তা আমাদের নিকট যেটুকু ছেড়ে দেবেন তার চাইতে অধিক পছন্দনীয় হবে। আর এ ব্যাপারে আপনি যে ফায়সালা করবেন আমাদের ফায়সালা তারই অনুসারী হবে। আল্লাহর কসম! আপনি যদি অগ্রসর হয়ে 'বার্কুল গিমাদ' পর্যন্ত চলে যান, তাহলেও আমরা আপনার সঙ্গেই যাব। আর যদি আপনি আমাদের নিয়ে ঐ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান, তবে আমরাও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

সা'দের এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন,

(سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم).

"চলো এবং আনন্দিত চিত্তে চল। আল্লাহ আমার সঙ্গে দুটো দলের মধ্য হতে একটির ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেন এ সময় (কাফের) সম্প্রদায়ের বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি।" *(আর-রাহীকুল মাখতূম ৩৭৩-৩৭৫পৃঃ)*

দুর্দান্ত সৎ সাহস ও মহান প্রতিপালকের প্রতি ঐকান্তিক ভরসা তাঁকে সেই যুদ্ধে জয়ী করল।

তিনি ছিলেন নির্ভীক বীর। আলী ﷺ বলেন, 'বদরের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিলাম। শত্রুর দিকে তিনিই ছিলেন আমাদের চাইতে বেশি নিকটবর্তী। সেদিন তিনিই ছিলেন বীর-বিক্রমশালীদের একজন।' *(আহমাদ ৬৫৪, ১০৪২, হাকেম, ইবনে আবী শাইবাহ ৩২৬১৪নং)*

আলী ﷺ আরো বলেছেন, 'যুদ্ধ যখন তীব্র হয়ে উঠত এবং উভয় পক্ষ লড়াইয়ে লিপ্ত হত, আমরা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আড়ালে নিজেদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। ফলে তিনি ছাড়া আমাদের মধ্যে কেউ শত্রুর অধিক নিকটবর্তী থাকত না।' *(হাকেম ২৬৩৩, আবূ য়্যা'লা ৩০২নং)*

উহুদ যুদ্ধের দিনেও তিনি দূরদর্শিতা ও বীরত্বের সাথে সৈন্য-বিন্যাস করে যুদ্ধ করেছিলেন। শত্রুপক্ষ পরাজয় বরণ করে পিছু হটতে শুরু করেছিল। কিন্তু মুসলিমদের একটি দলের ভুলের কারণে পুনরায় যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে গেল। যুদ্ধাবসানের কথা ঘোষণা করার আগেই সেনাপতির নির্দেশ লংঘন করে কিছু তীরন্দাজ সেনা নিজেদের নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করেছিলেন। আসলে তাঁরা ধারণা করেছিলেন, যুদ্ধ শেষ। ফলে শত্রুপক্ষ সুযোগ পেয়ে পিছন থেকে হামলা করল। মুসলিমগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লেন। ফলে শত্রু আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে পৌঁছতে সক্ষম হল। তাঁর উপর আক্রমণ হল। আঘাতে তাঁর নিচের চোয়ালের ডান দিকের (ঠিক মাঝের পার্শ্ববর্তী) দুটি দাঁত ভেঙ্গে গেল এবং তাঁর কপাল বিক্ষত হল। চোট লাগল তাঁর চেহারায়। গালের উপরি অংশে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া ঢুকে গেল।। তা দাঁত দিয়ে তুলতে গিয়ে আবূ উবাইদা ﷺ-এর মাঝের দাঁত দুটি ভেঙ্গে গেল।

মহান সেনাপতি মুসলিম সেনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করলেন। এই যুদ্ধে তিনি নিজ হাতে একমাত্র উবাই বিন খালাফকে বর্শার আঘাত দ্বারা হত্যা করেন।

হুনাইন যুদ্ধে মুসলিমরা কাফেরদের তীর-বর্ষণের সামনে দৃঢ়পদ থাকতে পারলেন না। তাঁরা পিছু হটতে শুরু করলে বীর সেনাপতি রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি অশ্বতরীতে সওয়ার হয়ে যোদ্ধাদেরকে আহবান করতে শুরু করলেন। তাঁদের মনে সাহস ও দৃঢ়তা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন,

« أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ».

অর্থাৎ, আমি নবী, এটা মিথ্যা নয়। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।

মহান আল্লাহর কাছে দুআ করে বলতে লাগলেন,

« اللَّهُمَّ نَزِّلْ نَصْرَكَ ».

অর্থাৎ, হে আল্লাহ তোমার বিজয় অবতীর্ণ কর। *(বুখারী, মুসলিম ৪৭১৬নং)*

সেদিন তিনিই ছিলেন মহাবীর। যোদ্ধাগণ তাঁর আড়ালেই যুদ্ধ করলেন। পরিশেষে বিজয় অবতীর্ণ হল।

তাঁর চাচা আব্বাস বিন মুত্তালিব সে যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুনাইন যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। আমি ও আবূ সুফয়ান বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাথে থাকতে লাগলাম। আমরা তাঁর নিকট থেকে পৃথক হলাম না। (সে সময়) রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। তারপর যখন মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল এবং (প্রথমতঃ) মুসলমানরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে (রণভূমি ছেড়ে) চলে গেল, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ স্বীয় খচ্চরকে কাফেরদের দিকে নিয়ে যাবার জন্য পায়ের আঘাত হানলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খচ্চরের লাগাম ধরে ছিলাম। তাকে ধরে থামাচ্ছিলাম যাতে দ্রুত বেগে না চলে। অন্য দিকে আবূ সুফয়ান আল্লাহর রসূল ﷺ-এর (সওয়ারীর) পা-দান ধরে ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আব্বাস! বাবলা গাছ তলে 'রিযওয়ান' বায়আতকারীদেরকে ডাক দাও।" আব্বাস ﷺ উচ্চকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, সুতরাং আমি উচ্চ স্বরে হেঁকে বললাম, 'বাবলা গাছ তলে বায়আতকারীরা কোথায়?' আল্লাহর কসম! যখন তারা আমার কণ্ঠধ্বনি শুনতে পেল, তখন গাভী যেমন তার বাচ্চার শব্দ শুনে তার দিকে দ্রুত গতিতে ফিরে যায়, ঠিক তেমনি তারা দ্রুত গতিতে ফিরে এল। তারা বলে উঠল, 'আমরা হাজির আছি, আমরা হাজির আছি।' তারপর আবার তাদের ও কাফেরদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলতে থাকল। সে সময় আনসারদেরকে সাধারণভাবে ডাক দেওয়া হল, 'হে আনসারগণ! হে আনসারগণ!' তারপর আহবান কেবল হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রের লোকেদের মাঝে সীমিত হল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খচ্চরের উপর থেকেই রণক্ষেত্রের দিকে তাকালেন। তিনি যেন সামরিক সংঘর্ষের কলাকৌশল ও বীরত্বের দৃশ্য গর্দান বাড়িয়ে অবলোকন করছিলেন। তিনি বললেন, "যুদ্ধ তুঙ্গে উঠার ও সাংঘাতিক রূপ ধারণ করার এটাই সময়।" অতঃপর তিনি কিছু কাঁকর হাতে নিয়ে কাফেরদের মুখের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "মুহাম্মাদের রবের শপথ! ওরা (কাফেররা) পরাজিত হয়ে গেছে।" আমিও দেখলাম যে, যুদ্ধ পূর্ণতা ও উত্তেজনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আল্লাহর কসম! যখনি তিনি ঐ কাঁকরগুলি কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন, তখনি আমি নিষ্পলক নেত্রে দেখতে থাকলাম যে, তাদের শক্তি ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে এবং তাদের ব্যাপারটা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। *(মুসলিম ৪৭১৯নং)*

উলামাগণ বলেন, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অশ্বতরীর উপরে সওয়ার হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করা বিশাল বীরত্বের পরিচয়। বিশেষ করে সেই সময়, যে সময়ে স্বপক্ষের যোদ্ধাগণ পিছু হটতে শুরু করেন।

তিনি নির্ভীক সাহসিক ছিলেন, এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় আরো এ বর্ণনায়। আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ ছিলেন সবার চেয়ে বেশি ভালো মানুষ, সবার চেয়ে বেশি দাতা মানুষ এবং সবার চেয়ে বেশি বীর মানুষ। এক রাত্রে মদীনার লোকেরা আতঙ্কিত হল। লোকেরা শব্দের দিকে অগ্রসর হল। দেখল, নবী ﷺ তাদের আগে শব্দের দিকে পৌঁছে আছেন। আর তিনি বলছেন,

(لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا).

অর্থাৎ, ভয়ের কিছু নেই, ভয়ের কিছু নেই।

তিনি আবূ তালহার একটি নগ্ন ঘোড়ার উপর সওয়ার আছেন। তার উপর জিনপোশ ছিল না, আর তাঁর গর্দানে ঝুলানো ছিল তরবারি। *(বুখারী ৬০৩৩, মুসলিম ৬১৪৬নং)*

তিনি ছিলেন মহানবী মহাবীর। স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

তাঁর ধৈর্যশীলতা

মহানবী ﷺ ছিলেন দ্বীনের দাঈ। পরিবেশে নতুন দাওয়াতের দাঈ। অধিকাংশ মানুষ তাঁর শত্রু হয়ে গেল। বহু-ঈশ্বরবাদীদের মাঝে একেশ্বরবাদের দাওয়াত দিলে তারা কি সহজে মেনে নেয়? তাই শুরু হল প্রতিবাদ, বাধা, প্রলোভন, হুমকি, সংঘাত। প্রয়োজন পড়ল ধৈর্যের।

কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হলেন। ধৈর্য ধরলেন ধৈর্যশীল নবী। তাঁর শিশ্যদের প্রতি অত্যাচার শুরু হল, তাতেও তিনি ধৈর্য ধরলেন। তাঁর জীবনই ধৈর্য-সহ্যের পাথর দিয়ে গড়া। তাঁর কষ্ট ছিল সবার চাইতে বড় কষ্ট। তাঁর ধৈর্য ছিল সবার চাইতে বেশি ধৈর্য।

মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসীবতগ্রস্ত হবে, তখন সে যেন আমার মসীবতের কথা স্মরণ করে (সান্ত্বনা নেয়)। কারণ, সে মসীবত হল সবার চাইতে বড় মসীবত।" *(ইবনে সা'দ, সহীহুল জামে' ৩৪৭নং)*

সা'দ ﷺ বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত কারা হয়?' উত্তরে তিনি বললেন, "সকল মানুষ অপেক্ষা নবীগণই অধিকতর কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। অতঃপর তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি এবং তারপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিপদে আক্রান্ত হন। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতার) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়; সুতরাং তার দ্বীনে যদি মজবুতি থাকে, তবে (যে পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনে দুর্বলতা থাকে, তবে তার দ্বীন অনুযায়ী তার বিপদও (হাল্কা) হয়। পরন্তু বিপদ এসে এসে বান্দার শেষে এই অবস্থা হয় যে, সে জমীনে চলা ফেরা করে অথচ তার কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে'* ৯৯২ নং)

এই হিসাবে মহানবী ﷺ-এর ধৈর্য ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁর কষ্ট ও বালা-মসীবত ছিল সবার চাইতে বেশি, তাই তো মহান আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন,

{فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} (٣٥) سورة الأحقاف

"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রসূলগণ এবং

তাদের জন্য (শাস্তি প্রার্থনায়) তাড়াতাড়ি করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিবসের এক দন্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এ হল ঘোষণা। সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কাউকেও ধ্বংস করা হবে না।" (আহক্বাফ ঃ ৩৫)

{فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ} (٤٨) سورة القلم

"অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি তিমি-ওয়ালা (ইউনুস)এর মত অধৈর্য হয়ো না, যখন সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল।" (ক্বালাম ঃ ৪৮)

{فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} (٢٤) سورة الإنسان

"সুতরাং ধৈর্যের সাথে তোমার প্রতিপালকের ফায়সালার প্রতীক্ষা কর এবং তাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা অবিশ্বাসী তার আনুগত্য করো না।" (দাহর ঃ ২৪)

{وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} (١٠٩) سورة يونس

"তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ কর এবং আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর। আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাদাতা।" (ইউনুস ঃ ১০৯)

{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ (١٢٦) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللّهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ } (١٢٧) سورة النحل

"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তাহলে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম। তুমি ধৈর্যধারণ কর; আর তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের (অবিশ্বাসের) জন্য তুমি দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না।" (নাহ্‌ল ঃ ১২৬-১২৭)

{وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا} (١٠) سورة المزمل

"লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার ক'রে চল।" (মুয্যাম্মিল ঃ ১০)

জন্মের আগে পিতা হারিয়েছেন। শৈশবে মাতাকে হারালেন। এতীম হয়ে ধৈর্যধারণ করলেন। জীবনের শত কষ্টে সবর করলেন।

নবুঅতপ্রাপ্ত হলেন। দাওয়াত ও প্রচারের জন্য আদিষ্ট হলেন। গোপনে দাওয়াত দিতে লাগলেন। অতঃপর আদেশ এল,

{فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} (٩٤) سورة الحجر

অর্থাৎ, অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা কর। (হিজ্‌র ঃ ৯৪)

শুরু হল সংঘাত। একটি পূর্ণ পৌত্তলিক পরিবেশে যদি মূর্তিপূজা বর্জন করার দাওয়াত দেওয়া হয়, তাহলে সেখানকার পথে কাঁটা তো বিছানা হবেই। 'পাগল' বলা হবে, আরো কত শত অপবাদ দিয়ে দাঈকে নিবৃত্ত করার অপচেষ্টা করা হবে।

অকুতোভয় নবী ﷺ তবুও ক্ষান্ত হননি। কাফেরদের কষ্টদানে ধৈর্য ধরেছেন। তাদের

অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার সহ্য করেছেন। আবারও তওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। "হে লোক সকল! তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বল, পরিত্রাণ পাবে।"

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এল,

{وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (٢١٤) سورة الشعراء

অর্থাৎ, তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর। *(সূরা শুআরা ২১৪ আয়াত)*

সুতরাং তিনি স্বাফা পর্বতে চড়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!" লোকেরা বলল, 'কে চিৎকার করে সতর্ক করে?' কেউ কেউ বলল, 'মুহাম্মাদ।' তিনি বলতে লাগলেন, "ওহে বানী অমুক! ওহে বানী অমুক! ওহে বানী অমুক! ওহে বানী আব্দে মানাফ! ওহে বানী আব্দুল মুত্তালিব!"

সতর্কের এই আহবান শুনে সকল গোত্র থেকে লোকেরা তাঁর নিকট জমা হল। তিনি বললেন, "আমি যদি বলি, অশ্বারোহী এক শত্রুদল এই পাহাড়ের (অপর দিকে) নিম্নদেশে আমাদের উপর আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, আপনারা কি আমার সে কথায় বিশ্বাস করবেন?" সকলে বলে উঠল, 'আমাদের অভিজ্ঞতায় আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি।' তিনি বললেন, "তাহলে শুনুন! আমি আপনাদেরকে কঠোর শাস্তি আগত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করছি।"

তাঁর এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলে উঠল, 'সর্বনাশ হোক তোর! এ জন্যই কি আমাদেরকে জমায়েত করেছিস?' অতঃপর সে উঠে প্রস্থান করল। আর এরই প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হল সূরা লাহাব ঃ

{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} (١) سورة المسد

অর্থাৎ, আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে।-- *(বুখারী ৪৭৭০, মুসলিম ৫২৯নং)*

এরপর কুরাইশ প্রত্যেক সেই ব্যক্তির উপর অত্যাচার শুরু করে দিল, যে মহানবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনল। দুর্বল মুমিনদেরকে শাস্তি দিতে লাগল।

যখন অত্যাচারের পরিধি বাড়তে লাগল, তখন তিনি তাঁদেরকে হাবশা (আবিসিনিয়া)তে হিজরত করতে আদেশ করলেন।

এদিকে মহানবী ﷺ-সহ তাঁর গোত্রের লোকেদেরকে 'শি'বে আবী তালেব' (দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিচু জায়গা)তে অবরোধ করে রাখল। তাদের সাথে বাজার সহ সর্বপ্রকার বয়কট বহাল করল। এর ফলে বনী হাশেমের সংকট চরমভাবে বৃদ্ধি পেল। ভীষণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ল গোত্রের সমস্ত লোক। এমনকি খাদ্য ও পানীয়র অভাবে ক্ষুধার তাড়নায় মহিলা ও শিশুদের ক্রন্দনরোল বাইরে থেকেও শোনা যেত। এই অবস্থায় তাঁরা চামড়া ও গাছের পাতাও খেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অবরোধ লাগাতার ৩ বছর বহাল থাকল।

কঠিন অবরোধ থেকে মুক্তি পাওয়ার ৯ মাস পর মহানবী ﷺ-এর নবুঅতের দশম বর্ষে তাঁর চাচা আবূ তালেব ইসলাম গ্রহণ না করেই মারা গেলেন। আর এর ঠিক ২ মাস পরেই প্রেমময়ী স্ত্রী খাদীজাও ইহলোক ত্যাগ করলেন। মহানবী ﷺ চলার পথে (আল্লাহর পরপর) সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক দুই মহান ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে বসলেন। তখনও তিনি কত ধৈর্য ধারণ করলেন।

চাচা আবূ তালেবের মৃত্যুর পর আল্লাহর নবী ﷺ-এর প্রতি অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথে মহাপ্রতিদানের আশা রেখে তিনি সকল কষ্ট বরণ করে নিলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, আবূ তালেবের মৃত্যুর পর কুরাইশদল আল্লাহর নবী ﷺ-কে জীবনান্তকর কষ্ট দিতে শুরু করল।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত যে, একদা তিনি (কা'বার পাশে) নামায পড়ছিলেন। অনতি দূরে পড়ে ছিল (যবেহ করার পর) উটনীর গর্ভাশয়। (মহিলার যেটাকে ফুল বলা হয়। আবূ জাহলের আদেশক্রমে) উকবাহ বিন আবী মুআইত্ব তা উঠিয়ে এনে সিজদারত মহানবী ﷺ-এর পিঠে চাপিয়ে দিল। তিনি সিজদায় রত থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কন্যা ফাতিমা এসে তা তাঁর পিঠ থেকে সরিয়ে ফেললেন। অতঃপর তিনি উঠে নামায শেষ করে কুরাইশের জন্য বদ্দুআ করে বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশের ঐ গোষ্ঠীকে ধ্বংস কর।" *(বুখারী, মুসলিম ১৭৯৪নং)*

বুখারীতে আছে যে, একদা উক্ত উকবাহ বিন আবী মুআইত্ব মহানবী ﷺ-এর বাহুতে ধরে তাঁর ঘাড়ে চাদর পেঁচিয়ে তাঁর শ্বাসরোধ করে ফেলে। তা দেখে আবূ বাক্র ﷺ ছুটে এসে তাকে সরিয়ে ফেলে বলেন, তুই কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাস, যে 'আল্লাহ আমার প্রভু' বলে? *(বুখারী ৩৬৭৮নং)*

ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তিনি তায়েফে গেলেন। সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রহৃত হলেন। রক্তাক্ত দেহে ফিরে এলেন। তায়েফবাসীর অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করলেন, তবুও তাদের বিরুদ্ধে বদ্দুআ করলেন না।

খাব্বাব ইবনে আরাত্ত্ ﷺ বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলাম (এমতাবস্থায়) যে, তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় একটি চাদরে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা মুশরিকদের দিক থেকে নানা কষ্ট পাচ্ছিলাম। আমরা বললাম যে, 'আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাইবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দুআ করবেন না?' তিনি উঠে বসলেন এবং তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। বললেন, "(তোমাদের জানা উচিত যে,) তোমাদের পূর্বেকার (মু'মিন) লোকেদের এই অবস্থা ছিল যে, একটি মানুষকে ধরে আনা হত, তার জন্য গর্ত খুঁড়ে তাকে তার মধ্যে (পুঁতে) রাখা হত। অতঃপর তার মাথার উপর করাত চালিয়ে তাকে দু'খন্ড ক'রে দেওয়া হত এবং দেহের মাংসের নিচে হাড় পর্যন্ত লোহার চিরুনী চালিয়ে শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু এই (কঠোর পরীক্ষা) তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ নিশ্চয় এই ব্যাপারটিকে (দ্বীন ইসলামকে) এমন সুসম্পন্ন করবেন যে, একজন আরোহী সানআ' থেকে হাযরামাউত একাই সফর করবে; কিন্তু সে (রাস্তায়) আল্লাহ এবং নিজ ছাগলের উপর নেকড়ের আক্রমণ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ।" *(বুখারী ৩৬১২, ৩৮৫২, ৬৯৪৩নং)*

মুশরিকদের সাথে সংঘাত শুরু হল। ইসলাম শক্তিশালী হলে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার পালা এল। যুদ্ধ বাধল। হতাহতের ক্ষতিতে তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন।

উহুদের যুদ্ধে ৭০ জন সঙ্গীকে শহীদ করা হল। তাঁর আপন চাচাকে হত্যা করা হল, এক মহিলা তাঁর কলিজা বের ক'রে চিবিয়ে ফেলল! তা দেখে তিনি ধৈর্যধারণ করলেন।

সেদিন তিনি রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হলেন। তাঁর দাঁত ভেঙ্গে গেল। সেখানে তিনি ধৈর্য ধরলেন।

ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, আমি যেন (এখনো) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নবীদের মধ্যে এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে রক্তাক্ত ক'রে দিয়েছে, আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন এবং বলছেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা ক'রে দাও। কেননা তারা অজ্ঞ।" *(বুখারী ৩৪৭৭, মুসলিম ৪৭৪৭নং)*

ইবনে মাসউদ ﷺ আরো বলেন, হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মাল বন্টনে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোককে (তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য) প্রাধান্য দিলেন (অর্থাৎ, অন্য লোকের তুলনায় তাদেরকে বেশী মাল দিলেন)। সুতরাং তিনি আক্বরা' ইবনে হাবেসকে একশত উট দিলেন এবং উয়াইনা ইবনে হিস্নকেও তারই মত দিলেন। অনুরূপ আরবের আরো কিছু সম্ভ্রান্ত মানুষকেও সেদিন (মাল) বন্টনে প্রাধান্য দিলেন। (এ দেখে) একটি লোক বলল, 'আল্লাহর কসম! এই বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তোষ লাভের ইচ্ছা রাখা হয়নি!' আমি (ইবনে মাসউদ) বললাম, 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এই সংবাদ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেব।' অতএব আমি তাঁর কাছে এসে সেই সংবাদ দিলাম যা সে বলল। ফলে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে এমনকি লালবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন,

« فَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ».

"যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইনসাফ না করেন, তাহলে আর কে ইনসাফ করবে?" অতঃপর তিনি বললেন,

« يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِىَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ ».

"আল্লাহ মূসাকে রহম করুন, তাঁকে এর চাইতে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।"

অবশেষে আমি (মনে মনে) বললাম যে, 'আমি এর পরে কোন কথা তাঁর কাছে পৌঁছাব না।' *(বুখারী৩১৫০, মুসলিম ২৪৯৪নং)*

লোকেরা তাঁর প্রেমময়ী স্ত্রীর চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা লেপন করল। তাতেও তিনি ধৈর্য ধরলেন।

কত শত কষ্ট পেয়েছেন মহানবী ﷺ। কিন্তু যেমন তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন, তেমনই মহান প্রতিপালক তাঁকে সান্ত্বনাও দিয়েছেন।

{وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (١٧٦) سورة آل عمران

"যারা কুফরীতে শীঘ্রতা করে, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা নিশ্চয় আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ পরকালে তাদেরকে কোন অংশ দেওয়ার ইচ্ছা করেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" (আলে ইমরান ঃ ১৭৬)

{وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (٢٣)

"কেউ কাফের হলে তার কুফরী যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। আমারই নিকট ওদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর ওরা যা করেছে, আমি ওদেরকে তা অবহিত করব। অবশ্যই অন্তরে যা রয়েছে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" (লুক্বমান ঃ ২৩)

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن

قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ} (٤١) سورة المائدة

"হে রসূল! যারা মুখে বলে, 'বিশ্বাস করেছি' কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নয় ও যারা ইয়াহুদী হয়েছে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়।" *(মায়িদাহঃ ৪১)*

{قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ}

"আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে, তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়। আসলে তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং অত্যাচারিগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।" *(আনআমঃ ৩৩)*

{وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (٦٥) سورة يونس

"ওদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই যাবতীয় শক্তি-সম্মান আল্লাহরই জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।" (ইউনুস ঃ ৬৫)

{فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} (٧٦) سورة يــس

"অতএব ওদের কথা তোমাকে যেন কষ্ট না দেয়। আমি তো জানি যা ওরা গোপন করে এবং যা ওরা ব্যক্ত করে।" (ইয়াসীন ঃ ৭৬)

মহান আল্লাহ মহানবীর হয়ে প্রতিবাদ করেছেন, বিধান অবতীর্ণ করেছেন।

একদা তাঁর ফুফু সাফিয়্যার ছেলে যুবাইর এক আনসারীর সঙ্গে জমির সেচ নিয়ে গন্ডগোল বাধলে তাঁর কাছে বিচার নিয়ে এলেন। যুবাইরের জমি ছিল উপরে এবং আনসারীর জমি নিচে। আর মহানবী ﷺ ছিলেন সবার চেয়ে বেশি ন্যায়পরায়ণ, অভিজ্ঞ ও পরহেযগার। বিচারে প্রশস্ততা ও আনসারীর প্রতি সহানুভূতি রেখেই তিনি যুবাইরকে বললেন, "তুমি পানি আটকে রাখো। অতঃপর তোমার সেচ হয়ে গেলে পানি নিচের প্রতিবেশীর জমির জন্য ছেড়ে দাও।"

কিন্তু বিচার শুনে আনসারী রেগে উঠে বলল, 'আপনার ফুফাতো ভাই কি না, তাই এই ফায়সালা দিলেন।'

তা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠল। অতঃপর কঠোর ফায়সালা দিয়ে যুবাইরকে বললেন, "তুমি পানি আটকে রেখো, যতক্ষণ না তা জমির আল বা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে না যায়। তারপর পানি ছেড়ে দিয়ো।"

নিশ্চয় মহানবী ﷺ-এর মন খারাপ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি আনসারীর বিরুদ্ধে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন না। বরং ধৈর্য ধরলেন। আর তার দরুন মহান আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (٦٥) سورة النساء

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। (নিসা ঃ ৬৫)

দ্বীন-দুনিয়ার বাদশা হয়ে তিনি জীবন-জীবিকার কষ্টে ধৈর্যধারণ করেছেন। ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধেছেন! এক-দুই মাস ধরে একটানা তাঁর বাড়িতে চুলো জ্বলেনি। কেবল খেজুর-পানি ও দুধ খেয়ে কালাতিপাত করেছেন ধৈর্যশীল নবী ﷺ।

সকল নবীই আল্লাহর পথে ধৈর্যধারণ করেছেন। তবে আমার নবী ছিলেন তাঁদের সকলের শীর্ষে। মহান আল্লাহর লিখিত তকদীরের বালা-মসীবতে তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন, ধৈর্য ধরেছিলেন তাঁর আদেশ ও নিষেধ পালনে। ধৈর্য ধরেছিলেন মানুষের কষ্টদানে।

স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

তাঁর সত্যবাদিতা

নবীর সত্যবাদিতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কোন মু'মিন তো সন্দেহ করতেই পারে না। মু'মিনদের বিশ্বাস হয় সাহাবী খুযাইমাহ ؓ-এর মতো।

একদা মহানবী ﷺ সাওয়া বিন কাইস মুহারেবী বেদুঈনের নিকট থেকে একটি ঘোড়া কিনলেন। কিন্তু সে ঐ বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করল এবং বলল, 'তুমি যদি আমার কাছে ঘোড়া কিনেছ, তাহলে সাক্ষী উপস্থিত কর।'

এ কথা শুনে খুযাইমাহ বিন সাবেত সাহাবী ؓ তাঁর সপক্ষে সাক্ষি দিয়ে বললেন, 'এই ঘোড়া তোমার নিকট থেকে উনি খরীদ করেছেন।'

নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "তুমি তো আমাদের ঘোড়া ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উপস্থিত ছিলে না, তাহলে সাক্ষি দিলে কীভাবে?"

তিনি বললেন, 'আপনি যা বলেন, তাতেই আমি আপনাকে সত্যবাদী বলে জানি। আরো জানি যে আপনি কখনো মিথ্যা বলবেন না।'

মহানবী ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তির সপক্ষে অথবা বিপক্ষে খুযাইমাহ সাক্ষি দেবে, সাক্ষির জন্য সে একাই যথেষ্ট।" আর তখন থেকেই তাঁর উপাধি পড়ে গেল 'ডবল সাক্ষি-ওয়ালা' সাহাবী। *(আবূ দাউদ ৩৬০৭, নাসাঈ ৪৬৬১নং, ত্বাবারানী, হাকেম ২/২২, বাইহাকী ১০/১৪৬)*

অমুসলিমরাও তাঁকে সত্যবাদীরূপেই জানত। সে সাক্ষি তারা নিজেরাই দিয়েছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবী ﷺ-এর কাছে নির্দেশ এল,

{وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (٢١٤) سورة الشعراء

অর্থাৎ, তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর। *(সূরা শুআরা ২১৪ আয়াত)*

সুতরাং তিনি স্বাফা পর্বতে চড়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!" লোকেরা বলল, 'কে চিৎকার করে সতর্ক করে?' কেউ কেউ বলল, 'মুহাম্মাদ।' তিনি বলতে লাগলেন, "হে বানী অমুক! হে বানী অমুক! হে বানী অমুক! হে বানী আব্দে মানাফ! হে বানী আব্দুল মুত্তালিব!"

সতর্কের এই আহবান শুনে সকল গোত্র থেকে লোকেরা তাঁর নিকট জমা হল। তিনি বললেন, "আমি যদি বলি, অশ্বারোহী এক শত্রুদল এই পাহাড়ের (অপর দিকে) নিম্নদেশে আমাদের উপর আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, আপনারা কি আমার সে কথায় বিশ্বাস করবেন?" সকলে বলে উঠল, 'আমাদের অভিজ্ঞতায় আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি।' তিনি বললেন, "তাহলে শুনুন! আমি আপনাদেরকে কঠোর শাস্তি আগত

হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করছি।”

তাঁর এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলে উঠল, ‘সর্বনাশ হোক তোর! এ জন্যই কি আমাদেরকে জমায়েত করেছিস?’ অতঃপর সে উঠে প্রস্থান করল। আর এরই প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হল সূরা লাহাব ঃ

{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} (١) سورة المسد

অর্থাৎ, আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক সে নিজে।-- *(বুখারী ৪৭৭০, মুসলিম ৫২৯নং)*

সম্রাট হিরাকিল মহানবী ﷺ-এর মহাশক্র মুশরিকদের প্রতিনিধি আবূ সুফয়ানকে এক প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘তোমাদের কাছে কি তাঁর নবুঅতের দাবীর আগে তিনি মিথ্যাবাদী বলে অভিযোগ আছে?’

আবূ সুফিয়ান বলেছিল, ‘না।’ *(বুখারী ৭, মুসলিম ৪৭০৭নং)*

মহান আল্লাহও সে কথার সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন,

{قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ}

“আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে, তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়। আসলে তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং অত্যাচারিগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।” *(আনআম ঃ ৩৩)*

তিনি ছিলেন মহাসত্যবাদী এবং তিনি সত্যকে খুব পছন্দ করতেন। তাই তিনি বলেছেন,

(أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ).

অর্থাৎ, আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কথা হল, যা সত্য। *(বুখারী ২৩০৭নং)*

পরিবারের কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে একটা মিথ্যা বলতে শুনলে তার তওবা না করা পর্যন্ত তিনি তার প্রতি বৈমুখ থাকতেন। *(আহমাদ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৪৬৭৫নং)*

আর তিনি বলেছেন, “নিশ্চয় সত্য পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (অবিরত) সত্য বলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাকে খুব সত্যবাদী বলে লেখা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (সর্বদা) মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ অবধি আল্লাহর নিকটে তাকে মহা মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।” *(বুখারী ৬০৯৪, মুসলিম ৬৮০৩নং)*

তাঁর ইবাদত

রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার চাইতে বড় আবেদ ছিলেন। তাঁর ইবাদতের বর্ণনা দিয়ে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ রাত্রির একাংশে (নামাযে) এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা ফুলে ফাটার উপক্রম হয়ে পড়ত। একদা আমি তাঁকে বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি এত কষ্ট সহ্য করছেন কেন? অথচ আপনার তো পূর্ব ও পরের গুনাহসমূহকে ক্ষমা ক’রে দেওয়া হয়েছে।’ তিনি বললেন, “আমি কি শুকরগুযার বান্দা হব না?” *(বুখারী ৪৮৩৭, মুসলিম ৭৩০৪নং)*

রাত্রে তিনি ১১ রাকআত তাহাজ্জুদ পড়তেন। কখনো পড়তেন ১৩ রাকআত। *(বুখারী ১১৪৭, মুসলিম ৭৩৭নং)*

রাতের এই নামাযকে তিনি কখনো কখনো এত দীর্ঘ করতেন যে, এক রাকআতে তিনি

প্রায় পাঁচ পারা কুরআন তিলাঅত করতেন!

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক রাতে নামায পড়েছি। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমি একটা মন্দ কাজের ইচ্ছা ক'রে ফেলেছিলাম।' ইবনে মাসউদ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সে ইচ্ছাটা কী করেছিলেন?' তিনি বললেন, 'আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে, তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ি।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

হুযাইফা ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক রাতে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ আরম্ভ করলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, 'একশত আয়াতের মাথায় তিনি রুকু করবেন।' (কিন্তু) তিনি তারপরও কিরাআত চালু রাখলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, 'তিনি এরই দ্বারা (সূরা শেষ করে) রুকু করবেন।' কিন্তু তিনি সূরা নিসা পড়তে আরম্ভ করলেন এবং সম্পূর্ণ পড়লেন। তিনি স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে তেলাঅত করতেন। যখন এমন আয়াত আসত, যাতে তাসবীহ পাঠ করার উল্লেখ আছে, তখন (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করতেন। যখন কোন প্রার্থনা সম্বলিত আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। যখন কোন আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (অতঃপর) তিনি রুকু করলেন। সুতরাং তিনি রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পড়তে আরম্ভ করলেন। আর তাঁর রুকু ও কিয়াম (দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়া অবস্থা) এক সমান ছিল। তারপর তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা অলাকাল হাম্দ' (অর্থাৎ আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রশংসা শুনলেন, যে তা তাঁর জন্য করল। হে আমাদের পালনকর্তা তোমার সমস্ত প্রশংসা) পড়লেন। অতঃপর বেশ কিছুক্ষণ (কওমায়) দাঁড়িয়ে থাকলেন রুকুর কাছাকাছি সময় জুড়ে। তারপর সাজদাহ করলেন এবং তাতে তিনি পড়লেন, 'সুবহানাল্লা রাব্বিয়াল আ'লা' (অর্থাৎ আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)। আর তাঁর সাজদা দীর্ঘ ছিল তার কিয়াম (দাঁড়িয়ে কিরাআত পড়া অবস্থা)র কাছাকাছি। *(মুসলিম ৭৭২নং)*

ফরয নামাযের আগে-পরে সুনানে রাতেবাহ পড়তেন ১২ রাকআত। *(মুসলিম ৭২৮নং)* কোন কোন দিন তিনি ১০ রাকআত পড়তেন। *(বুখারী ১১৭২, মুসলিম ৭২৯নং)*

চাশ্তের নামায পড়তেন ৪ বা তারও বেশি রাকআত। *(মুসলিম ৭১৯নং)*

সুতরাং দিবারাত্রি ফরয-সহ তাঁর নামাযের মোট রাকআত-সংখ্যা হতো চল্লিশের বেশি। *(কিতাবুস স্বালাত, ইবনুল কাইয়েম ১৪০পৃঃ)*

এ ছাড়া তিনি অন্যান্য অতিরিক্ত নামায পড়তেও উৎসাহিত করেছেন উম্মতকে।

নামাযের মধ্যে তিনি 'স্বস্তি' অনুভব করতেন। *(আহমাদ ২৩০৮৮, আবূ দাউদ ৮৫৪৯নং)*

নামায ছিল তাঁর চক্ষুশীতলকারী ইবাদত। *(আহমাদ ১২২৯৩, নাসাঈ ৩৯৩৯নং)*

রমযানের রোযা ছাড়া তিনি প্রত্যেক মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম ৩ দিন রোযা রাখতেন। *(মুসলিম ১১৬০নং)*

প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারেও রোযা রাখতেন। *(তিরমিযী ৭৪৫, নাসাঈ ২১৮৬নং)*

শা'বান মাসের প্রায় সবটাই রোযা রাখতেন। *(বুখারী ১৯৬৯, মুসলিম ১১৫৬নং)*

শওয়াল মাসের ৬টি রোযা রাখতে উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। *(মুসলিম ১১৬৪নং)*

তিনি মুহার্রামের ১০ তারীখে আশূরার রোযা রাখতেন। *(বুখারী ২০০০, মুসলিম ১১২৫নং)*

যুলহজ্জ মাসের প্রথম ৯ দিনও রোযা রাখতেন। *(আহমাদ ২২৩৩৪, আবূ দাউদ ২৪৩৭, সঃ নাসাঈ ২২৩৬নং)*

কখনো তিনি রোযা রাখতেন, মনে হতো তিনি রোযা ছাড়বেন না। আবার কখনো তিনি রোযা রাখতেন না, মনে হতো তিনি আর রোযা রাখবেন না। *(বুখারী ১৯৭১, মুসলিম ১১৫৬নং)*

ইফতারী না করে তিনি একটানা ২-৩ দিন রোযা (সওমে বিসাল) রাখতেন। অবশ্য উম্মতকে এ রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ১৯৬১, মুসলিম ১১০২নং)*

তিনি ধনবান ছিলেন না। তাঁর নিকট যাই থাকত, তাই দান করার মাধ্যমে আর্থিক ইবাদত করতেন। রমযান মাসে তিনি বেশি দান করতেন। *(বুখারী ৬, মুসলিম ২৩০৮-নং)*

তিনি এমন দান করতেন যে, তারপর তিনি অভাবী হয়ে যাবেন, সে ভয় করতেন না। *(মুসলিম ২৩১২নং)*

তিনি ছিলেন সবার চাইতে বেশি দানশীল। *(বুখারী ৬০৩৩, মুসলিম ২৩০৮-নং)*

হিজরতের পরে একবার হজ্জ করেছেন। অবশ্য হিজরতের পূর্বে দুই বা তারও বেশী হজ্জ করেছেন।

তিনি উমরাহ করেছেন মোট চারটি।

বাকী তাঁর ব্যবহার ও সংসার জীবনের প্রায় সব কর্মই ছিল ইবাদত।

এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি ইবাদতে অতিরঞ্জন পছন্দ করতেন না। অবশ্য তিনি যে আমল করতেন, তা নিরবচ্ছিন্নভাবে করতেন।

তিনি বলতেন,

« عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا ».

"তোমরা সাধ্যমত আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।"

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যেটা তার আমলকারী লাগাতার ক'রে থাকে।' *(বুখারী ১৯৭০, মুসলিম ৭৮-২নং)*

আনাস ﷺ বলেন যে, তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, 'আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন ক'রে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)।' সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।' দ্বিতীয়জন বললেন, 'আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বললেন, 'আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন,

(أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي).

"তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত (তরীকা) হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ১৪০১নং)*

তিনি বলতেন,

(إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ).

"নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।" *(বুখারী ৩৯নং)*

তাঁর ন্যায়পরায়ণতা

ন্যায়পরায়ণতা এমন একটি সদাচরণ, যার দ্বারা দোস্ত ও দুশমনকে বশীভূত করা যায়। ইনসাফ-কার্য দ্বারা রাজার রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব লাভ করে। তাই ইসলামে এ গুণের গুরুত্ব অসীম।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন ন্যায়পরায়ণ বিচারক, ন্যায়পরায়ণ বাদশা, ন্যায়পরায়ণ সাংসারিক।

তিনি শাসনকার্যে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতেন এবং তাঁর সকল ভারপ্রাপ্তকে ন্যায়পরায়ণ হতে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি বলেছেন,

"আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তাদের মধ্যে একজন হল,) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা)। *(বুখারী ৬৬০, মুসলিম ২৪২৭নং)*

"আল্লাহর নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ।" *(মুসলিম ১৮২৭নং)*

"যে কোন দশ ব্যক্তির আমীরকে কিয়ামতের দিন বেড়ি পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। পরিশেষে হয় তাকে তার (কৃত) ন্যায়পরায়ণতা বেড়ি-মুক্ত করবে, নচেৎ তার (কৃত) অত্যাচারিতা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।" *(আহমাদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫৬৯৫নং)*

তিনি নিজ বিচারকার্যে ন্যায়পরায়ণতা বহাল রেখেছেন। আর তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেছেন,

"কাযী (বিচারক) তিন প্রকার। এদের মধ্যে একজন জান্নাতী এবং অপর দু'জন জাহান্নামী।

জান্নাতী হল সেই বিচারক যে 'হক' (সত্য) জানল এবং সেই অনুযায়ী বিচার করল। আর যে বিচারক 'হক' জানা সত্ত্বেও অবিচার করল, সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক না জেনে (বিনা ইলমে) লোকেদের বিচার করল, সেও জাহান্নামী।" *(আবূ দাউদ ৩৫৭৩, তিরমিযী ১৩২২, ইবনে মাজাহ ২৩১৫, সহীহুল জামে' ৪৪৪৬নং)*

আর মহান আল্লাহ বিচারকার্যে ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন উম্মতকে। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (٥٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত উৎকৃষ্ট ! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(নিসা ঃ ৫৮)*

বিচার অমুসলিমদের মাঝে হলেও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রেখেছেন বিশ্বনবী ﷺ। মদীনায় ইয়াহুদীদের দুটি গোত্র ছিল; বানূ নাযীর ও বানূ কুরাইযা। বানূ নাযীর ছিল বানূ কুরাইযা অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত। ফলে তাদের রক্তপণ ছিল দ্বিগুণ। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে বানূ কুরাইযা ডবল রক্তপণ দিতে অস্বীকার করল এবং এ ব্যাপারে সব গোত্রেরই সমানাধিকার হওয়ার কথা দাবী করল। তারা তা মেনে না নিলে মহানবী ﷺ-এর কাছে অভিযোগ দায়ের করে বিচারপ্রার্থী হল। তিনি তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার ফায়সালা দিলেন। এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হল কুরআনের এই আয়াত,

{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}

অর্থাৎ, তাদের জন্য ওতে (তওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ, নাকের বদল নাক, কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত এবং জখমের বদল অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে ওতে তারই পাপ মোচন হবে। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অত্যাচারী। *(মায়িদাহ ঃ ৪৫)*

অন্য এক বর্ণনামতে বানূ নাযীর বানূ কুরাইযার কাউকে হত্যা করলে অর্ধেক রক্তপণ আদায় করত। পক্ষান্তরে বানূ কুরাইযা বানূ নাযীরের কাউকে হত্যা করলে পুরো রক্তপণ আদায় করতে হতো। মহানবী ﷺ-এর কাছে বিচার এলে তিনি তাদের মাঝে ইনসাফ কায়েম করলেন।

তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ ছিল,

{سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (٤٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ উপায়ে লব্ধ বস্তু ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত, তারা যদি তোমার নিকট আসে, তাহলে তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর। আর যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাহলে তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি বিচার-নিষ্পত্তি কর, তাহলে তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার-নিষ্পত্তি কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। *(মায়িদাহ ঃ ৪২, আবূ দাউদ ৩৫৯১, নাসাঈ ৪৭৩৩নং)*

শাস্তিদানেও তিনি ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীর বুকে বিচারকার্যের অনুপম দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী ধনী হোক বা গরীব, উচ্চ-বংশীয় হোক বা বংশ-পরিচয়হীন, বিচারকের আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, এমনকি রাষ্ট্রনেতার কোন আত্মীয় হলেও তার প্রতি সেই সাজা প্রয়োগ করতে কোন বাধা থাকা চলবে না ইসলামের আদালতে।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা (এক উচ্চবংশীয়া) মাখযূমী মহিলা চুরি করার ফলে ধরা পড়লে তাকে নিয়ে কুরাইশ বংশের লোকেরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। (তার

হাত যাতে কাটা না হয় সেই চেষ্টায়) তারা বলাবলি করল, 'ওর ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে কে কথা বলবে?' পরিশেষে তারা বলল, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র উসামাহ বিন যায়দ ছাড়া আর কে (এ ব্যাপারে) তাঁর সাথে কথা বলার দুঃসাহস করবে?'

সুতরাং (তাদের অনুরোধ মতে) উসামাহ তাঁর সাথে কথা বললেন (এবং ঐ মহিলার হাত যাতে কাটা না যায় সে ব্যাপারে সুপারিশ করলেন)। এর ফলে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন,

« أَتَشْفَعُ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ».

"(হে উসামাহ!) তুমি কি আল্লাহর দন্ডবিধিসমূহের এক দন্ডবিধি (কায়েম না হওয়ার) ব্যাপারে সুপারিশ করছ?!"

অতঃপর তিনি দন্ডায়মান হয়ে ভাষণে বললেন,

« أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ».

"তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ জন্যই ধ্বংস হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চবংশীয় (বা ধনী) লোক চুরি করলে তারা তাকে (দন্ড না দিয়ে) ছেড়ে দিত। আর কোন (নিম্নবংশীয়, গরীব বা) দুর্বল লোক চুরি করলে তারা তার উপর দন্ডবিধি প্রয়োগ করত। পক্ষান্তরে আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করত, তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম।" *(বুখারী ৬৭৮৮, মুসলিম ১৬৮৮নং, আসহাবে সুনান)*

অতঃপর সেই মহিলার হাত কাটা হল। পরে তার তওবা সত্যরূপে প্রকাশ পেয়েছিল এবং তার বিবাহও হয়েছিল।

মহানবী ﷺ মানুষের সাথে ব্যবহারে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তিনি অন্ধ পক্ষপাতিত্বের বেড়া, ভেদাভেদের প্রাচীর, বর্ণ-বৈষম্যের অন্তরাল তুলে দিয়ে গেছেন। ঈমান ও ইসলামের ছত্রছায়ায় সকলকে সমানরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

যে কোনও মুসলিম ভালো কাজ করবে, সে ইসলামে ভালো হবে। চাহে তার দেশ, বংশ, ভাষা, রং যাই হবে হোক। তাদের মধ্যে প্রতিদানে কাউকে কম, কাউকে বেশি দেওয়া হবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (٩٧) سورة النحل

অর্থাৎ, পুরুষ ও নারী যে কেউই বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই সুখী জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। *(নাহল ঃ ৯৭)*

ধনী-গরীব, অভিজাত-অনভিজাত সকলের ভেদাভেদ মুছে দিয়ে ইসলামের আহবান,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (١٣) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। (হুজুরাত ঃ ১৩)

বিশ্ব-মানবতার নবী ﷺ বলেন,

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى).

"হে লোক সকল! শোনো, তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতাও এক। শোনো, অনারবীর উপর আরবীর এবং আরবীর উপর অনারবীর, কৃষ্ণাঙ্গের উপর গৌরাঙ্গের এবং গৌরাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়া'র ভিত্তিতেই।" *(আহমাদ ২৩৪৮৯নং)*

বিরোধী ও শত্রুর সাথে ন্যায়পরায়ণতা

নিজের বিরুদ্ধে অথবা নিজের আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে হয় ইসলামে। যেহেতু মহান প্রতিপালকের নির্দেশ,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (٨) سورة المائدة

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন।" (মায়িদাহ ঃ ৮)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (١٣٥) سورة النساء

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল, তাহলে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। (নিসা ঃ ১৩৫)

{وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (١٥٢)

অর্থাৎ, যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বল এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (আনআম ঃ ১৫২)

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একটি লোক নবী ﷺ-এর নিকট এসে রূঢ়ভাবে তাঁর কাছে পাওনা তলব করল। তখন সাহাবীগণ তাকে ভর্ৎসনা করতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন,

(دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا).

"ওকে ছেড়ে দাও। কারণ হক (পাওনা)দারের কথা বলার অধিকার আছে।"

তারপর বললেন, "ওকে ঠিক সেই বয়সের (উট) দিয়ে দাও যে বয়সের (উট) ওর ছিল।" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তার চেয়ে উত্তম (উট) বৈ পাচ্ছি না।' তিনি বললেন, "ওকে (ওটিই) দিয়ে দাও, কেননা, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ ক'রে থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আর এক মরুবাসী (বেদুঈন) লোকের কাছে তিনি কিছু খেজুর ধার করেছিলেন। সে তাঁর নিকট নিজের পাওনা আদায় করতে এসে তাঁকে কটু কথা শুনাতে লাগল। এমনকি সে তাঁকে বলল, 'আপনি আমার ঋণ পরিশোধ না করলে, আমি আপনাকে মুশকিলে ফেলব!' এ কথা শুনে সাহাবাগণ তাকে ধমক দিলেন ও বললেন, 'আরে বেআদব! জান তুমি কার সাথে কথা বলছ?' লোকটি বলল, 'আমি আমার হক আদায় চাচ্ছি।' মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা হকদারের সঙ্গ দিলে না কেন?" অতঃপর তিনি খাওলাহ বিন্তে কাইসের নিকট বলে পাঠালেন যে, "যদি তোমার কাছে খেজুর থাকে, তাহলে আমাকে ধার দাও। অতঃপর আমাদের খেজুর এলে তোমাকে পরিশোধ করে দেব।" খাওলাহ বললেন, 'অবশ্যই দেব। আমার আব্বা আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল!' অতঃপর তিনি খেজুর দিলে মহানবী ﷺ লোকটির ঋণ পরিশোধ করলেন এবং আরো কিছু বেশী খেতে দিলেন। লোকটি বলল, 'আপনি আমার হক পূরণ করলেন, আল্লাহ আপনার হক পূরণ করুক।' মহানবী ﷺ বললেন, "ওরাই হল ভাল লোক, (যারা সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।) সে জাতি পবিত্র হবে না (বা না হোক), যে জাতির দুর্বল ব্যক্তি নিজ অধিকার অনায়াসে আদায় না করতে পেরেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২৬, বাযযার, ত্বাবারানী, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ২৪২১ নং)*

পাওনাদার কড়া কথা বলতে পারে, এ ইনসাফ কায়েম করলেন ন্যায়পরায়ণ নবী ﷺ। যদিও সে তাঁর প্রতি বেআদবের মতো ব্যবহার প্রদর্শন করেছে।

হলেই বা শত্রুপক্ষ, হলেই বা অমুসলিম, তবুও তার পাওনা পাওয়ার অধিকার আছে।

আবূ হাদরাদ আসলামীর কাছে এক ইয়াহুদীর চার দিরহাম পাওনা ছিল। সুতরাং সে তাঁর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নালিশ জানিয়ে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! এর কাছে আমার চার দিরহাম পাওনা আছে। তা আদায় করতে আমাকে হার মানিয়েছে।'

নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "ওকে ওর পাওনা দিয়ে দাও।"

তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য-সহ প্রেরণ করেছেন! আমি তা পরিশোধে অক্ষম।'

নবী ﷺ পুনরায় তাকীদ দিয়ে বললেন, "ওকে ওর পাওনা দিয়ে দাও।"

তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! আমি তা পরিশোধে অক্ষম। আমি ওকে বলেছি, আপনি আমাদেরকে খায়বার পাঠাবেন এবং আশা করি যে, আপনি কিছু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দেবেন। অতঃপর ফিরে এসে আমি তার পাওনা মিটিয়ে দেব।'

কিন্তু নবী ﷺ আবারো জোর দিয়ে বললেন, "ওকে ওর পাওনা দিয়ে দাও।"

মহানবী ﷺ-এর ব্যাপারে রীতি এমন ছিল যে, তিনি কোন আদেশ তিনবার করলে আর তাঁর সাথে কেউ কথা বলতে পারতেন না। সে আদেশ প্রত্যাহার করার আর কোন আশা থাকত না।

সুতরাং আবূ হাদরাদ বাদীকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে বের হয়ে গেলেন। তাঁর মাথায় পাগড়ি

ছিল এবং পরনে ছিল একটি চাদর। মাথার পাগড়িটা খুলে নিয়ে কোমরে জড়ালেন এবং চাদরটা খুলে নিয়ে বললেন, 'তুমি এটা আমার কাছ থেকে কিনে নাও।'

সুতরাং সেটাকে তার কাছে চার দিরহামে বিক্রি করে দিয়ে তার দেনা পরিশোধ করলেন।

সেখানে এ বৃদ্ধা তাঁর এ দশা দেখে বলল, 'হে রাসূলুল্লাহর সাথী! কী ব্যাপার আপনার?'

তিনি ঘটনা খুলে বললে, সে তাঁর গায়ে একটি চাদর ছুঁড়ে দিল। *(আহমাদ ১৪৯৪২, সিঃ সহীহাহ ২ ১০৮-নং)*

আনসারদের যাফার গোত্রের ত্বো'মা অথবা বাশীর ইবনে উবাইরিক্ব নামক এক ব্যক্তি অপর এক আনসারীর বর্ম চুরি ক'রেছিল। যখন এই চুরির চর্চা হতে লাগল এবং যখন সে অনুভব করল যে, তার চুরির কথা ফাঁস হয়ে যাবে, তখন সে (চুরিকৃত) বর্মটি এক ইয়াহুদীর বাড়িতে ফেলে দিয়ে যাফার গোত্রের কিছু লোককে সাথে নিয়ে রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। সকলে মিলে বলল যে, বর্মটা অমুক ইয়াহুদী চুরি করেছিল। সেই ইয়াহুদীও নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'ইবনে উবাইরিক্ব বর্ম চুরি ক'রে আমার বাড়িতে ফেলে দিয়েছিল।'

যাফার গোত্রের লোকেরা (ত্বো'মা অথবা বাশীর প্রভৃতি) প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল। তারা নবী করীম ﷺ-কে বুঝাতে চেষ্টা করছিল যে, চোর ইয়াহুদীই; ত্বো'মার উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে।

নবী করীম ﷺ তাদের চমৎকার ও চাতুর্যপূর্ণ কথাবার্তায় প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লেন এবং আনসারীকে চুরির অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা ক'রে ইয়াহুদীকে চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করতে যাবেন, ঠিক এই সময়ই মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন।

{إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا}

অর্থাৎ, তোমার প্রতি সত্য সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর। আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের সপক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। (নিসা ঃ ১০৫)

যেহেতু নবী করীম ﷺ একজন মানুষ ছিলেন, বিধায় তিনি ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন না। তাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবাণী এল এবং সেই অনুযায়ী ইয়াহুদীকে অপরাধমুক্ত ঘোষণা করলেন। ইয়াহুদী বলে তার ব্যাপারে অন্যায়াচরণ করলেন না।

বিবদমান দুই গোষ্ঠীর মাঝে সন্ধি স্থাপনে ন্যায়পরায়ণতা বজায় করতে আদিষ্ট হয়েছে মুসলিমরা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (٩) سورة الحجرات

অর্থাৎ, মু'মিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর; অতঃপর তাদের একদল অপর দলের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করলে তোমরা বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সন্ধি স্থাপন কর এবং সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ

সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (হুজুরাত ঃ ৯)

নিজ সন্তানদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন মহানবী ﷺ।

নু'মান ইবনে বাশীর ؓ-এর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, 'আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম দান করেছি। (কিন্তু এর মা আপনাকে সাক্ষী রাখতে বলে।)' নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ?" তিনি বললেন, 'না।' নবী ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তা ফেরৎ নাও।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমার সব ছেলের সঙ্গেই এরূপ ব্যবহার দেখিয়েছ?" তিনি বললেন, 'না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

« اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِى أَوْلاَدِكُمْ ».

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। সুতরাং আমার পিতা ফিরে এলেন এবং ঐ সাদকাহ (দান) ফিরিয়ে নিলেন।"

আর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে বাশীর! তোমার কি এ ছাড়া অন্য সন্তান আছে?" তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ।' (রসূল ﷺ) বললেন, "তাদের সকলকে কি এর মত দান দিয়েছ?" তিনি বললেন, 'জী না।' (রসূল ﷺ) বললেন, "তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে সাক্ষী মেনো না। কারণ আমি অন্যায় কাজে সাক্ষ্য দেব না।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমাকে অন্যায় কাজে সাক্ষী মেনো না।"

অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, "এ ব্যাপারে তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সাক্ষী মানো।" অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি কি এ কথায় খুশী হবে যে, তারা তোমার সেবায় সমান হোক?" বাশীর বললেন, 'জী অবশ্যই।' তিনি বললেন, "তাহলে এরূপ করো না।" *(বুখারী ২৬৫০, মুসলিম ৪২৬২-৪২৭৪নং)*

কোন উপহার বা অতিরিক্ত কিছু দিলে সন্তানদের সকলকে সমানভাবে দিতে হবে। অনেকের মতে ছেলেমেয়ে উভয়কেই সমান দিতে হবে। অবশ্য সঠিকমতে মীরাস-বন্টনের মতো মেয়ের দ্বিগুণ ছেলেকে দিতে হবে। দ্বীনদার ও পাপাচারীর মাঝে পার্থক্য করা যাবে না। পাপাচারীকে উপদেশ দিতে হবে। *(ফতোয়া ইবনে বায, রাহমাতুল লিল-আলামীন ১০/৪)* অবশ্য সন্তান কাফের বা নাস্তিক হলে আলাদা কথা।

মহানবী ﷺ স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা বহাল রাখতেন। ইনসাফের সাথে প্রত্যেকের বাসায় পালাক্রমে রাত্রিযাপন করতেন। সকলকে সমানভাবে ভরণপোষণ ও খোরপোশ দিতেন। আর তিনি বলতেন,

« مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ».

"যে ব্যক্তির দু'টি স্ত্রী আছে, কিন্তু সে তন্মধ্যে একটির দিকে ঝুঁকে যায়, এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার অর্ধদেহ ধসা অবস্থায় উপস্থিত হবে।" *(আহমাদ ২/৩৪৭, আসহাবে সুনান, হাকেম ২/ ১৮৬, ইবনে হিব্বান ৪১৯৪নং)*

কিন্তু নতুন বিবাহিত হলে তার প্রাথমিক অধিকার আছে বেশি। তার ব্যাপারেও ন্যায্য অধিকার দিয়েছেন দ্বীনের নবী ﷺ। কুমারী হলে তার কাছে ৭ দিন এবং অকুমারী হলে ৩ দিন রাত্রিবাস ক'রে পরে সমানভাবে পালা নির্ধারণ হবে। *(বুখারী ৫২১৪, মুসলিম ১৪৬১নং)*

মহানবী ﷺ যখন সফরে বের হতেন, তখনও স্ত্রীদের অধিকারের কথা খেয়াল রাখতেন।

কিন্তু সকল স্ত্রীকে সঙ্গে নেওয়া সম্ভব ছিল না, তাই তাদের মাঝে লটারি করতেন এবং একজনকে সঙ্গে নিতেন। *(বুখারী ২৫৯৩, মুসলিম ২৭৭০নং)*

স্ত্রীগণের মাঝে কোন প্রকার সতীনের ঈর্ষাঘটিত কোন অন্যায়াচরণ কারো দ্বারা ঘটে থাকলে সেক্ষেত্রেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতেন তিনি। একদা তিনি এক স্ত্রীর বাসায় ছিলেন। অন্য এক স্ত্রী দাসীর মাধ্যমে তাঁর কাছে এক পাত্র কোন খাবার পাঠালেন। যাঁর বাসায় তিনি ছিলেন, সেই স্ত্রী দাসীর হাতে আঘাত করলে পাত্রটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। নবী ﷺ পাত্রের টুকরাগুলো জমা করে তার উপরে খাবারগুলো রাখতে লাগলেন এবং বললেন,

(غَارَتْ أُمُّكُمْ). "তোমাদের মা ঈর্ষান্বিতা হয়ে পড়েছে!"

অতঃপর দাসীকে যেতে দিলেন না, যতক্ষণ না তিনি যার বাসায় ছিলেন, তার বাসা থেকে একটি ভালো পাত্র আনা হল। অতঃপর তিনি ভালো পাত্রটি তাঁকে দিয়ে পাঠালেন, যাঁর পাত্র ভাঙ্গা হয়েছিল। আর ভাঙ্গা পাত্রটি তাঁর বাসায় রেখে নিলেন, যাঁর বাসায় তিনি ছিলেন। *(বুখারী ৫২২৫, ২৪৮১নং)*

উক্ত হাদীসে মহানবী ﷺ-এর স্ত্রীদের সাথে ধৈর্যশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রকৃষ্ট নমুনা বিদ্যমান। তাছাড়া তিনি নিজেই বলেছিলেন,

(أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي).

"সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর এবং ওদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।" *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১২৩২নং)*

যৌথকর্মে ন্যায়পরায়ণতা

একদা নবী ﷺ কোন সফরে সাহাবাগণের সঙ্গে ছিলেন। একটি বকরী পাকিয়ে খানা প্রস্তুত করার সময় এলে কেউ বকরী যবেহ করার দায়িত্ব নিল, কেউ পাকাবার দায়িত্ব নিল। আর তিনি নিলেন জ্বালানি সংগ্রহ করার দায়িত্ব। *(আর্রাহীকুল মাখতূম ৪৭৮পৃঃ)*

মহানবী ﷺ-এর ন্যায়পরায়ণতা, তা ছিল স্বয়ং প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সেই মাদ্রাসায় শিক্ষিত ছাত্রদল যখন বিশ্বজয় করেন, তখন তাঁরাও বিশ্বকে ন্যায়পরায়ণতার বৃষ্টিতে পরিপ্লুত করেন। ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁদেরই একজন অত্যাচারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

(مَتَى اسْتَعْبَدتُّمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا ؟)

অর্থাৎ, কখন মানুষকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছ, অথচ তাদের মাতৃগণ তাদেরকে স্বাধীনরূপে জন্ম দিয়েছে? *(আমীরুল মু'মিনীন উমার বিন খাত্ত্বাব ১/১২৪)*

মহানবী ﷺ-এর ভুল-ত্রুটি

মহানবী ﷺ মানুষ ছিলেন। তাই মানুষের প্রকৃতি অনুসারে স্বভাবতই তিনি অনেক কিছু ভুলে যেতেন। আর সেটা নবুঅতের জন্য কোন ত্রুটি বা কমি নয়। পক্ষান্তরে নবুঅতের তাবলীগে তাঁর ভুল হতো না। মহান আল্লাহর অবতীর্ণ অহী তিনি ভুলতেন না। যেহেতু তার হিফাযতের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٩) سورة الحجر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক। (হিজর ঃ ৯)

জিবরীল ﷺ যখন অহী নিয়ে আসতেন, তখন নবী ﷺও তাঁর সাথে সাথে তাড়াতাড়ি ক'রে পড়ে যেতেন। যাতে কোন শব্দ যেন ভুলে না যান। মহান আল্লাহ তাঁকে ফিরিশ্তার সাথে এইভাবে পড়তে নিষেধ ক'রে বললেন,

{وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا} (١١٤) سورة طـه

অর্থাৎ, তোমার প্রতি আল্লাহর অহী (প্রত্যাদেশ) সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন পাঠে তাড়াতাড়ি করো না। আর বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।' *(ত্বা-হাঃ ১১৪)*

{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} (١٩)

অর্থাৎ, তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা ওর সাথে সঞ্চালন করো না। নিশ্চয় এটার সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি ওটা (জিব্রাঈলের মাধ্যমে) পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর নিশ্চয় এর বিবৃতির দায়িত্ব আমারই। *(ক্বিয়ামাহঃ ১৬- ১৯)*

সুতরাং এই নির্দেশের পর রসূল ﷺ চুপ ক'রে কেবল শুনতেন।

অর্থাৎ, তোমার বক্ষে তা সংরক্ষণ ক'রে দেওয়া এবং জবানে তার পঠন কাজ চালু ক'রে দেওয়া হল আমার দায়িত্ব। যাতে তার কোন অংশ তোমার স্মরণচ্যুত না হয় এবং কোন কিছু তোমার স্মৃতি থেকে মুছে না যায়।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى (٦) إِلَّا مَا شَاء اللَّهُ} (٧) سورة الأعلى

অর্থাৎ, অচিরেই আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি ভুলবে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন। *(আ'লাঃ ৬-৭)*

মহান আল্লাহ চাইলে কোন কোন আয়াত বা জিনিস তিনি ভুলে যেতেন। যেমন শবেকদর জানানোর পর তাঁকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। *(বুখারী ২০১৬, মুসলিম ২৮২৯-২৮৩২নং)*

কোন কোন আয়াত বিস্মৃত হওয়ার পর স্মরণ করতেন। এক রাত্রে তিনি এক ব্যক্তিকে কুরআন পড়তে শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন,

(يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا).

অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে রহম করুন। অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। *(বুখারী ৫০৩৮, মুসলিম ১৮৭৪নং)*

কখনো কখনো নামাযে কুরআন পড়তে তাঁর ভুল হতো।

একদা তিনি নামাযে কুরআন পড়তে পড়তে ভুলে কিছু অংশ ছেড়ে দিলেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! অমুক অমুক আয়াত আপনি ছেড়ে দিয়েছেন, (পড়েন নি)। তিনি বললেন, "তুমি আমাকে মনে পড়িয়ে দিলে না কেন?" *(আবূ দাউদ ৯০৭ নং, ইবনে মাজাহ)*

একদা নামাযে ক্বিরাআত পড়তে পড়তে তাঁর কিছু গোলমাল হল। সালাম ফেরার পর উবাই ﷺ এর উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "তুমি আমাদের সাথে নামায পড়লে?" উবাই ﷺ বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তবে ভুল ধরিয়ে দিলে না কেন?" *(আবূ দাউদ ৯০৭,*

ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী ৩/২১২)

একদা ফজরের নামায শুরু করে সাহাবাগণকে ইঙ্গিত করলেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে অপেক্ষা কর। অতঃপর তিনি বাড়ি প্রবেশ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হয়ে এলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। অতঃপর নামায শেষ করে বললেন,

(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا).

আমি একজন মানুষই। আমি অপবিত্র ছিলাম। (গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম।) *(আহমাদ ২০৪২০নং)*

একদা নামায পড়তে গিয়ে তিনি ভুল ক'রে চার রাকআতের জায়গায় পাঁচ রাকআত পড়ে ফেললেন। সালাম ফিরার পরে তাঁকে সে ব্যাপারে বলা হলে দু'টি সহু সিজদা ক'রে বললেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي.

"আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে মনে পড়িয়ে দিয়ো।" *(বুখারী ৪০১, মুসলিম ৫৭২নং)*

একদা মহানবী ﷺ যোহর কিংবা আসরের নামায ভুল করে ২ রাকআত পড়ে সালাম ফিরে উঠে অন্য জায়গায় বসলেন। লোকেরা ভাবল, নামায সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। আবূ বাক্র, উমার কেউই ভয়ে তাঁর সাথে কথা বললেন না। অবশেষে যুল-য়্যাদাইন বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি নামায কম হয়ে গেল?' তিনি বললেন, "আমি ভুলিও নি, নামায কমও হয়নি।" (যুল-য়্যাদাইন বললেন, 'বরং আপনি ভুলে গেছেন হে আল্লাহ রসূল!') অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "যুল-য়্যাদাইন যা বলছে তা কি ঠিক?" সকলে বলল, 'জী হ্যাঁ।' সুতরাং তিনি অগ্রসর হয়ে বাকী নামায পূরণ করে সালাম ফিরলেন। অতঃপর তকবীর দিয়ে অনুরূপ অথবা তার চেয়ে লম্বা সিজদা দিলেন। তারপর আবার তকবীর দিয়ে মাথা তুললেন। পুনরায় তকবীর দিয়ে অনুরূপ অথবা তার চেয়ে লম্বা আরো একটি সিজদাহ করলেন। তারপর আবার তকবীর দিয়ে মাথা তুলে সালাম ফিরলেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০১৭নং)*

ˆjlf mrfbhD ﷺ bfmfsp iaKm ShEsj bf hsn …sE isVb. stfsjvf knhDr htstW dkdb bf hsn bfmfp swsN lc*f* dnulfr jsv nftfm dIsvb. *(hcJfvD, mcndtm, dmwjfk 1018bQ)*

অনেকে বলতে পারেন, তাঁর নামাযের মধ্যে ভুল আসলে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যাতে তারা বুঝতে পারে, তাদের নামাযে ভুল হলে সংশোধনের উপায় কী? সুতরাং তিনি মানবিক দুর্বলতার কারণে ভুলতেন না, বরং ভুলের বিধান বাতলে দেওয়ার জন্যই মহান আল্লাহ তাঁকে ভুলিয়ে দিতেন। এ মর্মে একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে হাদিসটি ভিত্তিহীন বাতিল। *(সিঃ যয়ীফাহ ১০১নং দ্রঃ)*

তাছাড়া এ উক্তি মহানবী ﷺ-এর সেই হাদীসের পরিপন্থী, যাতে তিনি বলেছেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي.

"আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে মনে পড়িয়ে দিয়ো।" *(বুখারী ৪০১, মুসলিম ৫৭২নং)*

কোন জিনিস ভুলে গিয়ে তিনি তা স্মরণ করতেন। উক্ববাহ ইবনে হারেস ؓ বলেন যে,

আমি নবী ﷺ-এর পিছনে মদীনায় আসরের নামায পড়লাম। অতঃপর সালাম ফিরে তিনি অতি শীঘ্র দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর লোকদের গর্দান টপকে তাঁর কোন এক স্ত্রীর কক্ষে চলে গেলেন। লোকেরা তাঁর শীঘ্রতা দেখে ঘাবড়ে গেল। অতঃপর তিনি বের হয়ে এলেন; দেখলেন লোকেরা তাঁর শীঘ্রতার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। তিনি বললেন,

(ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ).

"(নামাযে) আমার মনে পড়ল যে, (বাড়ীতে সোনা অথবা চাঁদির) একটি টুকরা রয়ে গেছে। আমি চাইলাম না যে, তা আমাকে আল্লাহর স্মরণে বাধা দেবে। যার জন্য আমি (দ্রুত বাড়ীতে গিয়ে) তা বন্টন করার আদেশ দিলাম।" *(বুখারী ১২২১নং)*

বায়তুল্লাহর খাদেম ও চাবিরক্ষক উষমান বিন ত্বালহাকে এক সময় বলেছিলেন,

« إِنِّي نَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخَمِّرَ الْقَرْنَيْنِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ ».

অর্থাৎ, আমি তোমাকে আদেশ করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, (ইসমাঈলের বদলে যবেহকৃত দুম্বার) শিং দু'টিকে ঢেকে দিয়ো। যেহেতু কা'বাগৃহে এমন কোন জিনিস থাকা উচিত নয়, যাতে নামাযীকে অমনোযোগী করে তোলে। *(আবূ দাঊদ ২০৩০নং)*

আর এই শ্রেণীর বিস্মৃতি নবুঅতের জন্য কোন ত্রুটি নয়। বরং তা এ কথার প্রমাণ যে, তিনি মানুষ ছিলেন এবং তারই প্রকৃতি অনুসারে তিনি বিস্মৃত হতেন। আর পরিপূর্ণতা কেবল মহান আল্লাহর জন্যই।

পার্থিব বিষয়ে তিনি কোন কোন সময় ধারণা ক'রে এমন কথা বলতেন, যা সঠিক হতো না। একদা তিনি সাহাবাদেরকে দেখলেন, তাঁরা খেজুর মোছার পরাগ-মিলন সাধন করছেন; অর্থাৎ, ষাঁড়া গাছের মোছা নিয়ে মাদী গাছের মোছার সাথে বেঁধে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, "আমার মনে হয় ঐরূপ করাতে কোন লাভ নেই। ঐরূপ না করলেও খেজুর ফলবে।" তাঁর এ মন্তব্য শুনে সাহাবাগণ তা ত্যাগ করলেন। কিন্তু খেজুর ফলার সময় দেখা গেল, খেজুর পরিপুষ্ট হয়নি; ফলে তার ফলনও ভালো হয়নি। তিনি তা দেখে বললেন, "কী ব্যাপার, তোমাদের খেজুরের ফলন নেই কেন?" তাঁরা বললেন, যেহেতু আপনি পরাগ-মিলন ঘটাতে নিষেধ করেছিলেন, সেহেতু তা না করার ফলে ফলন কম হয়েছে। তিনি বললেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ : قَالَ اللَّهُ، فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ.

"আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। আর ধারণা ভুল হয়, ঠিকও হয়। কিন্তু আমি যখন বলি, 'আল্লাহ বলেছেন' তখন কখনই আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলব না।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, মুসলিম ৬২৭৬নং ভিন্ন শব্দে)*

মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

((أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ)).

অর্থাৎ, "তোমাদের পার্থিব বিষয়ে তোমরাই অধিক অবগত।"

মানুষের অনুমান হিসাবে তিনি তাঁদেরকে এ কথা বলেছিলেন। আর এটা নবুঅতের ক্ষেত্রে কোন অসম্পূর্ণতা নয়, ত্রুটিও নয়। নবীর জন্য চাষী না হওয়া, কামার বা ছুতোর না হওয়া কোন দোষের নয়।

পক্ষান্তরে দ্বীনের ব্যাপারে তাঁর কোন ভুল হতেই পারে না। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে যা বলেন, তা অহীর জ্ঞানে বলেন। আর অহীর প্রচারে তাঁর ভুল হতেই পারে না। মহান আল্লাহ

বলেছেন,

[وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى] (٤) سورة النجم

"আর সে (মুহাম্মাদ ﷺ) মনগড়া কথাও বলেন না। তাতো অহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" *(সূরা নাজ্‌ম ৩-৪)*

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ؓ বলেন, আমি মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে যা শুনতাম, তা সবই লিখে নিতাম। কিন্তু কুরাইশরা আমাকে লিখতে নিষেধ ক'রে দিল। তারা বলল, 'তুমি যা কিছু শোন, সবই লিখে নাও অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন একজন মানুষ। রাগ ও আনন্দ উভয় অবস্থাতেই তিনি কথা বলেন।' সুতরাং আমি লেখা বন্ধ ক'রে দিলাম এবং এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালাম। তিনি তা শুনে নিজের মুখের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত ক'রে বললেন,

((اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ)).

অর্থাৎ, লেখো, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! এ (মুখ) থেকে সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বেরই হয় না। *(আবূ দাউদ ৩৬৪৬নং)*

বাকী থাকল সেই ভুল, যাতে পাপ হয়। সে ভুল থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন। নবীগণ নিষ্পাপ হন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

তাহলে মহান আল্লাহ কেন বলেছেন,

{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} (٥٥) سورة غافر

"অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" *(মু'মিন ঃ ৫৫)*

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} (١٩)

"সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই। আর ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান ক্ষেত্র সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।" *(মুহাম্মাদ ঃ ১৯)*

{لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا} (٢) الفتح

"যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।" *(ফাত্‌হ ঃ ২)*

কেন মহানবী ﷺ দিনে সত্তরের বেশি অথবা এক শতবার ক'রে ইস্তিগফার করতেন?

নবী করীম ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর শপথ! আমি প্রত্যহ আল্লাহর কাছে সত্তর বারেরও বেশি ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও তাওবাহ করে থাকি।" *(বুখারী ৬৩০৭নং)*

"আমার অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে নিমেষভর বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেহেতু আমি দিনে একশত বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই।" *(মুসলিম ৭০৩৩নং)*

তাঁর পূর্বাপর সকল গোনাহকে ক্ষমা করা হয়েছে সাহাবাগণ সে কথা তাঁকে বলতেন।

কোন আমল করতে বললে এবং সাহাবাগণ তার চাইতে বেশি করতে চাইলে মহানবী ﷺ তাঁদেরকে নিষেধ করতেন। তখন সাহাবাগণ বলতেন, 'আমরা তো আপনার মতো নই হে

আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।' *(বুখারী ২০নং)*

এক ব্যক্তি এসে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! অপবিত্র থাকা অবস্থায় ফজরের নামাযের সময় হয়ে যায়, তাহলে আমি কি রোযা রাখব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

« وَأَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ ».

"(হ্যাঁ,) আমারও অপবিত্র অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে যায়, অতঃপর আমি রোযা রাখি।"

লোকটি বলল, 'আপনি তো আমাদের মতো নন হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।' *(মুসলিম ২৬৪৯নং)*

কিয়ামতে কষ্টের সময় সুপারিশের জন্য লোকেরা নবীগণের কাছে যাবে। তারা সকলের প্রশংসা করে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে বলবে। তারা মহানবী ﷺ-এর প্রশংসা করে বলবে, 'আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।' *(বুখারী ৪৭১২, মুসলিম ৫০১নং)*

উবাইদ বিন উমাইর ﷺ বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে বললাম, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর জীবনে সবচেয়ে বড় আশ্চর্যময় ঘটনা কী দেখেছেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন, 'এক রাত্রে (নবী ﷺ) আমাকে বললেন, "আয়েশা! আজ রাতে আমাকে আমার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য ছেড়ে দাও।" আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনার নৈকট্য চাই এবং তাই চাই, যা আপনাকে আনন্দ দান করে।' সুতরা তিনি উঠে ওযূ করলেন এবং নামায পড়তে শুরু করলেন। নামাযে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তিনি বসে ছিলেন, (চোখের পানিতে) তাঁর কোল ভিজে গেল। তারপরও কাঁদতে লাগলেন। (সিজদায় গেলে অশ্রুতে) মাটি ভিজে গেল! (ফজরের আগে) বিলাল নামাযের খবর দিতে এলেন। তিনি যখন তাঁকে কাঁদতে দেখলেন, তখন বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কাঁদছেন? অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন!' তিনি বললেন, "আমি কি (আল্লাহর) শুক্‌রগুযার বান্দা হব না? আজ রাত্রে আমার উপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ধ্বংস তার জন্য, যে তা পড়েছে, অথচ তা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা ক'রে দেখেনি।

{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (١٩١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। *(আলে ইমরান ঃ ১৯০- ১৯১, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১৪৬৮-নং)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ রাতে (এত দীর্ঘ) কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা দুখানি (ফুলে) ফেটে (দাগ পড়ে) যেত। একদা আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এরূপ কাজ কেন করছেন? আল্লাহ তো আপনার আগের ও পিছের সমস্ত পাপ মোচন ক'রে দিয়েছেন।' তিনি বললেন, "আমি কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করব

না?” *(বুখারী ৪৮৩৭, মুসলিম ৭৩০৪নং)*

মুগীরাহ বিন শু’বাহ কর্তৃক অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ১১৩০, মুসলিম ৭৩০২নং)*

মহানবী ﷺ-এর ‘পাপ’ বলতে এমন ছোট-খাটো ভুল-চুক যা মানবীয় দুর্বলতা অনুযায়ী ঘটে যায় এবং যেগুলোর সংশোধনও মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ক’রে দেওয়া হয়।

মহানবী ﷺ-এর ‘অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ’-এর অর্থ, এমন সব বিষয়াদি, যা ত্যাগ করাই উত্তম অথবা এমন সব জিনিস, যা তিনি ﷺ স্বীয় জ্ঞান, অনুমান ও প্রচেষ্টার আলোকে করেছেন, কিন্তু আল্লাহ তা পছন্দ করেননি। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম ؓ-এর ঘটনা; যার উপর সূরা ‘আবাসা’ অবতীর্ণ হল।

“সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। যেহেতু তার নিকট অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল। তোমাকে কিসে জানাবে? হয়তো বা সে পরিশুদ্ধ হত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে তা তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে লোক বেপরোয়া, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিলে। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যে তোমার নিকট ছুটে এল সভয় মনে, তুমি তার প্রতি বিমুখ হলে! কক্ষনো (এরূপ করবে) না। এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)।” *(আবাসাঃ ১-১২)*

একদা নবী ﷺ-এর নিকট কুরাইশ (কাফের)দের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ বসে কথা-বার্তা বলছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ উক্ত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম ؓ উপস্থিত হলেন। তিনি একজন অন্ধ মানুষ ছিলেন। আসা মাত্র নবী ﷺ-কে দ্বীনের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি তাঁর প্রতি কিছুটা বিরক্তিভাব পোষণ করলেন এবং তার প্রতি অমনোযোগী হলেন। এটা মহান আল্লাহর অপছন্দনীয় ছিল। তাই সতর্কতাস্বরূপ সূরা আবাসার ঐ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হল। *(তিরমিযী ৩৩৩১নং)*

অনুরূপ একটি ঘটনা, কিছু লোক জিহাদে শরীক না হওয়ার অনুমতি চাইলে মহানবী ﷺ তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় অনুমতি না দেওয়াটাই সঠিক ছিল। মহান আল্লাহ তাই তাঁকে সতর্ক করে বললেন,

{عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ} (٤٣) سورة التوبة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তোমার নিকট সত্যবাদী স্পষ্ট ও মিথ্যাবাদী জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে তুমি তাদেরকে অনুমতি কেন দিলে? *(তাওবাহঃ ৪৩)*

মহানবী ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হলো যে, জিহাদে শরীক না হওয়ার অনুমতি প্রার্থীদেরকে তাদের ওজর সত্য ছিল কি না, তা তদন্ত করে না দেখে কেন অনুমতি দিয়ে দিলে? কিন্তু এই তিরস্কারেও স্নেহের প্রভাব বেশী ছিল। এই জন্য উক্ত ত্রুটির ক্ষমার কথা প্রথমেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

জেনে রাখা দরকার যে, এই তিরস্কার এই জন্য করা হয়েছে যে, অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ার সাথে কাজ নেওয়া হয়েছে এবং পূর্ণভাবে সত্যতা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। নচেৎ তদন্তের পর যার সত্যই ওজর আছে তাকে অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহর তরফ থেকে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যেমন তিনি বলেছেন, {فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ} “অতএব তারা তোমার কাছে তাদের কোন কাজের অনুমতি চাইলে তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দাও।” *(নূরঃ ৬২)*

'যাকে ইচ্ছা' মানে হল, যার কাছে সত্যিকারে ওজর আছে, তাকে অনুমতি দেওয়ার অধিকার তোমার রয়েছে। *(আহসানুল বায়ান)*

অনুরূপ আরো একটি ঘটনা, বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফের মারা পড়ল এবং ৭০ জন বন্দী হল। এটা কাফের ও মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ ছিল। এই জন্য যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কী ধরনের আচরণ করা যেতে পারে এ ব্যাপারে পূর্ণরূপে কোন বিধান স্পষ্ট ছিল না। সুতরাং নবী ﷺ সেই ৭০ জন বন্দীদের ব্যাপারে সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, কী করা যাবে? তাদেরকে হত্যা করা হবে, না কিছু মুক্তিপণ (বিনিময়) নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে? বৈধতা হিসাবে এই দু'টি রায়ই সঠিক ছিল। সেই জন্য উক্ত দু'টি রায় নিয়ে বিবেক-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। কিন্তু কখনো কখনো বৈধতা ও অবৈধতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কাল-পাত্র ও পরিস্থিতি বুঝে অধিকতর উত্তম পন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। এখানেও অধিকতর কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বৈধতাকে সামনে রেখে অপেক্ষাকৃত কমতর কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করা হল। যে ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলার তরফ হতে ভর্ৎসনাস্বরূপ আয়াত অবতীর্ণ হল। উমার ؓ প্রভৃতিগণ নবী ﷺ-কে এই পরামর্শ দিলেন যে, কুফরের শক্তি ও প্রতাপকে ভেঙ্গে ফেলা দরকার আছে। এই জন্য বন্দীদেরকে হত্যা করা হোক। কেননা, এরা হল কুফ্র ও কাফেরদের প্রধান ও সম্মানিত ব্যক্তি। এরা মুক্তি পেলে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অধিকরূপে চক্রান্ত চালাবে। পক্ষান্তরে আবু বাক্র ؓ প্রভৃতিগণ উমার ؓ-এর রায়ের বিপরীত রায় পেশ করলেন যে, তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ (বিনিময়) নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। আর ঐ মাল দ্বারা আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হোক। নবী ﷺ এই রায়কে প্রাধান্য দিলেন। তখন এ ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হল,

{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (٦٨) الأنفال

অর্থাৎ, দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব বিধান (লিপিবদ্ধ) না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত। *(আন্ফাল ঃ ৬৭-৬৮)*

(حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ) এর মতলব হল, যদি দেশে কুফ্রের আধিপত্য হয় (যেমন, সেই সময় আরবে কুফরের আধিপত্য ছিল), তাহলে এ অবস্থায় বন্দী কাফেরদেরকে হত্যা করে তাদের শক্তির মাথাকে চূর্ণ করে ফেলা আবশ্যক। সুতরাং তোমরা এই সূক্ষ্ম নীতিকে দৃষ্টিচ্যুত করে যে মুক্তিপণ (বিনিময়) গ্রহণ করলে, তার মানে হল অধিকতর উত্তম পন্থা বর্জন করে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের পন্থা অবলম্বন করলে; যা তোমাদের ভুল এখতিয়ার। আর তার জন্য মহান আল্লাহ উক্ত সতর্কবাণী অবতীর্ণ করলেন।

আনসারদের যাফার গোত্রের ত্বো'মা অথবা বাশীর ইবনে উবাইরিক্ব নামক এক ব্যক্তি অপর এক আনসারীর বর্ম চুরি ক'রে নেয়। যখন এই চুরির চর্চা হতে লাগল এবং যখন সে অনুভব করল যে, তার চুরির কথা ফাঁস হয়ে যাবে, তখন সে (চুরিকৃত) বর্মটা এক ইয়াহুদীর বাড়িতে ফেলে দিয়ে যাফার গোত্রের কিছু লোককে সাথে নিয়ে রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত

হল। সকলে মিলে বলল যে, বর্মটা অমুক ইয়াহুদী চুরি করেছিল। সেই ইয়াহুদীও নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইবনে উবাইরিক্ব বর্ম চুরি ক'রে আমার বাড়িতে ফেলে দিয়েছিল। যাফার গোত্রের লোকেরা (ত্বো'মা অথবা বাশীর প্রভৃতি) প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল। তারা নবী করীম ﷺ-কে বুঝাতে চেষ্টা করছিল যে, চোর ইয়াহুদীই; ত্বো'মার উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে। নবী করীম ﷺ তাদের চমৎকার ও চতুরতাপূর্ণ কথাবার্তায় প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন এবং আনসারীকে চুরির অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা ক'রে ইয়াহুদীকে চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করতে যাবেন, ঠিক এই সময়ই মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন,

{إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا}

অর্থাৎ, তোমার প্রতি সত্য সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর। আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের সপক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। (নিসা ঃ ১০৫)

এ থেকে যে বিষয়গুলো জানা গেল তা হল ঃ-

প্রথমতঃ নবী করীম ﷺ একজন মানুষ বিধায় তিনি ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন না। গায়বের খবর জানলে তিনি সত্বর তাদের প্রকৃত ব্যাপার জেনে নিতেন।

তৃতীয়তঃ মহান আল্লাহ স্বীয় পয়গম্বরের হিফাযত করেন। তাই কখনোও যদি প্রকৃত ব্যাপার গুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে নবীর দ্বারা (সত্যের) বিপরীত কিছু হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই মহান আল্লাহ সে ব্যাপারে নবীকে সতর্ক ক'রে তাঁর সংশোধন ক'রে দিতেন। আর এটাই হল নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার মূল রহস্য। এ এমন এক উচ্চ মর্যাদা যা আম্বিয়া ব্যতীত আর কেউ লাভ করতে পারে না।

এই ত্রুটির জন্যই মহান আল্লাহ তাঁর রসূল ﷺ-কে বললেন,

{وَاسْتَغْفِرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (١٠٦) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(নিসা ঃ ১০৬)*

কোন তদন্ত না ক'রে খিয়ানতকারীদের যেহেতু তুমি সমর্থন করেছ, তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় দলের মধ্যে কোন এক পক্ষের সত্যতার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা না হওয়া পর্যন্ত তার সমর্থন করা এবং তার হয়ে ওকালতি বা প্রতিনিধিত্ব করা বৈধ নয়। তাই মহান আল্লাহ মহানবী ﷺ-কে নির্দেশ দিলেন,

{وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا} (١٠٧) النساء

অর্থাৎ, তুমি তাদের পক্ষে কথা বলো না, যারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না। *(নিসা ঃ ১০৭)*

উপর্যুক্ত ভুল আচরণ ও কর্মগুলি যদিও কোন পাপ নয় এবং মহানবী ﷺ-এর নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী কাজ ছিল না, তবুও তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা হিসাবে এগুলিকেও ত্রুটি ও কমি গণ্য করা হয়েছে এবং এরই উপর ক্ষমার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেহেতু বলা হয় যে,

(حَسَنَاتُ الأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْن).

অর্থাৎ, নেক লোকদের নেকী, নৈকট্যপ্রাপ্তদের বদী।

এমন অনেক কাজ আছে, যা আম লোকেদের জন্য করা বৈধ। কিন্তু তা খাস লোকেদের জন্য ত্রুটি বলে গণ্য হয়। আর তাই হয়েছে নবীগণের ক্ষেত্রে।

নবী করীম ﷺ-কে তাঁর নিজের জন্য এবং মু'মিনদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা)ও একটি ইবাদত। নেকী ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নবী ﷺ-কে ইস্তিগফার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিংবা উদ্দেশ্য হল উম্মতের দিক নির্দেশনা যে, তারা যেন ইস্তিগফারের অমুখাপেক্ষী না হয়।

তাঁর তা'লীম ও তারবিয়াত

তা'লীম ও তারবিয়াত-জগতে তাঁর তুলনা নেই। একজন সবার চাইতে বেশি আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। অজ্ঞ মানুষকে বিজ্ঞ করার জন্য তিনি এ ধরায় জন্ম নিয়েছিলেন। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট জীবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্যই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন।

তিনি ছিলেন রহমতের নবী। তাই তাঁর সকল তা'লীম ও তারবিয়াতেও রহমতই পরিদৃষ্ট হয়। সরলতা, সহজতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতা ও দয়ার্দ্রতা তাঁর শিক্ষাঙ্গনের প্রতীক। তিনি বলেছিলেন,

« إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِى مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِى مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا ».

"আমাকে আল্লাহ নিজের ব্যাপারে ও অপরের ব্যাপারে কঠোর ক'রে পাঠাননি। বরং তিনি আমাকে সরল শিক্ষক ক'রে পাঠিয়েছেন।" *(মুসলিম ৩৭৬৩নং)*

মহান শিক্ষাগুরু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষায় ছিল আকীদাহ, আহকাম, ইবাদত, আখলাক-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংসার ও সমাজ, রাজনীতি ও যুদ্ধনীতি ইত্যাদি বিষয়।

তিনি শিক্ষা দিয়েছেন নম্রতা ও ধৈর্যশীলতার মাধ্যমে বড় সুকৌশলের সাথে। তাই তাঁর শিক্ষা মানুষের মর্মমূলে স্থান করে নিয়েছে এবং মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকে স্পর্শ করতে পেরেছে।

তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির জন্য কোন কোন শিক্ষার্থী বলতে বাধ্য হয়েছে, "আমার পিতামাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক! আমি ইতিপূর্বে এবং তাঁর পরে তাঁর চাইতে বেশি সুন্দর শিক্ষক দর্শন করিনি। আল্লাহর কসম! (এত বড় ভুল করার পরেও) তিনি আমাকে ধমক দেননি, প্রহার করেননি এবং গালিও দেননি।" *(মুসলিম ১২২৭, মিশকাত ৯৭৮নং)*

যাঁরা তাঁর সুন্নাহ পালন করেন, তাঁকে জীবনের পথপ্রদর্শক মানেন, চলার পথের আদর্শ রাহবার মানেন এবং তাঁর জীবনী পড়াশোনা করেন, তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন তাঁর শিক্ষাদানে রয়েছে সরল-সুন্দর নীতি-রীতি। যার অনুসরণ করলে একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়া যায় এবং শিক্ষিত আদর্শ মানুষ তৈরি করা যায়।

কয়েকটি নীতি প্রনিধানযোগ্য ঃ-

(১) মহানবী ﷺ শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে একই সঙ্গে অনেক ইলম চাপিয়ে দিতেন না। বরং গুরুত্ব অনুসারে যথাক্রমে বেশি অতঃপর কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দিতেন।

যেমন শিক্ষা দেওয়াটাই তাঁর দায়িত্ব ছিল না, বরং সেই অনুযায়ী আমল হচ্ছে কি না, তাও তাঁর দায়িত্ব ছিল। তিনি একই সাথে তা'লীম ও তারবিয়ত দান করে গেছেন মানুষকে।

জুন্দুব বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন আমরা সাবলকত্বের কাছাকাছি কিশোর। আমরা (তাঁর নিকট) কুরআন শিক্ষা করার আগে ঈমান শিক্ষা করেছি। অতঃপর কুরআন শিক্ষা করে ঈমান বৃদ্ধি করেছি।' *(ইবনে মাজাহ ৬১নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, 'আমাদের মধ্যে প্রত্যেক লোকে যখন দশটি আয়াত শিক্ষা (মুখস্থ) করত, তখন তার অর্থ বুঝে না নেওয়া ও সেই অনুযায়ী আমল না করে নেওয়া পর্যন্ত সেগুলিকে অতিক্রম করত না।'

আবু আব্দুর রহমান সুলামী (রঃ) বলেন, 'আমাদেরকে আমাদের ওস্তাদগণ বর্ণনা করেছেন যে, যাঁরা নবী ﷺ-এর ছাত্র ছিলেন তাঁরা দশটি আয়াত শিখলে ততক্ষণ পর্যন্ত আর আগে বাড়তেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দশ আয়াতের বর্ণিত ও নির্দেশিত সমস্ত আমল করেছেন। তাই আমরা কুরআন ও আমল উভয়ই (একই সময়ে) শিক্ষা করেছি।' *(তাফসীর ত্বাবারী ১/৮০, ইবনে কাষীর ১/৮)*

অনেক মানুষের আমল এই নীতির বিপরীত। দেখবেন, তাদের তা'লীম আছে, তারবিয়ত নেই। ইল্ম ও দাওয়াত আছে, আমল নেই। বই আছে, পড়া নেই। অপরকে পড়তে দেয়, কিন্তু সে নিজে তা পড়ে না। তাদের অবস্থা অনেকটা সেই আতর-ওয়ালার মতো, যে আতর বিতরণ করে, কিন্তু নিজের গায়ে দুর্গন্ধ। অথবা সে চিনির বলদ অথবা সে অন্ধ, রাতের অন্ধকারে তার হাতে থাকে প্রদীপ। অথবা সে দায়িত্ব পালন করে, কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে কি না, খেয়াল করে না বা গুরুত্ব দেয় না।

অথবা সে এমন ব্যক্তি, যে এক সঙ্গে অনেক কিছু শিখতে চায়, ফলে তার কিছুই শেখা হয় না। অথবা যে এক সঙ্গে অনেক কিছু শিখাতে চায়, ফলে তার কিছুই শেখানো হয় না।

নববী তা'লীম ও তারবিয়াত তেমন ছিল না।

(২) শিক্ষার্থীর মানসিকতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুমান ক'রে তাকে যথাযথ শিক্ষা প্রদান করা। যার যেমন প্রয়োজন, তাকে তেমন শিক্ষা দেওয়া।

একটি লোক নবী ﷺ-এর সমীপে আবেদন জানাল, 'আপনি আমাকে অসিয়ত করুন।' তিনি বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" লোকটি বার বার একই আবেদন জানাল। তিনি (প্রত্যেক বারেই) তাকে একই অসিয়ত করলেন যে, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" *(বুখারী ৬১১৬নং)*

মুআয ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, "এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর, যেন তুমি তাঁকে দেখছ এবং তুমি নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর। আর যদি চাও তবে তোমাকে এমন কাজের কথা বলব যা তোমার পক্ষে এ সবের চেয়ে অধিক সহজ সাধ্য।" অতঃপর তিনি নিজ হাত দ্বারা নিজের জিভের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "এটা (সংযত রাখ)।" *(ইবনে আবিদ্ দুনয়্যা)*

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "যখন তুমি তোমার নামাযে দাঁড়াবে তখন (মরণ পথের পথিকের বিদায় নেওয়ার সময়) শেষ নামায পড়ার মতো নামায পড়। এমন কথা বলো না, যা বলে (অপরের নিকট) ক্ষমা চাইতে হয়। আর লোকেদের হাতে যা আছে তা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে যাও।" *(বুখারী তারীখ, ইবনে মাজাহ ৪১৭১ নং, আহমাদ ৫/৪১২, বাইহাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪০১ নং)*

জাহেমাহ ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদ করব মনস্থ করেছি, তাই আপনার নিকট পরামর্শ নিতে এসেছি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "তোমার মা আছে কি?" জাহেমাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তার খিদমতে অবিচল থাক। কারণ, তার পদতলে তোমার জান্নাত রয়েছে।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ নাসাঈ ২৯০৮-নং)*

(৩) তা'লীমে সংলাপ ও কথোপকথন।

মহানবী ﷺ-এর শিক্ষাতে রয়েছে সংলাপের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা। ইসলাম, ঈমান ও ইহসান বিষয়ক শিক্ষামূলক জিবরীলের হাদীস এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ।

সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষা শরীয়তের একটি উপকারী পদ্ধতি। এতে শিক্ষার্থী ও শ্রোতার মনে সতর্কতা ও মনোযোগ সজাগ থাকে। মহানবী ﷺ 'তোমরা কি জানো? তোমরা কী মনে কর? তোমাদের কী রায়? তোমরা বল তো---' ইত্যাদি বাক্য দিয়ে সংলাপ শুরু করতেন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা'লীমী পদ্ধতি শ্রোতার মনে দাগ কাটে বেশি। মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদেও বহু সংলাপ পরিদৃষ্ট হয়। সংলাপের 'ক্বুল' (বল) শব্দটি তাতে ৩৩২ বার উল্লিখিত হয়েছে। যেমন 'ক্বালূ' (বলল) শব্দটিও একই সংখ্যায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আর 'ক্বা-লা' শব্দটি এসেছে ৫২৯ বার।

(৪) প্রয়োজনে লিখে ও এঁকে তালীমদান।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, একদিন নবী ﷺ একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং এর মাঝখানে একটি রেখা টানলেন যেটি চতুর্ভুজের বাইরে চলে গেল। তারপর দু পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে ভিতরের দিকে কয়েকটা ছোট ছোট রেখা মেলালেন এবং বললেন, "এ মাঝামাঝি রেখাটা হল মানুষ। আর চতুর্ভুজটি হল তার মৃত্যু; যা তাকে ঘিরে রেখেছে। আর বাইরের দিকে বর্ধিত রেখাটি হল তার আশা-আকাঙ্ক্ষা। আর ছোট ছোট রেখাগুলো নানা রকম বিপদাপদ। যদি সে এর একটাকে এড়িয়ে যায়, তবে অন্যটা তাকে আক্রমণ করে। আর অন্যটাকেও যদি এড়িয়ে যায়, তবে পরবর্তী অন্য একটি তাকে আক্রমণ করে।" *(বুখারী ৬৪১৭নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, একদা রসূল ﷺ স্বহস্তে একটি (সরল) রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, "এটা আল্লাহর সরল পথ।" তারপর ঐ রেখাটির ডানে ও বামে আরো অনেক রেখা টেনে বললেন, "এই হচ্ছে বিভিন্ন পথ; যার প্রত্যেকটির উপর রয়েছে শয়তান, যে ঐ পথের দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত দিতে) থাকে।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ-

{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٥٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, নিশ্চয় এটিই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর ও বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন যেন তোমরা সাবধান হও। *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত, আহমাদ ৪১৪২, হাকেম ২৯৩৮-নং)*

(৫) বিভিন্ন উপলক্ষ্য ও বিশেষ সময়কে কাজে লাগিয়ে তা'লীমদান।

একদা নবী ﷺ সাহাবাদের এক ব্যক্তির জানাযায় বের হয়ে কবর খুঁড়তে দেরী হচ্ছিল বলে সেখানে বসে গেলেন। তাঁর আশে-পাশে সকল সাহাবাগণও নিশ্চুপ, ধীর ও শান্তভাবে

বসে গেলেন। তখন মহানবী ﷺ-এর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল যার দ্বারা তিনি (চিন্তিত ব্যক্তিদের ন্যায়) মাটিতে দাগ কাটছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠালেন এবং বললেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট কবরের আযাব হতে পানাহ্‌ চাও।" তিনি এ কথা দুই কি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, "মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে ত্যাগ করতে এবং আখেরাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার নিকট আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট একদল ফিরিশ্তা আসেন----।"

এইভাবে তিনি মু'মিন ও কাফেরের মৃত্যু সময়কালীন অবস্থা বর্ণনা ক'রে সাহাবাগণকে উপদেশ দিলেন।

একদা তিনি একটি কানকাটা মৃত ছাগল-ছানার পাশ দিয়ে পার হয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "তোমাদের কে এটাকে এক দিরহাম দিয়ে কিনতে চায়?" লোকেরা বলল, 'আমরা তা সামান্য কিছুর বিনিময়েও চাই না।' তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম! আল্লাহর নিকট দুনিয়া এর চাইতেও অধিক নিকৃষ্টতর।" *(মুসলিম, মিশকাত ৫১৫৭ নং)*

(৬) মহানবী ﷺ-এর তা'লীমে ছিল ভীতিপ্রদর্শনের সাথে আগ্রহ সৃষ্টি ও অনুপ্রেরণার রীতি। কুফলের পাশাপাশি সুফলের বয়ান, শাস্তির পাশাপাশি শান্তির বর্ণনা, জাহান্নামের পাশে জান্নাতের বর্ণনা। আর এমন রীতি আল-কুরআনেও উল্লেখ হয়েছে বহুবার।

মহানবী ﷺ মুআয ও আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)কে দাওয়াতের কাজে ইয়ামান পাঠাবার সময় বলেছিলেন,

(يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا).

"তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। পরস্পর মেনে-মানিয়ে চলো, মতবিরোধ করো না।" *(বুখারী ৩০৩৮, মুসলিম ৪৫২৬নং)*

(৭) প্রাচীন যুগের কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে তা'লীম ও তারবিয়ত।

যেমন একটি পিপাসিত কুকুরকে পানি পান করিয়ে এক ব্যক্তি জান্নাতে গেছে। একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে খেতে না দিয়ে মেরে ফেলে এক মহিলা জাহান্নামে গেছে। ইত্যাদি।

(৮) লিখিয়ে তা'লীম দেওয়া।

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ؓ বলেন, আমি মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে যা শুনতাম, তা সবই লিখে নিতাম। কিন্তু কুরাইশরা আমাকে লিখতে নিষেধ ক'রে দিল। তারা বলল, 'তুমি যা কিছু শোন, সবই লিখে নাও অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন একজন মানুষ। রাগ ও আনন্দ উভয় অবস্থাতেই তিনি কথা বলেন।' সুতরাং আমি লেখা বন্ধ ক'রে দিলাম এবং এ কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালাম। তিনি তা শুনে নিজের মুখের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত ক'রে বললেন,

((اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ)).

অর্থাৎ, লেখো, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! এ (মুখ) থেকে সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বেরই হয় না। *(আবূ দাউদ ৩৬৪৬নং)*

লেখার মাধ্যমেই ছড়িয়ে গেল ইসলাম পৃথিবীর চারি প্রান্তে। লেখার মাধ্যমেই সুসংরক্ষিত হল কত শত ইল্‌মের ভান্ডার।

(৯) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তালীম ও তারবিয়াত।

"তুমি কি জানো, বান্দা উপর আল্লাহর এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কী?" *(বুখারী ৫৯৬৭, মুসলিম ১৫২নং)*

"তুমি কি জানো, তোমার কাছে আল্লাহর কিতাবের কোন্ আয়াতটি মর্যাদায় সবচেয়ে বড়?" *(মুসলিম ১৯২১নং)*

"বল দেখি, এমন কোন্ গাছ আছে, যার উপমা একজন মুসলিমের, যার পাতা ঝরে না?" *(বুখারী ৬১, মুসলিম ৭২৭৬নং)*

"তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কে?" *(মুসলিম ৬৭৪৪নং)* ইত্যাদি

এইভাবে প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন এবং তার মেধা পরীক্ষা করেছেন আদর্শ শিক্ষাগুরু।

(১০) কখনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে অন্য শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করতেন মহান ওস্তাদ।

একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, 'এমন জিনিসের কথা বলুন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।'

তিনি উত্তর না দিয়ে সাহাবাগণের প্রতি তাকালেন। তারপর বললেন, "লোকটি তওফীক বা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে।" অতঃপর তাকে সম্বোধন করে বললেন, "কী যেন বললে?"

তখন লোকটি নিজ কথার পুনরাবৃত্তি ঘটালো এবং নবী ﷺ তাঁর উত্তর দিলেন। *(মুসলিম ১১৩নং)*

(১১) অনেক সময় কিছু শিক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিক্ষার্থীর মনে অধিক আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ও ইল্‌মের প্রতি লালসা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ক্ষণকাল বিরত থাকতেন। অতঃপর শিক্ষার্থীর আবেদনে শিক্ষণীয় কথা বলতেন।

আবূ সাঈদ রাফে' ইবনে মুআল্লা رضي الله عنه বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন,

(أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ).

"মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বেই তোমাকে কি কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব না?" এই সাথে তিনি আমার হাত ধরলেন। অতঃপর যখন আমরা বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি নিবেদন করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যে আমাকে বললেন, তোমাকে অবশ্যই কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব?' সুতরাং তিনি বললেন, "(তা হচ্ছে) 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সূরা ফাতেহা)। এটি হচ্ছে 'সাবউ মাসানী' (অর্থাৎ, নামাযে বারংবার পঠিতব্য সপ্ত আয়াত) এবং মহা কুরআন; যা আমাকে দান করা হয়েছে।" *(বুখারী ৪৪৭৪নং)*

(১২) কখনো শিক্ষার্থীর কোন অঙ্গ ধারণ করে শিক্ষা দিতেন। যাতে তার সাথে স্মৃতি বিজড়িত থেকে যায়। যেমন পূর্বোক্ত আবূ সাইদ বিন মুআল্লার হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। অনুরূপ একদা তিনি বললেন,

(مَنْ يَأْخُذُ مِنْ أُمَّتِي خَمْسَ خِصَالٍ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ).

"আমার উম্মতের যে ব্যক্তি পাঁচটি আচরণ গ্রহণ করবে, তা আমল করবে অথবা তাকে শিক্ষা দেবে, যে তা আমল করবে?"

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه বললেন, 'আমি হে আল্লাহর রসূল!' অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং ঐ পাঁচটি আচরণ গুনলেন, "নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আ'বেদ (ইবাদতকারী) গণ্য হবে। আল্লাহ যা তোমাকে

দিয়েছেন, তাতেই পরিতুষ্ট থাক, তবে তুমিই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী হবে। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু'মিন বিবেচিত হবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম গণ্য হবে। আর খুব বেশী হাসবে না, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।" *(আহমাদ, তিরমিযী ২৩০৫, সঃ জামে ১০০নং)*

(১৩) অনেক সময় শিক্ষার ভূমিকা স্বরূপ এমন একটি ঘটনা বা জিনিসকে উপস্থাপন করতেন, যাতে সেই ঘটনা বা জিনিস মনে পড়লে বা দেখলে সেই শিক্ষণীয় বিষয়টি স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। যেমন কোন নির্দিষ্ট সুগন্ধ বা নাকে এলে অথবা দৃশ্য চোখে এলে তার সাথে স্মৃতি-বিজড়িত ঘটনা মনে পড়ে যায়।

আবু উযমান নাহদী (রঃ) বলেন, একদা একটি গাছের নিচে আমি সালমান ﷺ-এর সাথে (বসে) ছিলাম। তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে ডালের সমস্ত পাতাগুলি ঝরে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আবু উযমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?' আমি বললাম, 'কেন করলেন?' তিনি বললেন, 'একদা আমিও আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে গাছের নিচে ছিলাম। তিনি আমার সামনে অনুরূপ করলেন; গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে তার সমস্ত পাতা খসে পড়ল। অতঃপর বললেন, "হে সালমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?" আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, "মুসলিম যখন সুন্দরভাবে ওযু করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, তখন তার পাপরাশি ঠিক ঐভাবেই ঝরে যায়, যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে গেল। আর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

((وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّآتِ، ذلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ)).

অর্থাৎ, আর তুমি দিনের দু' প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে নামায কায়েম কর। পুণ্যরাশি অবশ্যই পাপরাশিকে দূরীভূত করে দেয়। (আল্লাহর) স্মরণকারীদের জন্য এ হল এক স্মরণ। *(সূরা হূদ ১১৪ আয়াত) (আহমাদ ২৩৭০৭, নাসাঈ, ত্বাবারানীর কাবীর ৬১৫১, সহীহ তারগীব ৩৬৩নং)*

(১৪) তাঁর একটি তারবিয়াতী পদ্ধতি হলো, তিনি অনেক কথা বলার সময় সংখ্যা ব্যবহার করতেন। যেমনঃ-

"তিনটি জিনিস যার মধ্যে হবে, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ করবে।" *(বুখারী ১৬, মুসলিম ১৭৪নং)*

"চারটি জিনিস যার মধ্যে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক হয়ে যাবে।" *(বুখারী ৩৪, মুসলিম ২১৯নং)*

(১৫) কখনো তিনি ইশারা ও ইঙ্গিত ব্যবহার করতেন। যেমনঃ-

"আমি ও এতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকব।" এ কথা বলার সময় তিনি (তাঁর) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে উভয়ের মাঝে একটু ফাঁক রেখে ইশারা ক'রে দেখালেন। *(বুখারী ৫৩০৪নং)*

(১৬) কখনো কোন কথা বর্ণনার সময় তা বাস্তবে রূপদান করে দেখাতেন। যেমনঃ-

একদা তিনি বয়ান করছিলেন, (নবজাত শিশুদের মধ্যে) দোলনায় তিনজনই মাত্র কথা বলেছে; মারয়্যামের পুত্র ঈসা, (বানী ইস্রাঈলের) জুরাইজের (পবিত্রতার সাক্ষী) শিশু, আর বানী ইস্রাঈলের অন্য এক শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন সময় তার পাশ দিয়ে উৎকৃষ্ট সওয়ারীতে আরোহী এক সুদর্শন পুরুষ চলে গেল। তার মা দুআ ক'রে বলল, 'হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে ওর মতো করো।' শিশুটি তখনি মায়ের দুধ ছেড়ে দিয়ে সেই

আরোহীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ আমাকে ওর মতো করো না।' তারপর মায়ের দুধের দিকে ফিরে দুধ চুষতে লাগল।

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের তর্জনী আঙ্গুলকে নিজ মুখে চুষে শিশুটির দুধ পান দেখাতে লাগলেন। আমি যেন তা এখনো দেখতে পাচ্ছি।' *(বুখারী ৩৪৩৬, মুসলিম ৬৬৭৩নং)*

(১৭) মহানবী ﷺ তাঁর তা'লীমে উপমা ব্যবহার করতেন অনেক। তাতে অনেক অজানা জিনিস সহজে জানা যায়, অবোধ্য জিনিস বুঝতে সহজ হয়, তা মনে রাখাও আসান হয়। যেমন ঃ-

"আমার ও তোমাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মতো যে আগুন প্রজ্বলিত করল। অতঃপর তাতে উচ্চুঙ্গ ও পতঙ্গ পড়তে আরম্ভ করল, আর সে ব্যক্তি তা হতে তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাচ্ছি, আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে (জাহান্নামের আগুনে) পতিত হচ্ছ।" *(মুসলিম ৬০৯৫নং)*

"মু'মিনদের আপোসের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মতো। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" *(বুখারী ৬০১১, মুসলিম ৬৭৫১নং)*

"মু'মিন মু'মিনের জন্য আয়না স্বরূপ।" *(আবূ দাউদ ৪৯১৮, তিরমিযী ১৯২৯নং)*

"মহিলা পাঁজরের হাড়ের মতো। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও, তবে তুমি তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাও, তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে।" *(বুখারী ৫১৮৪, মুসলিম ৩৭১৭নং)*

"পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের উদাহরণ প্রচুর পানিতে পরিপূর্ণ ঐ নদীর মতো, যা তোমাদের কারো দুয়ারের (সামনে বয়ে) প্রবাহিত হয়, যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে।" *(মুসলিম ১৫৫৫নং)*

"কুরআন পাঠকারী মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে ঠিক বাতাবী লেবুর মতো; যার ঘ্রাণ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক খেজুরের মতো; যার (উত্তম) ঘ্রাণ তো নেই, তবে স্বাদ মিষ্ট। (অন্যদিকে) কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধিময় (তুলসী) গাছের মতো; যার ঘ্রাণ উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক মাকাল ফলের মতো; যার (উত্তম) ঘ্রাণ নেই, স্বাদও তিক্ত।" *(বুখারী ৫০২০, মুসলিম ১৮৯৬নং)*

"কুরআন-ওয়ালা (হাফেয) হল বাঁধা উট-ওয়ালার মতো। (সে যদি তা বাঁধার পর তার যথারীতি দেখাশোনা করে, তাহলে বাঁধাই থাকবে। নচেৎ ঢিল দিলেই উট পালিয়ে যাবে।)" *(বুখারী ৫০৩৩, মুসলিম ১৮৮০নং)*

"যে ব্যক্তি নিজের দান ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মতো, যে বমি করে, তারপর তা আবার খেয়ে ফেলে।" *(বুখারী ২৬২৩, মুসলিম ৪২৪৮নং)* ইত্যাদি।

মানুষের প্রাথমিক পর্যায়ের ফরয ৪টি ঃ দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করা, আমল করা, প্রচার করা ও সে সবে ধৈর্যধারণ করা। তাঁর শিক্ষা ও তরবিয়তে ধৈর্যশীলতা ও ক্ষমাশীলতা ছিল। তাইতো তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু, জগদ্‌গুরু।

তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা

যাঁর নাম 'মুহাম্মাদ' তিনি প্রশংসিত। তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা বিষয়ে লিখে শেষ করার মতো ক্ষমতা কারো নেই। যে দিক নিয়েই তাঁর কথা আলোচনা করবেন, সে দিক হতেই তাঁর মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য ধ্রুব তারকার মতো ফুটে উঠবে।

মহান প্রতিপালক নিজেই তাঁর কত প্রশংসা করেছেন! তাঁর কত মর্যাদা বর্ণনা করেছেন!

মহান আল্লাহ তাঁকে নিজ 'দাস' বলে মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا } (١) سورة الفرقان

"কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরক্বান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।" *(ফুরক্বান ঃ ১)*

তিনি তাঁকে সারা বিশ্বের জন্য 'রহমত' বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } (١٠٧) سورة الأنبياء

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি।" *(আম্বিয়া ঃ ১০৭)*

তিনি তাঁকে 'নিয়ামত' বলে আখ্যায়ন করেছেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ} (٢٨) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা আল্লাহর অনুগ্রহের (কৃতজ্ঞতার) বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নামিয়ে এনেছে ধ্বংসের মুখে। *(ইব্রাহীম ঃ ২৮)*

উদ্দেশ্য এই যে, মহান আল্লাহ মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও নিয়ামত ক'রে পাঠিয়েছেন, যে এই নিয়ামতকে গ্রহণ ক'রে তার কদর করবে, সে কৃতজ্ঞ এবং সে জান্নাতী হবে। পক্ষান্তরে যে এই নিয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তার বদলে কুফরীকে এখতিয়ার করবে, সে কৃতঘ্ন এবং সে জাহান্নামী হবে।

অনুরূপ বলেছেন অন্যত্র,

{يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ} (٨٣) سورة النحل

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চিনে নেয়, অতঃপর তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশই অবিশ্বাসী। *(নাহল ঃ ৮৩)*

যদিও নিয়ামতের অর্থ ব্যাপক, তবুও সমূহ নিয়ামতের মধ্যে মানবমন্ডলীর জন্য 'রাসূলুল্লাহ' একটি বড় নিয়ামত।

মহান আল্লাহ তাঁকে সর্বশেষ নবী বানিয়েছেন। অথচ তিনি কিয়ামতে সকল নবীদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত করবেন। তিনি বলেছেন,

{فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاء شَهِيدًا} (٤١) سورة النساء

অর্থাৎ, তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নবী) উপস্থিত করব এবং তোমাকেও তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব? *(নিসা ঃ ৪১)*

প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে তাদের পয়গম্বর আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য দিয়ে বলবেন যে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার বার্তা আমার জাতির নিকট পৌঁছে দিয়েছি। তারা মানেনি, তাতে আমার কোন ত্রুটি নেই।' অতঃপর তাঁদের কথার সত্যায়নে নবী করীম ﷺ সাক্ষ্য দেবেন যে, 'হে আল্লাহ! এই নবীরা সকলে সত্যবাদী।' তিনি এই সাক্ষ্য সেই কুরআনের ভিত্তিতে দেবেন, যা তাঁর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে বিগত নবীগণ ও তাঁদের জাতির ইতিবৃত্ত প্রয়োজনানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে।

মহানবী ﷺ যেখানে থাকতেন, সেখানে আল্লাহর আযাব আসত না। সেখানকার মানুষ যতই অবাধ্য হোক, মহানবী ﷺ-এর মর্যাদা রক্ষার্থে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করতেন না। তিনি বলেছেন,

{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (٣٣) سورة الأنفال

অর্থাৎ, আল্লাহ এরূপ নন যে, তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং তিনি এরূপ নন যে, তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায় তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। *(আনফাল ঃ ৩৩)*

মহান আল্লাহ মানুষকে আদেশ করেছেন, তারা যেন তাঁর নবী ﷺ-এর প্রতি আদবের সাথে কথাবার্তা বলে। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} (٢) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বল, তার সাথে সেইভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলো না; কারণ এতে অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। (হুজুরাত ঃ ১-২)

মহান আল্লাহর নিকট তাঁর নবীর এত বড় মর্যাদা ছিল যে, মানুষের কোন কথায় তাঁর মন খারাপ হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন, মনঃক্ষুণ্ণ হতে ও মনে কষ্ট পেতে নিষেধ করতেন, তাঁর তরফ থেকে প্রতিবাদ করতেন।

(ক) এ ব্যাপারে আবূ লাহাবের বদ্দুআ প্রসিদ্ধ। মহান আল্লাহ তাকেই পাল্টা বদ্দুআ দিয়ে সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেছিলেন।

(খ) যখন নবী ﷺ-এর কোন ছেলে-সন্তান জীবিত থাকল না, তখন কিছু কাফের তাঁকে নির্বংশ বলতে লাগল। এই কথার উপরে আল্লাহ তাআলা মহানবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, নির্বংশ তুমি নও; বরং তোমার দুশমনরাই নির্বংশ হবে। এর সাথে তিনি তাঁকে হওযে কাওষার দান করার কথা ঘোষণা করে খুশী করলেন। অবতীর্ণ করলেন সূরা কাওষার,

{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ} (٣)

অর্থাৎ, আমি অবশ্যই তোমাকে (হওযে) কাউষার দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর। নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই হল নির্বংশ। *(কাউষারঃ ১-৩)*

সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর বংশকে তাঁর কন্যার পরম্পরা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখলেন। এ ছাড়া তাঁর উম্মতও তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানেরই পর্যায়ভুক্ত। যাদের আধিক্য নিয়ে তিনি কিয়ামতে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবেন। এ ছাড়াও নবী ﷺ-এর নাম সারা বিশ্বে বড় শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে তাঁর শত্রুদের নাম শুধুমাত্র ইতিহাসের পাতাতেই লেখা পড়ে আছে। কারো অন্তরে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং কারো মুখে প্রশংসার সাথে তাদের নাম উল্লেখ হয় না।

মহানবী ﷺ-এর ব্যথিত হৃদয়কে উৎসাহিত করার জন্য কাওষার দানের কথা জানিয়ে দিলেন।

কাওষারের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে কাষীর (রঃ) 'প্রভূত কল্যাণ' অর্থকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ এই অর্থ নেওয়াতে এমন ব্যাপকতা রয়েছে, যাতে অন্যান্য অর্থ শামিল হয়ে যায়। যেমন, সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে, 'এটা একটি নহর যা বেহেশ্তে নবী ﷺ-কে দান করা হবে'। কোন কোন হাদীসে কাওষার বলতে 'হওয' বুঝানো হয়েছে। যে হওয হতে ঈমানদাররা জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে নবী ﷺ-এর মুবারক হাতে পানি পান করবে। জান্নাতের ঐ নহর থেকেই পানি সেই হওযের মধ্যে আসতে থাকবে। অনুরূপ দুনিয়ার বিজয়, নবী ﷺ-এর মর্যাদা ও খ্যাতি, চিরস্থায়ীভাবে তাঁর সুনাম এবং আখেরাতের প্রতিদান ও বিনিময় ইত্যাদি সমস্ত জিনিসই 'প্রভূত কল্যাণ'-এ শামিল হয়ে যায়। *(ইবনে কাষীর, আহসানুল বায়ান)*

(গ) একদা প্রিয় নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দু-তিন রাতে তিনি তাহাজ্জুদ পড়লেন না। আবু জাহলের স্ত্রী উম্মে জামীল তাঁর নিকট এসে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! মনে হয় যেন তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে। কেননা, দু-তিন রাত্রি থেকে দেখছি, সে তোমার নিকট আসে না।' এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা সূরা যুহা অবতীর্ণ করলেন। *(বুখারী ৪৯৫০, মুসলিম ৪৭৫৮-নং)*

"যাতে বলা হয়েছে, শপথ পূর্বাহ্নের (দিনের প্রথম ভাগের)। শপথ রাত্রির; যখন তা সমাচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি বিরূপও হননি। তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা অধিক শ্রেয়। অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (এমন কিছু) দান করবেন, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে। তিনি কি তোমাকে পিতৃহীন অবস্থায় পাননি, অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নি? তিনি তোমাকে পেলেন পথহারা অবস্থায়, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করলেন। অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না এবং ভিক্ষুককে ধমক দিয়ো না। আর তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত কর।"

মহানবী ﷺ-এর মর্যাদা বর্ধনের জন্য মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি বহু অনুগ্রহ প্রদান করেছেন। তার মধ্যে একটি হল, তিনি তাঁর বক্ষকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} (١) سورة الشرح

অর্থাৎ, আমি কি তোমার বক্ষকে প্রশস্ত ক'রে দিইনি? (ইনশিরাহ ঃ ১)

মহান আল্লাহ অবশ্যই তাঁর বক্ষকে আলোকিত ও উদার করেছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল না কোন সংকীর্ণতা, ছিল না অনুদারতা, ক্ষমাশূন্যতা, আত্মকেন্দ্রিকতা বা স্বার্থপরতা।

তাঁর বক্ষে অন্যায় ক্রোধ ছিল না, বিন্দু পরিমাণ লোভ ছিল না, অহংকার ছিল না, অবাঞ্ছিত মোহ ছিল না, কোন হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা ছিল না।

বলা হয় যে, এই জন্যই একাধিকবার তাঁর বক্ষ বিদারণ করে যমযমের পানি দ্বারা তাঁর হৃদয়কে ধৌত করা হয়েছিল। *(তাফসীর ইবনে কাষীর দ্রঃ)*

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর নামকে উঁচু করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} (٤) سورة الشرح

অর্থাৎ, আর আমি তোমার খ্যাতিকে সমুচ্চ করেছি। *(আলাম নাশ্রাহ ঃ ৪)*

তিনি নিজের নামের সাথে তাঁর নাম জুড়ে তাঁর সম্মান বর্ধন করেছেন।

কালেমায়ে শাহাদাতে রয়েছে তাঁর নাম।

আযানে রয়েছে তাঁর নাম।

ইকামতে রয়েছে তাঁর নাম।

নামাযের তাশাহহুদে রয়েছে তাঁর নাম।

খুতবায় রয়েছে তাঁর নাম।

এমন কোন্ সময় আছে, যে সময়ে তাঁর নাম উল্লেখ হয় না অথবা তাঁর নামে দরূদ পাঠ হয় না? দুনিয়ায় কোথাও না কোথাও প্রত্যেক সময়ে আযান, ইকামত, তাশাহহুদ বা খুতবা হচ্ছেই হচ্ছে। সুতরাং দুনিয়ার বুকে সদা-সর্বদা তাঁর নাম গুঞ্জরিত হচ্ছে।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমের প্রায় ৬০ স্থলে তাঁর নিজের সাথে মহানবী ﷺ-কে রসূলরূপে সংযুক্ত করেছেন। যেমন ঃ-

{فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} (٢٧٩) سورة البقرة

আর যদি তোমরা (সূদ বর্জন) না কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ সুনিশ্চিত জানো। (বাক্বারাহ ঃ ২৭৯)

{وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ} (١٣) سورة النساء

যে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে---। (নিসা ঃ ১৩)

{وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ} (١٤) سورة النساء

পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে---। (নিসা ঃ ১৪)

{وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ} (١٠٠) سورة النساء

যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগী হয়ে বের হবে---। (নিসা ঃ ১০০)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ} (١٣٦) سورة النساء

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহতে, তাঁর রসূলে----বিশ্বাস স্থাপন কর। (নিসা ঃ ১৩৬)

{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ} (٣٣) سورة المائدة

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের শাস্তি---। (মায়িদাহ ঃ ৩৩)

{إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ} (٥٥) سورة المائدة

নিশ্চয় তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রসূল---। (মায়িদাহ ঃ ৫৫)

{وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (١٣٢) سورة آل عمران

আর তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার। *(আলে ইমরান ঃ ১৩২)*

এক তফসীর মতে মহান আল্লাহ শেষ নবী ﷺ-এর ব্যাপারে অন্যান্য নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ} (٨١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আর যখন আল্লাহ নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা দান করছি, অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে, তার সমর্থকরূপে যখন একজন রসূল আসবে, তখন নিশ্চয় তোমরা তাকে বিশ্বাস ও সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।' *(আলে ইমরান ঃ ৮১)*

আদম সৃষ্টির আগে থেকেই তাঁর নবুঅতের কথা প্রসিদ্ধ রেখেছেন। ইব্রাহীম ﵇-এর পর থেকে প্রত্যেক নবী-মারফৎ মানুষের মাঝে তাঁর শুভাগমন-সংবাদ প্রচার করেছেন।

তিনি তাঁর সর্বশেষ নবী ﷺ-কে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগে প্রেরণ করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন,

(بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ).

অর্থাৎ, আমি আদম-সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দীতে প্রেরিত হয়েছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে সেই শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছি, যা আমার জন্য নির্ধারিত ছিল। *(বুখারী ৩৫৫৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দী আমার শতাব্দী। অতঃপর তার পরবর্তী শতাব্দী। অতঃপর তার পরবর্তী শতাব্দী (এর লোকেরা)। *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ৬৯৯নং)*

মহান আল্লাহ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনিই আফযালুল আম্বিয়া ও আশরাফুল মুরসালীন।

নবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন পাঁচজন ঃ নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (আলাইহিমুস সালাম)। উক্ত পঞ্চজনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ। তিনিই নবীকুল শিরোমণি। সুতরাং তিনিই হলেন সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। সর্বের সেরা মানুষ। তিনি বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ ».

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ইসমাঈলের বংশধর থেকে কিনানাকে মনোনীত করেছেন।

কুরাইশকে মনোনীত করেছেন কিনানা থেকে। বানী হাশেমকে মনোনীত করেছেন কুরাইশ থেকে। আর আমাকে মনোনীত করেছেন বানী হাশেম থেকে। *(মুসলিম ৬০৭৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ فِرْقَةٍ، وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ قَبِيلَةٍ، وَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا).

অর্থাৎ, আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। মহান আল্লাহ সৃষ্টি রচনা ক'রে আমাকে সৃষ্টির সেরা (মানুষের) দলভুক্ত করেছেন। সৃষ্টিকে (আরব ও আজম) দুই দলে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে উত্তম দলে স্থান দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রে জন্ম দিয়েছেন। বিভিন্ন বাড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাড়িতে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি বাড়ির দিক দিয়ে তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্যক্তির দিক দিয়েও তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ। *(আহমাদ ১৭৮৮নং)*

কিন্তু বুখারী-মুসলিমের হাদীসে আছে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لاَ تُخَيِّرُونِى عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِى أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ ».

"মূসার উপর আমাকে প্রাধান্য দিয়ো না। যেহেতু কিয়ামতের দিন মানুষ মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আমি সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠে দেখব, মূসা আরশের পায়াসমূহের একটি পায়া (অন্য এক বর্ণনা মতে আরশের এক প্রান্ত) ধরে আছেন। অতএব জানি না যে, তিনি মূর্ছিত হয়েছিলেন অথবা (আল্লাহকে দেখতে চাওয়ার সময় তূর পাহাড়ে) মূর্ছিত হওয়ার বিনিময়ে তিনি মূর্ছিত হননি।" *(বুখারী ২৪১১, মুসলিম ৬৩০২নং)*

"তোমরা বলো না যে, আমি ইউনুস বিন মাত্তা অপেক্ষা উত্তম।" *(বুখারী ৩৪১২, মুসলিম ৬৩০৯নং)*

অন্য এক হাদীসে আছে, "তোমরা নবীদের মাঝে একে অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ো না।" *(বুখারী ২৪১২, মুসলিম ৬৩০৫নং)*

হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, উলামাগণ (এই পরস্পর-বিরোধী হাদীসসমূহের মাঝে সামঞ্জস্য সাধন করার মানসে) বলেছেন, 'যদি তিনি সৃষ্টির সেরা---এ কথা জানার পরেও ঐ কথা বলেছেন, তাহলে তিনি বিনয় প্রকাশার্থে বলেছেন। আর যদি সে কথা জানার পূর্বে বলেছেন, তাহলে তো কোন জটিলতাই নেই।'

আরো বলা হয়েছে যে, বিশেষ ক'রে ইউনুসের নাম এই জন্য উল্লেখ করেছেন, যেহেতু তাঁর কাহিনী শুনে অনেকে নিজ মনে তাঁকে তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে সেই আশঙ্কায়। তাই তাঁর মর্যাদায় অত্যুক্তি ক'রে সেই ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিয়েছেন। *(ফাতহুল বারী ১/২১২)*

বলা বাহুল্য তিনিই সৃষ্টির সেরা, তিনিই ইমামুল আম্বিয়া। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব দিতে নিষেধ করেছেন, যাতে অন্য নবীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়।

নিষেধের অর্থ এও হতে পারে যে, তোমরা নবুঅত ও রিসালাতের ব্যাপারে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ো না। কারণ তাতে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে সকল নবী-রসূল সমান। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ} (١٣٦) البقرة

অর্থাৎ, তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছে এবং যা অন্যান্য নবীগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদত্ত হয়েছে তাতেও (বিশ্বাস করি)। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' *(বাক্বারাহ ঃ ১৩৬)*

{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ} (٢٨٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও; সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) 'আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' *(বাক্বারাহ ঃ ২৮৫)*

অর্থাৎ, সমস্ত নবীগণ আল্লাহ কর্তৃক যা কিছু পেয়েছেন বা যা কিছু তাঁদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবের উপর ঈমান আনা জরুরী। কোন কিতাব ও রসূলকে অস্বীকার করা বৈধ নয়। কোন এক কিতাব বা নবীকে মেনে নেওয়া এবং কোন নবীকে অস্বীকার করা হল নবীদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করা; যা ইসলামে বৈধ নয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

«الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلاَّتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ...».

অর্থাৎ, নবীরা বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু দ্বীন অভিন্ন। *(বুখারী ৩৪৪৩, মুসলিম ৬২৮১নং)*

অথচ প্রকৃতপ্রস্তাবে নবীগণ মর্যাদায় এক সমান নন। এ কথা মহান আল্লাহও বলেছেন,

{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} (٢٥٣)

অর্থাৎ, এ রসূলগণ, তাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কাউকে উচ্চ-মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৩)*

{وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا} (٥٥) سورة الإسراء

অর্থাৎ, আমি তো নবীদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি। আর দাউদকে আমি যাবূর দিয়েছি। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৫৫)*

সুতরাং নবীগণের মর্যাদায় পার্থক্য রয়েছে। আর মর্যাদায় সবার চাইতে বড় হলেন সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি বলেছেন,

« أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ ».

অর্থাৎ, আমি কিয়ামতের দিন আদম-সন্তানদের সর্দার। প্রথম আমাকেই কবর থেকে উঠানো হবে এবং প্রথম আমিই সুপারিশকারী ও আমার সুপারিশ গৃহীত হবে। *(মুসলিম ৬০৭৯নং)*

শাফাআতের সুদীর্ঘ হাদীসও সেই কথাই প্রমাণ করে। অন্য এক বর্ণনায় আছে,

(أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ).

অর্থাৎ, আমিই আদম-সন্তানদের সর্দার। আর তাতে গর্ব নেই। *(তিরমিযী ৩১৪৮, ইবনে মাজাহ ৪৩০৮, প্রমুখ)*

তিনি ইমামুল আম্বিয়া। ইসরার রাতে সকল নবীগণ তাঁর ইমামতিতে নামায পড়েছেন। *(মুসলিম ৪৪৮-নং)*

অনুরূপ তিনি বলেছেন,

(إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ).

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন এলে আমি হব নবীগণের ইমাম ও খতীব এবং তাঁদের শাফাআত-ওয়ালা। আর এতে কোন গর্ব নেই। *(আহমাদ ২১২৪৫, তিরমিযী ৩৬১৩, ইবনে মাজাহ ৪৩১৪, হাকেম ২৪০নং)*

আর তাঁর নেতৃত্বের কথা স্পষ্ট হয় কিয়ামতের বিভিষিকাময় ময়দানে মহান প্রতিপালকের দরবারে সুপারিশের সময়।

তাঁর জীবদ্দশায় তিনিই নবী। তিনি সর্বশেষ নবীও। তাঁর জীবদ্দশায় ও তিরোধানের পরে কোন নবী নেই। তাঁর বর্তমানে কোন নবী এলে তিনি তাঁরই অনুসরণ করতে বাধ্য হতেন।

তিনি বলেছেন,

(لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي).

"যদি মূসা তোমাদের মাঝে জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর জন্য অন্য কিছু বৈধ হতো না। *(আহমাদ ১৪৬৩১, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ১৭৯, আবূ য়্যা'লা ২১৩৫নং)*

কিয়ামতের পূর্বে ঈসা ﷺ অবতরণ করবেন। তিনিও সর্বশেষ নবীর উম্মত হয়ে পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। উম্মতে মুহাম্মাদীর মহান নেতা ইমাম মাহদীর পিছনে মুক্তাদী হয়ে তিনি নামায পড়বেন। অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে, আখেরী নবী ﷺ-এর আগমনের পর পৃথিবীর কোন মানুষের জন্য বৈধ নয়, তিনি ছাড়া অন্য কারো অনুকরণ ও অনুসরণ করা।

মহানবী ﷺ-এর একটি মাহাত্ম্য এই যে, কিয়ামতে তাঁর আত্মীয়তা ছিন্ন হবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ} (١٦٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যখন অনুসৃত ব্যক্তিবর্গরা অনুসারীদের প্রতি বিমুখ হবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। *(বাক্বারাহ ঃ ১৬৬)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(كُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا سَبَبِي وَنَسَبِي).

অর্থাৎ, আমার বৈবাহিক ও বংশীয় সম্পর্ক ছাড়া সকল বৈবাহিক ও বংশীয় সম্পর্ক কিয়ামতের দিন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। *(ত্বাবারানী, হাকেম, বাইহাক্বী, সঃ জামে' ৪৫২৭নং)*

মহানবী ﷺ-এর মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর ওজন ছিল অস্বাভাবিক।

আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, '(সর্বপ্রথম) নিশ্চিতরূপে কীভাবে জানলেন যে, আপনি নবী?' উত্তরে তিনি বললেন, "হে আবূ যার্র! আমি মক্কার কোন এক বাত্হাতে (উপত্যকার বালুচরে) ছিলাম। সেই সময় আমার কাছে দু'জন ফিরিশ্তা এলেন। তাঁদের মধ্যে একজন যমীনে অবতরণ করলেন অন্য জন আকাশ

ও পৃথিবীর মাঝে শূন্যে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের একজন তাঁর সঙ্গীকে বললেন, 'উনিই কি তিনি?' সঙ্গী বললেন, 'হ্যাঁ।' প্রথমজন বললেন, 'উনাকে একজন লোক দ্বারা ওজন কর।' সুতরাং আমাকে একজন লোক দ্বারা ওজন করা হল। তাতে আমার ওজন বেশি হল। তারপর প্রথমজন বললেন, 'এখন উনাকে দশজন লোক দ্বারা ওজন কর।' সুতরাং আমাকে দশজন লোক দ্বারা ওজন করা হল। তাতেও আমার ওজন বেশি হল। তারপর প্রথমজন বললেন, 'এখন উনাকে একশত জন লোক দ্বারা ওজন কর।' সুতরাং আমাকে একশত জন লোক দ্বারা ওজন করা হল। তাতেও আমার ওজন বেশি হল। তারপর প্রথমজন বললেন, 'এখন উনাকে এক হাজার জন লোক দ্বারা ওজন কর।' সুতরাং আমাকে এক হাজার জন লোক দ্বারা ওজন করা হল। তাতেও আমার ওজন বেশি হল। আমি যেন এখনও তাদেরকে দেখছি, তাদের পাল্লা হাল্কা হওয়ার দরুন তারা আমার উপর পড়ে যাচ্ছিল!

তারপর প্রথমজন তাঁর সঙ্গীকে বললেন,

(لَوْ وَزَنْتَهُ بِأُمَّتِهِ لَرَجَحَهَا).

'উনাকে যদি তাঁর উম্মত দ্বারা ওজন করা হয়, তাহলেও নিশ্চিতরূপে তাঁরই ওজন বেশি হবে।" *(দারেমী ১৪, বায্যার ৪০৬৯, সিঃ সহীহাহ ১৫৪৫নং)*

আরো কত শত আছে তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদার বর্ণনা। কোন এক আলেম বলেছেন, 'যদি তুমি তাঁর আকার-আকৃতির দিকে দৃকপাত কর, তাহলে এমন সৌন্দর্য দেখতে পাবে, যার পর আর কোন সৌন্দর্য নেই। যদি তুমি তাঁর চরিত্র ও আচরণের প্রতি লক্ষ্য কর, তাহলে এমন পূর্ণতা লক্ষ্য করবে, যার পর আর কোন পূর্ণতা নেই। যদি তুমি সকল মানুষের প্রতি ও বিশেষ ক'রে মুসলিমদের প্রতি তাঁর পরোপকারিতা ও অনুগ্রহ লক্ষ্য কর, তাহলে এমন ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করবে, যার পর আর কোন ঐকান্তিকতা নেই।

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহ তাঁর মধ্যে বিশ্বের সবার চাইতে বেশি আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য, বাহ্যিক সৌন্দর্য ও বংশীয় সৌন্দর্য একত্রিত করেছিলেন। যদি কেউ কারো রূপ-সৌন্দর্য দেখে অথবা চরিত্র-ব্যবহার দেখে অথবা উপকার ও হিতৈষণা পেয়ে তাকে ভালোবাসতে চায়, তাহলে তার উচিত, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালোবাসা। কারণ ভালোবাসার এ সকল চিত্তাকর্ষী বিষয় কেবল তাঁরই মাঝে একত্রিত ছিল।

স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী

মহানবী ﷺ আমাদের মতো মানুষ ছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁর মতো অবশ্যই নই। সাধারণ মানুষের তুলনায় তাঁর কিছু গুণ ছিল অতিরিক্ত, কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল স্বতন্ত্র। কিছু কর্ম ছিল তাঁর জন্য বৈধ; কিন্তু উম্মতের জন্য অবৈধ এবং অন্য কিছু কর্ম ছিল; যা তাঁর জন্য অবৈধ এবং উম্মতের জন্য বৈধ। এই শ্রেণীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ-

(১) মহানবী ﷺ-এর নবুঅত আদম সৃষ্টির পূর্ব থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন আদি পিতা ইব্রাহীম ﷺ,

{رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ} (١٢٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আর তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এক রসূল প্রেরণ কর, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে; তাদেরকে কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) ও হিকমত (জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে (শির্ক থেকে) পবিত্র করবে। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' *(বাক্বারাহ ঃ ১২৯)*

(২) ঈসা ﷺ নিজ সম্প্রদায়কে তাঁর সুসংবাদ দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ} (٦) الصف

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যখন মারয়্যাম তনয় ঈসা বলেছিল, 'হে বানী ইস্রাঈল! আমি তোমাদের প্রতি (প্রেরিত) আল্লাহর রসূল এবং আমার পূর্ব হতে (তোমাদের নিকট) যে তাওরাত রয়েছে, আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে 'আহমাদ' নামে যে রসূল আসবেন, আমি তাঁর সুসংবাদদাতা।' পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাদের নিকট আগমন করল, তখন তারা বলতে লাগল, 'এটা তো এক স্পষ্ট যাদু।' *(স্বাফ্ ঃ ৬)*

ঈসা ﷺ বানী ইস্রাঈলের সর্বশেষ নবী। তাঁর পূর্ববর্তী এবং ইব্রাহীম ﷺ-এর পরবর্তী সকল নবীই নিজ নিজ জাতিকে তাঁর সুসংবাদ শুনিয়ে গেছেন।

মহান আল্লাহর তকদীরে সকল নবীই সৃষ্টির পূর্ব হতেই নির্ধারিত। কিন্তু নবুঅতের ঘোষণা ছিল কেবল নবীকুল শিরোমণি ও সর্বশেষ নবীর নবুঅতের কথা।

(৩) তিনি গর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর জননী স্বপ্নে দর্শন করেন, যেন তাঁর দুই পায়ের মধ্যখান থেকে একটি প্রদীপ অথবা আলো বের হচ্ছে এবং তাতে শাম দেশের বুসরা শহরের অট্টালিকাগুলি আলোকিত হচ্ছে।

কোন কোন বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে, এ স্বপ্ন সকল নবীর জননীগণই দেখে থাকেন। সুতরাং এটা মহানবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু সে বর্ণনা সহীহ নয়। *(সিঃ যয়ীফাহ ২০৮-৫নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ دَعْوَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةِ عِيسَى قَوْمَهُ وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ).

"আমি (আব্দুল্লাহ) আল্লাহর নিকট তাঁর লওহে মাহফূযে লিখিত তখনও সর্বশেষ নবী, যখন আদম কাদা অবস্থায় পড়ে ছিলেন। আর এর তাৎপর্য এই যে, (আমার নবুঅতের প্রথম বিকাশ ঘটে) আমার পিতা ইব্রাহীমের দুআ, ঈসার তাঁর কওমকে দেওয়া সুসংবাদ এবং আমার আম্মার দেখা সেই স্বপ্নের মাধ্যমে, যাতে তিনি তাঁর নিকট থেকে এমন জ্যোতি বের হতে দেখেন যা, শামদেশের অট্টালিকাসমূহকে আলোকিত করেছিল। *(আহমাদ ১৭১৬৩নং)*

গর্ভাবস্থায় নবী-জননীর স্বপ্নে আলো বের হতে দেখার অর্থ হল, তাঁর গর্ভস্থ সন্তান নবী হবেন এবং তাঁর নবুঅতের আলোক সারা বিশ্বে বিচ্ছুরিত হবে। সেই আলোতে শির্ক ও কুফরীর অন্ধকার দূরীভূত হবে। শাম দেশের বুসরা জয় হবে। আর তা হয়েছিল আবূ বাক্র সিদ্দীকের খেলাফতকালে।

(৪) মহানবী ﷺ-এর জন্য চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ হালাল করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (٥٠) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে নবী! নিশ্চয় আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীগণকে বৈধ করেছি, যাদেরকে তুমি মোহরানা প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি তোমার অধিকারভুক্ত দাসিগণকে যাদেরকে আমি যুদ্ধবন্দিনীরূপে দান করেছি এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাতো ভগিনী, ফুফাতো ভগিনী, মামাতো ভগিনী ও খালাতো ভগিনীকে; যারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করেছে এবং কোন বিশ্বাসিনী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে (সেও তোমার জন্য বৈধ।) --এ (বিধান) বিশেষ ক'রে তোমারই জন্য; অন্য মু'মিনদের জন্য নয়; মু'মিনদের স্ত্রী এবং তাদের দাসিগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারিত করেছি, তা আমি জানি। (এ বিধান এ জন্য) যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(আহ্যাবঃ ৫০)*

যেহেতু তাঁর কাছে যুলমের লেশমাত্র ছিল না। তাছাড়া তাঁর বহু বিবাহের কারণসমূহ হল ঃ-

(ক) শিক্ষাগত কারণ ঃ আদর্শ মানুষের একাধিক জীবন-সঙ্গিনী দ্বারা তাঁর চরিত্র, আভ্যন্তরীণ আচরণ, সাংসারিক আদর্শ এবং নারী সংক্রান্ত বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় খুব সূক্ষ্মভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

(খ) ধর্মীয় অনুশাসনগত কারণ ঃ জাহেলিয়াতের এক প্রথা ছিল যে, পালিত পুত্রকে আপন ঔরসজাত পুত্রের সমান মনে করা হত। ওয়ারেস হত এবং তার স্ত্রী অর্থাৎ ঐ পুত্রবধুকে পালয়িতা শ্বশুরের জন্য চিরতরে বিবাহ হারাম মনে করা হত। অথচ শরীয়ত মতে মুখে বলা বা পাতানো অথবা পালিত পুত্র পালয়িত্রী মায়ের জন্য (যথাসময়ে পরিমাণ মত স্তনদুগ্ধ পান না করিয়ে থাকলে) মাহরাম নয়, আপোসে বিবাহ বৈধ এবং পর্দা ওয়াজেব। আর পালিত পুত্রের স্ত্রী পালয়িতা শ্বশুরের পক্ষে (চিরতরে) হারাম নয়।

যেহেতু মুখে বলার চেয়ে কাজে পরিণত করে প্রদর্শনের প্রভাব মানুষের মনে অধিক পড়ে, তাই এই বাতিল প্রথার খন্ডন করে ঐ অনুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যয়নাব (রাঃ) (তাঁর পালিতপুত্র যায়দের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী)কে মহান আল্লাহ আসমানেই তাঁর সাথে বিবাহ সম্পন্ন করেছিলেন।

(গ) সামাজিক কারণ ঃ সুন্দর ও আদর্শ ভিত্তিক সমাজ গড়তে এবং সেই সমাজে যথার্থ প্রভাব অর্জন করতে, সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রতি অগ্রসর সহজ থেকে সহজতর হয়েছিল। সেই কারণেই আয়েশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ)কে তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন।

(ঘ) রাজনৈতিক কারণ ঃ শত্রুকে আপন করার জন্য বৈবাহিক সন্ধিস্থাপন এক পবিত্র নীতি।

(চ) এতদ্ব্যতীত সম্মানদান, প্রবোধদান, আশ্রয়দান প্রভৃতি মানবিক নীতির অনুসরণ করে প্রিয় নবী ﷺ (সফিয়া, উম্মে হাবীবা, উম্মে সালামা, জুয়াইরিয়া প্রভৃতি মহিলাকে) বিবাহ-সূত্রে গেঁথে বহু মানুষকে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন।

(৫) তাঁর বিবাহ বিনা সাক্ষীতেই সম্পন্ন হত।

(৬) তাঁর তালাক দেওয়া বা ইন্তিকাল করার পর তাঁর সমস্ত স্ত্রীকে অপরের জন্য বিবাহ করা হারাম ছিল।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (٦) سورة الأحزاب

"নবী, মু'মিনদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা-স্বরূপ।" *(আহযাবঃ ৬)*

{وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا} (٥٣) سورة الأحزاب

"তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা কখনও সংগত নয়। নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ঘোরতর অপরাধ।" *(আহযাবঃ ৫৩)*

(৭) তাঁকে যে গালি দিত অথবা তাঁর ছিদ্রান্বেষণ করে নিন্দা করত, তাকে হত্যা করা তাঁর জন্য হালাল ছিল।

তিনি কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। *(বুখারী ৪০৩৭, মুসলিম ৪৭৬৫নং)*

খাইবারে আবূ রাফে' নামক এক ইয়াহুদী ব্যবসায়ী ছিল। সেও একই শ্রেণীর কষ্টদানে তৎপর ছিল। নবী ﷺ-এর আদেশে আওস গোত্রের লোকেরা যখন কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করল, তখন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খাযরাজ গোত্রের লোকেরা আবূ রাফে'কে হত্যা করার অনুমতি ও দায়িত্ব নিয়ে তাকে হত্যা করেছিল। *(বুখারী ৩০২২নং)*

একদা এক মুশরিক মহানবী ﷺ-কে গালি দিলে তিনি বললেন, "আমার পক্ষ থেকে আমার শত্রুর জন্য কে যথেষ্ট হবে?" তা শুনে যুবাইর বললেন, 'আমি।' অতঃপর তিনি তার সাথে লড়াই ক'রে তাকে হত্যা করলেন। *(হিল্য়াতুল আউলিয়া ৮/৪৫)*

(৮) তাঁর জন্য 'সওমে বিসাল' (মাঝে ইফতারী না করে এবং সেহরীও না খেয়ে একটানা দুই অথবা ততোধিক দিন রোযা রাখা) বৈধ ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সওমে বিসাল রাখতে নিষেধ করলেন। লোকেরা নিবেদন করল, 'আপনি তো সওমে বিসাল রাখেন? তিনি বললেন,

« إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّى أُطْعَمُ وَأُسْقَى ».

« وَلَكِنِّى لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ ».

« إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِى ذَلِكَ مِثْلِى إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِى».

"(এ বিষয়ে) আমি তোমাদের কারো মতো নই। (অথবা তোমরা এ বিষয়ে আমার মতো নও। আমাকে আমার প্রতিপালক রাতে পানাহার করান।) আমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) পানাহার করানো হয়।" *(বুখারী ১৯২২, মুসলিম ২৬১৮-২৬২৭নং)*

মহান আল্লাহ তাঁকে রাতে খাওয়াতেন ও পান করাতেন অথবা তাঁকে পানাহারকারীর মত শক্তি দান করেছিলেন।

(৯) তাঁর চক্ষু নিদ্রাভিভূত হত; কিন্তু হৃদয় সজাগ থাকত।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান ও অন্যান্য মাসে

(তাহাজ্জুদ তথা তারাবীহ) ১১ রাকআতের বেশী পড়তেন না। প্রথমে চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্নই করো না। তারপর (আবার) চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে প্রশ্নই করো না। অতঃপর তিন রাকআত (বিত্র) পড়তেন। (একদা তিনি বিত্র পড়ার আগেই শুয়ে গেলেন।) আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি বিত্র পড়ার পূর্বেই ঘুমাবেন?" তিনি বললেন,

« يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَان وَلاَ يَنَامُ قَلْبِى ».

"হে আয়েশা! আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায়; কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।" *(বুখারী ১১৪৭, মুসলিম ১৭৫৭নং)*

(১০) তাঁর জন্য তাহাজ্জুদের নামায ছিল ওয়াজেব।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا} (٧٩) سورة الإسراء

অর্থাৎ, আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম কর; এটা তোমার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৭৯)*

(১১) শয়তান তাঁর আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

(وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).

"যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে সে সত্যই আমাকে দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলে, সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" *(বুখারী ১১০নং) ('তাঁর দর্শন' শিরোনাম দ্রঃ)*

(১২) তাঁর ব্যবহৃত ও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন (মলমূত্র ও রক্ত ছাড়া) সকল জিনিস ছিল বর্কতময় মহৌষধ। *('তাঁর মাধ্যমে তাবার্রুক' শিরোনাম দ্রঃ)*

(১৩) তাঁর পূর্বাপর ত্রুটি মার্জনা করা হয়েছিল।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا} (٢) سورة الفتح

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই (হে রসূল!) আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। *(ফাতহ ঃ ১-২)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে আসমানবাসী (ফিরিশ্তা-মন্ডলী)র উপরেও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।' তাঁকে বলা হল, 'কীসের মাধ্যমে হে ইবনে আব্বাস?' তিনি বললেন, মহান আল্লাহ আসমানবাসীর ব্যাপারে বলেছেন,

{وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} (٢٩) الأنبياء

"তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমিই উপাস্য তিনি ব্যতীত' তাকে আমি শাস্তি দিব জাহান্নামে;

এভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।” *(আম্বিয়া ঃ ২৯)*

আর তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে বলেছেন,

{إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} (٢) سورة الفتح

নিশ্চয়ই (হে রসূল!) আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রটিসমূহ মার্জনা করেন। *(ফাত্হ ঃ ১-২, দারেমী ৪৬নং, তফসীর কুরতুবী ৩/২৬৩)*

কোন আমল করতে বললে এবং সাহাবাগণ তার চাইতে বেশি করতে চাইলে মহানবী ﷺ তাঁদেরকে নিষেধ করতেন। তখন সাহাবাগণ বলতেন, 'আমরা তো আপনার মতো নই হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।' *(বুখারী ২০নং)*

এক ব্যক্তি এসে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! অপবিত্র থাকা অবস্থায় ফজরের নামাযের সময় হয়ে যায়, তাহলে আমি কি রোযা রাখব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

« وَأَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ ».

"(হ্যাঁ,) আমারও অপবিত্র অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে যায়, অতঃপর আমি রোযা রাখি।"

লোকটি বলল, 'আপনি তো আমাদের মতো নন হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।' *(মুসলিম ২৬৪৯নং)*

(১৪) তাঁর আহবানে সাড়া দেওয়া ওয়াজেব ছিল; যদিও আহূত ব্যক্তি নামাযরত থাকত।

আবু সাঈদ বিন মুআল্লা ﷺ বলেন, আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি সাড়া দিলাম না। অতঃপর নামায শেষ করে তাঁর নিকট এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি নামায পড়ছিলাম।' তিনি বললেন, "আল্লাহ কি বলেননি যে, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে (রসূল) ডাকে---?' *(আনফাল ঃ ২৪)* অতঃপর তিনি বললেন, "মসজিদ থেকে তোমার বের হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের মধ্যে মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব না কি?" অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর আমরা যখন বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন আমি বললাম, 'হে আল্লার রসূল! আপনি বলেছিলেন "আমি তোমাকে কুরআনের মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব।" তিনি বললেন, "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।" এটাই হল সেই সপ্তপদী (সূরা) যা নামাযে পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয়, আর সেটাই হল মহা কুরআন; যা আমাকে দান করা হয়েছে।" *(বুখারী ৫০০৬ নং)*

(১৫) ফিরিশ্তা তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর পূর্বে বা পরে কারো সাথে করেননি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (١٢٣) سورة آل عمران

"নিশ্চয় বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন, তখন তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(স্মরণ কর) যখন তুমি বিশ্বাসিগণকে বলেছিলে, 'যদি তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার প্রেরিত ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করেন, তাহলে কি তোমাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে না?' অবশ্যই, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে তারা দ্রুতগতিতে

তোমাদের উপর আক্রমণ করলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার (বিশেষরূপে) চিহ্নিত ফিরিশ্তা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আর এ (সাহায্যকে) তো আল্লাহ তোমাদের জন্য সুসংবাদ করেছেন, যাতে তোমাদের মন শান্তি পায় এবং সাহায্য শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট থেকেই আসে। *(আলে ইমরান ঃ ১২৩-১২৬)*

(১৬) তাঁর মু'জেযা কুরআন মাজীদ কিয়ামত অবধি অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু অন্যান্য নবীদের মু'জেযা তাঁদের জীবনকাল অবধি সীমাবদ্ধ ছিল।

(১৭) তাঁকে ৩০ জন পুরুষের সমান যৌন-ক্ষমতা দান করা হয়েছিল।

আনাস ﷺ বলেন, 'তিনি দিবারাত্রির একই সময়ে তাঁর (ক্রীতদাসী-সহ) ১১টি স্ত্রীর সাথে মিলন করতেন।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তিনি কি তাতে সক্ষম ছিলেন?' আনাস ﷺ বললেন, 'আমরা বলাবলি করতাম, তাঁকে ৩০ জন পুরুষের সমান যৌনক্ষমতা দান করা হয়েছে।' *(বুখারী ২৬৮-নং)*

(১৮) তিনি অন্যান্য মানুষের তুলনায় দ্বিগুণ জ্বরগ্রস্ত হতেন।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি জ্বর ভুগছিলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার যে প্রচন্ড জ্বর!' তিনি বললেন, "হ্যাঁ! তোমাদের দু'জনের সমান আমার জ্বর আসে।" আমি বললাম, 'তার জন্যই কি আপনার পুরস্কারও দ্বিগুণ?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ! ব্যাপার তা-ই। (অনুরূপ) যে কোন মুসলিমকে কোন কষ্ট পৌঁছে, কাঁটা লাগে অথবা তার চেয়েও কঠিন কষ্ট হয়, আল্লাহ তাআলা এর কারণে তার পাপসমূহকে মোচন ক'রে দেন এবং তার পাপসমূহকে এইভাবে ঝরিয়ে দেওয়া হয়; যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।" *(বুখারী ৫৬৪৮, মুসলিম ৬৭২৪নং)*

(১৯) এক মাসের পথ অবধি দূর থেকে লোকেরা তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত হত।

(২০) তাঁর জন্য সারা পৃথিবীকে মসজিদ করা হয়েছিল। যে কোন পবিত্র জায়গায় নামায পড়া বৈধ ছিল। অথচ অন্যান্য নবীগণ ও তাঁদের উম্মতের নির্দিষ্ট উপাসনালয় ছাড়া উপাসনা হতো না। যেমন পবিত্র মাটিকে পানির বিকল্পরূপ পবিত্রতার মাধ্যম গণ্য করা হয়েছিল। পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে পানি দ্বারা ওযূ-গোসলের পরিবর্তে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায পড়ার বিধান ছিল। আজও তাঁর উম্মতের জন্য সেই বিধান আছে।

(২১) তাঁর জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী কোন নবী ও তাঁর উম্মতের জন্য তা হালাল ছিল না। তারা তা পুড়িয়ে ফেলত।

(২২) মহান আল্লাহ তাঁকে বৃহৎ শাফাআত দান করেছেন। ('তাঁর শাফাআত' শিরোনামে আলোচনা দ্রঃ)

(২৩) তিনি সারা জাহানের জিন ও ইনসানের জন্য সর্বশেষ নবী।

তিনি বলেছেন, "আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ চলার মত দূরত্বেও আমার ভীতি দুশমনদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে , (২) আমার জন্য সারা পৃথিবীকে মসজিদ ও (তার মাটিকে) পবিত্রকারী করে দেওয়া হয়েছে, অতএব আমার উম্মত যেখানেই থাকুক নামাযের সময় হয়ে গেলে সেখানেই সে যেন নামায পড়ে নেয়, (৩) আমার জন্য গনীমাতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কারোর জন্য বৈধ ছিল না, (৪) আমাকে কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (৫) অন্য সকল নবীকে নির্দিষ্ট গোত্রের নিকট পাঠানো

হয়েছিল আর আমাকে সকল মানুষের জন্য নবী করে পাঠানো হয়েছে।” *(বুখারী ৩৩৫, মুসলিম ১১৯১নং)*

(২৪) তাঁকে সারগর্ভ এমন কথা বলার শক্তি প্রদান করা হয়েছিল, যার শব্দ কম; কিন্তু অর্থ অনেক।

তিনি বলেছেন,

« فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ ».

“ছয়টি জিনিস দিয়ে আমাকে অন্যান্য নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আমাকে বহুলার্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলী (বলার ক্ষমতা) দেওয়া হয়েছে। আতঙ্ক দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদ ও (তার মাটিকে) পবিত্রকারী বানানো হয়েছে। আমি সারা সৃষ্টির জন্য প্রেরিত হয়েছি। আর আমাকে দিয়ে নবুঅতের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।” *(মুসলিম ১১৯৫নং)*

(২৫) তাঁর উম্মতের কাতারকে ফিরিশ্‌তামন্ডলীর কাতারের মতো গণ্য করা হয়েছে।

জাবের বিন সামুরাহ ﷺ বলেন, একদা তিনি বললেন, “তোমরা প্রতিপালকের সামনে ফিরিশ্তাবর্গের কাতার বাঁধার মত কাতার বেঁধে দাঁড়াবে না কি?” আমরা বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! ফিরিশ্তাবর্গ তাঁদের প্রতিপালকের সামনে কিরূপে কাতার বেঁধে দাঁড়ান।’ তিনি বললেন, “প্রথমকার কাতারসমূহ পূর্ণ করেন এবং ঘন হয়ে জমে কাতার বেঁধে দাঁড়ান।” *(মুসলিম ৪৩০, আবূ দাউদ ৬৬১, মিশকাত ১০৯১নং)*

(২৬) তাঁকে সূরা বাক্বারার শেষ ২টি আয়াত আরশের নিম্নস্থ ভান্ডার থেকে দান করা হয়েছে।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা জিবরীল ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় উপর দিক হতে এক শব্দ শুনলেন। উপর দিকে মাথা তুলে তিনি বললেন, ‘এ শব্দটি আসমানের এক দরজার শব্দ যা আজ খোলা হল; যা আজ ছাড়া ইতিপূর্বে কক্ষনো খোলা হয়নি। ঐ দরজা দিয়ে এক ফিরিশ্তা অবতরণ করেন।’ অতঃপর তিনি বললেন, “তিনি এমন এক ফিরিশ্তা যিনি (আজ) পৃথিবীর প্রতি অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া ইতি পূর্বে কোনদিন তিনি অবতরণ করেননি। অতঃপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, “(হে মুহাম্মাদ!) আপনি দুটি জ্যোতির সুসংবাদ নিন; যা আপনাকে দান করা হয়েছে এবং যা পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয়নি; (তা হল,) সূরা ফাতেহা ও বাক্বারার শেষ (দুই) আয়াত। যখনই আপনি উভয়কে পাঠ করবেন, তখনই আপনাকে উভয়ের প্রত্যেক বাক্যের (প্রার্থিত বিষয় অথবা সওয়াব) প্রদান করা হবে।” *(মুসলিম ৮০৬নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ করবে , তার জন্য সকল বস্তুর অনিষ্ট হতে ঐ দুটিই যথেষ্ট করবে।” *(বুখারী ৫০০৮ নং, মুসলিম ৮০৭ নং)*

তিনি বলেছেন,

«فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي».

অর্থাৎ, লোকেদের উপরে তিনটি বিষয় দিয়ে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে ঃ আমাদের কাতারকে ফিরিশ্‌তামন্ডলীর কাতারের মতো গণ্য করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল স্থানকে আমাদের জন্য মসজিদ বানানো হয়েছে। পানি না পেলে তার মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতার মাধ্যম বানানো হয়েছে। আর আমাকে সূরা বাক্বারার শেষাংশের এই আয়াতগুলি আরশের নিচের ভান্ডার থেকে দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দান করা হয়নি। *(আহমাদ ২৩২৫১, মুসলিম ১১৯৩, নাসাঈ কুবরা ৮০২২নং)*

(২৭) তাঁকে পৃথিবীর সকল ভান্ডারের চাবিকাঠি প্রদান করা হয়েছিল।

তিনি বলেছেন,

(بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي).

অর্থাৎ, বহুলার্থবোধক বাক্য-সহ আমি প্রেরিত হয়েছি, (কাফেরদের মনে) আতঙ্ক প্রক্ষেপ দ্বারা আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি, আর এক সময় যখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন (স্বপ্নে) পৃথিবীর যাবতীয় ভান্ডারের চাবিরাশি এনে আমার হাতে রাখা হয়েছে। *(বুখারী ২৯৯৭, ৬৯৯৮, ৭২৭৩, মুসলিম ১১৯৬নং)*

(২৮) কিয়ামতের দিন তাঁরই উম্মত-সংখ্যা সবার চাইতে বেশী হবে।

ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতোমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, ‘এটি হল মূসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান।’ অতঃপর তাকাতেই আরও দিগন্তভর একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, ‘এটি হল আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্‌ত্‌ প্রবেশ করবে।” *(বুখারী ৫৭০৫, মুসলিম ৫৪৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(إنَّ لكلِّ نَبِيَ حَوْضاً وإنَّهُمْ يَتَباهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وإنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً).

অর্থাৎ, প্রত্যেক নবীর হওয থাকবে (কিয়ামতে)। তাঁরা আপোসে গর্ব করবেন, তাঁদের মধ্যে কার (হওযের) অবতরণকারী সবচেয়ে বেশী হবে। আর আমি অবশ্যই আশা করি যে, তাঁদের মধ্যে আমার (হওযের) অবতরণকারী সবচেয়ে বেশি হবে। *(তিরমিযী ২৪৪৩, সঃ জামে’ ২১৫৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আমি অবশ্যই আশা করি যে, তাঁদের মধ্যে আমার অনুসারী সবচেয়ে বেশি হবে। *(সিঃ সহীহাহ ১৫৮-৯নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন,

« مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِىٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِىَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

অর্থাৎ, নবীগণের মধ্যে প্রত্যেক নবীকেই এমন নিদর্শনাবলী দেওয়া হয়েছিল, যার অনুরূপ দেখে মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা হল অহী, আল্লাহ আমার প্রতি প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি অবশ্যই আশা করি যে, কিয়ামতের দিন তাঁদের

মধ্যে আমার অনুসারী সবার চেয়ে বেশি হবে। *(বুখারী ৪৯৮১, মুসলিম ৪০২নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ ».

অর্থাৎ, আম্বিয়াগণের মধ্যে আমার অনুসারীই বেশি হবে কিয়ামতের দিন। আমিই হব প্রথম সেই ব্যক্তি, যে বেহেশ্‌তের দরজায় করাঘাত করবে। *(মুসলিম ৫০৫নং)*

(২৯) তিনিই সর্বপ্রথম কবর থেকে পুনরুত্থিত হবেন।

(৩০) তিনিই কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের সর্দার ও নেতা হবেন।

(৩১) তিনিই প্রথম সুপারিশকারী হবেন এবং তাঁর সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ ».

অর্থাৎ, আমি কিয়ামতের দিন আদম-সন্তানদের সর্দার। প্রথম আমাকেই কবর থেকে উঠানো হবে এবং প্রথম আমিই সুপারিশকারী ও আমার সুপারিশ গৃহীত হবে। *(মুসলিম ৬০৭৯নং)*

তিনি বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আমি হব সকল মানুষের নেতা। তোমরা কি জান, কী কারণে? কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সমগ্র মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে। (সে ময়দানটি এমন হবে যে,) সেখানে দর্শক তাদেরকে দেখতে পাবে এবং আহবানকারী (নিজ আহবান) তাদেরকে শুনাতে পারবে। সূর্য একেবারে কাছে এসে যাবে। মানুষ এতই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিপতিত হবে যে, ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। তারা বলবে, 'দেখ, তোমাদের সবার কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তোমাদের কী বিপদ এসে পৌঁছেছে! এমন কোন ব্যক্তির খোঁজ কর, যিনি পরওয়ারদেগারের কাছে সুপারিশ করতে পারেন।' লোকেরা বলবে, 'চল আদমের কাছে যাই।' (তাঁর কাছে গেলে তিনি এবং এইভাবে নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) ওযর পেশ করবেন। সকলেই বলবেন,) 'আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও।'

সুতরাং তারা সবাই আমার কাছে এসে বলবে, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি আখেরী নবী। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী (ভয়াবহ) দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করছি।' তখন আমি চলে যাব এবং আরশের নীচে আমার প্রতিপালকের জন্য সিজদাবনত হব। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের জন্য আমার হৃদয়কে এমন উন্মুক্ত ক'রে দেবেন, যেমন ইতোপূর্বে আর কারো জন্য করেননি। অতঃপর তিনি বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' *(বুখারী ৪৭১২, মুসলিম ৪৯৫নং)*

(৩২) তিনিই সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবেন।

তিনি বলেছেন,

...(وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَدُعَاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ....).

"---জাহান্নামের পুল রাখা হবে। সুতরাং আমিই হব সর্বপ্রথম সেই ব্যক্তি, যে পার হবে। আর সেদিন রসূলগণের দুআ হবে, 'আল্লাহুম্মা সাল্লিম সাল্লিম।' *(বুখারী ৬৫৭৩নং)*

তাঁর পর তাঁরই উম্মত অন্যান্য উম্মতের পূর্বে পুলসিরাত অতিক্রম করে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। *(বুখারী ৭৪৩৭, মুসলিম ৪৬৯নং)*

(৩৩) তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

তিনি বলেছেন,

(أنا أَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بابِ الجَنَّةِ فَأُقَعْقِعُهَا).

অর্থাৎ, আমিই হব সেই ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া ধরে হিলাবে। *(আহমাদ ২৬৯২, তিরমিযী ৩১৪৮, দারেমী ৫০নং)*

(وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ).

অর্থাৎ, আমিই হব সেই ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(আহমাদ ১২৪৯১, সিঃ সহীহাহ ১৫৭১নং)*

(وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ تَحْتَ لِوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الجَنَّةِ).

"কিয়ামতের দিন আদম-সন্তানদের সকলেই আমার পতাকাতলে অবস্থান করবে এবং আমিই হব সেই ব্যক্তি, যার জন্য সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলা হবে।" *(ইবনে আসাকির, সঃ জামে' ৭১১৮নং)*

« آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ ».

"আমি জান্নাতের নিকট এসে তার দরজা খুলতে বলব। দারোয়ান ফিরিশ্‌তা বলবেন, 'কে আপনি?' আমি বলব, 'মুহাম্মাদ।' দারোয়ান বলবেন, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য দরজা না খুলি।" *(মুসলিম ৫০৭নং)*

(৩৪) তাঁর প্রতি একবার দরূদ ও সালাম পড়লে দশবার আল্লাহর রহমতের অধিকারী হওয়া যায়।

(৩৫) তাঁকে 'অসীলা' নামক জান্নাতের একটি সর্বোৎকৃষ্ট স্থান দান করা হবে।

তিনি বলেছেন,

« إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ».

"তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন (আযানের উত্তরে) মুআয্‌যিন যা কিছু বলবে, তোমরাও ঠিক তাই বলবে। তারপর আযান শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে তার প্রতি আল্লাহ দশটি রহমত নাযেল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'অসীলা' প্রার্থনা করবে। কারণ, 'অসীলা' হচ্ছে জান্নাতের এমন একটি স্থান, যা সমস্ত বান্দার মধ্যে কেবল আল্লাহর একটি বান্দা (তার উপযুক্ত) হবে। আর আশা করি, আমিই সেই বান্দা হব। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য (আমার) সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।" *(মুসলিম ৮৭৫নং)*

তাঁর মাধ্যমে তাবার্রুক গ্রহণ

তাবার্রুক কোন বস্তুর মাঝে মঙ্গল ও কল্যাণের আশা রাখা, শুভ ধারণা ও কামনা করা, প্রাচুর্য ও পবিত্রতার বিশ্বাস রাখাকে বুঝায়।

আহলে সুন্নাহ এ বিষয়ে একমত যে, মূলতঃ তাবার্রুক নিষিদ্ধ, সে বিষয়ে ছাড়া, যে বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সহীহ শরয়ী দলীল আছে।

কী মুবারক, কীসে বর্কত আছে, কীভাবে বর্কত অর্জন করা যাবে, তা একমাত্র শরীয়তের নির্দেশেই নির্ধারিত হয়। কারো ভক্তি-ভালোবাসা ও আবেগ দ্বারা তা নির্ধারণ হয় না।

শরীয়ত কর্তৃক নির্ণীত মুবারক ব্যক্তিত্ব ছিল আল্লাহর খলীল, প্রিয় নবী ﷺ-এর। তাঁর মাঝে আল্লাহ বহু ইহলৌকিক ও পারলৌকিক খায়র ও বর্কত পুঞ্জীভূত করেছিলেন। যে তাঁর নিকট তাবার্রুকের আশায় যেত, আল্লাহ তাকেও বর্কতপূর্ণ করতেন। সেই বর্কতের কথা সাহাবীগণও জানতেন এবং সৃষ্টির সেরা মানুষের নিকট সেই বর্কত লাভও করতেন।

তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর দেহ স্পর্শ করে তাবার্রুক গ্রহণ করেছেন সাহাবাগণ। যেহেতু তিনি ছিলেন মুবারক, তাঁর মধ্যে ছিল বর্কতের ভান্ডার।

আবূ জুহাইফা ؓ বলেন, একদা দুপুরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাত্‌হার দিকে বের হলেন। সেখানে উযূ করে যোহরের দু' রাকআত ও আসরের দু' রাকআত নামায আদায় করলেন। লোকেরা উঠে তাঁর দুই হাত নিয়ে নিজেদের চেহারায় মাসাহ করতে লাগল। আমিও তাঁর হাত নিয়ে আমার চেহারার উপরে রাখলাম। দেখলাম, তা বরফের চেয়ে বেশি ঠান্ডা এবং কস্তুরীর চেয়ে বেশি সুগন্ধময়। *(বুখারী ৩৫৫৩নং)*

তাঁর পবিত্র হাতের বর্কত নেবার জন্য পাত্রে পানি নিয়ে তাঁর হাত ডুবার অপেক্ষা করতেন। আনাস ؓ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের নামায পড়তেন, তখন মদীনার দাস-দাসীরা পানির পাত্র নিয়ে হাযির থাকত। তিনি প্রত্যেক পাত্রেই হাত ডুবিয়ে দিতেন। কখনো শীতের ফজরেও তিনি পাত্রে হাত ডুবাতেন।' *(মুসলিম ৬১৮৭নং)*

মাথার কেশ মুন্ডন করার সময় সাহাবীগণ তাঁর চার পাশে ঘিরে দাঁড়াতেন। তাঁর একটি চুলও মাটিতে পড়তে না দিয়ে হাতের মুঠোয় নিয়ে সকলকে বন্টন করতেন এবং তার দ্বারায় তাবার্রুক হাসিল করতেন। *(ঐ ৬১৮৮নং)*

তিনি নিজেই তাঁর মুন্ডিত কেশ লোকেদের মাঝে বিতরণ করতে আদেশ করতেন। *(ঐ ৩২১৫নং)*

ইসলামের মহান যোদ্ধা ও বীর সেনাপতি খালেদ বিন অলীদ ؓ যুদ্ধের সময় তাঁর পাগড়ীতে সেই চুল তাবার্রুক স্বরূপ বেঁধে রাখতেন।

তাঁর দেহের ঘাম শিশিতে ভরে রাখা হতো এবং তা খোশবুর সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করা হতো বর্কত লাভের জন্য।

একদা তিনি উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। তিনি

ঘরে ছিলেন না। তিনি এলে তাঁকে বলা হল, 'নবী ﷺ তোমার ঘরে এসে তোমার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছেন।' তিনি ঘর্মাক্ত হলে তাঁর ঘাম বিছানার চামড়ার উপর জমে উঠেছিল। উম্মে সুলাইম তাঁর সিন্দুক খুলে শিশি বের করলেন। অতঃপর সেই ঘাম (কাপড়খন্ড দ্বারা শোষণ ক'রে তা) নিংড়ে শিশিতে রাখতে লাগলেন। নবী ﷺ অকস্মাৎ ঘাবড়ে উঠলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করছ উম্মে সুলাইম?' বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! (আপনার ঘাম। আমাদের সুগন্ধিতে মিশিয়ে দেব। তা হবে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি।) আর তাতে আমাদের শিশুদের জন্য বর্কতের আশা করব।' তিনি বললেন, "ঠিক আছে।" *(মুসলিম ৬২০১-৬২০২নং)*

সাহাবাগণ তাঁর ওযুর পানি বর্কতের আশায় পান করতেন।

সায়েব বিন য্যাযীদ বলেন, (শিশু অবস্থায়) আমাকে আমার খালা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। খালা তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার বোনপো ব্যথা অনুভব করে।' সুতরাং তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং আমার জন্য বর্কতের দুআ দিলেন। অতঃপর তিনি ওযূ করলেন। সুতরাং আমি তাঁর ওযূর পানি পান করলাম। অতঃপর তাঁর পিঠের পিছনে খাড়া হলাম এবং তাঁর দুই কাঁধের মাঝে পায়রার ডিমের মতো নবুঅতের মোহর দেখতে পেলাম। *(বুখারী ১৮৭, মুসলিম ২৩৪৫নং)*

সাহাবাগণ তাঁর থুথু গায়ে মাখতেন। *(বুখারী ২৭৩২নং)*

হুদাইবিয়্যার সন্ধির সময় মক্কার কুরাইশদের প্রতিনিধি দল ও মুসলিমদের মাঝে কথাবার্তা ও টানাপোড়েন চলছিল। সেই অবস্থায় উরওয়াহ বিন মাসঊদ সাক্বাফী মুসলিমদের আচরণ সচক্ষে দর্শন করছিলেন। মুসলিমরা তাঁদের নবীর সাথে কী ব্যবহার করছে, তা তিনি সন্তর্পণে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ কফ ফেলতেই তা ওদের কারো হাতে পড়ছিল এবং সে তা নিয়ে নিজের চেহারা ও চামড়ায় মেখে নিচ্ছিল। তিনি কোন আদেশ করলে তারা তাঁর আদেশ পালনে তৎপর ছিল। তিনি উযূ করলে তাঁর উযূর পানি নেওয়ার জন্য মারামারি করছিল। তিনি কথা বললে তারা নিজেদের আওয়াজ তাঁর কাছে নিচু ক'রে নিচ্ছিল। অতি সমীহতে তাঁর প্রতি তারা এক দৃষ্টে তাকাচ্ছিল না।'

উরওয়াহ নিজ সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসে বললেন,

(أَيْ قَوْمِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى

وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا....).

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! অনেক রাজা-বাদশার দরবারে গেছি, ক্বাইসার, কিসরা ও নাজাশীর দরবারে গেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! কোন রাজাকে দেখিনি, তার প্রজারা তাকে তেমন সমীহ করে, যেমন মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিশ্যরা করে মুহাম্মাদের! *(বুখারী ২৭৩২নং)*

সাহাবাগণ তাঁর উচ্ছিষ্ট পানি বর্কতের আশায় পান করতেন। *(বুখারী ৪৩২৮নং)* তাঁর পরিহিত লেবাস বর্কত লাভের জন্য পরিধান করতেন। কাফনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রেখে নিতেন। *(বুখারী ৬০৩৬নং)*

মোট কথা, তাঁর দেহ ও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন চুল, ঘাম, লেবাস এবং তাঁর ব্যবহৃত পাত্র ও অন্যান্য বস্তু সবই ছিল বর্কতপূর্ণ। তাঁরা তাতে বর্কতের আশা করতেন এবং ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করতেন। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের বর্কত ও কল্যাণ দান করেছেন।

সাহ্ল ইবনে সা'দ সায়েদী ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার (যুদ্ধের) দিন বললেন, "নিশ্চয় আমি আগামীকাল যুদ্ধ-পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, আর সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালবাসেন।" অতঃপর লোকেরা এই আলোচনা করতে করতে রাত কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এটা দেওয়া হবে। অতঃপর সকালে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেল। তাদের প্রত্যেকেরই এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আলী ইবনে আবী ত্বালেব কোথায়?" তাঁকে বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ব্যথা হচ্ছে।' তিনি বললেন, "তাকে ডেকে পাঠাও।" সুতরাং তাঁকে ডেকে আনা হল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চক্ষুদ্বয়ে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন। ফলে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন; যেন তাঁর কোন ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁকে যুদ্ধ-পতাকা দিলেন। *(বুখারী ২৯৪২, ৩৭০১, মুসলিম ৬৩৭৬নং)*

আবূ মূসা ؓ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর পাশে ছিলাম, তখন তিনি মক্কা-মদীনার মাঝে জিইর্রানাতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল। ইতি মধ্যে এক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা কি পালন করবেন না?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "সুসংবাদ নাও।"

বেদুঈন তাঁকে বলল, 'আপনি আমাকে সুসংবাদ বহুবার বলেছেন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত অবস্থায় আবূ মূসা ও বিলালের দিকে ফিরে বললেন,

« إِنَّ هَذَا قَدْ رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلاَ أَنْتُمَا ».

"এ তো সুসংবাদ রদ্দ করে দিল, তোমরা তা গ্রহণ কর।"

তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা তা গ্রহণ করলাম।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পাত্রে পানি আনতে বললেন। অতঃপর তিনি তাতে নিজ দুই হাত ও চেহারা ধুলেন এবং কুল্লি ক'রে (কুল্লির পানি) তাতে দিলেন। তারপর বললেন,

« اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا ».

"এ থেকে পান কর এবং তোমাদের চেহারা ও বুকে ঢেলে নাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর।"

তাঁরা পাত্রটি নিয়ে তাই করলেন, যা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে আদেশ করেছিলেন। পর্দার আড়াল থেকে উম্মে সালামাহ ডাক দিয়ে বললেন, 'তোমাদের পাত্রে যা আছে, তার কিছু তোমাদের আম্মার জন্য বাঁচিয়ে রাখ।' সুতরাং তাঁরা তাঁর জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখলেন। *(বুখারী ৪৩২৮, মুসলিম ৬৫৬১নং)*

বারা' বিন আযেব ﷺ বলেন, 'হুদাইবিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে চৌদ্দ শতেরও বেশি লোক ছিল। তারা একটি কুয়ার পাশে অবতরণ করলে তার পানি নিঃশেষ হয়ে যায়। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অভিযোগ জানায়। তিনি কুয়ার কিনারায় বসে তার এক বালতি পানি তলব করেন। পানি আনা হলে তিনি তাতে থুথু দিয়ে দুআ করেন। অতঃপর কিছুক্ষণ তা বর্জন করতে বলেন। সুতরাং (কুয়ার পানি বৃদ্ধি পায় এবং) সেখান থেকে প্রস্থান করে যাওয়া অবধি তারা পান করে পরিতৃপ্ত হয় ও তাদের সওয়ারীগুলিকেও পরিতৃপ্ত করে।' *(বুখারী ৪১৫১নং)*

জাবের ﷺ বলেন, (হুদাইবিয়ার দিন) একদা আসরের সময় হয়ে গেল। আমি নবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। সামান্য অবশিষ্ট পানি ছাড়া অন্য পানি ছিল না। ঐ পানিটুকু একটি পাত্রে রেখে নবী ﷺ-এর কাছে আনা হল। তিনি তাতে হাত ভরে দিলেন এবং আঙ্গুলগুলিকে ফাঁক করলেন। অতঃপর বললেন,

(حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوَضُوءِ، الْبَرَكَةُ مِنْ اللَّهِ).

"এসো উযূর পানির দিকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্কত।"

আমি দেখলাম, তাঁর আঙ্গুলগুলির মধ্য হতে পানি নিঃসৃত হচ্ছিল। সুতরাং লোকেরা তা দিয়ে উযূ করল এবং পান করল। তা হতে আমিও আমার পেটে রাখতে কোন ত্রুটি করিনি। আমি জেনেছিলাম, তা হল বর্কত।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি জাবের ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাদের সংখ্যা কত ছিল?' উত্তরে তিনি বললেন, 'চৌদ্দশত।' *(বুখারী ৫৬৩৯নং)*

জাবের ﷺ বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় আমরা পরিখা খনন করছিলাম। সেই সময় এক খন্ড কঠিন পাথর বেরিয়ে এলে (যা ভাঙ্গা যাচ্ছিল না) সকলেই নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'খন্দকের মধ্যে এক খন্ড পাথর বেরিয়েছে (আমরা তা ভাঙ্গতে পারছি না)।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, "আমি নিজে খন্দকে অবতরণ করব।" অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। সে সময়ে তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আর আমরাও অনাহারে ছিলাম; তিনদিন কোন কিছুই

খাইনি। নবী ﷺ (এসে) একটি গাঁইতি হাতে নিয়ে পাথরের উপর আঘাত করলেন, ফলে তৎক্ষণাৎ তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকা রাশিতে পরিণত হল। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বাড়ী যাওয়ার জন্য অনুমতি দিন।' (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ী পৌঁছে) আমার স্ত্রীকে বললাম, 'নবী ﷺ-এর মধ্যে আমি এমন কিছু দেখেছি, যা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমার নিকট কোন খাবার আছে কি?' সে বলল, 'আমার নিকট কিছু যব ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে।'

সুতরাং বকরীর বাচ্চাটি আমি যবেহ করলাম এবং সে যব পিষে দিল। অতঃপর গোশ্ত ডেকচিতে রেখে আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম। সে সময় আটা খামির হচ্ছিল এবং ডেকচি চুলার ঝিকের উপর ছিল ও গোশ্ত প্রায় রান্না হয়ে এসেছিল। তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার (বাড়ীতে) সামান্য কিছু খাবার আছে। ফলে একজন বা দু'জন সাথে নিয়ে আপনি উঠে আসুন।' তিনি বললেন, "কী পরিমাণ খাবার আছে?" আমি তাঁর নিকট সব খুলে বললে তিনি বললেন, 'অনেক এবং উত্তম আছে।' অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বল, সে যেন আমি না আসা পর্যন্ত ডেকচি চুলা থেকে না নামায় এবং রুটি তৈরী না করে।" তারপর (সকলের উদ্দেশ্যে) তিনি বললেন, "তোমরা উঠ! (জাবির তোমাদেরকে খাবারের দাওয়াত দিয়েছে।)" মুহাজির ও আনসারগণ উঠলেন (এবং চলতে লাগলেন)। অতঃপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললাম, 'তোমার সর্বনাশ হোক! (এখন কী হবে?) নবী ﷺ তো মুহাজির, আনসার এবং তাদের অন্য সাথীদের নিয়ে চলে আসছেন।' তিনি (জাবেরের স্ত্রী) বললেন, 'তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' (স্ত্রী বললেন, 'তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। আমাদের কাছে যা আছে তা তো আপনি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন।' জাবের বলেন, তখন আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূর হল। আমি বললাম, 'তুমি ঠিকই বলেছ।') তারপর নবী ﷺ উপস্থিত হয়ে বললেন, "তোমরা সকলেই প্রবেশ কর এবং ভিড় করো না।" এ বলে তিনি রুটি টুকরো ক'রে তার উপর গোশ্ত দিয়ে সাহাবাদের মাঝে বিতরণ করতে শুরু করলেন। (এগুলো পরিবেশন করার সময়) তিনি ডেকচি ও চুলা ঢেকে রেখেছিলেন। এভাবে তিনি রুটি টুকরো ক'রে হাত ভরে বিতরণ করতে লাগলেন এতে সকলে তৃপ্তি সহকারে খাবার পরেও কিছু বাকী রয়ে গেল। তিনি (জাবেরের স্ত্রীকে) বললেন, "এ তুমি খাও এবং অন্যকে উপহার দাও। কেননা, লোকেদেরকে ক্ষুধা পেয়েছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, জাবের ﷺ বলেন, যখন পরিখা খনন করা হল, তখন আমি নবী ﷺ-কে ভুখা দেখলাম। অতঃপর আমি আমার স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললাম, 'তোমার নিকট কোন (খাবার) জিনিস আছে কি? কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত দেখলাম।' সুতরাং সে একটি চামড়ার থলি বের করল, যাতে এক সা' (আড়াই কিলো পরিমাণ) যব ছিল। আর আমাদের নিকট একটি গৃহপালিত ছাগলের বাচ্চা ছিল। আমি তা জবাই করলাম এবং আমার স্ত্রী যব পিষল। আমার (মাংস বানানোর কাজ সম্পন্ন করা পর্যন্ত) সেও যব পিষার কাজ সেরে নিল। পুনরায় আমি মাংস টুকরো টুকরো করে হাঁড়িতে রাখলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যেতে লাগলাম। সে বলল, 'আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথীদের কাছে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না।' সুতরাং আমি তাঁর নিকট এলাম এবং চুপি চুপি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের একটি ছাগল জবাই করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা

যব পিষেছে। সুতরাং আপনি আসুন এবং আপনার সাথে কিছু লোক।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ চিৎকার ক'রে বললেন, "হে পরিখা খননকারীরা! জাবের খাবার তৈরী করেছে, তোমরা এসো।" রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "যে পর্যন্ত আমি না আসি, সে পর্যন্ত তুমি চুলা থেকে ডেকচি নামাবে না এবং আটার রুটি তৈরী করবে না।" অতঃপর আমি এলাম এবং নবী ﷺও এলেন। তিনি লোকেদের আগে আগে হাঁটতে লাগলেন। পরিশেষে আমি আমার স্ত্রীর নিকট এলাম (এবং তাকে সকলের আসার সংবাদ দিলাম)। সে আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। আমি বললাম, '(এতে আমার দোষ কী?) আমি তো তা-ই করেছি, যা তুমি আমাকে বলেছিলে।' (যাই হোক) সে খমীর বের ক'রে দিল। তিনি তাতে থুথু মারলেন এবং বর্কতের দুআ করলেন। তারপর তিনি আমাদের ডেকচির নিকট গিয়ে তাতেও থুথু মারলেন এবং বর্কতের দুআ করলেন। আর তিনি (আমার স্ত্রীকে) বললেন, "একজন মহিলা ডাকো; সে তোমার সাথে রুটি তৈরী করুক এবং তুমি ডেচকি থেকে (মাংস) পাত্রে দিতে থাক, কিন্তু চুলা থেকে তা নামাবে না।"

তাঁরা সংখ্যায় এক হাজার ছিলেন। জাবের বলেন, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, 'সকলেই খাবার খেলেন এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা কিছু অবশিষ্ট রেখে চলে গেলেন। আর আমাদের ডেকচি আগের মত ফুটতেই থাকল এবং আমাদের আটা থেকে রুটি প্রস্তুত হতেই রইল।' *(বুখারী ৪১০২, মুসলিম ৫৪৩৬নং)*

আনাস ইবনে মালেক ﷺ থেকে বর্ণিত, (একদা আমার সৎবাপ) আবূ ত্বালহা (আমার মা) উম্মে সুলাইমকে বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কণ্ঠস্বরটা খুব ক্ষীণ শুনলাম। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি ক্ষুধার্ত। সুতরাং তোমার নিকট কিছু আছে কি?' উম্মে সুলাইম বললেন, 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি কিছু যবের রুটি তার ওড়নার এক অংশ দিয়ে বেঁধে গোপনে আমার কাপড়ের নিচে গুঁজে দিলেন। আর অপর অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। আমি তা নিয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে বসা অবস্থায় পেলাম। তাঁর সাথে কিছু লোক ছিল। আমি তাদের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, "তোমাকে আবূ ত্বালহা পাঠিয়েছে?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "কোন খাবারের জন্য নাকি?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর (সাথীদেরকে) বললেন, "ওঠ।" সুতরাং তাঁরা রওনা হলেন। আমিও তাঁদের আগে আগে চলতে লাগলাম এবং আবূ ত্বালহার নিকট এসে খবর জানালাম। তখন আবূ ত্বালহা বললেন, 'হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোক নিয়ে আসছেন। অথচ আমাদের নিকট সবাইকে খাওয়ানোর মত খাদ্য সামগ্রী নেই (এখন কী করা যায়)?' উম্মে সুলাইম বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন।' অতঃপর আবূ তালহা (আগে) গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে আগমন করলেন এবং উভয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হে উম্মে সুলাইম! তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো।' সুতরাং তিনি ঐ রুটিগুলো এনে হাজির করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেগুলিকে টুকরা টুকরা করতে আদেশ করলেন। অতঃপর তার উপর উম্মে সুলাইম ঘিয়ের পাত্র ঢেলে তরকারি বানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাতে আল্লাহর ইচ্ছায় কী কী বলে (ফুঁক) দিলেন। তারপর বললেন, "দশজনকে আসতে বল।" তখন দশজনকে আসতে বলা হল। তারা এসে পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর বললেন, "আরো দশজনকে আসতে বল।" তখন আরও দশজন

এসে খেয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর বললেন, “আরো দশজনকে আসতে বল।” এভাবে আগত লোকদের সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়া-দাওয়া করলেন। আর আগত লোকদের সংখ্যা ছিল ৭০ কিংবা ৮০ জন। *(বুখারী ৩৫৭৮, মুসলিম ৫৪৩৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, দশজন ক'রে প্রবেশ করতে এবং বের হতে থাকল। এমনকি শেষ পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তি বাকী রইল না, যে প্রবেশ করে পরিতৃপ্তি সহকারে খায়নি। অতঃপর ঐ খাবার জমা ক'রে দেখা গেল যে, খাওয়ার আগের মতই বাকী রয়েছে।

অন্য বর্ণনায় আছে, তারা দশ দশজন ক'রে খাবার খেল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত ৮০ জন লোককে তিনি খাওয়ালেন। সবশেষে নবী ﷺ এবং গৃহবাসীরা খেলেন এবং তাঁরাও কিছু (খাবার) ছেড়ে দিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, অতঃপর তাঁরা এত খাবার অবশিষ্ট রাখলেন যে, তা প্রতিবেশীদের নিকট পৌঁছে দিলেন।

এক বর্ণনায় আছে, আবূ তালহা দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। পরিশেষে আল্লাহর রসূল ﷺ এসে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আসলে সামান্য কিছু জিনিস ছিল।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

« هَلُمَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَةَ ».

“এসো! আল্লাহ নিশ্চয় তাতে বর্কত সৃষ্টি করবেন।” *(মুসলিম ৫৪৪১নং)*

এ তো আল্লাহর খলীলের কথা। তিনি আর মানুষের মাঝে নেই। তাঁর ব্যবহৃত কোন জিনিস বা তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন চুল বা অন্য কিছু সুনিশ্চিতভাবে তাঁরই বলে কোথাও সংরক্ষিত নেই। তাই সেই ধরনের তাবার্রুক গ্রহণ এখন আর সম্ভব নয়। আর তাঁর মত কোন হাবীব নেই, যাঁর দেহ বা দেহাংশ নিয়ে মানুষ তাবার্রুক নিতে পারে বা বর্কতের আশা করতে পারে।

এ কথা প্রমাণিত যে, তাঁর ব্যবহৃত জিনিসগুলি বিভিন্ন ফিতনা ও যুদ্ধের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে অথবা হারিয়ে গেছে।

তাঁর একটি চাদর আব্বাসীদের আমলের শেষ সময়কালে নষ্ট হয়ে গেছে। ৬৫৬ হিজরীতে তাতার তা পুড়িয়ে ফেলেছে। এটি বাগদাদে সংরক্ষিত ছিল।

তাঁর পায়ের একজোড়া জুতা ছিল দামেশকে। তৈমুরলঙ্গের ফিতনা আমলে ৮০৩ হিজরীতে নিখোঁজ হয়ে যায়।

আর এইভাবে মহানবী ﷺ-এর চুল, রুমাল, পাগড়ি, লাঠি বা অন্য কিছু কোথাও আছে বলে সঠিক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিধায় ধারণাবশে কোন কিছুকে তাঁর মনে করে তার দ্বারা তাবার্রুক গ্রহণ মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। *(দ্রঃ আল-আষারুন নাবাবিয়্যাহ ৮২পৃঃ)*

অনুরূপভাবে এ কথাও জেনে রাখা দরকার যে, তাবার্রুক গ্রহণের ব্যাপারে মহানবী ﷺ-এর মতো অন্য কেউ হতে পারেন না, চাহে তিনি আহলে বায়তের কেউ হন অথবা অন্য কোন বড় বুযুর্গ হন। নবীর ওয়ারেসদের মধ্যে সেই ধরনের কোন বর্কত নেই। যেহেতু নবীগণ কেবল ইল্‌মের ওয়ারেস বানিয়ে থাকেন। মহানবী ﷺ-এর দেহ বা তাঁর দেহ সংলগ্ন অথবা তাঁর ব্যবহৃত কোন জিনিস নিয়ে বর্কত গ্রহণ কেবল তাঁর সাথেই সীমাবদ্ধ। পরবর্তী কোন সাহাবী, তাবেঈ, ইমাম, বুযুর্গ বা আলেমের দেহ বা দেহ সংলগ্ন অথবা তাঁদের ব্যবহৃত কোন জিনিস নিয়ে তাবার্রুক গ্রহণ বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ-এর তিরোধানের পর কোন

সাহাবীর মাধ্যমে সেই শ্রেণীর তাবার্রুক গ্রহণ প্রমাণিত নয়। না খুলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক, আর না অন্য কোন সাহাবী কর্তৃক।

বলা বাহুল্য, ব্যক্তিত্ব নিয়ে তাবার্রুক গ্রহণ মহানবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য। নবীর ওয়ারেসদের ইল্‌ম দ্বারা বর্কত অর্জন করা মুসলিমদের কর্তব্য।

মুসলিমের মন অবশ্যই তার প্রিয় নবী ﷺ-এর প্রতি সদা আগ্রহী থাকবে। মদীনা নববিয়াতে থাকাকালে কত আশা করেছি, যদি তাঁর কোন স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পাই। ভালোবাসার আকর্ষণে মনে হয়েছে যদি তাঁর কোন ত্যক্ত জিনিস দেখতে পাই। তাঁর হুজরার পাশে রওযায় বসে কত কল্পনা করেছি, যদি তাঁর নূরানী মুবারক চেহারা দেখে আমার চক্ষুদ্বয়কে শীতল করতে পারতাম। যদি তাঁকে এক পলকের জন্য স্পর্শ করতে পারতাম। যদি এক মুহূর্তের জন্য তাঁর কোন সুমিষ্ট বাণী শুনতে পেতাম। যদি আমার সব কিছু কুরবানী দিয়েও একবার সেই মুবারক হাবীবের দেখা পেতাম।

তাঁর মিহরাবের পাশে বসেছি, তাঁর দর্সগাহে ভাবাবেগে আকুল হয়েছি, তাঁর কোন সাহাবীকেও দেখতে পেতাম, যিনি আমার হাবীবকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

মক্কার তাঁর জন্মস্থান, নূর পাহাড়-সহ অন্যান্য স্মৃতিস্থান দর্শন করে নয়নে অশ্রু ঝরিয়েছি, যদি এক নিমেষের জন্য হাবীবের দেখা পেতাম। এই চৌদ্দ শ' বছর পরেও এমন আশা বড় আজীব হলেও সে আশাতে যেন প্রশান্তি ছিল, এক প্রকার আনন্দ ছিল। মদীনার অলীতে-গলীতে ঘুরে বেড়িয়েও এক প্রকার আনন্দ লাভ করেছি।

ইবনে সীরীন বলেন, একদা আমি উবাইদাহ বিন আম্‌রকে বললাম, 'আমাদের কাছে নবী ﷺ-এর চুল আছে, যা আনাস অথবা আনাসের পরিবারের কারো নিকট থেকে অর্জন করেছি।' তিনি বললেন, 'আমার নিকট তাঁর একটি চুল থাকা দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত বস্তুসমূহ থেকে অধিক প্রিয়।' *(বুখারী ১৭০নং)*

ইমাম যাহাবী এই উক্তির টীকায় বলেন, 'এই শ্রেণীর কথা নবী ﷺ-এর পঞ্চাশ বছর পরে এই ইমাম বলেন! তাহলে আমরা আমাদের এই সময়ে কী বলব? যদি আমরা সঠিক সূত্রে তাঁর কিছু চুল অথবা জুতার ফিতা অথবা কাটা নখ অথবা পান-পাত্রের ভগ্নাংশও লাভ করতাম! *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৪/৪২)*

প্রকৃতপ্রস্তাবে সহীহ সূত্রে তাঁর কোন কিছুই বর্তমান নেই।

ইমাম যাহাবী অন্যত্র বলেন, এ কথা প্রমাণিত যে, নবী ﷺ মাথা নেড়া করার সময় তাঁর পবিত্র চুল সাহাবাদের মাঝে তাঁদের সম্মানার্থে বিতরণ করেছেন। হায় আফসোস! যদি তাঁর একটি চুলে চুম্বন দিতে সক্ষম হতাম। *(ঐ ১৩/৫৪৭)*

সাবেত বুনানী (রঃ) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম আনাস ﷛-কে দেখতেন, তখন তাঁর কাছে এসে তাঁর হাতে চুমা দিতেন এবং বলতেন, 'এটা সেই হাত, যে হাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতকে স্পর্শ করেছে।'

অনুরূপ আচরণ করেছেন ইয়াহ্য়া বিন হারেষ (রঃ) সাহাবী ওয়াষেলাহ বিন আসক্বা' ﷛-এর সাথে এবং কিছু তাবেঈন সালামাহ বিন আকওয়া' ﷛-এর সাথে।

জাবের ﷛ বলেন, 'একটি খেজুর গাছের গুঁড়ি (খুঁটি) ছিল। নবী ﷺ খুতবাহ দানকালে দাঁড়িয়ে তাতে হেলান দিতেন। তারপর যখন (কাঠের) মিম্বর (তৈরী ক'রে) রাখা হল, তখন আমরা দশ মাসের গাভিন উটনীর শব্দের ন্যায় গুঁড়িটির (কান্নার) শব্দ শুনতে পেলাম।

পরিশেষে নবী ﷺ (মিম্বর হতে) নেমে নিজ হাত তার উপর রাখলে সে শান্ত হল।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যখন জুমআর দিন এল এবং নবী ﷺ মিম্বরের উপর বসলেন, তখন খেজুরের যে গুঁড়ির পাশে তিনি খুতবা দিতেন, তা এমন চিল্লিয়ে কেঁদে উঠল যে, তা ফেটে যাবার উপক্রম হয়ে পড়ল!'

অপর বর্ণনায় আছে, 'শিশুর মত চিল্লিয়ে উঠল। সুতরাং নবী ﷺ (মিম্বর থেকে) নেমে তাকে ধরে নিজ বুকে জড়ালেন। তখন সে সেই শিশুর মত কাঁদতে লাগল, যে শিশুকে (আদর ক'রে) চুপ করানো হয়, (তাকে চুপ করানো হল এবং) পরিশেষে সে প্রকৃতিস্থ হল।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এর কান্নার কারণ হচ্ছে এই যে, এ (কাছে থেকে) খুতবা শুনত (যা থেকে সে এখন বঞ্চিত হয়ে পড়েছে)।" *(বুখারী)*

হাসান বাস্‌রী (রঃ) উক্ত হাদীসের কাহিনী বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, 'হে আল্লাহর বান্দাগণ! কাঠ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ-কামনায় কেঁদে ওঠে! সুতরাং তোমরা এমন সাক্ষাৎ-কামনার বেশি হকদার। *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৪/৫৭০)*

নিশ্চয় সৌভাগ্যবান তাঁরা, যাঁরা মক্কা-মদীনা দেখার সুযোগ লাভ করেছে। তাদের প্রতি লোকের হিংসা হওয়ার কথাও স্বাভাবিক। মক্কা-মদীনা দেখার অধীর আগ্রহ ও তীব্র কামনা থাকার কথাও স্বাভাবিক।

কিন্তু সে আগ্রহ যদি বাস্তব না হয়, সে কামনা যদি অপূরণ থেকেই যায়, তাহলে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ মদীনার বর্কত লাভে ধন্য না হলে, মদীনা-ওয়ালার সুন্নাহকে ভালোবেসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করা অতি সহজ। অতএব প্রিয়তমের দর্শনের বর্কতলাভে সফল না হলে তাঁর আনুগত্যের বর্কতলাভে সফল হন। চির সাফল্য আপনার জন্যই।

তাঁর দর্শন

তিনি আল্লাহর খালীল। তাঁকে যিনি দর্শন করবেন তাঁর মর্যাদা বিশাল। তাঁকে যিনি দর্শন করবেন, তিনি হবেন সাহাবী। শরীয়তের পরিভাষায় 'সাহাবী' বলা হয়, প্রত্যেক সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে, যিনি ঈমানের অবস্থায় নবী ﷺ-এ সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

তিনিও সৌভাগ্যবান, যিনি ঈমানের অবস্থায় এমন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, যিনি নবী ﷺ-কে দর্শন করেছেন এবং ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। এমন ব্যক্তিতে তাবেঈ বলা হয়।

যিনি তাবেঈকে দর্শন করেছেন, তিনি তাবে-তাবেঈন। তিনিও বড় সৌভাগ্যবান। যেহেতু তিনি এমন ব্যক্তিকে দর্শন করেছেন, যাঁর ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দর্শন করেছেন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(طُوبَى لِمَنْ رآنِي وَآمَنَ بِي، وَطُوبَى لِمَنْ رَأى مَنْ رآنِي، وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رآني وَآمَنَ بِي، طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآب).

অর্থাৎ, কল্যাণ তার জন্য, যে আমাকে দর্শন করেছে ও আমার প্রতি ঈমান এনেছে।

কল্যাণ তার জন্য, যে সেই ব্যক্তিকে দর্শন করেছে, যে আমাকে দর্শন করেছে। আর তার জন্যও যে সেই ব্যক্তিকে দর্শন করেছে, যে ব্যক্তি এমন লোককে দর্শন করেছে, যে আমাকে দর্শন করেছে ও আমার প্রতি ঈমান এনেছে। তাদের জন্য কল্যাণ ও শুভ পরিণাম। *(ত্বাবারানী, হাকেম, সঃ জামে' ৩৯২৬নং)*

শুধু তাই নয়; বরং এমন লোকের জন্যও বহুগুণ কল্যাণ রয়েছে, যে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। আর তাঁর প্রতি ঈমানের দাবী হল তাঁকে ভালোবাসা। আর ভালোবাসার দাবী ও বাসনা হল প্রীতিভাজনকে এক নজর চেয়ে দেখা। প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন,

(طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُوبَى ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي).

অর্থাৎ, কল্যাণ তার জন্য, যে আমাকে দর্শন করেছে ও আমার প্রতি ঈমান এনেছে। আর কল্যাণ অতঃপর কল্যাণ অতঃপর কল্যাণ তার জন্য, যে আমার প্রতি ঈমান এনেছে অথচ আমাকে দেখেনি। *(আহমাদ ১১৬৯১, সঃ জামে' ৩৯২৩নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(طُوبَى لِمَنْ رآنِي وآمَنَ بِي مَرَّةً وَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي سَبْعَ مَرَّاتٍ).

অর্থাৎ, একবার কল্যাণ তার জন্য, যে আমাকে দর্শন করেছে ও আমার প্রতি ঈমান এনেছে। আর সাতবার কল্যাণ তার জন্য, যে আমাকে দর্শন করেনি অথচ আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে। *(আহমাদ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১২৪১নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ لاَنْ يَرَانِي ثُمَّ لاَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ).

"যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, সেই সত্তার কসম! অবশ্যই তোমাদের মাঝে এমন দিন আসবে, সেদিন আমার দর্শন অতঃপর আমার দর্শন (মু'মিনের নিকট) তার পরিবার ও সম্পদ সকল অপেক্ষা বেশি প্রিয় হবে।" *(আহমাদ, মুসলিম ৬২৭৮নং)*

« مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِى لِى حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِى يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِى بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ ».

"আমাকে প্রচন্ড ভালোবাসে এমন উম্মতীর মধ্যে সেই লোক হবে, যারা আমার গত হওয়ার পর আসবে। তাদের প্রত্যেকে এই আশা পোষণ করবে যে, যদি সে তার পরিবার ও সম্পদের বিনিময়ে আমাকে দর্শন করত।" *(আহমাদ ৯৩৮৮, মুসলিম ৭৩২৩নং)*

একদা তিনি বললেন, "আমার কামনা, যদি আমি আমার ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করতাম।" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই?' তিনি বললেন,

(أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَلَكِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي).

"তোমরা আমার সাহাবা। কিন্তু আমার ভাই হল তারা, যারা আমার প্রতি ঈমান এনেছে অথচ আমাকে দর্শন করেনি।" *(আহমাদ ১২৬০১, সিঃ সহীহাহ ২৮৮৮নং)*

হাবীব বিন সিবা' ؓ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দুপুরের খাবার খেলাম। আমাদের সাথে ছিলেন আবূ উবাইদাহ বিন জার্রাহ ؓ। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ কি কেউ আছে? আমরা আপনার কাছে মুসলিম হয়েছি ও আপনার

সাথে থেকে জিহাদ করেছি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(نَعَمْ ، قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ ، يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي).

"হ্যাঁ, এমন সম্প্রদায়, যারা তোমাদের পরে আসবে, যারা আমার প্রতি ঈমান আনবে অথচ আমাকে দর্শন করেনি।" *(আহমাদ ১৭০১৮, সিঃ সহীহাহ ৩৩১০নং)*

একদা ফজরের নামায পড়ে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে লোক সকল! ঈমানের ব্যাপারে আজব সৃষ্টি কারা? (জানো কি?)"

তাঁরা বললেন, 'ফিরিশ্‌তামন্ডলী।'

তিনি বললেন, "তাঁদের কী হয়েছে যে, তাঁরা ঈমান আনবেন না? তাঁরা তো তাঁদের প্রতিপালকের নিকটে রয়েছেন।"

তাঁরা বললেন, 'তাহলে নবীগণ হে আল্লাহর রসূল!'

তিনি বললেন, "তাঁদের কী হয়েছে যে, তাঁরা ঈমান আনবেন না? তাঁদের উপরে তো আকাশ থেকে অহী অবতীর্ণ হয়।"

তাঁরা বললেন, 'তাহলে আমরা হে আল্লাহর রসূল!'

তিনি বললেন,

(وَمَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَأَنْتُمْ تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ؟ وَلَكِنَّ أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِيمَانًا قَوْمٌ يَجِيئُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ ، فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِنَ الْوَحْيِ ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَتَّبِعُونَهُ ، فَهُمْ أَعْجَبُ الْخَلْقِ إِيمَانًا).

"তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনবে না? অথচ তোমরা যা দেখছ তা দেখছ। বরং ঈমানের ব্যাপারে আজব সৃষ্টি হল সেই সম্প্রদায়, যারা তোমাদের পরে আগমন করবে। অতঃপর তারা অহীর কিতাব পেয়ে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ও তার অনুসরণ করবে। তারাই হল ঈমানের ব্যাপারে আজব সৃষ্টি।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১২৫৬০, সিঃ সহীহাহ ৩২১৫নং)*

আল্লাহু আকবার! প্রিয় নবী ﷺ-কে দেখার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা মু'মিনকে এমন উচ্চ মর্যাদা দান করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٣) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (٤) سورة الجمعة

অর্থাৎ, তাদের অন্যান্যদের জন্যও (রসূল প্রেরিত হয়েছে), যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল। *(জুমুআহ ঃ ৩-৪)*

এ অনুগ্রহ তাদের জন্য, যারা কিয়ামত পর্যন্ত রসূল ﷺ-এর উপর ঈমান আনয়ন করবে। কেউ কেউ বলেন, আরব ও অনারবদের সেই সমস্ত মুসলমান, যারা সাহাবাদের যামানার পর কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে। এতে পারস্য, রোম, বর্বর, সুডান, তুর্কিস্তান, মোগল, কুর্দিস্তান এবং চিন ও ভারত ইত্যাদি দেশের বরং সারা বিশ্বের সমস্ত বাসিন্দারা অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী সকল মুসলিমদের জন্য রয়েছে মহান আল্লাহর সেই অনুগ্রহ।

নবী-ভক্ত উম্মতী, যে মহানবী ﷺ-কে যথার্থ ভালোবাসে এবং তাঁর দর্শন কামনা মনে-প্রাণে পোষণ করে, সে তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পারে। তিনি নিজে তাকে দেখা দেবেন, তা নয়। বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে স্বপ্ন দেখানো হবে। ফিরিশ্‌তা তাঁর আকৃতি ধারণ করে

তার মানসপটে দর্শন দান করবেন। কারণ শয়তান তাঁর আকৃতি বা বেশ ধারণ করতে পারে না। তিনি বলেছেন,

(وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).

"যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে, সে সত্যই আমাকে দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলে, সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" *(বুখারী ১১০নং)*

"সব চেয়ে বড় মিথ্যা ও গড়া কথার অন্যতম এই যে, মানুষ স্বপ্নে যা দেখে না, তা দেখেছে বলে দাবী করা (বা প্রচার করা)।" *(সহীহুল জামে' ২২০৭)*

তবে দর্শককে দেখতে হবে তাঁর ঠিক সেই হুলিয়াতে, যে হুলিয়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অন্য হুলিয়াতে দেখলে এবং তা নবী ﷺ-এর ধারণা করলে স্বপ্ন সত্য নয়।

বরং কেবল ধারণাবশে কাউকে নবী ﷺ বলে দাবী করলে এবং লোকের কাছে প্রশংসার লোভে প্রচার করলে নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেওয়া হবে। আর তা হবে সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে তাঁকে তাঁর আসল আকৃতিতে দর্শন করবে, তার দর্শন সত্য। নিশ্চয় সে সৌভাগ্যবান। তবে সে তাতে সাহাবীর মর্যাদা পাবে না।

অন্য এক হাদীসে আছে,

(مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ وَلاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي).

"যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দর্শন করল, সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করবে। কেননা, শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।" *(বুখারী ৬৯৯৩নং)*

এই হাদীসের ভিত্তিতে অনেক সূফীপন্থীর ধারণা, তাঁকে স্বপ্নে দেখা গেলে পরবর্তীতে জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে দেখা যাবে। কিন্তু সে ধারণা সঠিক নয়। যেহেতু সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে,

« مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِى فِى الْيَقَظَةِ أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِى فِى الْيَقَظَةِ لاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِى ».

"যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দর্শন করল, সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করবে অথবা সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করল। কেননা, শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না।" *(মুসলিম ৬০৫৭নং)*

অর্থাৎ, তাঁকে স্বপ্নে দেখা জাগ্রতাবস্থায় দেখার মতোই বাস্তব দেখা।

তবুও সহীহ বুখারীর সন্দেহহীন বর্ণনার অনেকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ-

"সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দর্শন করবে"---এ কথা তাঁর জীবদ্দশায় সেই লোকেদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু তখনো তাঁকে দর্শন করেনি। তাঁকে অহীর মাধ্যমে খবর করা হয়েছিল যে, আল্লাহ যাকে স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর নবী ﷺ-কে প্রদর্শন করেন, সে অচিরেই হিজরত করে সরাসরি তাঁর দর্শন লাভ করবে। এ ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য অগ্রিম সুসংবাদ।

অথবা তার সেই স্বপ্নের বাস্তবতা ও সত্যতা জাগ্রতাবস্থায় দেখতে পাবে।

অথবা পরকালে তাঁকে দেখতে পাবে। যেহেতু পরকালে এমনও লোক থাকবে, যারা তাঁর

দর্শন পাবে না।

অথবা পরকালে তাঁর নৈকট্য ও শাফাআত লাভে ধন্য হওয়ার সাথে বিশেষভাবে বাস্তব দর্শন লাভ করবে।

অনেক সূফীর দাবী এই যে, মহানবী ﷺ-কে জাগ্রতাবস্থায় দেখা যায়। তিনি ইন্তিকাল করেননি, পর্দা নিয়েছেন। বিলায়াতের বিশেষ শক্তি দ্বারা তারা সচক্ষে তাঁকে দর্শন করে থাকে!

এমন দাবী মিথ্যা। তার কারণ, আমভাবে এ দুনিয়া ত্যাগ করে পরলোকগত মানুষদের জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (١٠٠) سورة المؤمنون

"তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (মু'মিনূন ঃ ১০০)

{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ} (١٥٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে 'মৃত' বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। (বাক্বারাহ ঃ ১৫৪)

আর খাসভাবে তাঁর জীবিত থেকে 'হাযির-নাযির' হয়ে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো বা আওলিয়াদেরকে দর্শন দানের কোন দলীল নেই। বিনা দলীলে কেবল দাবী দ্বারাই কোন কিছু প্রমাণ বা দখল করা যায় না।

জাগ্রতাবস্থায় তাঁকে দেখা সম্ভব হলে কিয়ামত পর্যন্ত সাহাবার সিলসিলা জারী থাকবে। আর এ বিশ্বাস কোন মুসলিম রাখতে পারে না। পরন্তু এ কথাও প্রমাণিত নয় যে, কোন সাহাবী অথবা আহলে বায়তের কেউ ইন্তিকালের পর নবী ﷺ-কে জাগ্রতাবস্থায় সরাসরি দর্শন করেছেন। তাঁদের অনেকে তাঁকে স্বপ্নে দর্শন করেছেন, কিন্তু তারপর জাগ্রতাবস্থায় তাঁকে দর্শন করেননি। *(দ্রঃ ফাতহুল বারী ১২/৩৮৫)*

সুতরাং যে বলে, 'আমি (জাগ্রতাবস্থায়) নবী আকরাম ﷺ-কে দেখলাম----আমি নবী করীম ﷺ-এর সাথে কথা বললাম---' ইত্যাদি, সে মিথ্যুক।

অনুরূপ যারা শরীয়তের হালাল-হারামের ব্যাপারে কোন এমন কথা দাবী করে, যা শরীয়ত-বিরোধী অথবা শরীয়ত-বহির্ভূত, তাদের স্বপ্নও সত্য নয়। এমন দাবীদার মিথ্যুক, যে দাবী করে মহানবী ﷺ স্বপ্নে তাকে অমুক নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁর জীবদ্দশাতেই দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। *(মায়িদাহ ঃ ৩)*

তাঁর নিজ প্রতিপালককে দর্শন

মহান আল্লাহকে পরকালে দেখা যাবে। জান্নাতীরা তাঁর চেহারা দর্শন করতে পারবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ ক'রে যাবে, তখন মহান বর্কতময় আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি

দিই?' তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবিষ্ট করনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি?' অতঃপর আল্লাহ (হঠাৎ গর্বের) পর্দা সরিয়ে দেবেন (এবং তারা তাঁর চেহারা দর্শন লাভ করবে)। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। *(মুসলিম ৪৬৭নং)*

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শোন! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাবে, যেমন স্পষ্ট ঐ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভিড়ের সম্মুখীন হবে না।" *(বুখারী ৫৫৪, মুসলিম ১৪৬৬নং)*

পার্থিব জগতে তাঁর দর্শন লাভ সম্ভব নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "মরণের পূর্বে কখনই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে না।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ২৪৫৯নং)*

মূসা ﵇ তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সফল হননি। মহান আল্লাহ সে কথা বলেছেন,

{وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} (١٤٣) سورة الأعراف

অর্থাৎ, মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখবে।' সুতরাং যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, তখন বলল, 'মহিমময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।' *(আ'রাফ ঃ ১৪৩)*

তবে সর্বশেষ নবী ﷺ স্বপ্নে মহান আল্লাহকে দর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন,

(رَأَيْتُ رَبِّيْ فِيْ أَحْسَنِ صُوْرَةٍ).

অর্থাৎ, আমি আমার প্রতিপালককে সবচেয়ে সুন্দর আকৃতিতে দর্শন করেছি। *(আহমাদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৫৯নং)*

কিন্তু তিনি কি জাগ্রতাবস্থায় চাক্ষুষ-দর্শন লাভ করেছেন, তিনি কি মি'রাজের রাত্রে তাঁকে দেখেছেন? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

অনেকে বলেন, 'তিনি হৃদয় দিয়ে আল্লাহকে দর্শন করেছেন।'

অন্য অনেকে বলেন, 'তিনি সচক্ষে আল্লাহকে দর্শন করেছেন।'

তাঁদের একটি দাবী, 'ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) বর্ণনা করেছেন ঃ ---(আরবী ইবারত) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, আমরা বনু হাশিমের বংশধর। আমরা (সকলেই) বলছি যে, মুহাম্মদ ﷺ মি'রাজের রাত্রে তাঁর মস্তকস্থিত চক্ষু দ্বারা তাঁর

প্রতিপালকের দীদার লাভ করেছিলেন, তা স্বপ্নেও ছিল না এবং দিলেও ছিল না। এ হাদীস বর্ণনা করেন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর মুসনাদে। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ ইবনে আব্বাস (রা) যা বলেছেন, আমিও তাই বলি। তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন নিজ চক্ষুতে; তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন নিজ চক্ষুতে; তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন নিজ চক্ষুতে। (নুযহাতুল মাজালিস)'

উৎসুক পাঠক নিশ্চয় জানতে চাইবেন, এই শ্রেণীর কথা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ)এর মুসনাদে আছে কি না? না, নেই। ঝুটা হাওয়ালা।

আর নুযহাতুল মাজালিস কিতাব (২/৩৭৪)এ আছে নিম্নরূপ ঃ-

قال القرطبي في سورة الأنعام اجتمع ابن عباس وأبي بن كعب فقال ابن عباس أما نحن بنو هاشم فنقول أن محمدا رأى ربه مرتين، ثم قال أتعجبون أن الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد (صلى الله عليه وسلم)؟ فكبر أبي بن كعب تكبيرة حتى جاوبته الجبال.

وقال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أنا أقول بما قاله ابن عباس رآه بعينه رآه بعينه حتى انقطع نفس الإمام أحمد.

"কুরতুবী সূরা আনআমে (তফসীর ৭/৫৬, ১৭/৯২এ) বলেছেন, একদা ইবনে আব্বাস ও উবাই বিন কা'ব একত্রিত হলে ইবনে আব্বাস বললেন, 'আমরা বানূ হাশেম, আমরা বলি মুহাম্মাদ তাঁর প্রতিপালককে ২ বার দর্শন করেছেন।' অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমরা কি অবাক হও যে, খালীলত্ব ইব্রাহীমের, (সরাসরি) কথোপকথন মূসার এবং দর্শন মুহাম্মাদ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য?' এ কথা শুনে উবাই বিন কা'ব এমন তকবীর দিলেন যে, (আরাফাতের) পাহাড়ে তা প্রতিধ্বনিত হল।

আর ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হাম্বল বলেছেন, 'ইবনে আব্বাস যা বলেছেন, আমিও তাই বলি। তিনি তাঁকে স্বচক্ষে দর্শন করেছেন। তিনি তাঁকে স্বচক্ষে দর্শন করেছেন।' এ কথা বলতে বলতে ইমাম আহমাদের শ্বাস ফুরিয়ে গেল।"

এই শেষের বাক্যটি পৃথকভাবে নুযহাতুল মাজালিসে আছে, যেমন আছে তাফসীর হাক্কী (১৪/৩০৭)তে। অথচ তালে গোল লাগিয়ে বলা হয়েছে, 'এ হাদীস বর্ণনা করেন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর মুসনাদে। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ ইবনে আব্বাস (রা) যা বলেছেন, আমিও তাই বলি। তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন নিজ চক্ষুতে; তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন নিজ চক্ষুতে; তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন নিজ চক্ষুতে।'

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র) এ হাদীস বর্ণনা করেননি। ওটা ভুল হাওয়ালা। যেমন 'ইবনে আব্বাস (রা) যা বলেছেন, আমিও তাই বলি।'---এ কথাও তাঁর মুসনাদে নেই। তাঁর উক্তি বলে প্রমাণিতও নয়।

পক্ষান্তরে মুসনাদে আহমাদে আছে, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(رَأَيْتُ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى).

অর্থাৎ, আমি আমার রব্ব তাবারাকা অতাআলাকে দেখেছি। *(আহমাদ ২৫৮১, ২৬৩৪নং)*

কিন্তু মারফূ-সূত্রে এ হাদীস সহীহ নয়। মাওকূফ-সূত্রে সহীহ। যেমন মুস্তাদরাক-এ-

হাকেমের হাওয়ালায় 'আমি আমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান ও সর্ব গরীয়ান আল্লাহকে চর্ম চক্ষুতে দর্শন করেছি' বলে কোন হাদীস নেই। এ হাওয়ালাও ভুল।

পরন্তু মুসনাদেই আছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} قَالَ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَلْبِهِ مَرَّتَيْنِ.

অর্থাৎ, 'যা সে দেখেছে, তার হৃদয় তা অস্বীকার করেনি।' *(নাজ্‌ম ঃ ১১)* মহান আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার ---এই বাণীর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'মুহাম্মাদ তাঁর রব্ব আয্‌যা অজাল্লকে নিজ অন্তর দ্বারা দুইবার দর্শন করেছেন। *(আহমাদ ১৯৫৬, মুসলিম ৪৫৫, তিরমিযী ৩২৮ নং)*

আবূ উমার বলেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, 'তিনি তাঁকে হৃদয় দ্বারা দর্শন করেছেন।' আর দুনিয়াতে তাঁকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করার কথা বলতে সাহস করেননি। *(তফসীর কুরতুবী ৭/৫৬)*

সুতরাং খোদ ইবনে আব্বাস ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মতামতেই দ্বৈধতা রয়েছে। পক্ষান্তরে মা আয়েশার মত হল, মহানবী ﷺ মহান আল্লাহকে মি'রাজের রাত্রে দর্শন করেননি।

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটের মানুষ মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'যে ব্যক্তি তিনটের মধ্যে একটি কথা বলে, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে ঃ-

(১) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ তাঁর প্রতিপালক (আল্লাহ)কে দেখেছেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। যেহেতু আল্লাহ বলেন,

{لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (١٠٣) سورة الأنعام

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্বে আছে এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী; সম্যক পরিজ্ঞাত।" *(আনআম ঃ ১০৩)*

{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} (٥١) سورة الشورى

"কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা কোন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে; আর তখন আল্লাহ যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে অহী (প্রত্যাদেশ) করেন; নিঃসন্দেহে তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।" *(শূরা ঃ ৫১)*

বর্ণনাকারী মাসরূক বলেন, আমি হেলান দিয়ে বসে ছিলাম। এ কথা শুনে সোজা হয়ে বসে বললাম, 'হে উম্মুল মু'মিনীন! একটু থামুন, আমার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবেন না। আল্লাহ তাআলা কি বলেননি যে,

{وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} (١٣) سورة النجم

"নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।" *(নাজ্‌ম ঃ ১৩)* "অবশ্যই সে তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দর্শন করেছে।" *(তাকভীর ঃ ২৩)*

মা আয়েশা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন,

« إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِى خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ».

"তিনি হলেন জিব্রীল। তাঁকে ঐ দুইবার ছাড়া অন্য বারে তাঁর সৃষ্টিগত আসল রূপে দর্শন করিনি। যখন তিনি আসমানে অবতরণরত ছিলেন, তাঁর বিরাট সৃষ্টি-আকৃতি আকাশ-পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে ঘিরে রেখেছিল!"

(২) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর অবতীর্ণ কিছু অহী গোপন করেছেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আল্লাহ বলেন, "হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর, (যদি তা না কর, তাহলে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না।)" *(সূরা মাইদাহ ৬৭ আয়াত)*

(৩) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ ভবিষ্যতের খবর জানেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আল্লাহ বলেন, "বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" *(নাম্‌ল ঃ ৬৫) (মুসলিম ৪৫৭নং, তিরমিযী প্রমুখ)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)এর হাদীসকে সমর্থন করে আবূ যার্র ﷺ-এর হাদীস। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি আপনার রব্বকে দেখেছেন?' উত্তরে তিনি বললেন,

« نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ ». أو « رَأَيْتُ نُورًا ».

"নূর, কীভাবে তাঁকে দেখব?" অথবা "আমি নূর দেখেছি।" *(আহমাদ ২১৩১৩, মুসলিম ৪৬১নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ).

অর্থাৎ, তাঁর পর্দা (অন্তরাল) হল নূর (জ্যোতি)। যে পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর আনন-দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টিকুলকে দগ্ধীভূত ক'রে ফেলবে। *(মুসলিম ৪৬৩নং)*

পক্ষান্তরে তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রতিপালকে দেখেছেন।' এ কথা শুনে ইকরামা (অবাক হয়ে) বলেন, '(এটা কীভাবে সম্ভব?) আল্লাহ কি বলেননি যে,

{لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ} (١٠٣) سورة الأنعام

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, কিন্তু দৃষ্টিসমূহ তাঁর আয়ত্বে আছে।" *(আনআম ঃ ১০৩)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, 'তোমার বিনাশ হোক! এটা তো তখন, যখন তিনি নিজের সেই নূরে আবির্ভূত হবেন, যা তাঁর সত্তার নূর। তাঁকে দুইবার দর্শন দেওয়া হয়েছে।' *(তিরমিযী ৩২৭৯নং)*

কিন্তু এ বর্ণনা সহীহ নয়, বরং যয়ীফ। *(যিলালুল জান্নাহ ৪৩৭নং)*

স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ইবনে আব্বাসের প্রমাণ হাদীস-ভিত্তিক নয়, বরং আয়েশার প্রমাণই হাদীস-ভিত্তিক। আয়েশা দলীল পেশ করে খন্ডন করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শুনেছেনও। যেমন শুনেছেন আবু যার্র ﷺ। কাজেই আয়েশার মতই অধিকতর প্রবল।

খোলাসা এই যে, সহীহ সনদে রাসূল ﷺ কর্তৃক এ কথা বর্ণিত হয়নি যে, তিনি নিজ চর্ম-চক্ষু দ্বারা জাগ্রতাবস্থায় মহান আল্লাহকে দেখেছেন। বরং এর বিপরীত কথাই সহীহ সূত্রে

বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সঠিক বিশ্বাস হল, তিনি স্বপ্ন ও নিজ অন্তর দ্বারা তাঁর দর্শনলাভে ধন্য হয়েছেন। আর সেটাও কম কিছু নয়।

তাঁর শাফাআত বা সুপারিশ

কিয়ামতের দিন, সে ভীষণ ভয়ানক দিন! সেদিন বিচারের দিন।

{يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} (١٩) سورة الإنفطار

"সেদিন কেউই কারোর জন্য কিছু করবার সামর্থ্য রাখবে না; আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে (একমাত্র) আল্লাহর।" *(ইনফিত্বার ঃ ১৯)*

এই জন্য মহান প্রতিপালক মু'মিনগণকে সতর্ক করে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٢٥٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দান করেছি, তা থেকে তোমরা দান কর, সেই (শেষ বিচারের) দিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না। আর অবিশ্বাসীরাই সীমালংঘনকারী। *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৪)*

তিনি তাঁর নবী ﷺ-কে আদেশ করে বলেছেন,

{قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (٤٤) سورة الزمر

অর্থাৎ, বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।' *(যুমার ঃ ৪৪)*

{وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}

অর্থাৎ, তুমি তাদেরকে এ (কুরআন) দ্বারা সতর্ক কর, যারা ভয় করে যে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরকে এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না; হয়তো তারা সাবধান হবে। *(আনআম ঃ ৫১)*

dj§Â snƒ Hqfbj dlhn djqfmk sjfseGv dhyfvj zfïfr kfzftf yfƒst, k]fv zbcmdkÛÁsm jfsvf ncifdvw ytsh. dj§Â sj jvsh, jfv ubA ncifdvw jvfv zbcmdk rsh kfv yfvde ÎfkhA wkG vsqsY }-

১। সুপারিশকারীর সুপারিশ করার ক্ষমতা ঃ

অতএব যার ক্ষমতা নেই, যে নিজেরই কৃতকর্ম নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ও চিন্তিত, তার কী হবে---তাই নিয়ে যে ব্যস্ত, সে কোনদিন সুপারিশ করতে পারবে না। তঅতএব বাতিল মা'বুদের বিশ্বাসীরা, যারা আল্লাহ ব্যতীত কোন মাটি-পাথরের কাছে সুপারিশের আশা রাখে, তাদের ধারণা ও আশা ভ্রান্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (٨٦)

অর্থাৎ, আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের অধিকার তাদের নেই। তবে যারা সত্য উপলব্ধি ক'রে ওর (সত্যের) সাক্ষ্য দেয়, তাদের কথা স্বতন্ত্র। *(যুখরুফ ঃ ৮৬)*

{لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} (٨٧) سورة مريم

অর্থাৎ, যে পরম দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ছাড়া অন্য কারো সুপারিশ করবার ক্ষমতা থাকবে না। *(মারয়্যামঃ ৮৭)*

২। যার জন্য সুপারিশ করা হবে, সে যেন তাওহীদবাদী মুসলিম হয়ঃ

অর্থাৎ কোন মুশরিক বা কাফেরের জন্য কোন সুপারিশ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} (٤٨) سورة المدثر

অর্থাৎ, ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না। *(মুদ্দাস্‌সিরঃ ৪৮)*

{فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨) وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ (٩٩) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠) وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} (١٠٢) الشعراء

অর্থাৎ, অতঃপর ওদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। ওরা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, 'আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম। আমাদেরকে দুষ্কৃতকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিল। পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই! হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত, তাহলে আমরা বিশ্বাসী হয়ে যেতাম!' *(শুআ'রাঃ ৯৪-১০২)*

{وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ}

অর্থাৎ, ওদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন দুঃখে-কষ্টে ওদের হৃদয় কণ্ঠাগত হবে। সীমালংঘনকারীদের জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য করা হবে। *(মু'মিনঃ ১৮)*

একদা মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার শাফাআত-লাভের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে?' উত্তরে তিনি বললেন,

((أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ)).

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত-লাভের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই হবে, যে নিজ অন্তর বা মন থেকে বিশুদ্ধভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে। *(বুখারী ৯৯নং)*

অর্থাৎ, যথার্থভাবে কালেমা পাঠ করেছে। তার সঠিক অর্থ জেনেছে। তার অর্থে পরিপূর্ণ একীন ও প্রত্যয় রেখেছে। বিশুদ্ধচিত্তে (ইখলাসের সাথে) তা পাঠ করেছে। তার অর্থ-বিশ্বাসে সত্যনিষ্ঠা ও অকপটতা বজায় রেখেছে। তার নির্দেশের প্রতি প্রেম ও ভক্তি রেখেছে। তার নির্দেশ, দাবী ও অধিকারের অনুবর্তী হয়েছে। প্রত্যাখ্যানহীনভাবে সাদরে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ, সে শির্কমুক্ত হয়ে তাওহীদবাদী মুসলিম থেকে যথাসাধ্য আমল করেছে।

৩। যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টিঃ

অতএব তিনি যার জন্য সুপারিশ গ্রহণ করতে রাজি ও সম্মত হবেন তার জন্য হবে। তিনি বলেছেন,

{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ}

অর্থাৎ, তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে কেবল তাদের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। *(আম্বিয়া ঃ ২৮)*

{وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى}

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলীতে কত ফিরিশ্তা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। *(নাজ্ম ঃ ২৬)*

৪। সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহর অনুমতি ঃ

তিনি যাকে অনুমতি দেবেন, কেবল সেই ব্যক্তিই সুপারিশ করতে পারবে। তিনি বলেন,

{مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৫)*

{وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} (٢٣) سورة سبأ

অর্থাৎ, যাকে অনুমতি দেওয়া হবে, সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। *(সাবা' ঃ ২৩)*

{يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا} (١٠٩) سورة طه

অর্থাৎ, পরম দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন, সে ব্যতীত কারো সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না। *(ত্বা-হা ঃ ১০৯)*

{إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ} (٣) يونس

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা ক'রে থাকেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশকারী কেউ নেই। ঐ (স্রষ্টা ও পরিচালক) আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? *(ইউনুস ঃ ৩)*

আমাদের মহানবী ﷺ মহান প্রতিপালকের খালীল এবং উম্মতের প্রতি দয়ালু নবী। তিনি নিশ্চয় তাঁর দরবারে সুপারিশ করার যোগ্যতা রাখেন। তিনি বলেছেন, তাঁকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন,

« لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ دَعَا بِهَا فِى أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ وَإِنِّى أُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

"প্রত্যেক নবীর (কবুলকৃত) দুআ ছিল, তিনি উম্মতের মাঝে সে দুআ করেছেন এবং তাঁর জন্য তা কবুল করা হয়েছে। আর আমি ইন শাআল্লাহ আমার দুআকে কিয়ামতে আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য বিলম্বিত করব।" *(বুখারী ৬৩০৫, মুসলিম ৫১৪নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِىٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّى اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِى شَفَاعَةً لأُمَّتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِىَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ».

"প্রত্যেক নবীর জন্য কবুলযোগ্য দুআ রয়েছে। প্রত্যেক নবী তাঁর দুআকে ত্বরান্বিত করেছেন। আর আমি আমার দুআকে কিয়ামতে আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য গোপন রেখেছি। ইন শাআল্লাহ তা প্রাপ্ত হবে আমার উম্মতের প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।" *(মুসলিম ৫১২নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

কিন্তু সেই সাথে ৪নং শর্তটিও পূরণ হতে হবে। মহান আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তিনি নিজের ইচ্ছায় কারো জন্য কোনও সুপারিশ করতে পারবেন না। মহান আল্লাহ তাঁকে বলেছেন,

{قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَدًا} (٢١) سورة الجن

অর্থাৎ, বল, 'আমি তোমাদের অপকার অথবা উপকার কিছুরই মালিক নই।' *(জ্বিন ঃ ২১)*

তাই তো মহানবী ﷺ তাঁর আত্মীয় ও বংশের লোককে সম্বোধন করে বলে গেছেন, "হে কুরাইশদল! তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নাও, আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কোন উপকার করতে পারব না। হে বানী আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন কাজে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সাফিয়্যাহ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে কোন উপকারে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের বেটী ফাতেমা! আমার কাছে যে ধন-সম্পদ চাইবে চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" *(বুখারী ২৭৫৩, মুসলিম ৫২৫নং)*

লালনকারী চাচা আবূ তালেবের মৃত্যুর সময় আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "চাচা! আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই) বলুন, আমি কিয়ামতে তা দলীলস্বরূপ আল্লাহর সামনে পেশ করে তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করার সুপারিশ করব।" কিন্তু পার্শ্বেই আব্দুল্লাহ বিন আবি উমাইয়া ও আবূ জাহল বসেছিল, তারা তাঁকে স্ব-ধর্ম ত্যাগ করতে বাধা দিলে আবূ তালেব কালেমা পড়তে অস্বীকার করলেন। মহানবী ﷺ বললেন,

(أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ).

"আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না আমাকে আপনার ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে, ততক্ষণ আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট 'ইস্তিগফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকব।"

কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর এল,

{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (١١٣) سورة التوبة

"নবী এবং মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও বা তারা আত্মীয়-স্বজন হয়; যখন এ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওরা দোযখবাসী।" *(তাওবাহ ঃ ১১৩)*

আবূ তালেবের ব্যাপারে আরো অবতীর্ণ হল,

{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (٥٦)

"(হে নবী!) তুমি যাকে প্রিয় মনে কর, তাকে হেদায়াত করতে (সৎপথে আনতে) পার

না।[১] বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনতে পারেন। আর তিনিই ভাল জানেন কারা সৎপথের অনুসারী।” *(ক্বাস্বাস ঃ ৫৬, বুখারী ১৩৬০, মুসলিম ১৪১নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ একবার মায়ের কবর যিয়ারতে গেলেন। সঙ্গে কিছু সাহাবাও ছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি কেঁদে উঠলেন। সাহাবাগণ কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,

« اسْتَأْذَنْتُ رَبِّى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّى فَلَمْ يَأْذَنْ لِى وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِى ».

“আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আমার আম্মার জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। আমি তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।” *(মুসলিম ২৩০৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ এর মনে প্রশ্ন জাগল যে, ইব্রাহীম عليه السلام তো তাঁর পিতার জন্য (মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও) ইস্তিগফার করেছিলেন। আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর এল,

{وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ } (١١٤) سورة التوبة

“ইব্রাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং তা (ইস্তিগফার) তাকে দেওয়া আল্লাহর একটি প্রতিশ্রুতির জন্য সম্ভব হয়েছিল। অতঃপর যখন এ তার নিকট সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন ইব্রাহীম তার সম্পর্কে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল কোমল হৃদয় ও সহনশীল।” *(তাওবাহ ঃ ১১৪, তফসীর ইবনে কাষীর ২/৩৯৩)*

zfhC ùvfƒvf رضي الله عنه hstb, ˆjlf zfïfrv vnCt ﷺ zfmfslv mfsU l×fqmfb rsq obDmskv mfst dJqfbskv jKf …sïJ jvstb ˆhQ dhNqdev iadk HDNB Èv¢k¶ zfsvfi jvstb. idvswsN dkdb htstb, ªzfdm skfmfslv msLA jf…sj spb djqfmskv dlb dy]dr]-vhdhdwó …e OfsV jsv hrb jvf zh²¿fq …id²¿k bf ifƒ. pJb sn htsh, `sr zfïfrv vnCt! zfmfsj h]fyfb!' zfv zfdm hth, `zfdm skfmfv sjfb iajfv nfrfpA jvsk ifvh bf. zfdm skf (lcdbqfsk) skfmfv dbje ˆ (lcvh²¿fv jKf) si]ZsY dlsqdYtfm.'

zfdm skfmfslv msLA jf…sj spb djqfmskv dlb dy]dr]-vhdhdwó sOfVf OfsV jsv hrb jvf zh²¿fq …id²¿k bf ifƒ. pJb sn htsh `zfïfrv vnCt! zfmfsj h]fyfb!' kJb zfdm hth, `zfdm skfmfv sjfb iajfv …ijfv jvsk nmKG bƒ. zfdm skf (ixdKhDsk) skfmfv dbje (ˆ lcdlGsbv jKf) si]ZsY dlsqdYtfm.'

zfdm skfmfslv msLA jf…sj spb djqfmskv dlb sm]-sm] vhdhdwó Yfot OfsV hrb jvf zh²¿fq …id²¿k bf ifƒ. pJb sn htsh, `sr zfïfrv vnCt! zfmfsj h]fyfb.' zfv zfdm kJb hth, `zfdm skfmfv

---

(১) *কাউকে সৎপথে আনা কেবল আল্লাহর কাজ। আল্লাহর রসূল সৎপথ প্রদর্শন ক’রে থাকেন। (কুরআন ৪২/৫২)*

sjfb iajfv nrfqkf jvsk n[m bƒ. zfdm skf skfmfv dbje (ˆ jv¢B zh²¿fv jKf lcdbqfsk) si]ZsY dlsqdYtfm.'

zfdm skfmfslv msLA jf…sj spb djqfmskv dlb dy{jfv zfWqfu-dhdwó sjfb uDh OfsV hrb jvf zh²¿fq …id²¿k bf ifƒ. pJb sn htsh, `sr zfïfrv vnCt! zfmfsj h]fyfb!' zfv zfdm sn nmq hth, `zfdm skfmfv sjfb iajfv nfrfpA jvsk ifvh bf. zfdm skf (lcdbqfsk) skfmfv dbje (ˆ dblfv¢b zh²¿fv jKf) si]ZsY dlsqdYtfm.'

zfdm skfmfslv jf…sj spb djqfmskv dlb …V§À jfiV OfsV hrb jvf zh²¿fq …id²¿k bf ifƒ. pJb sn htsh, `sr zfïfrv vnCt! zfmfsj nfrfpA jv¢b!' zfv zfdm kJb hth, `zfdm skfmfv sjfb iajfv …ijfv jvsk ifvh bf. zfdm skf (lcdbqfsk) skfmfv dbje (ˆ lclGwfv jKf) si]ZsY dlsqdYtfm.'

zfdm skfmfslv msLA jf…sj spb djqfmskv dlb snfbf-y]fdl OfsV hrb jvf zh²¿fq …id²¿k bf ifƒ. pJb sn htsh, `sr zfïfrv vnCt! zfmfsj nfrfpA jv¢b!' zfv zfdm kJb hth, `zfdm skfmfv sjfb iajfv nfrfpA jvsk nmKG bƒ. zfdm skf (ixdKhDsk) skfmfsj (wvDqskv jKf) si]ZsY dlsqdYtfm.« *(hcJfvD 3073, mcndtm 1831bQ, rflDsnv wèfhtD ƒmfm mcndtsmv.)*

উপর্যুক্ত শর্তসাপেক্ষে মহানবী ﷺ কিয়ামতে সারা বিশ্বের মানুষের জন্য ও বিশেষ ক'রে উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন। আর তাঁর সুপারিশ অনিবার্য হবে বিশেষ কিছু মানুষের জন্য। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে,

« إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ».

"তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন (আযানের উত্তরে) মুআয্যিন যা কিছু বলবে, তোমরাও ঠিক তাই বলবে। তারপর আযান শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে তার প্রতি আল্লাহ দশটি রহমত নাযেল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'অসীলা' প্রার্থনা করবে। কারণ, 'অসীলা' হচ্ছে জান্নাতের এমন একটি স্থান, যা সমস্ত বান্দার মধ্যে কেবল আল্লাহর একটি বান্দা (তার উপযুক্ত) হবে। আর আশা করি, আমিই সেই বান্দা হব। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য (আমার) সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।" *(মুসলিম ৮৭৫নং)*

আযান শোনার পর তাঁর জন্য ‘অসীলা’ প্রার্থনা করার দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন মহানবী ﷺ। তিনি বলেছেন,

(مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

“যে ব্যক্তি আযান শুনে (আযানের শেষে) এই দুআ বলবে, অর্থাৎ, হে আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ ﷺ-কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।

সে ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।” *(বুখারী ৬১৪নং)*

তিনি সকল উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন কিয়ামতে; সর্বপ্রথম সুপারিশ ও সর্ববৃহৎ সুপারিশ।

আবূ হুরাইরা ؓ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক দাওয়াতে ছিলাম। তাঁকে সামনের পায়ের একটি রান তুলে দেওয়া হল। তিনি এই রান বড় পছন্দ করতেন। তা থেকে তিনি (দাঁতে কেটে) খেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, “কিয়ামতের দিন আমি হব সকল মানুষের নেতা। তোমরা কি জান, কী কারণে? কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সমগ্র মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে। (সে ময়দানটি এমন হবে যে,) সেখানে দর্শক তাদেরকে দেখতে পাবে এবং আহবানকারী (নিজ আহবান) তাদেরকে শুনাতে পারবে। সূর্য একেবারে কাছে এসে যাবে। মানুষ এতই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিপতিত হবে যে, ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। তারা বলবে, ‘দেখ, তোমাদের সবার কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তোমাদের কী বিপদ এসে পৌঁছেছে! এমন কোন ব্যক্তির খোঁজ কর, যিনি পরওয়ারদেগারের কাছে সুপারিশ করতে পারেন।’ লোকেরা বলবে, ‘চল আদমের কাছে যাই।’ সে মতে তারা আদমের কাছে এসে বলবে, ‘আপনি মানব জাতির পিতা, আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং ফুঁক দিয়ে তাঁর ‘রূহ’ আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর নির্দেশে ফিরিশ্তাগণ আপনাকে সিজদা করেছিলেন। আপনাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি?’ আদম ؑ বলবেন, ‘আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তার নির্দেশ অমান্য করেছিলাম। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও।’

সুতরাং তারা সকলে নূহ ؑ-এর কাছে এসে বলবে, ‘হে নূহ! আপনি পৃথিবীর প্রতি প্রথম প্রেরিত রসূল। আল্লাহ আপনাকে শোকর-গুজার বান্দা হিসাবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি?’ নূহ ؑ বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন

হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া আমার একটি দুআ ছিল, যার দ্বারা আমার জাতির উপর বদ্দুআ করেছি। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও।'

সুতরাং তারা সবাই ইব্রাহীম ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে ইব্রাহীম! আপনি আল্লাহর নবী ও পৃথিবীবাসীদের মধ্য থেকে আপনিই তাঁর খাস বন্ধু। আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী যন্ত্রণার মধ্যে আছি?' তিনি তাদেরকে বলবেন, 'আমার পালনকর্তা আজ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন রাগান্বিত তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া (দুনিয়াতে) আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছি। সুতরাং আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও।'

অতঃপর তারা মূসা ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে মূসা! আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে তাঁর রিসালত দিয়ে এবং আপনার সাথে (সরাসরি) কথা বলে সমগ্র মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী দুর্ভোগ পোহাচ্ছি?' তিনি বলবেন, 'আজ আমার প্রতিপালক এত ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর আগে কখনো হননি এবং আগামীতেও আর কোনদিন হবেন না। তাছাড়া আমি তো (পৃথিবীতে) একটি প্রাণ হত্যা করেছিলাম, যাকে হত্যা করার কোন নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও।'

অতঃপর তারা সবাই ঈসা ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনি আল্লাহর সেই কালেমা, যা তিনি মারয়্যামের প্রতি প্রক্ষেপ করেছিলেন। আপনি হচ্ছেন তাঁর রূহ, আপনি (জন্ম নেওয়ার পর) শিশুকালে দোলনায় শুয়েই মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী যন্ত্রণার মধ্যে আছি?' তিনি তাদেরকে বলবেন, 'আমার পালনকর্তা আজ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন রাগান্বিত তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। (এখানে তিনি তাঁর কোন অপরাধ উল্লেখ করেননি।) আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সুতরাং তারা সবাই আমার কাছে এসে বলবে, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি আখেরী নবী। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী (ভয়াবহ) দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করছি।' তখন আমি চলে যাব এবং আরশের নীচে আমার প্রতিপালকের জন্য সিজদাবনত হব। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের জন্য আমার হৃদয়কে এমন উন্মুক্ত ক'রে দেবেন, যেমন

ইতোপূর্বে আর কারো জন্য করেননি। অতঃপর তিনি বলবেন,

(يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ).

'হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' তখন আমি মাথা উঠিয়ে বলব, আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক!' এর প্রত্যুত্তরে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বলা হবে, 'হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে ডান দিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও। এই দরজা ছাড়া তারা অন্য সব দরজাতেও সকল মানুষের শরীক।'

অতঃপর তিনি বললেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, তাঁর কসম! জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা হচ্ছে মক্কা ও (বাহরাইনের) হাজারের মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা মক্কা ও (সিরিয়ার) বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।" *(বুখারী ৪৭১২, মুসলিম ৫০১নং)*

লক্ষণীয় যে, লোকেরা তাঁর কাছে সুপারিশের আবেদন জানালে তিনি সাথে সাথে সুপারিশ শুরু করবেন না। বরং অনুমতি প্রার্থনা স্বরূপ তিনি আরশের নীচে নিজ প্রতিপালকের জন্য সিজদাবনত হবেন। অতঃপর মহান আল্লাহ নিজ প্রশংসা ও গুণগানের জন্য তাঁর হৃদয়কে এমন উন্মুক্ত ক'রে দেবেন, যেমন ইতোপূর্বে আর কারো জন্য করেননি। অতঃপর তিনি বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' অতঃপর তিনি সুপারিশ করবেন।

উপর্যুক্ত শর্তসাপেক্ষে মহানবী ﷺ-এর সুপারিশ হবে কয়েক ধরনের ঃ-

১। সর্ববৃহৎ সুপারিশ, যা কিয়ামতের ময়দানে সকল মানুষের জন্য।

২। যাদের পাপ-পুণ্য সমান হয়েছে এমন লোকেদের জান্নাত যাওয়ার জন্য সুপারিশ।

৩। যে তওহীদবাদীরা কাবীরা গোনাহর কারণে জাহান্নামী হবে, তারা যাতে জাহান্নাম প্রবেশ না করে, তার জন্য সুপারিশ।

৪। জান্নাতে কোন কোন জান্নাতীর মর্যাদা বর্ধনের জন্য সুপারিশ।

৫। কিছু লোকের জন্য বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার সুপারিশ।

৬। কোন জাহান্নামীর জাহান্নামে আযাব হাল্কা করার জন্য সুপারিশ।

৭। সকল মু'মিনদের জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়ার জন্য সুপারিশ।

৮। যে তওহীদবাদীরা কাবীরা গোনাহর কারণে জাহান্নামী হবে, তারা যাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায় তার জন্য সুপারিশ। *(আক্বীদাহ ত্বাহাবিয়্যাহ দ্রঃ)*

তাঁর বিশ্বজনীনতা

তিনি বিশ্বনবী, জ্বিন-ইনসান সকলের নবী। সকল জাতি, দেশ, ভাষা ও বর্ণের নবী। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (٢٨) سورة سبأ

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" *(সাবা' ঃ ২৮)*

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}

"বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূল নিরক্ষর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা পথ পাও।" *(আ'রাফঃ ১৫৮)*

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} (١٠٧) سورة الأنبياء

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি।" *(আম্বিয়াঃ ১০৭)*

{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} (١) سورة الفرقان

"কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরক্বান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।" *(ফুরক্বানঃ ১)*

{الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} (١) سورة إبراهيم

"আলিফ লা-ম রা। এই কিতাব এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি; যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে আলোকের দিকে; পরাক্রমশালী, সর্বপ্রশংসিতের পথে বের করে আনতে পার।" *(ইব্রাহীমঃ ১)*

আর মহানবী ﷺ বলেন,

« وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ».

অর্থাৎ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, সেই সত্তার কসম! এই উম্মতের যে কেউ--- ইয়াহুদী হোক বা খ্রিস্টান আমার কথা শুনবে, অতঃপর যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি ঈমান আনবে না, সেই জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(মুসলিম ৪০৩নং)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ} (٨١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যখন আল্লাহ নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা দান করছি, অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রসূল আসবে, তখন নিশ্চয় তোমরা তাকে বিশ্বাস ও সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং আমার অঙ্গীকার গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।'

প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে, তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর নবুঅতকালে যদি অন্য নবীর আবির্ভাব ঘটে, তাহলে এই নবাগত নবীর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর সহযোগিতা করা অত্যাবশ্যক হবে। যদি নবী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নবাগত নবীর উপর ঈমান এই নবীর উপর জরুরী হয়, তাহলে এই নবীর উম্মতের উপর নবাগত নবীর উপর ঈমান আনা তো আরো বেশী জরুরী হয়ে যায়।

কোন কোন মুফাস্‌সির رَسُوْلٌ مُصَدِّقٌ (সমর্থক রসূল) থেকে মুহাম্মাদ ﷺ-কে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্যাপারে অন্য সমস্ত নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যে, যদি তাঁর যুগে তিনি এসে যান, তাহলে নিজের নবুঅতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে এই নবীর উপর ঈমান আনতে হবে। কিন্তু আসলে প্রথম অর্থের সাথে এই দ্বিতীয় অর্থ আপনা-আপনিই এসে যায়। সুতরাং কুরআনের শব্দের দিক দিয়ে প্রথম অর্থই সঠিক এবং এই অর্থের দিক থেকে এ কথাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুঅতের সূর্য উদিত হওয়ার পর আর কোন নবীর (নবুঅতের) প্রদীপ উজ্জ্বল থাকবে না। যেমন, হাদীসে এসেছে যে, একদা উমার ﷺ তাওরাতের কয়েকটি পাতা নিয়ে পড়ছিলেন। তা দেখে নবী করীম ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন,

(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظِّي مِنْ الْأُمَمِ وَأَنَا حَظُّكُمْ مِنْ النَّبِيِّينَ).

"সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুসাও জীবিত হয়ে এসে যান, আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসারী হয়ে যাও এবং আমাকে বর্জন কর, তাহলে অবশ্যই তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। নিশ্চয় উম্মতের মধ্যে তোমরা আমার অংশ এবং নবীগণের মধ্যে আমি তোমাদের অংশ।" *(আহমাদ ১৫৮৬৪, ১৮৩৩৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

(لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي).

"যদি মূসা তোমাদের মাঝে জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর জন্য অন্য কিছু বৈধ হতো না। *(আহমাদ ১৪৬৩১, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ১৭৭, আবূ য়্যা'লা ২১৩৫নং)*

বলা বাহুল্য, এখন কিয়ামত পর্যন্ত অপরিহার্য অনুসরণ কেবল মুহাম্মাদ ﷺ-এরই করতে হবে। তাঁর আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে মুক্তি, কোন ইমামের অন্ধ অনুকরণ অথবা কোন বুযুর্গের হাতে বায়াত করার মধ্যে নয়। কোন পয়গম্বরের সিক্কা যদি না চলে, তাহলে অন্য কোন ব্যক্তিত্ব শর্তহীন আনুগত্যের অধিকারী কীভাবে হতে পারে? *(আহসানুল বায়ান)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِستٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّونَ ».

"ছয়টি জিনিস দিয়ে আমাকে অন্যান্য নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আমাকে বহুলার্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলী (বলার ক্ষমতা) দেওয়া হয়েছে। আতঙ্ক দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদ ও (তার মাটিকে) পবিত্রকারী বানানো হয়েছে। আমি সারা সৃষ্টির জন্য প্রেরিত হয়েছি।

আর আমাকে দিয়ে নবুঅতের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।” *(মুসলিম ১১৯৫নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى كَانَ كُلُّ نَبِىٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَىْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ».

অর্থাৎ, আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কাউকে দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক নবী বিশেষভাবে নিজের জাতির নিকট প্রেরিত হতেন। আর আমি প্রত্যেক লাল ও কালোর প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আমার জন্য গনীমত হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কারো জন্য হালাল করা হয়নি। আমার জন্য যমীনকে পবিত্রতার মাধ্যম ও মসজিদ বানানো হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তির কাছে নামাযের সময় এসে উপস্থিত হবে, সে ব্যক্তি যেখানে থাকবে, সেখানেই নামায পড়ে নেবে। এক মাসের পথ অবধি আতঙ্ক দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আর আমাকে শাফাআত দান করা হয়েছে। *(মুসলিম ১১৯১নং)*

“আমি প্রত্যেক লাল ও কালোর প্রতি প্রেরিত হয়েছি”-এর অর্থ হল, আমি আরব ও আজমের সকল মানুষের প্রতি রসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। অথবা মানব-দানব উভয় সম্প্রদায়ের জন্য নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছি।

প্রত্যেক নবী বিশেষভাবে নিজের জাতির নিকট প্রেরিত হতেন। নিজের স্বভাষী মানুষের নিকট প্রেরিত হতেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (٤) سورة إبراهيم

আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী ক’রে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(ইব্রাহীম ঃ ৪)*

কিন্তু সর্বশেষ নবী ﷺ সকল ভাষাভাষীর মানুষের জন্যই প্রেরিত হয়েছেন।

তিনি প্রেরিত হয়েছেন মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য। যে তাঁকে বরণ করবে, সে পরিত্রাণ পাবে। আর যে প্রত্যাখ্যান করবে, সে ধ্বংস হবে।

{أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ} (١٧) سورة هود

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ওর সঙ্গে তাঁর তরফ হতে এক সাক্ষীও বিদ্যমান, আর ওর পূর্বে (সাক্ষী) ছিল আদর্শ ও করুণা স্বরূপ মূসার গ্রন্থ; (সে কি তার মত যে অনুরূপ নয়)? এমন লোকরাই এ (কুরআন)-এর প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর সমস্ত দলের মধ্য হতে যে ব্যক্তি এই (কুরআন) অমান্য করবে, তার প্রতিশ্রুত স্থান হবে দোযখ। অতএব তুমি এ (কুরআন) সম্পর্কে সন্দেহে পড়ো না। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এটা সত্য (গ্রন্থ); কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস

করে না। *(হূদঃ ১৭)*

না, তিনি কেবল আরবের নবী নন, বরং তিনি বিশ্বনবী। এ ব্যাপারটি হাদীসে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, অনারব বা আজমের বহু লোক নবী ﷺ-এর হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সুহাইব রূমী, বিলাল হাবশী, সালমান ফারেসী ؓ প্রভৃতিগণ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ ছাড়া মহানবী ﷺ রোম-সম্রাট হিরাকিল, পারস্য-সম্রাট কিসরা ও কিবতের সম্রাট মুকাওকিসকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন।

সুতরাং তাঁর দাওয়াত শুরু হয়েছিল এই নির্দেশ দিয়ে,

{وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} (٢١٤) سورة الشعراء

"তোমার নিকটতম স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক ক'রে দাও।" *(শুআ'রাঃ ২১৪)*

অতঃপর দাওয়াতী ময়দানের পরিসর বৃদ্ধি করে নির্দেশ এল,

{فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} (٩٤) سورة الحجر

"অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা কর।" *(হিজ্রঃ ৯৪)*

অতঃপর বলা হল,

{وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا} (٩٢) الأنعام

"এ কিতাব (কুরআন) কল্যাণময় ক'রে অবতীর্ণ করেছি, যা ওর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যা দিয়ে তুমি মক্কা ও ওর পার্শ্ববর্তী লোকদের সতর্ক কর। *(আন্আমঃ ৯২)*

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا} (٧) سورة الشورى

"এভাবে আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন অহী করেছি; যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কাবাসীদেরকে এবং ওর আশেপাশের বাসিন্দাকে।" *(শূরাঃ ৭)*

অতঃপর আরবের বিভিন্ন গোত্র সহ মরুভূমি অতিক্রম করল দাওয়াতী আহবান। পৌঁছে গেল ইয়ামান, শাম, আফ্রিকা, রোম ও পারস্য। এইভাবে পৃথিবীর অবশিষ্টাংশে সেই দাওয়াত পৌঁছাবার দায়িত্ব অর্পিত হল মহানবী ﷺ-এর নায়েবদের উপর।

মহান আল্লাহ জানতেন, পৃথিবী একদিন ছোট্ট একটি শহরে পরিণত হবে। তাই সারা বিশ্বের জন্য একজন নবী ও সর্বশেষ নবী। পৃথিবী আজ চারিপাশে আয়না বসানো একটি কক্ষের মতো। নিমেষের ভিতরে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অনায়াসে অবলোকন করা যায়। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের মানুষের কথা মুখোমুখী কথোপকথনের মতোই স্পষ্ট শোনা যায়। তাই সেখানে একাধিক নবীর প্রয়োজন নেই। তাই পৃথিবীর শেষ বয়সে সর্বশেষ নবী প্রেরিত হলেন পৃথিবীর হৃদয়স্থলে মক্কায়। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ।

তিনি সারা বিশ্বের জন্য প্রেরিত, জীবিত জ্ঞানসম্পন্ন সকল মানব-দানবের জন্য প্রেরিত। যেহেতু মৃত ও জ্ঞানহীন তাঁর দাওয়াত শুনতে পারে না, বুঝতে পারে না, মানতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ} (٧٠) سورة يــس

অর্থাৎ, যাতে সে জীবিত (জাগ্রতচিত্ত) ব্যক্তিদেরকে সতর্ক করতে পারে এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সাব্যস্ত হয়। *(ইয়াসীনঃ ৭০)*

অনুরূপ যাদের কাছে তাঁর দাওয়াতের সংবাদ পৌঁছবে, তাদের জন্য তিনি প্রেরিত।

{وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} (١٩) سورة الأنعام

অর্থাৎ, এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটি পৌঁছবে তাদেরকে এ দ্বারা আমি সতর্ক করি। *(আন্আম ঃ ১৯)*

নচেৎ যারা তাঁর খবর এখনও পায়নি, তারা ভারপ্রাপ্ত নয়। তাদেরকে মহান আল্লাহ শাস্তি দেবেন না। তিনি বলেছেন,

{مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (١٥) سورة الإسراء

অর্থাৎ, যারা সৎপথ অবলম্বন করবে, তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্যই সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে, তারা নিজেদেরই ধ্বংসের জন্যই হবে এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না। আর আমি রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ১৫)*

বলা বাহুল্য, প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন নারী-পুরুষ যখনই ইসলামের কথা শুনবে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ না করলে তাকে শাস্তি ভুগতে হবে। তাঁর অনুসরণই হল মানবতার চূড়ান্ত ও সর্বশেষ পথ।

তাঁর মাধ্যমে নবুঅতের পরিসমাপ্তি

মহানবী ﷺ প্রেরিত হয়েছিলেন মানুষের শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর চরিত্রের পরিপূর্ণতার জন্য। তা পরিপূর্ণতা পেয়ে গেছে।

মহান আল্লাহ জানতেন, শেষ যামানায় দুনিয়া যোগাযোগ-সুবিধায় ক্ষুদ্রাকার ধারণ করবে।

তিনি জানতেন, ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত যথাযথভাবে উপযোগী। ইসলাম চিরন্তন ও কালজয়ী ধর্ম।

তিনি দ্বীনের আলেমগণকে তাঁর নবীর ওয়ারেস বানিয়েছেন। "নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের ওয়ারেসীন (উত্তরাধিকারী)। নবীগণ না কোন দীনারের উত্তরাধিকার করেছেন, না কোন দিরহামের। বরং তাঁরা ইলমেরই উত্তরাধিকার করে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে সে পর্যাপ্ত অংশ গ্রহণ করে থাকে।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাযাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৬৭নং)*

সুতরাং নবীর পরে আলেম-উলামা ওয়ারেসসূত্রে নবুঅতের ইল্ম প্রচারের কাজ চালাবেন।

সেই জন মহান আল্লাহ মহানবী ﷺ দ্বারা নবুঅতের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}

অর্থাৎ, মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। *(আহযাব ঃ ৪০)*

'খাতাম' মোহরকে বলা হয়। আর মোহর খতম করা বা সর্বশেষ কর্মকে বলা হয়। যেমন পত্রের শেষে মোহর মারা হয়, যাকে শীলমোহর বলা হয়। কোন পাত্রকেও শীল মেরে বন্ধ করা হয়।

নবুঅতের উপর শীল মেরে শেষনবী ﷺ দ্বারা নবুঅত ও রিসালাতের রাস্তা বন্ধ ক'রে

দেওয়া হয়েছে। এই জন্য তাঁকে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' বলা হয়। তার মানে তিনি আখেরী নবী, সর্বশেষ নবী।

'খাতাম' মানে আংটিও হয়। যেহেতু সে যুগে হিফাযতের জন্য 'শীলমোহর'কে আঙ্গুলে আংটি রূপে ব্যবহার করা হতো।

বলা বাহুল্য, তাঁর পর যে কেউ নবী হওয়ার দাবী করবে, সে নবী নয়; বরং মিথ্যুক ও দাজ্জাল বলে পরিগণিত হবে। এ বিষয়ে হাদীস গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি আল্লাহর দাস উম্মুল কিতাবে (লওহে মাহফূযে অঙ্কিত) ছিলাম সর্বশেষ নবীরূপে। আর আদম তখনও তাঁর কাদায় পতিত ছিলেন। *(আহমাদ ১৭১৬৩নং)*

কিয়ামতের দিন ভীষণ কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে লোকেরা নূহ, ইব্রাহীম ও মূসার কাছে সুপারিশের জন্য যাবে। সকলেই ওযর পেশ করবেন। মূসা নবী বলবেন, 'আমি তার যোগ্য নই। বরং তোমরা আল্লাহর রূহ ও কালেমা ঈসার কাছে যাও। লোকেরা তাঁর কাছে এসে আবেদন জানালে তিনিও বলবেন,

إِنِّي لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِنْ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ....

'আমি তার যোগ্য নই, বরং তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট যাও। কারণ তিনি সর্বশেষ নবী। *(বুখারী ৪৪৭৬, মুসলিম ৪৯৫নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে ২৭ জন মিথ্যুক দাজ্জাল (নবী) আসবে, তার মধ্যে ৪ জন মহিলা! আর আমিই হলাম সর্বশেষ নবী, আমার পর কোন নবী নেই।" *(সিঃ সহীহাহ ১৯৯৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« إِنَّ مَثَلِى وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ ، إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ ».

অর্থাৎ, আমার উদাহরণ ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ এমন এক ব্যক্তির মতো, যে উত্তম ও সুন্দর রূপে একটি গৃহ নির্মাণ করেছে। কিন্তু এক কোণে একটি ইট পরিমাণ জায়গা ছেড়ে রেখেছে। লোকেরা তা ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগল ও অবাক হল এবং বলতে লাগল, 'এই ইটটা স্থাপিত হয়নি কেন?'

(নবী ﷺ বলেন,) সুতরাং আমিই হলাম সেই ইট। আমিই হলাম সর্বশেষ নবী। *(বুখারী ৩৫৩৫, মুসলিম ৬১০১নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(أَنَا خَاتَمُ الأَنبِيَاءِ وَمَسْجِدِي خَاتَمُ مَسَاجِدِ الأَنبِيَاءِ).

অর্থাৎ, আমি সর্বশেষ নবী এবং আমার মসজিদ নবীগণের সর্বশেষ মসজিদ। *(সঃ তারগীব ১১৭৫নং)*

মহানবী ﷺ আলী ؓ-কে মদীনার নায়েব বানিয়ে তবূক যুদ্ধে বের হয়ে যাচ্ছিলেন। আলী

বললেন, 'আমি আপনার সাথে যুদ্ধে যেতে চাই।' আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, "না।" তিনি কাঁদতে লাগলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

« أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نُبُوَّةَ بَعْدِى ».

"তুমি কি চাও না যে, হারূন যেমন মূসার নায়েব হয়েছিলেন, তুমি তেমনি আমার নায়েব হবে? তবে আমার পরে কোন নবী নেই।" *(মুসলিম ৬৩৭৩নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ فلا نُبُوَّةَ بَعْدِي إِلاَّ الْمُبَشِّراتُ الرُّؤيا الصَّالِحَةُ يَرَاها الرَّجُلُ أَوْ تُرَى لَهُ).

অর্থাৎ, নবুঅত চলে গেছে। সুতরাং আমার পরে আর নবুঅত নেই। অবশ্য শুভ সংবাদ বা নেক স্বপ্ন বাকী থাকবে, যা মানুষ দেখবে বা তাকে দেখানো হবে। *(ত্বাবারানীর কাবীর ৩০৫১, সঃ জামে' ৩৪৩৮-নং)*

এক ব্যক্তি মুগীরাহ বিন শু'বাহ ﷺ-এর নিকট বলল, 'স্বাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন খাতামিল আম্বিয়া। যিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে কোন নবী নেই।' মুগীরাহ বললেন, 'খাতামুল আম্বিয়া বলাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ আমরা বলাবলি করতাস, ঈসার আবির্ভাব হবে। সুতরাং তাঁর আবির্ভাব হলে তিনি তাঁর পূর্বের নবী, তাঁর পরের নবী।' *(ইবনে আবী শাইবাহ ২৬৬৫৪নং)*

কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঈসা ﷺ-এর অবতরণ হবে, যা সহীহ ও সূত্রবহুল প্রসিদ্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। তবে তিনি নবী হয়ে আসবেন না; বরং শেষ নবী ﷺ-এর উম্মত হয়ে আসবেন। যার ফলে তাঁর অবতরণ হওয়া 'খাতমে নবুঅত'-এর আকীদার পরিপন্থী নয়।

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রঃ)কে বলা হল, 'এই সকল জাল হাদীস? (কী উপায় হবে?)' তিনি বললেন, 'তা বাছাই করার জন্য বড় বড় মুহাদ্দিসীন আছেন।' অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٩) سورة الحجر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই 'যিক্র' অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক। *(হিজ্র ঃ ৯)*

আয়াতে উল্লিখিত 'যিক্র' উদ্দেশ্য শুধু কুরআনই নয়, বরং তাতে সুন্নাহও শামিল; যদিও তা শব্দাবলী-সহ শামিল নয়। বরং তাতে আরবী ও প্রত্যেক সেই জিনিস শামিল, যার উপর হকের পরিচয় নির্ভরশীল। যেহেতু কুরআন হিফাযত করার উদ্দেশ্য হল, হুজ্জত কায়েম থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হিদায়াত স্থায়ী থাকবে। যেহেতু মুহাম্মাদ ﷺ সর্বশেষ নবী এবং তাঁর শরীয়ত সর্বশেষ শরীয়ত। *(আত্-তানকীল ১৩৫পৃঃ)*

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বহু নামধারী মুসলিম এ সকল দলীল-প্রমাণ ও উক্তির অপব্যাখ্যা করে নবুঅতের সিলসিলা জারি রেখে দিয়েছে। আর সত্য হয়েছে সর্বশেষ নবী ﷺ-এর ভবিষ্যৎ-বাণী। তাঁর পরে প্রায় ৩০ জন মিথ্যা নবুঅতের দাবীদার প্রকাশ পাবে। আবার তার মধ্যে মহিলা নবীও আছে! ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

তারা স্পষ্ট আয়াত ও হাদীসকে অস্বীকার করে অথবা অপব্যাখ্যা করে। তারা বলে, 'খাতামুন নাবিয়্যীন মানে, সর্বশেষ নবী নয়। তার মানে নবীগণের অঙ্গুরীয়। আঙ্গুলের অলংকার যেমন অঙ্গুরীয়, তেমনি মুহাম্মাদ নবীগণের অলংকার। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তবে তাঁর পরেও নবী আছে!'

আর 'লা নাবিয়্যা বা'দী' মানে? ওরা বলে, তার মানে 'আমার পর কোন নবী নেই' নয়। বরং তার সঠিক মানে 'আমার সাথে কোন নবী নেই।' ওদের মতে আরবী শব্দ 'বা'দ' মানে 'সাথে' বা 'সঙ্গে', 'পরে' নয়।

তার মানে, মানব না, তাই ধানাই-পানাই। তাতে আলেমরা 'জাহেল' বলল তো কী হল? সরল-সাদা মানুষকে তো বুঝানো যাবে!

শুনেছি ওদের অনেকে বলে,

{والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ} (٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরলোকে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী। (বাক্বারাহ ঃ ৪)

না, আয়াতে উল্লিখিত 'আখেরাত' মানে পরলোক নয়। বরং তার মানে শেষের নবী। তার মানে, 'হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরবর্তী নবীতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।' আর সে হল মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী!

আয়াত ও হাদীসের এই শ্রেণীর উল্টাপাল্টা অর্থ ও অপব্যাখ্যা করে ইংরেজদের গোলাম ও মদদপুষ্ট নবী গোলাম আহমাদ নিজের নবুঅত প্রচার করে গেছে এবং তার চেলারা এখনও করে যাচ্ছে। ফাহাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।

কত শত কবি, লেখক ও দার্শনিক অথবা ভুয়া নবী ও বুযুর্গেরা এই শ্রেণীর অপব্যাখ্যা করে ইসলামের মূল স্রোতধারাকে পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় কোমরে কাপড় বেঁধে লাগাতার কাজ করে যাচ্ছে।

কেউ বলছে, 'সালাত' মানে পাঁচ অক্তে ওঠ-বস করা নয়। সালাত মানে দুআ। দুআ করতে হবে। প্রচলিত নামায কিছু নয়।

'যাকাত' মানে দান করা বা অর্থ ব্যয় করা নয়। যাকাত মানে মনের পরিশুদ্ধতা। মনকে পরিষ্কার করতে হবে, আত্মশুদ্ধি করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} (٩٩) سورة الحجر

অর্থাৎ, তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। *(হিজ্র ঃ ৯৯)*

ওদের অনেকে বলে, 'না, এ তর্জমা ভুল। এর আসল তর্জমা হল, "তোমার একীন উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।" অর্থাৎ আল্লাহ প্রতি 'একীন' হয়ে গেলে (মারেফাত পেয়ে গেলে) আর ইবাদত করতে হবে না!

প্রিয় পাঠক! আপনি তাদেরকে কী বলবেন? যারা খেয়াল-খুশীর পূজারী হয়ে খেয়াল-খুশী মতো কুরআন ও হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা করে। তাদেরকেও কি 'মুসলিম' বলতে পারবেন? এমন কুকান্ড করার পরেও কি তারা ইসলামের গন্ডিসীমায় অবস্থান করবে? তারা কি সেই ইয়াহুদীদের মতো নয়, যাদের জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن

لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً} (٤٦) سورة النساء

অর্থাৎ, ইয়াহুদীদের কিছু লোক (তাওরাতের) বাক্যাবলী বিকৃত করে এবং (মুহাম্মাদকে) বলে, 'আমরা (তোমার কথা) শুনলাম ও অমান্য করলাম' এবং 'শোন! তোমার কথা যেন শোনা না হয়।' আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করে এবং ধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য করে বলে, 'রায়িনা'। কিন্তু তারা যদি বলত, 'শুনলাম ও মান্য করলাম' এবং 'শোন ও উনযুরনা (আমাদের খেয়াল কর)' তবে তা তাদের জন্য উত্তম ও সুসঙ্গত হত। কিন্তু তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। অতএব, তাদের অল্পসংখক লোকই বিশ্বাস করবে। *(নিসা ঃ ৪৬)*

মহানবী ﷺ মানুষের জন্য একটি অনুগ্রহ

মহানবী ﷺ সারা বিশ্বের মানুষের জন্য---বিশেষ ক'রে মু'মিনদের জন্য একটি অনুগ্রহ। মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে সে অনুগ্রহ না হলে মানুষ ভ্রষ্ট থাকত, অসভ্য থাকত, পশুর মতো বর্বর থাকত।

মানুষ সৃষ্টিকর্তাকে চিনত না, চিনলেও সঠিকভাবে তাঁর অধিকার আদায় করতে পারত না অথবা মনগড়া পদ্ধতিতে তা আদায় করত, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হতেন না।

মানুষ লেনদেনের ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা না পেয়ে অন্যায়, অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হতো।

আচার-ব্যবহার ও সুন্দর চরিত্রের সন্ধান পেত না। খেয়ালখুশীর আচরণে মানুষ অবজ্ঞা ও অতিরঞ্জনের কবলে আপতিত হতো।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ} (١٦٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাসীদের প্রতি তাদের নিজেদের মধ্যে হতে রসূল প্রেরণ ক'রে অনুগ্রহ করেছেন। সে (নবী) তার আয়াতগুলি তাদের নিকট আবৃত্তি ক'রে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়। আর অবশ্যই তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল। *(আলে ইমরান ঃ ১৬৪)*

মহান আল্লাহ মানব-দানবকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ মূলতঃ ভ্রষ্ট। তারা ইবাদতের সময় জানে না, ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি জানে না। তাছাড়া দুনিয়ার বুকে বসবাস করার শান্তিপূর্ণ রীতি-নীতি জানে না। তাই মহান প্রতিপালক অনুগ্রহপূর্বক মানুষের নিকট নবী প্রেরণ করেছেন। এ নবী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য রহমত, এ নবী মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ।

নবীর মানুষ হওয়া এবং মানব-জাতিভুক্ত হওয়াকে মহান আল্লাহ একটি অনুগ্রহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর বাস্তবিকই এটা একটি মহা অনুগ্রহ। কারণ,

প্রথমতঃ তিনি তাঁর জাতির স্থানীয় ভাষায় আল্লাহর পায়গাম পৌছাতে পারবেন যা বুঝা প্রত্যেক মানুষের জন্য সহজ হবে।

দ্বিতীয়তঃ একই জাতিভুক্ত হওয়ার কারণে মানুষ তাঁর ঘনিষ্ঠ হবে এবং তাঁর কাছ ঘেঁসবে।

তৃতীয়তঃ মানুষের জন্য মানুষ হওয়াটাই সব দিক দিয়ে সমীচীন। কেননা, মানুষের পক্ষে মানুষের অনুসরণ করা সম্ভব, কিন্তু তাদের পক্ষে ফিরিশ্তাদের অনুসরণ করা সম্ভব নয়। অনুরূপ ফিরিশ্তাকুল মানুষের আবেগ ও অনুভূতির গভীরতা ও সূক্ষ্মতা অনুধাবন করতে সক্ষম নন। কাজেই পয়গম্বর যদি ফিরিশ্তাদের মধ্য থেকে হতেন, তাহলে তিনি সেই সমূহ গুণাবলী থেকে বঞ্চিত হতেন, যা দ্বীনের দাওয়াতের জন্য অতি প্রয়োজন। আর এই জন্যই দুনিয়াতে যত নবী এসেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন মানুষ।

এর চাইতে বড় অনুগ্রহ আর কী হতে পারে যে, সেই নবী এসে মানুষের নিকট তাঁর আয়াত পাঠ করেন। তাদেরকে তাঁর কিতাব ও হিকমত বা সুন্নাহ শিক্ষা দেন। তাদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা ও চরিত্রের আবর্জনা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করেন। দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করেন। ভ্রষ্ট পথ থেকে সরিয়ে এনে সৎপথের পথিক করেন। ফলে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা সন্তুষ্ট হন এবং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের চির শান্তি দান করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« مَثَلِى وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِى ».

"আমার ও তোমাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল। অতঃপর তাতে উচ্চুঙ্গ ও পতঙ্গ পড়তে আরম্ভ করল, আর সে ব্যক্তি তা হতে তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাচ্ছি, আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে (জাহান্নামের আগুনে) পতিত হচ্ছ।" *(বুখারী ৬৪৮৩, মুসলিম ৬০৯৮-নং)*

মহানবী ﷺ মানুষকে কুফরী, শির্ক, মুনাফিকী, বিদআত, অশ্লীলতা, অন্যায়-অত্যাচার ও যাবতীয় পাপাচরণ থেকে বিরত রেখেছেন, বিরত থাকতে বলেছেন। অনুরূপ জাহান্নাম থেকেও দূরে রেখেছেন, দূরে থাকতে বলেছেন। নিম্নোক্ত আয়াতের একটি অর্থে তাই বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (٢٨) سورة سبأ

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী প্রতিরোধকরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। *(সাবা' ঃ ২৮)*

তাঁর আখ্যেয় নাম ও গুণাবলী

মহানবী ﷺ-এর যে সুবিশাল ব্যক্তিত্ব, সুবিশাল বহুমুখী জীবন, অনুপম বৈশিষ্ট্যমন্ডিত চরিত্র, তাঁর জীবনের যে ইহলৌকিক, পারলৌকিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক দিক, তার সবটা আয়ত্ত করা সকলের জন্য সম্ভব নয়। তিনি ছিলেন মনোরম শিশু, শান্ত-শিষ্ট ও স্বভাব-সুন্দর কিশোর, আদর্শ মেষরক্ষক, চরিত্রবান ও আদর্শবান যুবক, শিষ্ট-সুশীল, অত্যন্ত লজ্জাশীল, ধৈর্যশীল, অত্যন্ত আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন, অমায়িক মধুর সদালাপী, মিতভাষী, বিনম্র, বিনয়ী, ন্যায় ও সত্যের কাছে নম্র এবং অন্যায় ও বাতিলের কাছে কঠোর, সৎ ও মহৎ মানুষ, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য আমানতদার, আদর্শ স্বামী, আদর্শ সংসারী, আদর্শ

শ্বশুর, আদর্শ ভাই, আদর্শপরায়ণ সুপুত্র, উত্তম পিতা, শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী, আদর্শ মুবাল্লিগ বা সুকৌশলী ধর্মপ্রচারক, দুনিয়ার সর্বস্তরের ও সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য হিদায়াতের জ্বলন্ত ভাস্কর, বিজয়ী সিপাহ্‌সালার, বীর যোদ্ধা, নির্ভিকচিত্ত, অসীম সাহসী, 'আবেদ' ও তাপসপ্রবর, যিক্‌রকারী, শুক্‌রকারী, কৃতজ্ঞ, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী ও সফল রাজনীতিবিদ, সমাজ-বিজ্ঞানী, গরীব-দরদী, দুঃখীর সাথী, সংবেদনশীল, দয়ার্দ্রচিত্ত, পরোপকারী, অতুলনীয় দানশীল, উদার, মহানুভব ও প্রশস্ত-হৃদয়, ন্যায়-নিষ্ঠাবান সম্রাট, নিরপেক্ষ বিচারপতি, বিষয়-বিরাগী, তুলনাহীন আদর্শ ব্যবসায়ী, নজীরহীন শিক্ষাগুরু, সদালাপী, সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে রসিকতা-প্রিয়, যুগ-সংস্কারক, ভেষজবিদ ও সুচিকিৎসক, সকল সদ্‌গুণের গুণাধার, মহামানব, বিশ্বনবী, মহানবী, জগদ্‌গুরু, বিশ্বজন-নেতা, দুই জাহানের সর্দার, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, সকল সৃষ্টির সেরা। তিনি খাইরু খালক্বিল্লাহ।

তিনি আফযালুল আম্বিয়া, আশরাফুল মুরসালীন, নবীকুল শিরোমণি, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, খাতামুন নাবিয়্যীন, সর্বশেষ নবী। তিনি ইমামুল আম্বিয়া, ইসরার রাতে নবীগণের ইমামতি করেছেন।

তিনি সাইয়্যিদুল কাওনাইন, সাইয়্যিদুল বাশার, সাইয়্যিদুল আওয়ালীন অল-আখিরীন।

তিনি আব্দুল্লাহ, তিনি রাসূলুল্লাহ, নাবিয়্যুল্লাহ, খালীলুল্লাহ।

সর্বপ্রথম তিনি কবর থেকে পুনরুত্থিত হবেন।

তিনি সাহেবুল মাক্বামিল মাহমূদ।

তিনি সর্বপ্রথম শাফাআতকারী এবং সর্বপ্রথম তাঁর শাফাআত কবুল হবে। তিনি শাফীউল মুযনিবীন।

তিনি সাহেবুল হাওযিল মাওরূদ ঃ হাওযে কাওসারের অধিপতি।

তিনি আস-স্বাদেক্বুল মাস্বদূক্ব ঃ তিনি সত্যবাদী ও তাঁর কথাকেও সবাই সত্য বলে মানে।

সাহেবুল মু'জিযাত ঃ মহান আল্লাহ তাঁকে বহু মু'জিযা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। মহানবী ﷺ-এর সত্যতা ও নবুঅত প্রমাণের জন্য মহান আল্লাহ তাঁর মাঝে কিছু অলৌকিক শক্তি, অতিপ্রাকৃত নিদর্শন ও অনৈসর্গিক কর্মাবলী প্রকাশ করেছিলেন। তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১। কুরআন কারীম ঃ কুরআন সর্ববৃহৎ চিরন্তন মু'জিযা। মহান আল্লাহ এই সাহিত্যগ্রন্থ দিয়ে আরবের আরবী সাহিত্যিকদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই অনুরূপ একটি সূরা বা আয়াতও রচনা করতে সক্ষম হয়নি। আর মহানবী ﷺ নিজে ছিলেন নিরক্ষর। কোন মানুষ তাঁর শিক্ষক ছিল না।

২। চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া ঃ মহানবী ﷺ-এর আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়েছিল এবং কুরাইশ তা সচক্ষে দর্শনও করেছিল।

৩। নয় শত লোকের সৈন্যদলকে কতকগুলি খেজুর ভরপেট খাইয়েও পরিশেষে তা বেঁচে গিয়েছিল।

৪। মহানবী ﷺ-এর আঙ্গুলসমূহের মধ্য হতে পানির ঝরনা প্রবাহিত হয়েছিল। সেই পানি সেনাবাহিনীর সবাই পান করেছিলেন।

৫। শত্রুপক্ষের সৈন্যের উপর তিনি এক মুঠো ধুলো ছিটিয়ে দিলে সকলের চোখে তা পৌঁছে গিয়েছিল।

৬। যে খেজুরের গুঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে তিনি খুতবা দিতেন, মিম্বর বানাবার পর তা ত্যাগ

করলে উটের মত তার কান্নার শব্দ শোনা গিয়েছিল।

৭। গাছের ডাল ধরে টান দিলে পর্দার জন্য গাছ তার সঙ্গে চলেছিল।

৮। (আল্লাহর তরফ থেকে) তিনি বহু গায়বী খবর এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যা ঠিক ঠিক ভাবে ঘটেছে, ঘটছে ও ঘটবে।

৯। মহানবী ﷺ-এর সম্মুখস্থ খাবারের তসবীহ শোনা গেছে।

১০। তাঁর সত্যতার সাক্ষি দিতে হস্তমুষ্টিতে কঙ্কর তসবীহ পড়েছিল।

১১। তিনি এক রাতে ইসরা' ও মি'রাজ ভ্রমণে গিয়েছিলেন।

১২। খায়বার পাঠাবার দিন আলী رضي الله عنه-এর নেত্রদাহে তাঁর চোখে মহানবী ﷺ থুথু লাগিয়ে দিলে সাথে সাথে ভালো হয়ে গিয়েছিল এবং তারপর আর কোন দিন তাঁর ঐ রোগ দেখা দেয়নি।

তাঁর প্রশংসায় কতিপয় কবিতা

তাঁর চাচা আবূ তালেব তাঁর একটি বাস্তব-চিত্র কবিতায় এঁকেছিলেন,

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه .... ثمال اليتامي عصمة للأرامل .

অর্থাৎ, তিনি গৌরবর্ণ, তাঁর চেহারা দ্বারা বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। তিনি অনাথদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। *(আহমাদ ৫৬৭৩, বুখারী ১০০৮-১০০৯, ইবনে মাজাহ ১২৭২নং)*

তাঁর চাচা আবূ তালেব তাঁর নবুঅতের দশম বছরে মুসলিম না হয়েই মারা যান। কিন্তু তিনি তাঁর আচরণে মুগ্ধ ছিলেন। তাই দুশমনদের হাত থেকে তিনি তাঁকে নিরাপদে রেখেছিলেন।

মহানবী ﷺ অনাথ-এতীমদের দেখাশোনা করতেন, তাদের পানাহারের ব্যবস্থা করতেন। স্বামীহারা বিধবাদের তত্ত্বাবধান করতেন, তাদেরকে যুলুম ও কষ্ট থেকে রক্ষা করতেন।

অনাবৃষ্টি দেখা দিলে লোকেরা তাঁকে অসীলা বানিয়ে দুআ করে বৃষ্টি প্রার্থনা করত। তিনি দুআ করলে বৃষ্টি বর্ষণ হতো। আর এ সব ছিল তাঁর জীবদ্দশায়। ইন্তিকালের পর তিনি কারো আশ্রস্থল ও রক্ষাকর্তা নন। তাঁর অসীলায় দুআও করা বৈধ নয়। বরং তাঁর ঐ সকল সুন্নাহর অনুসরণ করা বিধেয়।

সাহাবী কবি হাস্‌সান বিন সাবেত رضي الله عنه তাঁর প্রশংসায় বলেছেন,

أغَرُّ، عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّةِ خَاتَمٌ .... مِنَ اللَّهِ مَشْهُودٌ يَلُوحُ ويَشْهَدُ

وضمَّ الإلهُ اسمَ النبيّ إلى اسمهِ .... إذا قَالَ فِي الخَمْسِ المُؤَذِّنُ أشْهَدُ

وشقّ لهُ من اسمهِ ليجلهُ .... فذو العرشِ محمودٌ، وهذا محمَّدُ

نَبيٌّ أتَانَا بَعْدَ يَأسٍ وَفَتْرَةٍ.... منَ الرسلِ، والأوثانِ في الأرضِ تعبدُ

فَأمْسَى سِرَاجاً مُسْتَنيراً وَهَادِياً .... يَلُوحُ كما لاحَ الصّقِيلُ المُهَنَّدُ

وأنذرنا ناراً، وبشرَ جنةً .... وعلمنا الإسلامَ، فاللهَ نحمدُ

অর্থাৎ, তাঁর দেহের উপর নবুঅতের মোহর সমুজ্জ্বল। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য, যা চমকাচ্ছে ও সাক্ষি দিচ্ছে।

মা'বূদ (আল্লাহ) নবীর নামকে নিজের নামের সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। যখন মুআয্‌যিন

পাঁচ ওয়াক্তে 'আশহাদু (আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ)' বলে।

মর্যাদা বর্ধনের জন্য নিজের নাম থেকে তাঁর নাম উদ্ভাবন করেছেন। তাই আরশ-ওয়ালা 'মাহমূদ', আর ইনি হলেন 'মুহাম্মাদ'।

নিরাশা ও রসূলগণের আগমন বন্ধ থাকার পর আমাদের নিকট নবী এসেছেন, যখন পৃথিবীতে প্রতিমার পূজা হচ্ছিল।

তিনি হলেন উজ্জ্বল প্রদীপ ও পথপ্রদর্শক। ঝকমকে ভারতীয় তরবারির মতো ঝকমক করছেন।

তিনি আমাদেরকে জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি।

কবি হাস্সান ﵁ আরো বলেছেন,

خُلِقت مبرأً عن كل عيب   كأنك خلقت كما تشاء

وأجمل منك لم تر قط عين   وأحسن منك لم تلد النساء

অর্থাৎ, আপনি প্রত্যেক ত্রুটি থেকে পবিত্ররূপে সৃষ্টি হয়েছেন। যেন আপনি নিজের ইচ্ছামতো রূপ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছেন।

আপনার থেকে অধিক সুন্দর কোন চক্ষু দর্শন করেনি। আর আপনার থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ (সন্তান) নারীরা জন্ম দেয়নি।

উমার বিন খাত্তাব ﵁ তাঁর ব্যাপারে কবি যুহাইরের এই কবিতাছত্র আবৃত্তি করতেন,

لو كنت من شيء سوى البشر ** كنت المضيء لليلة البدر

অর্থাৎ, আপনি যদি মানুষ ছাড়া অন্য কোন বস্তু হতেন, তাহলে আপনিই পূর্ণিমার রাত্রিকে আলোকিত করতেন।

অন্য এক কবি তাঁর প্রশংসায় বলেছেন,

صلى عليك الله يا علَم الهدى .... واستبشرت بقدومك الأيامُ

هتفت لك الأرواح من أشواقها .... وازينت بحديثك الأقلامُ

অর্থাৎ, আল্লাহ আপনার প্রতি করুণা বর্ষণ করুন হে হিদায়াত-কেতন! আপনার আগমনে যুগ সুসংবাদ পেয়েছে।

আত্মাসমূহ আকুল আকাঙ্ক্ষায় আপনার জন্য গুণকীর্তন করেছে এবং আপনার কথা নিয়ে কলমসমূহ সৌন্দর্যমন্ডিত হয়েছে।

এক বাঙ্গালী কবি বলেছেন,

'বজ্রের ধ্বনী ছিল সে অথবা ছিল সে সওতে হাদী,
দিল সে কাঁপায়ে আরবের মাটি রসূল সত্যবাদী।
জাগালো সে এক নতুন লগ্ন সকলের অন্তরে,
জাগায়ে গেল সে জনতাকে চির-সুপ্তির প্রান্তরে।
সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে এই সত্যের পয়গামে,
হল মুখরিত গিরি-প্রান্তর চির সত্যের নামে।'

শেখ সা'দী তাঁর এক কবিতায় মহানবী ﷺ-এর প্রশংসায় লিখেছেন,

بلغ العُلا بكماله .... كشف الدجى بجماله

حسنت جميع خصاله .... صلوا عليه وآله

অর্থাৎ, তিনি নিজ পরিপূর্ণতার সাথে উচ্চতায় পৌঁছেছেন। তাঁর সৌন্দর্যে অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে।

তাঁর সকল আচরণ ছিল সুন্দর। তাঁর প্রতি ও তাঁর বংশধরের প্রতি দরূদ পড়।

মানবিক পরিপূর্ণতার উচ্চ শিখরে তিনি উন্নীত ছিলেন। তাঁর আভ্যন্তরীণ ও চারিত্রিক সৌন্দর্যের ফলে কুফরী ও পাপাচারিতার অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে।

বাহ্যিক সৌন্দর্যের আতিশয্যের কারণে অত্যুক্তি করে বলা হয়, তাঁর মুখমন্ডলের ঔজ্জ্বল্যে অন্ধকার দূরীভূত হতো। মহান আল্লাহ তাঁকে 'জ্বলন্ত প্রদীপ' বলেছেন। *(আহযাব ঃ ৪৬)* সাহাবাগণও তাঁর চেহারাকে 'সূর্য ও পূর্ণিমার চাঁদ' বলেছেন। *(মুসলিম ৬২৩০নং)* কিন্তু তা বাস্তবে নয়, রূপক ও আলঙ্কারিক অর্থে।

আর তাঁর সকল চরিত্র যে সুচরিত্র এবং সকল আচরণ যে সুন্দর, তাতে কোন সন্দেহই নেই। স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন

ভালোবাসা ও ভক্তির আতিশয্যে মানুষ তার প্রিয়পাত্রকে নিয়ে বড় অতিরঞ্জন করে থাকে। ভালোবাসার আবেগে পড়ে অসুন্দরীকেও বিশ্বসুন্দরী লাগে।

আমাদের মহানবী ﷺ-এর যে গুণাবলী ছিল, সে গুণাবলীর উপরেও তাঁর অনেক ভক্ত বাড়াবাড়ি করে থাকে।

এ কথা অবশ্যই সত্য ও সুনিশ্চিত যে, তাঁর অতিপ্রাকৃত বহু বিষয় ছিল, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অলৌকিক বহু কর্ম ও গুণ ছিল। তার মধ্যে যা সহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত, কুরআনী আয়াতের স্পষ্ট উক্তি অথবা সহীহ হাদীসের স্বচ্ছ বর্ণনায় উল্লিখিত, তা মেনে নেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজেব।

ঠিক তার বিপরীত যা প্রমাণিত নয়, যা কেবল অতিভক্তির আবেগে অনুমানে লিখিত, তা কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলী বলেই অন্ধের মতো বিশ্বাস করা বৈধ নয়। যেহেতু তা আকীদাগত বিষয়। আর আকীদার বিষয়ে জাল হাদীস তো দূরের কথা, কোন যয়ীফ হাদীসকেও ভিত্তি করা যাবে না। পরন্তু অনেক কথা এমন আছে, যেগুলি কোন হাদীসের কিতাবেই নেই; বরং কোন মীলাদী সূফীদের কিতাবে আছে, তার হাওয়ালায় এ সব কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলে মহানবী ﷺ-এর ব্যাপারে অতিরঞ্জন করা হয়, যা মূলতঃ নিষিদ্ধ।

আনাস ؓ বলেন, একদা কিছু লোক বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! হে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি! হে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র! হে আমাদের সর্দার! হে আমাদের সর্দারের পুত্র!'

এ সব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَا رَفَعَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ).

অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের কথা বল। আর অবশ্যই যেন শয়তান

তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ এবং আল্লাহর রসূল। আল্লাহর কসম! আমি পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে সেই স্থানের উর্ধ্বে উত্তোলন কর, যে স্থানে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল আমাকে উত্তোলন করেছেন। *(আহমাদ ১৩৫২৯, সিঃ সহীহাহ ১০৯৭নং)*

আব্দুল্লাহ বিন শিখ্খীর ﷺ বলেন, একদা আমি বানূ আমেরের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। আমরা তাঁকে বললাম, 'আপনি আমাদের সাইয়েদ (প্রভু)।' তিনি বললেন, "সাইয়েদ হলেন আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা।" আমরা বললাম, 'মর্যাদায় আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দানশীলতা ও শৌর্যে আমাদের সবার বড়।' এ কথা শুনে তিনি বললেন,

« قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ».

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের কথা বল অথবা তোমাদের কিছু কথা বল। আর শয়তান যেন অবশ্যই তোমাদেরকে দুঃসাহসিক বানিয়ে না দেয়। *(আবূ দাঊদ ৪৮০৮নং)*

'প্রভু' ইত্যাদি সম্মানসূচক শব্দ পার্থিব জগতের রাজা-নেতা-মালিকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। সেই হিসাবে তাঁরা ভেবেছিলেন নবুঅতের ব্যাপারেও তাঁকে 'প্রভু' বলা যাবে। মহানবী ﷺ তাঁদের ভুল ভেঙ্গে দিয়ে বললেন, "তোমরা তোমাদের কথা বল।" অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের দ্বীন ও মিল্লতের কথা বল এবং আমাকে 'নবী' ও 'রসূল' বলে ডাকো। যেমন আল্লাহ আমার নাম নিয়ে তাঁর কিতাবে (প্রায় ১৩ জায়গায়) 'হে নবী!' বলে ডেকেছেন। এবং (প্রায় ২ জায়গায়) 'হে রসূল!' বলে ডেকেছেন। আর আমাকে 'সাইয়েদ' (প্রভু) বলে ডেকো না, যেমন তোমরা তোমাদের পার্থিব নেতা-সর্দারদেরকে ডেকে থাকো। আমাকে তাদের মতো বানিয়ে দিয়ো না। আমি তাদের কারো মতো নই। যেহেতু তারা পার্থিব কারণে প্রভুত্ব বিস্তার ক'রে থাকে। আর আমি তো নবুঅত ও রিসালতের কারণে তোমাদের সম্মান লাভ ক'রে থাকি। অতএব তোমরা আমাকে 'নবী' ও 'রসূল' বলেই সম্বোধন করো। *(মাআলিমুস সুনান, খাত্ত্বাবী ৫/ ১৫৫)*

সাহাবাগণের উক্ত সম্বোধনে নবী ﷺ-এর প্রশংসায় অতিরঞ্জন ছিল। তাই তিনি সাথে সাথে তাঁদেরকে অনুরূপ প্রশংসা করতে নিষেধ করলেন এবং এ বিষয়েও সতর্ক করলেন যে, শয়তান হয়তো এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে মানুষের ঈমান নষ্ট করে ছাড়বে। ফলে তারা হয়তো মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসায় এমন নাম দিয়ে বসবে, যা একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য শোভনীয়। তাই তিনি সেই দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

এই চোরা দরজা বন্ধ করার লক্ষ্যে তিনি আরো বলেছেন,

«لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ».

"তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনে মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে 'আল্লাহর দাস' ও 'তাঁর রসূল'ই বলো।" *(বুখারী ৩৪৪৫, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৯৭ নং)*

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, উম্মাহর বহু মানুষ সে সতর্কবাণীকে উপেক্ষা ক'রে তাঁর প্রশংসায় বাড়াবাড়িই করেছে এবং তাতে তারা অনায়াসে ঐ খ্রিস্টানদেরই পথ অবলম্বন করেছে। তার ফলে মহানবী ﷺ-এর ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হয়ে গেছে। তিনি বলেছিলেন,

(لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ).

"অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি গো-সাপের (সান্ডা)র গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমরাও তা করবে!)"

সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াহুদ ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলছেন?' তিনি বললেন, "তবে আবার কার?" *(বুখারী ৭৩২০, মুসলিম ২৬৬৯, হাকেম, আহমাদ, সহীহুল জামে' ৫০৬৭ নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "পূর্ববর্তী জাতির সকল আচরণ এই উম্মত গ্রহণ করে নেবে।" *(সহীহুল জামে' ৭২১৯ নং)*

মীলাদীদের ইমাম বূস্বেরী বলেছেন,

دع ما ادعته النصارى في نبيهم ... واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم

فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف ... وانسب إلى قدره ما شئت من عظم

فإن فضل رسول الله ليس له ... حد فيعرب عنه ناطق بفم

অর্থাৎ, খ্রিস্টানরা তাদের নবীর প্রশংসায় যা বলেছিল, তুমি তা পরিহার কর। এ ছাড়া তাঁর প্রশংসায় তোমার যা ইচ্ছে হয়, তাই বল এবং তাতে অটল থাক!

তুমি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি তোমার ইচ্ছামতো মর্যাদা সম্পৃক্ত কর এবং তাঁর গৌরবে তোমার ইচ্ছামতো মহত্ত্ব আরোপ কর।

যেহেতু রাসূলুল্লাহর মাহাত্ম্যের কোন সীমা নেই, যা কোন বক্তা মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে পারে।

মীলাদীদের উদ্দেশ্য হল, খ্রিস্টানরা ঈসা ﷺ-কে নিয়ে কেবল একটি বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল। আর তা হল, তারা তাঁকে 'আল্লাহর পুত্র' বলেছিল। সুতরাং তুমি তোমার নবী ﷺ-কে 'আল্লাহর পুত্র' বলবে না। তাঁকে নবীই বলবে। এ ছাড়া প্রশংসায় অন্য রকম মাত্রা ছাড়িয়ে বাড়াবাড়ি তুমি ইচ্ছামতো করতে পার, নিজ মনোমতো সীমালংঘন ক'রে তাঁর যশকীর্তন করতে পার, যত পার, তত তাঁর গুণগান গাইতে পার! নবী ﷺ-কে 'আল্লাহর বেটা' বলো না। বাস্ এটাই নিষিদ্ধ। অন্য কিছু বলতে তোমার স্বাধীনতা আছে!

আমরা বলি, বাজে কথা এটা, ভুল বুঝ এটা। সত্য, বাস্তব ও শরীয়তে প্রমাণিত মর্যাদা, যশ ও গুণাবলী ছাড়া তাঁর শানে অন্য কিছু নিজের তরফ থেকে বানিয়ে বলা যাবে না। কারণ সীমাছাড়া ও বন্ধনহারা ঐ কীর্তনে এমন কীর্তি থাকতে পারে, যাতে শির্ক হয়ে যাবে এবং এমন গুণাবলী আরোপ হতে পারে, যার অধিকারী কেবল মহান আল্লাহই। অথবা এমন বর্ণনা আসতে পারে, যাতে মহান প্রতিপালকের সমকক্ষতা প্রকাশ পায়।

সুতরাং আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ইচ্ছামতো প্রশংসা করতে পারি না, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে ইচ্ছামতো আকীদা, বিশ্বাস ও ধারণা রাখতে পারি না। শরীয়তের লাগাম খুলে ফেলে বল্গাহীন কল্পনা-বিহার করতে পারি না।

উক্ত হাদীসের মানে এই নয় যে, খ্রিস্টানরা নবীকে আল্লাহর আরশ-সঙ্গী বলেনি, অতএব আমাদের বলা চলবে। খ্রিস্টানরা 'বিনা আয়নের আরব' ও 'বিনা মীমের আহমাদ'এর মতো কোন কথা বলেনি, অতএব আমাদের বলা চলবে। খ্রিস্টানরা তাদের নবীকে 'বিপত্তারণ'

বলেনি, অতএব আমাদের বলা চলবে।

মোটেই না। হাদীসে বর্ণিত 'ইত্বরা' মানেই হল কারো প্রশংসায় সীমালংঘন করা। আর 'সীমা' হল শরীয়ত। শরীয়তের প্রতিকূল কিছু বলে প্রশংসা করাই হল 'ইত্বরা' বা সীমাছাড়া প্রশংসা।

কবি বূস্বেরী, যাঁকে মুসলিমদের একটি বৃহৎ সংখ্যক গোষ্ঠী সীমাহীন শ্রদ্ধা করে 'ইমাম' মনে করে এবং মহানবী ﷺ-এর প্রশংসায় অতিরঞ্জন ক'রে তাঁর লিখিত 'বুর্দাহ' নামক কবিতাগুচ্ছ নিয়ে সুর ভাঁজে, তা স্পর্শ ও পাঠ করে বর্কত ও সওয়াবের আশা করে, মীলাদের মহফিল ও জালসা-জলুসে আবেগাপ্লুত হয়ে আবৃত্তি করে, এ কাজকে তারা আল্লাহর নৈকট্যদাতা ধারণা করে এবং নবী-প্রীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় মনে করে, সেই কবির ধারণা হল, মহানবী ﷺ-কে 'আল্লাহর সন্তান' না বলে ইচ্ছামতো অন্য কিছু বলে তাঁর অতি প্রশংসা করা যায়, যদিও তার কোন প্রমাণ শরীয়তে না থাকে অথবা তার দলীল দুর্বল, নকল বা জাল হয়। অথচ এমন ধারণা স্পষ্ট ভ্রষ্টতা এবং উক্ত হাদীস বিরোধী।

উক্ত হাদীসে সাধারণভাবে প্রশংসায় অতিরঞ্জন করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর অতিরঞ্জনের চরম সীমা হল সৃষ্টিকে স্রষ্টা বা স্রষ্টার কোন অংশ স্থির করা।

মহানবী ﷺ তাঁর প্রশংসার সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা আমাকে 'আল্লাহর দাস' ও 'তাঁর রসূল'ই বলো।"

নিশ্চয় তা সুউচ্চ প্রশংসা, যে প্রশংসা স্বয়ং প্রতিপালক করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে 'রসূল' ও 'দাস' বলেছেন। তার পরেও কি এমন কোন প্রশংসা থাকতে পারে, যা শরীয়তের অনুকূল নয়? তার পরেও কি এমন প্রশংসা করা বৈধ হতে পারে, যে প্রশংসার অধিকারী কেবল মহান আল্লাহ?

যেমন তাঁকে 'বিপত্তারণ' বা 'বিপদে আশ্রয়স্থল' ধারণা করা কি আল্লাহর আসনে বসিয়ে দেওয়া নয়?

মীলাদীদের ইমাম বূস্বেরী বলেছেন, যা তারা তাদের মীলাদ অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করে থাকে,

يا أكرَمَ الخلقِ ما لي مَن ألوذُ به ... سِوَاكَ عِندَ حُلول الحادِثِ العَمِمِ

ولَن يَضِيقَ رسولَ اللّهِ جاهُكَ بي ... إذا الكريمُ تَجَلَّى باسمِ مُنتَقِمِ

فإن من جودك الدنيا وضرتها .... ومن علومك علوم اللوح والقلم

'হে সৃষ্টি-সেরা সম্মানিত! সর্বব্যাপী বিপদ গ্রাস করার সময় আপনি ছাড়া আমার এমন কেউ নেই, যার কাছে আশ্রয় নিতে পারি।

হে আল্লাহর রসূল! আমার ব্যাপারে আপনার মহিমা কখনই সংকীর্ণ হবে না। যখন মহানুভব প্রতিশোধগ্রহণকারীরূপে প্রকাশ পাবেন।

পৃথিবী ও তার অফুরন্ত সম্পদ (বা দুনিয়া ও আখেরাত) আপনার বদান্যতারই অংশ,

লওহে মাহফূয ও কলমের ইলমও আপনার অগাধ ইলমের অন্তর্ভুক্ত!!'

প্রিয় পাঠক! কবি বলেছেন, 'সর্বব্যাপী বিপদ গ্রাস করার সময় আপনি ছাড়া আমার এমন কেউ নেই, যার কাছে আশ্রয় নিতে পারি।' তাহলে মহান আল্লাহ কোথায়? মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কেই বলেছেন,

{قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (٢١) قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ

مُلْتَحَدًا} (٢٢) سورة الجن

অর্থাৎ, বল, 'আমি তোমাদের অপকার অথবা উপকার কিছুরই মালিক নই।' বল, 'আল্লাহর (শাস্তি) হতে কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থলও পাব না। *(জ্বিন ঃ ২১-২২)*

{وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ} (١٧)

অর্থাৎ, আর যদি আল্লাহ তোমাকে ক্লেশদান করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত আর কেউ তার মোচনকারী নেই। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ করেন, তাহলে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। *(আনআম ঃ ১৭)*

মহান আল্লাহই আর্তের আহবানে সাড়া দেন। তিনি বলেছেন,

{أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} (٦٢) سورة النمل

অর্থাৎ, অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক। *(নাম্ল ঃ ৬২)*

কবি আবেগ বশে মহান আল্লাহকে ছেড়ে মহানবী ﷺ-কে আহবান করেছেন। অথচ তিনি এ জগতে আমাদের মাঝে নেই। আর এটা নিশ্চয় ভ্রষ্টতার পরিচয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ}

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে অবহিতও নয়। *(আহক্বাফ ঃ ৫)*

যদি উক্ত কবিতাছত্রের ব্যাখ্যা কিয়ামতে সুপারিশ চাওয়াও করা হয়, তবুও সরাসরি মহানবী ﷺ-এর কাছে সুপারিশ চাওয়া বৈধ নয়। যেহেতু তা আল্লাহর হাতে আছে এবং তা চাইতে হবে তাঁরই কাছে। পরন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর নিকট কোন কিছু চাওয়া বৈধ নয়। সে চাওয়ার আবেদন তিনি দুনিয়াতে শুনতে পান না এবং মহান আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কিয়ামতে তা দান করতেও পারেন না।

অন্য এক কবি বলেছেন,

شفاعته ترجى لدى كل غمة .... وكرب وهول واقتحام الغوائل

অর্থাৎ, তাঁর সুপারিশ আশা করা যায় প্রত্যেক মসীবত, বিপদাপদ, ভয়-ভীতি ও সংকট প্রবেশের সময়। *(মওলানা আযীযুল হক সাহেবের বাংলা বোখারী শরীফ ৫ম খন্ডের ভূমিকার ৩পৃঃ)*

এখানে কিন্তু কিয়ামতের কথা নেই। বরং বলা হয়েছে প্রত্যেক বিপদাপদের সময় তাঁর সুপারিশ আশা করা যায়!

কবি বূস্বেরী বলেছেন, 'পৃথিবী ও তার অফুরন্ত সম্পদ (বা দুনিয়া ও আখেরাত) আপনার বদান্যতারই অংশ!' অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء لاَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ

ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} (١٦) سورة الرعد

অর্থাৎ, বল, 'কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক?' বল, 'তিনি আল্লাহ।' বল, 'তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে, যারা নিজেদের লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়?' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? অথবা তারা কি আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করেছে যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যার কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে তালগোল খেয়ে গেছে?' বল, 'আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী।' *(রা'দঃ ১৬)*

{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ} (٢٢) سورة سبأ

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা তাদেরকে আহবান কর, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা (যাদেরকে উপাস্য) মনে কর। ওরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতে ওদের কোন অংশও নেই এবং ওদের কেউ আল্লাহর কাজে সাহায্যকারীও নয়।' *(সাবা'ঃ ২২)*

কবি বলেছেন, 'লওহে মাহফূয ও কলমের ইলমও আপনার অগাধ ইলমের অন্তর্ভুক্ত!!'

সেই লওহে মাহফূয, যাতে লিপিবদ্ধ আছে সারা সৃষ্টির ভাগ্যলিপি। যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বিশ্ব-রচনার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে। যাতে আছে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের নাম।

যে কিতাব সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} (٧٥) سورة النمل

অর্থাৎ, আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই। *(নামলঃ ৭৫)*

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} (٣) سورة سبأ

অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা কিয়ামতের সম্মুখীন হব না।' বল, 'অবশ্যই তোমাদেরকে তার সম্মুখীন হতেই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ; যিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তার থেকে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু তাঁর অগোচর নয়; ওর প্রত্যেকটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। *(সাবা'ঃ ৩)*

তাতে আছে বহু গায়বী বিষয়। যা মহানবী ﷺ জানতেন না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} (٤٩) سورة هود

অর্থাৎ, এটা হচ্ছে অদৃশ্য সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার কাছে অহী (প্রত্যাদেশ) মারফত পৌছিয়ে দিচ্ছি, ইতিপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার সম্প্রদায় জানত। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম সংযমশীলদের জন্যই। *(হূদঃ ৪৯)*

তাতে আছে কিয়ামত কখন ঘটবে। অথচ কিয়ামতের ইল্‌ম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও

নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} (١٨٧) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামত কখন ঘটবে?' বল, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকের নিকটেই আছে। কেবল তিনিই যথাকালে তা প্রকাশ করবেন। তা হবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের নিকট আসবে। তুমি এ বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করেই তারা তোমাকে প্রশ্ন করে। তুমি বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকটেই আছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' *(আ'রাফ ঃ ১৮৭)*

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (٤٢) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (٤٣) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا} (٤٤)

অর্থাৎ, তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তা কখন সংঘটিত হবে? এ ব্যাপারে তোমার কী বলার আছে? এর চূড়ান্ত জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকটেই। *(নাযিআত ঃ ৪২-৪৪)*

তাতে ছিল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (٥٢) سورة الشورى

অর্থাৎ, এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কী, ঈমান (বিশ্বাস) কী। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর। *(শূরা ঃ ৫২)*

সুতরাং কবির কল্পনা-বিহার যে ভ্রষ্ট পথে হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

মীলাদী কবি আরো লিখেছেন,

الأمان الأمان إن فؤادي .... من ذنوب أتيتهن هراء

هذه علتي وأنت طبيبي .... ليس يخفى عليك في القلب داء

অর্থাৎ, (হে আল্লাহর রসূল!) নিরাপত্তা নিরাপত্তা। নিশ্চয় আমার হৃদয় স্বকৃত পাপের জন্য বিকৃত হয়ে গেছে।

এ হল আমার রোগ, আর আপনি আমার ডাক্তার। আপনার কাছে হৃদয় মাঝের কোন রোগ গোপন নেই!

সুহৃদ পাঠক! বুঝতেই পারছেন, এটাই হল সেই অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি, যা মানুষকে শির্কে আপতিত করে। কবি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আকুতি জানাচ্ছেন। তাঁর কাছে আবেদন পেশ করছেন। অথচ তিনি আমাদের মাঝে নেই। অবশ্য কবির মতে তিনি 'হাযির-নাযির'। তিনি আমাদের পর্দার আড়ালে আছেন। তাই যত বিপত্তি।

অথচ এমন বুঝ সাহাবায়ে কিরাম ﵃-এর ছিল না। তাঁরা প্রিয় নবীর কবরের কাছাকাছি

থেকেও ‘হাযির-নাযির’ বা ‘পর্দার অন্তরালে’ ধারণা করতেন না। তাঁরা কোন বিপদ বা পাপ ঘটার সময় তাঁর নিকট আশ্রয় বা নিরাপত্তা চাইতেন না। যেহেতু তা হলে তো ‘তাওহীদ’ বরবাদ হয়ে যাবে।

কবি মহানবী ﷺ-এর কাছে পাপ অথবা তার শাস্তি থেকে নিরাপত্তা চেয়েছেন। অথচ আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ}

“যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?” *(আলে ইমরান ঃ ১৩৫)*

আর খোদ মহানবী ﷺ পাপমোচনের জন্য যে দুআ (সাইয়িদুল ইস্তিগফার) শিখিয়েছেন, তার অর্থ হল নিম্নরূপঃ-

“হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার দাস। আমি তোমার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি তার মন্দ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার উপর তোমার যে সম্পদ রয়েছে, তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও আমি স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মার্জনা করতে পারে না।” *(বুখারী ৬৩০৬নং)*

اَللّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْماً كَثِيْراً وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

“হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেহ গোনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয় তুমি মহা ক্ষমাশীল বড় দয়াবান।” *(বুখারী ৮৩৪, ৬৩২৬, মুসলিম ৭০৪৪নং)*

কবি নিজ হৃদরোগের অভিযোগ জানিয়েছেন পরলোকবাসী নবী ﷺ-এর কাছে! হার্দিক রোগের চিকিৎসা চেয়ে বলেছেন, ‘আপনার কাছে অন্তরের কোন রোগ গোপন নয়!’ তার মানে মহানবী ﷺ তার মনের খবর ও ব্যাধি কী, তা জানেন! অথচ এ বৈশিষ্ট্য কেবল মহান আল্লাহর। সুতরাং এ বিশ্বাসেও কবির তাওহীদ ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। যেহেতু মহান আল্লাহই একমাত্র অন্তর্যামী। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (٣٨) سورة فاطر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরে যা রয়েছে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। *(ফাত্বির ঃ ৩৮)*

{يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (٤)

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং আল্লাহ অন্তর্যামী। *(তাগাবুন ঃ ৪)*

পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ গায়ব তথা মনের খবর যে জানতেন না, সে সম্বন্ধে মহান আল্লাহ

বলেন,

{وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} (١٠١) سورة التوبة

অর্থাৎ, মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাদের মধ্য হতে কতিপয় এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক্ব রয়েছে; যারা মুনাফিক্বীতে অটল। তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব, অতঃপর (পরকালেও) তারা মহা শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। *(তাওবাহঃ ১০১)*

একদল লোক তাঁকে ভুল বুঝিয়ে এক ইয়াহুদীকে চোর বানাতে চেয়েছিল। তারা যে বিশ্বাসঘাতক তা তিনি জানতে না পেরে তাদের সপক্ষে কথা বলেছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে বললেন,

{وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا} (١٠٧) النساء

অর্থাৎ, তুমি তাদের পক্ষে কথা বলো না, যারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না। *(নিসাঃ ১০৭)*

আর মনের খবর জানতেন না, অহী না হলে জানতে পারেন না বলেই মহানবী ﷺ বলেছিলেন,

(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا).

"আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা (বিবাদ করে) ফায়সালার জন্য আমার নিকট আসো। হয়তো তোমাদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় অধিক বাক্‌পটু। আর আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি। সুতরাং আমি যদি কাউকে তার (মুসলিম) ভাইয়ের হক তার জন্য ফায়সালা করে দিই, তাহলে আসলে আমি তার জন্য আগুনের টুকরা কেটে দিই।" *(বুখারী ২৪৫৮, মুসলিম ৪৫৭২নং)*

বলা বাহুল্য, নবীর 'অন্তর্যামী' হওয়া নবুঅতের পরিপূরক কোন বিষয় নয়। বরং অন্তর্যামী হওয়া একমাত্র মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্যে যে তাঁকে শরীক করে, তার শির্ক ও সবচেয়ে বড় গোনাহ হয়।

আমাদের কবি নজরুলও এই শ্রেণীর শির্কী কবিতা রচে গেছেন।

আবহায়াতের পানি দাও, মরি পিপাসায়।
শরণ নিলাম নবিজির মোবারক পায়।
ভিখারীরে ফিরাবে কি শূন্য হাতে,
দয়ার সাগর তুমি যে মরু সাহারায়।। -*নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৫ নং*

*****

তোমায় পেলে পাব খোদায় ---
তাই শরণ যাচি তোমারি পায়। -*নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১০ নং*

বুঝতেই পারছেন, নবিজীর মোবারক পায়ের শরণ (আশ্রয়) নেওয়া এবং তাঁর কাছে ভিক্ষা চাওয়া দুটোই শির্ক।

তিনি দয়ার সাগর ছিলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর তাঁর নিকট দয়া ভিক্ষা করা যায়

না। এই শরণ ও দয়া ভিক্ষা একমাত্র করতে হবে আল্লাহর কাছে।

*****

'আমার ধ্যানের ছবি আমার হজরত
ও নাম প্রাণের মিটায় পিয়াসা
আমার তমন্না আমার আশা,
আমার গৌরব আমার ভরসা।' *-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৭ নং*

'ইয়া মুহাম্মাদ, বেহেশ্‌ত হতে
খোদায় পাওয়ার পথ দেখাও।
এই দুনিয়ার দুঃখ থেকে
এবার আমায় নাজাত দাও।' *-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৪১ নং*

এ কবি তো তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কেও পাপনাশিনী মনে করেন।

'খাতুনে জান্নাত ফাতেমা জননী
বিশ্ব-দুলালী নবী নন্দিনী।
মদীনা-বাসিনী পাপ-তাপ নাশিনী।
উম্মত তারিণী আনন্দিনী।' *-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৭৫ নং*

সুতরাং কবিদের অনুসরণ করে ভ্রষ্ট হওয়া থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। যেহেতু কেবল ভ্রষ্টরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে।

মহানবী ﷺ-এর প্রশংসায় অতিরঞ্জনকারী কবি বূস্বেরী আরো বলেছেন,

لو ناسَبَتْ قَدْرَهُ آياتُهُ عِظَمَاً ... أحيا اسمُهُ حين يُدعَى دارِسَ الرِّمَمِ

অর্থাৎ, যদি তাঁর অলৌকিক নিদর্শনাবলী মহত্ত্বে তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত হতো, তাহলে তাঁর নাম ডাকা হলে মাটিতে পরিণত হাড্ডিও জীবিত করে দিত!

পাঠক অনুমান করতে পারেন, কবিতার ছন্দে অতিরঞ্জিত প্রশংসার কথা। আমাদের জানা আছে যে, কুরআন কারীম তাঁর অলৌকিক নিদর্শনাবলীর অন্যতম। তাহলে কি তা তাঁর মর্যাদার মহত্ত্বের উপযুক্ত নয়? তাহলে কুরআনও কি তাঁর মর্যাদার কাছে ছোট?

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর 'ইসমে আ'যম' (মহোত্তম নাম) বা অন্য কোন সুন্দরতম নাম ডেকেও কি পচা-গলা হাড্ডিকে জীবিত করা যায়? তা না হলে নবীর নাম ডাকলে কীভাবে বিলীয়মান অস্থির মানুষ পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে?

মোটের উপর কথা হল, কবিদের কথায় কান দিয়ে আমাদের নবী ﷺ-কে নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি বাঞ্ছনীয় নয়, যা কখনো শির্ক হতে পারে। কখনো শির্ক না হলেও এমন অতিরঞ্জন হতে পারে, যা খোদ নবী ﷺ নিষেধ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর পানাহ।

তিনি কি সর্বপ্রথম সৃষ্টি

তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টিও নন। যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে যে, নূরে মুহাম্মাদীর সর্বপ্রথম সৃষ্টির কোন সহীহ দলীল নেই। কিন্তু হাদীসে যে আছে,

(كُنْت نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ المَاءِ وَالطِّين).

অর্থাৎ, আমি তখন থেকে নবী, যখন আদম তাঁর পানি ও মাটির মাঝে ছিলেন।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে।

আসলে তা ছিল আল্লাহর ফায়সালা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও আল্লাহর খলীল হবেন, তার সিদ্ধান্ত আগে থেকেই হয়ে ছিল। যেমন অন্যান্য সকল সিদ্ধান্ত বিশ্ব-রচনার ৫০ হাজার বছর পূর্ব থেকেই স্থির ছিল। এই জন্য উক্ত হাদীসের একটি শব্দে এসেছে,

(كُتِبْت وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ).

অর্থাৎ, আমি তখন থেকে নবী বলে লিখিত, যখন আদম তাঁর দেহ ও রূহের মাঝে ছিলেন। *(আহমাদ ২০৫৯৬, ত্বাবারানীর কাবীর ১২৫৭১, আওসাত্ব ৪১৭৫, সিঃ সহীহাহ ১৮৫৬নং)*

যেমন মি'রাজে নামায ৫০ অক্তের নামায ফরযের ব্যাপারে কোন কোন দুর্বল বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ যখন মূসা নবী ﷺ-এর পরামর্শে তা হাল্কা করতে চাইলেন, তখন মহান আল্লাহ বললেন, "আমি যেদিন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছি, সেদিনই তোমার ও তোমার উম্মতের উপর ৫০ অক্তের নামায ফরয করেছি-----।" *(নাসাঈ ৪৫০নং)*

সুতরাং আদম সৃষ্টির পূর্বেও সব কিছু স্থিরীকৃত ছিল এবং সব কিছু 'লাওহে-মাহফূয'-এ লিপিবদ্ধ ছিল। তখনও তিনি সর্বশেষ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলে লিপিবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাঁকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সৃজনের দিকে তিনি প্রথম এবং প্রেরণের দিকে তিনি শেষ নবী ছিলেন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি আল্লাহর দাস উম্মুল কিতাবে (লওহে মাহফূযে অঙ্কিত) ছিলাম সর্বশেষ নবীরূপে। আর আদম তখনও তাঁর কাদায় পতিত ছিলেন। *(আহমাদ ১৭১৬৩নং)*

এ হাদীসও প্রমাণ করে যে, তকদীর হিসাবে লওহে মাহফূযে লেখা হয়েছিল যে, তিনিই হবেন সর্বশেষ নবী। আর তার মানে এই নয় যে, তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টি।

আব্দুল ওয়াহেদ বিন সুলাইম বলেন, আমি মক্কা এলে আত্বা বিন রাবাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমি তাঁকে বললাম, 'হে আবূ মুহাম্মাদ! বসরাবাসীরা তকদীর অস্বীকার করে।'

তিনি বললেন, 'বেটা! তুমি কি কুরআন পড়?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তাহলে সূরা যুখরুফ পড়।'

আমি পড়তে শুরু করলাম,

{حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٣) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} (٤)

অর্থাৎ, হা-মীম। সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ। আমি এ অবতীর্ণ করেছি কুরআনরূপে আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার। নিশ্চয় এ আমার নিকট মূল গ্রন্থে (লাওহে মাহফূযে সুরক্ষিত) মহান, প্রজ্ঞাময়। *(যুখরুফ ঃ ১-৪)*

অতঃপর তিনি বললেন, 'তুমি কি জানো, 'উম্মুল কিতাব' (মূলগ্রন্থ লাওহে মাহফূয) কী?

আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশি জানেন।'

তিনি বললেন, 'এটি হল সেই কিতাব, যা আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির আগে রচনা করেছেন। আর তাতে আছে, ফিরআউন জাহান্নামী। তাতে আছে "ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজে।"

আত্বা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী উবাদাহ বিন স্বামেতের ছেলে অলীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মৃত্যুর সময় আপনার আব্বার অসিয়ত কী ছিল?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'আমাকে আমার আব্বা ডেকে বললেন, বেটা! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রেখো, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ভয় রাখতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতি এবং তকদীরের ভালো-মন্দ সব কিছুর প্রতি ঈমান এনেছ। এ ঈমান ছাড়া মারা গেলে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন, তা হল কলম। অতঃপর তাকে বলেন, 'লিখো'। কলম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কী লিখব?' তিনি বললেন, 'তকদীর এবং অনন্তকাল ধরে যা ঘটবে তা লিখো।' *(তিরমিযী ২ ১৫৫নং)*

সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ. قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ».

নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন, তা হল কলম। অতঃপর তাকে বলেন, 'লিখো'। কলম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কী লিখব?' তিনি বললেন, 'কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের (ঘটিতব্য) তকদীর লিখো।' *(আবূ দাউদ ৪৭০০, তিরমিযী ২ ১৫৫, সিঃ সহীহাহ ১৩৩নং)*

তাহলে সহীহ হাদীস মতে 'সর্বপ্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মাদী' নয় নিঃসন্দেহে।

অন্য একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ....).

"আল্লাহ ছিলেন, আর তিনি ছাড়া কেউ ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তিনি 'লাওহে-মাহফূয'-এ সব কিছু (ঘটিতব্য) লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেন।" *(বুখারী ৩ ১৯ ১, মিশকাত ৫৬৯৮-নং)*

সতর্কতার বিষয় যে, আহলুস সুন্নাহ অল-জামাআহ সহীহ হাদীস থেকে আক্বীদা গ্রহণ করে। কারণ যয়ীফ বা জাল হাদীস থেকে গ্রহণ করা আক্বীদা ভ্রান্ত হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমি আল্লাহর নিকট তাঁর লওহে মাহফূযে লিখিত তখনও সর্বশেষ নবী, যখন আদম কাদা অবস্থায় পড়ে ছিলেন। আর এর তাৎপর্য এই যে, (আমার নবুঅতের প্রথম বিকাশ ঘটে) আমার পিতা ইব্রাহীমের দুআ, ঈসার তাঁর কওমকে দেওয়া সুসংবাদ এবং আমার আম্মার দেখা সেই স্বপ্নের মাধ্যমে, যাতে তিনি তাঁর নিকট থেকে এমন জ্যোতি বের হতে দেখেন যা, শামদেশের অট্টালিকাসমূহকে আলোকিত করেছিল। *(আহমাদ ১৭১৬৩নং)*

এ হাদীসেও 'তিনি প্রথম সৃষ্টি'---এ কথা বলা হয়নি। আর এ দাবীও দলীলহীন যে, মহানবী ﷺ-এর মায়ের নিকট থেকে যে নূর বের হয়েছিল, তা ছিল 'নূরে মুহাম্মাদী'। কারণ তা ছিল স্বপ্ন, বাস্তব নয়।

মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ কথা সঠিক নয় যে, রাসূল আলাইহিস স্বালাতু অস-সালাম, তিনিই আল্লাহর সৃষ্টি প্রথম মানুষ। যেহেতু এ হল গায়বী বিষয়, যার ব্যাপারে ধারণা ক'রে কথা বলা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ

তাঁর কিতাবে বলেন,

{إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (٣٦) سورة يونس، سورة النجم ٢٨

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই বাস্তব ব্যাপারে ধারণা কোন কাজে আসে না। *(ইউনুসঃ ৩৬, নাজমঃ ২৮)*

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ».

অর্থাৎ, তোমরা ধারণা হতে দূরে থাকো, কারণ ধারণা হলো সবচেয়ে বেশি মিথ্যা কথা। *(বুখারী ৫১৪৩, মুসলিম ৬৭০১নং)*

সুতরাং যখন কোন মানুষ বলবে, আল্লাহ আযযা অজাল্ল সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন---মুহাম্মাদের ব্যক্তিত্ব বলব না, বরং যেমন ওরা ধারণা করে---মুহাম্মাদ ﷺ-এর নূর, তখন আমরা বলব, আল্লাহু তাবারাকা অতাআলা বলেছেন,

{مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا } (٥١)

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে (উপস্থিত) সাক্ষী রাখিনি এবং তাদের সৃজনকালেও নয়। আর আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে সহায়করূপে গ্রহণ করব। *(কাহফঃ ৫১)*

সুতরাং কোত্থেকে এ গায়বীভাবে ধারণাকারী জানতে পারল যে, আল্লাহ সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ আলাইহিস স্বালাতু অস-সালামের নূর সৃষ্টি করেছেন?

অবশ্য সে চট্ করে বলে বসবে যে, (জাবেরের হাদীস) "আওয়ালু মা খালাক্বাল্লাহু নূরা নাবিয়্যিকা ইয়া জাবের!"

আমরা বলব, হাদীসের প্রধান প্রধান ছয়টি প্রসিদ্ধ কিতাবে, আর না আহলুল হাদীসের নিকট পরিচিত সুনান গ্রন্থসমূহে, আর না তাছাড়া শত শত অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এ হাদীসের কোন ভিত্তি আছে। বলা বাহুল্য, সেই জাহেলদের মস্তিষ্ক ছাড়া এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই, যারা নবী ﷺ-এর হক ও বাতিল গুণকীর্তনকে নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছে, যার উপর নির্ভর করে তারা জীবনধারণ করছে। *(দুরুসুশ শায়খ আলবানী ৪/৩)*

বিশ্ব-রচনার আদি কারণ

মহান আল্লাহ মুখাপেক্ষাহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ বাদশা। তিনি নিজের ইবাদতের জন্য বিশ্ব-রচনা করেছেন, জ্বিন-ইনসান সৃষ্টি করেছেন, রসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٥٦) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। *(যারিয়াত ঃ ৫৬)*

তিনি রসূল প্রেরণের কারণ বর্ণনা করে বলেছেন,

{رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}

অর্থাৎ, আমি সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রসূল প্রেরণ করেছি; যাতে রসূল (আসার) পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী,

মহাজ্ঞানী। *(নিসা ঃ ১৬৫)*

নবুঅত অথবা সুসংবাদ দান ও ভীতি-প্রদর্শনের ধারাকে এই জন্যেই অব্যাহত রেখেছেন, যাতে শেষ বিচারের দিনে কেউ এ ওজর পেশ করতে না পারে যে, আমাদের নিকট তোমার কোন বার্তা পৌঁছেনি। যেমন অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى} (١٣٤) سورة طـه

অর্থাৎ, যদি আমি ওদেরকে তার পূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে ওরা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বেই তোমার নিদর্শন মেনে নিতাম। *(ত্বা-হাঃ ১৩৪)*

রসূল প্রেরণের কারণ বর্ণনা করে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ} (٢١٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, মানুষ (আদিতে) একই জাতিভুক্ত ছিল। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করে।) অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। *(বাক্বারাহ ঃ ২১৩)*

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} (٢٥) الحديد

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও তুলাদন্ড (ন্যায়-নীতি); যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। *(হাদীদ ঃ ২৫)*

কিন্তু কুরআনী বয়ানের বিপরীত বর্ণনা দিয়ে থাকে অতিরঞ্জনকারী হাদীস-নির্মাতারা। তারা বলে,

'ফুল বাগানে ফুটল নবীন ফুল।
সে ফুল যদি না ফুটিত কিছুই পয়দা না হইত,
না করিত আরশ-কুর্সী জলীল রব্বুল।
ফুল বাগানে ফুটল নবীন ফুল।'

তারা বলে, 'শুধুমাত্র বরের জন্য যেমন বিয়ে-বাড়ির সমস্ত আয়োজন, তেমনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য এ বিশ্বের সকল আয়োজন।'

তারা হাদীস বর্ণনা করে,

لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاَكَ.

অর্থাৎ, যদি তুমি না হতে, আমি আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।

অথচ এ মর্মে কোন হাদীস সহীহ নয়। *(মাউযূআত ৭৮নং, সিঃ যয়ীফাহ ২৮২নং, মুরশিদুল হায়ের ১০পৃঃ)*

এই জাল হাদীস এবং নূরে মুহাম্মাদীর জাল হাদীসের ভিত্তিতে মীলাদীরা বলে থাকে, তাঁর এক লকব 'মুহয়ী' হায়াত দানকারী। কারণ তাঁরই জন্য সারা জগৎ সৃষ্টি। তিনি সকল রূহের

প্রতিপালনকারী। তিনি হলেন আদেশের আদি কারণ আর সব হল ফল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বসৃষ্টির রূহ---মূল। তিনি রূহ ও হায়াতের অস্তিত্বের রহস্য। যদি তিনি না হতেন, তাহলে সৃষ্টিজগৎ নিস্তনাবুদ ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। হায়াত না থাকলে দেহ যেমন অসাড় হয়ে যায়, তেমনি তাঁর নূরের প্রবাহ না থাকলে সমগ্র সৃষ্টি অসাড় হয়ে যেত। *(নূরে মুজাস্সাম ১৩৯পৃঃ)*

প্রিয় পাঠক! বুঝতেই পারছেন, এমন আকীদা স্পষ্টতঃ কুরআন-বিরোধী। সুতরাং পাকা দলীল ছাড়া এমন অতিরঞ্জিত আকীদা রাখা ঈমানের জন্য বিশাল মারাত্মক।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী ﷺ-কে বলেছেন,

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}

অর্থাৎ, বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূল নিরক্ষর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা পথ পাও।' *(আ'রাফ ঃ ১৫৮)*

তিনি কি নূরী?

তিনি কি নূরী, নাকি বাশারী? অনেকে বলেন, 'তিনি নূরী-বাশারী।' মীলাদী কিতাবের কেস্সা হল,

'শরফুল আনানেতে লেখে এ কালাম,
কহিলেন রসূলুল্লাহ আলায় হেচ্ছালাম।
ছিনু আমি এক নূর আল্লাহর কাছেতে,
আদমের দু হাজার বছর পূর্বেতে।
পড়িত সেই নূর তছবিহ এলাহীর,
ফেরেশ্তারা তব সাথে করিত যিকির।
তারপর আল্লাহ তাআলা আদমে সৃজিয়া,
সে নূর দিল তাঁর সাথে মিশাইয়া।
আদমের পিঠে চড়ি বেহেশ্ত হইতে,
দুনিয়ায় আসিয়াছি খোদার কুদরতে।
নূহের পিঠে চড়ি নৌকায় উঠিনু,
খলীলের পিঠে চড়ি আগুনে পড়িনু।
করেছেন সদা আল্লা নকল আমারে,
পাক পিঠে পাক পেটে ইজ্জত খখরে।
অবশেষে নেকালিলা মা-বাপ হইতে,

হারামী গোলমি কভু পড়ে নেই তাতে।'

তাঁদের দলীল, কিছু জাল হাদীস ও কিছু সূফী মীলাদী কিতাবের উদ্ধৃতি।

হাদীসে বলা হয়েছে, নবী ﷺ নাকি বলেছেন,

أول ما خلق الله نوري، ومن نوري خلق كل شيء.

অর্থাৎ, আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন, তা আমার নূর। আর আমার নূর হতে সৃষ্ট হয়েছে প্রতিটি বস্তু।

হাদীসের কোন্ কিতাবে আছে? হাদীসের কোন কিতাবে নেই। 'মাত্বালিউল মুসাররাত' (নাকি মাসার্রাত) কিতাবে আছে।

অনুরূপ জাবের থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ নাকি তাঁকে বলেছেন,

أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر!

অর্থাৎ, আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন, তা তোমার নবীর নূর হে জাবের! *(আব্দুর রায্যাক)*

কিন্তু এ হাদীস মুহাদ্দিস আব্দুর রায্যাকের কোন্ কিতাবে আছে?

ওদের উত্তর ঃ "পূর্ণ হাদীসটি ইমাম আব্দুর রায্যাকের 'মুসান্নাফ'-এ বর্তমান। বিন-হুমাম আবূ বকর আব্দুর রাযাযাক ইবন-হুমাম হলেন হাদীসের হাফেয। তিনি ইমাম মালেকের শাগরিদ এবং ইমাম আহমদ-ইবন-হাম্বলের উস্তাদ এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিমের দাদা উস্তাদ। তিনি স্বলিখিত কিতাব 'মুসান্নাফ'-এ উক্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।" *(নূরে মুজাস্সাম ২২৩পৃঃ)*

"এবং পরবর্তীর ৮ জন ইমাম (?) তাঁদের কিতাবসমূহে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

বাস্! তাহলেই তো চোখ বন্ধ ক'রে বলা যায় যে, ঐ হাদীস 'সাহীহ'। কিন্তু হাদীস গ্রহণ-বর্জনের নীতি তো তা নয়।

হাদীসের সনদ বা সূত্র সহীহ হলে হাদীস সহীহ, নচেৎ না।

দ্বিতীয়তঃ আব্দুর রায্যাকের মুস্বান্নাফ, জামে' বা তফসীরের কোন কিতাবে এ হাদীসের উল্লেখ নেই। সুতরাং এটা মিথ্যা কথা ও মেকির হাওয়ালা।

হাফেয সুয়ূত্বী 'হাবী'তে বলেন, "এ হাদীসের কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই।"

বাইহাকীর 'দালায়িলুন নুবুউয়াহ'তেও এ হাদীস নেই।

বলা বাহুল্য, এটি তৈরি-করা মনগড়া মিথ্যা জাল হাদীস।

ইবনে আব্বাস নাকি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা যখন মাখলুকাতের সৃজন, যমীনকে নিম্নে স্থাপন ও আসমানসমূহকে ঊর্ধ্বে স্থাপনের ইচ্ছা করলেন তিনি নিজ নূর হতে এক মুষ্টি নূর গ্রহণ করলেন। অনন্তর তিনি ঐ মুষ্টি নূরকে বললেন ঃ তুমি আমার হাবীব মুহাম্মদ হয়ে যাও। অতঃপর সে নূর-ই-মুহাম্মদ আদম সৃষ্টির পাঁচশ বছর পূর্বে আরশ তাওয়াফ করেছিল। তাওয়াফকালে তা বলছিল---আল-হামদুলিল্লাহ্। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ এ হেতু আমি তোমার নামকরণ করলাম---মুহাম্মদ।' *(নুযহাতুল মাজালিস ২/৩২৬)*

এ কথাও মীলাদীদের গপ্প বৈ কিচ্ছু নয়। কোন হাদীস গ্রন্থে এ কথার অস্তিত্ব নেই।

(১) তবুও দাবী, 'এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, তাঁর নূর সৃষ্টির পূর্বে কোন সৃষ্টিই সৃষ্ট হয়নি, আসমানও না, যমীনও না।' *(নূরে মুজাস্সাম ১৪৩পৃঃ)*

আমরা বলি, 'আগে দেখি চেয়ার গড়, তারপরে তার নক্শা কর।' 'নূর-এ-মুহাম্মাদী'র অস্তিত্ব আগে প্রমাণ হবে, তারপর না তার আগে পরে কিছু সৃষ্টি হয়েছে কি না, তা নিয়ে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে?

(২) নবী ﷺ-কে 'নূরী' ধারণা করে 'দরূদে নূরী' তৈরী করা হয়েছে,

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ তুমি সালাত (খাস রহমত), সালাম ও বরকত বর্ষণ কর সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর যিনি হলেন যাতী নূর ঐবং ঐ রহস্য যা পবিত্রপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছে, আল্লাহ তাআলার সমূদয় নাম ও গুণাবলীতে।

তাদেরই 'ইমাম আহমাদ সাবী বলেছেন, এই দরূদের পথ হলো সালাত-ই-নূরী। এর প্রবর্তক হলেন (সূফী) ইমাম আবুল হাসান শাখেলী (র)।' *(নূরে মুজাস্‌সাম ১১৫পৃঃ)*

বুঝতেই পারছেন, এটাও উনাদের মনগড়া দরূদ। এই বিদাআতী দরূদ দিয়ে প্রমাণ করা যায় না যে, মহানবী ﷺ আল্লাহর যাতী নূর থেকে সৃষ্টি।

(৩) তিনি যখন ইসরাতে গেলেন, তখন বুরাকের পিঠে চড়ে বায়তুল মাকদিস গিয়েছিলেন। আর বুরাক ছিল গাধা অপেক্ষা বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট এক পশু। যার একটি পদক্ষেপ তার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে পড়ে। তা আসলে 'বার্ক' বিজলী বা বিদ্যুতের মতো বস্তু। 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নূরানী না হলে তিনি বোরাক স্পর্শে অস্তিত্বহীন হয়ে যেতেন।' *(নূরে মুজাস্‌সাম ১৭৪ পৃঃ)*

(৪) আর এক প্রমাণ হলো মি'রাজে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সিদরাতুল মুন্‌তাহা হতে উর্ধ্বলোকে চললেন তখন জিবরাঈল (আ) পশ্চাতে রয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলে জিব্রাঈল (আ) বললেন- لو دنوت أنملة لاحترقت

যদি আমি অঙ্গুলির অগ্রভাগও অগ্রসর হই, আমি আল্লাহর তাজাল্লীতে জ্বলে যাব। শেখ সাদীও কবিতায় সে কথা বলেছেন। (নূরে মুজাস্‌সাম ১১৭পৃঃ)

অথচ মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর একান্ত নিকটবর্তী হলেন। তিনি স্বচক্ষে তাঁকে দর্শন করলেন। তিনি জ্বললেন না। জিবরীল ফিরিশ্‌তাও নূর থেকে সৃষ্টি, কিন্তু তাঁর নূর সিফাতী। আর মহানবী ﷺ-এর নূর নাকি যাতী।

আল্লাহর নূরের তাজাল্লীর সামনে মূসা নবী ﷺ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} (١٤٣) سورة الأعراف

অর্থাৎ, মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখবে।' সুতরাং যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, তখন বলল, 'মহিমময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।' *(আ'রাফ ঃ ১৪৩)*

হাদীসে আছে,

(حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ).

অর্থাৎ, তাঁর পর্দা (অন্তরাল) হল নূর (জ্যোতি)। যে পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর আনন-দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টিকুলকে দগ্ধীভূত ক'রে ফেলবে। *(মুসলিম ৪৬৩নং)*

আমরা বলি,

(ক) 'যদি আমি অঙ্গুলির অগ্রভাগও অগ্রসর হই, আমি আল্লাহর তাজাল্লীতে জ্বলে যাব।' জিব্রাঈল ﷺ-এর কথা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়।

(খ) বুরাকের দেহে বিদ্যুৎ ছিল, তাও প্রমাণিত নয়।

(গ) ইব্রাহীম নবী ﷺ আগুনে জ্বলেননি, অথচ তিনি আগুনের সৃষ্টি ছিলেন না। ঈসা ﷺ জীবিত আছেন আসমানে, মহাশূন্যে অক্সিজেন নেই। তবুও নবীর কিছু হয়নি।

মহান আল্লাহ বলেন,

{فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ} (١٢٥) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করলে, তিনি তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত ক'রে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করার ইচ্ছা করলে, তিনি তাঁর হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ ক'রে দেন; তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদের উপর এরূপে অপবিত্রতা (শয়তান অথবা আযাব) নির্ধারিত করেন। *(আন্আম ঃ ১২৫)*

এ সব মহান সৃষ্টিকর্তার অসীম কুদরত। এক রাতে মক্কা থেকে জেরুজালেম এবং সেখান থেকে জান্নাত-জাহান্নাম ও সিদরাতুল মুন্তাহা দর্শন করেছেন আমাদের মহানবী ﷺ। নূরের সৃষ্টি না হলেও আল্লাহর কুদরতে তাঁর নবী ﷺ জ্বলেননি।

(ঘ) সঠিক কথা এই যে, মি'রাজের রাত্রে মহানবী ﷺ মহান আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেননি। তিনি নূরের পর্দার অন্তরাল থেকেই তাঁর সাথে কথা বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} (٥١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা কোন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে; আর তখন আল্লাহ যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে অহী (প্রত্যাদেশ) করেন; নিঃসন্দেহে তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। *(শূরা ঃ ৫১)*

(৫) বিশ্ব সৃষ্টির আদি উৎস হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নূর। ঐ নূরের অভিব্যক্তি হলো বিশ্ব-মন্ডল। আল্লাহ তাআলার উক্তি এই ঃ

{إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (٥٤) سورة الأعراف

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; ওদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশদান তাঁরই কাজ। তিনি মহিমময় বিশ্ব প্রতিপালক। *(আ'রাফ ঃ ৫৪) (নূরে মুজাস্সাম ১৭১পৃঃ)*

উদার মনের পাঠক হয়তো ধারণা করবেন, এই আয়াতেও বুঝি উক্ত দাবীর দলীল আছে। কিন্তু ভালোভাবে অনুবাদ পড়ে দেখুন, তাতে ঐ উদ্ভট দাবীর কোন দলীল আছে কি না।

আমরা বারবার একই কথা বলি, 'আগে দেখি চেয়ার গড়, তারপরে তার নক্শা কর।' আগে 'নূরে মুহাম্মাদী' প্রমাণ কর, তাপর তা হতে বিশ্ব ও তার নানা শ্রেণীর ব্যক্তি ও বস্তুর সৃষ্টি প্রমাণ কর।

সে নূর আল্লাহর যাতী হোক, তাঁর চেহারার হোক, তাঁর জামালের হোক, তাঁর ইল্ম বা রহমতের হোক অথবা ভিন্ন সৃষ্টি হোক, অরূপ হোক বা সরূপ হোক, তিনি যে নূর থেকে সৃষ্টি তার বিশুদ্ধ প্রমাণ কৈ? সূফী আবদুল গনী নাবলুসী দাবী করলেই কি 'সহীহ' বলে মেনে নেবেন মুহাদ্দিসীনগণ?

বলাই বাহুল্য যে, নূরে মুহাম্মাদীর সকল হাদীস ঠাঁই পেয়েছে জাল হাদীসের গ্রন্থসমূহে। অনুরূপ দাকায়েকুল আখবারের খবরও গাঁজারে গল্প। তাতে বর্ণিত বহু কথা কোন তওহীদবাদী মুসলিম বিশ্বাস করতে পারে না। আর এ কথাও বিদিতব্য যে, বিদাতীদের অধিকাংশ কথা দুর্বল ও জাল হাদীস-ভিত্তিক। তা না হলে তারা 'বিদাতী' হবে কেন?

(৬) ওঁরা বলেন, নবী যে নূর, সে কথা কুরআনে আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ} (١٥) سورة المائدة انظر ص ٢٣٠

"অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে নূর (জ্যোতি) ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে।" *(মায়িদাহ ঃ ১৫)*

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا} (١٧٤) النساء

হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসে পৌঁছেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট নূর (জ্যোতি) অবতীর্ণ করেছি। *(নিসা ঃ ১৭৪)*

উক্ত আয়াতে 'নূর' বলতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে 'অবতীর্ণ করা' সেই কথারই তাকীদ করে। যেহেতু নবী পাঠানো হয়েছে, অবতীর্ণ করা হয়নি। কুরআনই অবতীর্ণ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে 'নূর' মানে 'নবী' করলেও, এ থেকে প্রমাণ হয় না যে, নবী নূর থেকে সৃষ্ট। কারণ সে নূর রূপক অর্থের তাঁর নবুঅতের নূর হতে পারে। যেমন জ্ঞানের নূর, যা দৃশ্যমান নয়।

পরন্তু এ আলো, জ্যোতি বা নূর থেকে উদ্দেশ্য আল-কুরআন। উদ্দেশ্য নবী ﷺ নয়। অন্য আয়াতে তার ব্যাখ্যা রয়েছে,

{فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (٨) سورة التغابن

"অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" *(তাগাবুন ঃ ৮)*

যদি এ সত্ত্বেও কেউ বলে, রসূলকেই জ্যোতি বুঝানো হয়েছে, তাহলে নিম্নের আয়াত

প্রনিধানযোগ্য,

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٥٧) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যারা নিরক্ষর রসূল ও নবীর অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জীল যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করে এবং যে তাদের ভার ও বন্ধন যা তাদের উপর ছিল (তা হতে) তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হবে সফলকাম। *(আ’রাফঃ ১৫৭)*

বলা বাহুল্য, কুরআন হল আধ্যাত্মিক নূর, যা আলোকরূপে দৃশ্যমান নয়। অনুরূপ নবী ﷺ-কে 'নূর' মানলেও আধ্যাত্মিক নূর। দৃশ্যমান নূর আদৌ নয় এবং তিনি নূর থেকে সৃষ্ট, তাও নয়। আর এতে তাঁর সম্মান বিন্দু পরিমাণ হ্রাস হয় না।

(৭) সৃষ্টির ইতিহাসে আমরা জানি, মহানবী ﷺ বলেছেন,

« خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ».

"ফিরিশ্তাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা হতে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই বস্তু থেকে, যা তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে। (অর্থাৎ, মাটি থেকে)।" *(মুসলিম ৭৬৮-৭নং)*

উক্ত হাদীসে স্পষ্ট হয়েছে যে, ফিরিশ্তাকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আদম বা তার কোন সন্তানকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়নি।

পক্ষান্তরে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ আদম-সন্তান ছিলেন। আমাদের মত রক্ত, মাংস ও অস্থির গড়া মানুষ ছিলেন। আমাদের মত পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল। আমাদের মত তিনি খেতেন, পান করতেন। সুস্থ-অসুস্থ থাকতেন। বিস্মৃত হতেন, স্মরণ করতেন। বিবাহ-শাদী করেছেন, তাঁর একাধিক স্ত্রী ছিল। তিনি সন্তানের জনক ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। দুঃখ-শোক, ব্যথা ও যন্ত্রণা অনুভব করতেন। তাঁর প্রস্রাব-পায়খানা হত এবং তা অপবিত্র ছিল। তাঁর নাপাকীর উযূ-গোসলের প্রয়োজন হত। *(তিরমিযী ২৪৯১নং)* জীবিত ছিলেন, ইন্তিকাল করেছেন। মানুষের সকল প্রকৃতি ও প্রয়োজন তাঁর মাঝে ছিল।

কুরআন বলে,

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (١١٠) سورة الكهف، فصلت ٦

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য।' *(কাহফঃ ১১০, হা-মীম সাজদাহঃ ৬)*

(৮) ওঁরা বলেন, তিনি 'বাশার' ও 'আদম-সন্তান' তা আমরাও মানি। কিন্তু আদমের জন্মের আগে তাঁর জন্ম। সুতরাং তিনি 'নূরী-বাশারী।' নূররূপে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়ে তিনি

আদমের মাঝে প্রক্ষিপ্ত হন। তারপর সজ্জনদের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে স্থানান্তরিত হতে হতে অবশেষে আব্দুল্লাহর ঔরষে তাঁর জন্ম হয়।

আমরা বলি, 'আগে দেখি চেয়ার গড়, তারপরে তার নক্শা কর।'

পূর্বেই বলা হয়েছে, 'নূরে মুহাম্মাদী'র কোন সহীহ প্রমাণ নেই। তারপর তার স্থানান্তরিত হওয়ার কথাও কল্পনাভিত্তিক। আর তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টিও নন।

কিন্তু হাদীসে যে আছে,

(كُنْت نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الَماءِ وَالطِّين).

অর্থাৎ, আমি তখন থেকে নবী, যখন আদম তাঁর পানি ও মাটির মাঝে ছিলেন।

এ শব্দে হাদীস যদিও মনগড়া, তবুও অন্য 'আদম তাঁর দেহ ও রূহের মাঝে ছিলেন' শব্দে সহীহ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে।

আসলে তা ছিল আল্লাহর ফায়সালা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও আল্লাহর খলীল হবেন, তার সিদ্ধান্ত আগে থেকেই হয়ে ছিল। যেমন অন্যান্য সকল সিদ্ধান্ত বিশ্ব-রচনার ৫০ হাজার বছর পূর্ব থেকেই স্থির ছিল। এই জন্য উক্ত হাদীসের একটি শব্দে এসেছে, সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কখন থেকে নবী বলে লিখিত?' উত্তরে তিনি বললেন,

(كُتِبْت نبياً) وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ.

অর্থাৎ, আমি তখন থেকে নবী বলে লিখিত, যখন আদম তাঁর দেহ ও রূহের মাঝে ছিলেন। *(আহমাদ ২০৫৯৬, ত্বাবারানীর কাবীর ১২৫৭১, আওসাত্ব ৪১৭৫, সিঃ সহীহাহ ১৮৫৬নং)*

যেমন মি'রাজে নামায ৫০ অক্তের নামায ফরযের ব্যাপারে কোন কোন দুর্বল বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ যখন মূসা নবী ﷺ-এর পরামর্শে তা হাল্কা করতে চাইলেন, তখন মহান আল্লাহ বললেন, "আমি যেদিন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছি, সেদিনই তোমার ও তোমার উম্মতের উপর ৫০ অক্তের নামায ফরয করেছি-----।" *(নাসাঈ ৪৫০নং)*

সুতরাং আদমের পূর্বেও সব কিছু স্থির ছিল এবং সব কিছু 'লাওহে-মাহফূয'-এ লিপিবদ্ধ ছিল। তখনও তিনি 'শেষনবী' ও 'শ্রেষ্ঠ নবী' বলে লিপিবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তাঁকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সৃজনের দিকে তিনি প্রথম এবং প্রেরণের দিকে তিনি শেষ নবী ছিলেন।

সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ. قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ».

নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেন, তা হল কলম। অতঃপর তাকে বলেন, 'লিখো'। কলম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কী লিখব?' তিনি বললেন, 'কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের (ঘটিতব্য) তকদীর লিখো।' *(আবূ দাঊদ ৪৭০০, তিরমিযী ২১৫৫, সিঃ সহীহাহ ১৩৩নং)*

তাহলে সহীহ হাদীস মতে 'সর্বপ্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মাদী' নয় নিঃসন্দেহে।

অন্য একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ....).

“আল্লাহ ছিলেন, আর তিনি ছাড়া কেউ ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। তিনি ‘লাওহে-মাহফূয’-এ সব কিছু (ঘটিতব্য) লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেন।” *(বুখারী ৩১৯১, মিশকাত ৫৬৯৮-নং)*

সতর্কতার বিষয় যে, আহলুস সুন্নাহ অল-জামাআহ সহীহ হাদীস থেকে আক্বীদা গ্রহণ করে। কারণ যয়ীফ বা জাল হাদীস থেকে গ্রহণ করা আক্বীদা ভ্রান্ত হয়।

(৯) মহানবী ﷺ বলেছেন, “আমি আল্লাহর নিকট তাঁর লওহে মাহফূযে লিখিত তখনও সর্বশেষ নবী, যখন আদম কাদা অবস্থায় পড়ে ছিলেন। আর এর তাৎপর্য এই যে, (আমার নবুঅতের প্রথম বিকাশ ঘটে) আমার পিতা ইব্রাহীমের দুআ, ঈসার তাঁর কওমকে দেওয়া সুসংবাদ এবং আমার আম্মার দেখা সেই স্বপ্নের মাধ্যমে, যাতে তিনি তাঁর নিকট থেকে এমন জ্যোতি বের হতে দেখেন যা, শামদেশের অট্টালিকাসমূহকে আলোকিত করেছিল। *(আহমাদ ১৭১৬৩নং)*

এ হাদীসেও ‘তিনি প্রথম সৃষ্টি’---এ কথা বলা হয়নি। আর এ দাবীও দলীলহীন যে, মহানবী ﷺ-এর মায়ের নিকট থেকে যে নূর বের হয়েছিল, তা ছিল ‘নূরে মুহাম্মাদী’। কারণ তা ছিল স্বপ্ন, বাস্তব নয়।

মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ কথা সঠিক নয় যে, রাসূল আলাইহিস স্বালাতু অস্-সালাম, তিনিই আল্লাহর সৃষ্টি প্রথম মানুষ। যেহেতু এ হল গায়বী বিষয়, যার ব্যাপারে ধারণা ক'রে কথা বলা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন,

{إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (٣٦) سورة يونس، سورة النجم ٢٨

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই বাস্তব ব্যাপারে ধারণা কোন কাজে আসে না। *(ইউনুসঃ ৩৬, নাজমঃ ২৮)*

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ».

অর্থাৎ, তোমরা ধারণা হতে দূরে থাকো, কারণ ধারণা হলো সবচেয়ে বেশি মিথ্যা কথা। *(বুখারী ৫১৪৩, মুসলিম ৬৭০১নং)*

সুতরাং যখন কোন মানুষ বলবে, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন---মুহাম্মাদের ব্যক্তিত্ব বলব না, বরং যেমন ওরা ধারণা করে---মুহাম্মাদ ﷺ-এর নূর, তখন আমরা বলব, আল্লাহু তাবারাকা অতাআলা বলেছেন,

{مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا } (٥١)

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে (উপস্থিত) সাক্ষী রাখিনি এবং তাদের সৃজনকালেও নয়। আর আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে সহায়করূপে গ্রহণ করব। *(কাহফঃ ৫১)*

সুতরাং কোত্থেকে এ গায়বীভাবে ধারণাকারী জানতে পারল যে, আল্লাহ সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ আলাইহিস স্বালাতু অস-সালামের নূর সৃষ্টি করেছেন?

অবশ্য সে চট্ করে বলে বসবে যে, (জাবেরের হাদীস) “আওয়ালু মা খালাক্বাল্লাহু নূরা নাবিয়্যিকা ইয়া জাবের!”

আমরা বলব, হাদীসের প্রধান প্রধান ছয়টি প্রসিদ্ধ কিতাবে, আর না আহলুল হাদীসের নিকট পরিচিত সুনান গ্রন্থসমূহে, আর না তাছাড়া শত শত অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই। বলা বাহুল্য, সেই জাহেলদের মস্তিষ্ক ছাড়া এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই, যারা নবী ﷺ-এর হক ও বাতিল গুণকীর্তনকে নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছে, যার উপর নির্ভর করে তারা জীবনধারণ করছে।

পক্ষান্তরে বহু উলামার নিকট সহীহ হাদীস দ্বারা কোন আকীদা প্রমাণ করা বৈধ নয়। বরং তাঁরা শর্তারোপ করেন যে, আকীদা প্রমাণ করতে হাদীসকে 'মুতাওয়াতির' হতে হবে। হাদীস কেবল 'সহীহ' হলেই হবে না; যদিও তার দুই বা তিনটি সূত্র থাকে। জরুরী হল, সে হাদীস যেন বিশটি সূত্রে অর্থাৎ, বিশজন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়ে থাকে। তবেই সেই হাদীস দ্বারা আকীদা প্রমাণ হবে।

আমরা যদিও এ রায় সমর্থন করি না। যেহেতু রসূল ﷺ থেকে আকীদা-আহকাম যাই এসেছে, আমরা তাতে কোন পার্থক্য করি না। কারণ উভয়েরই অনুসরণ করা এবং তার নিকট আত্মসমর্পণ করা ওয়াজেব। তবুও আমরা উল্লেখ করছি যে, বহু উলামা সেই হাদীসে 'মুতাওয়াতির' হওয়ার শর্তারোপ করেছেন, যে হাদীস দ্বারা আকীদা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য হয়। তাঁরা এ শর্ত এ আগ্রহেই আরোপ করেছেন, যাতে মুসলিম এমন আকীদা পোষণ না করে বসে, যাতে হয়তো কোন বর্ণনাকারীর স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও আফসোসের বিষয় যে, বর্তমানের অধিকাংশ মানুষ সেই সব আকীদায় বিশ্বাসী, যার ভিত্তি হল যয়ীফ হাদীস, বরং জাল হাদীস। যেমন এই হাদীস, "আওয়ালু মা খালাক্বাল্লাহু নূরা নাবিয়্যিকা ইয়া জাবের!"

এই জন্য মুসলিমের জন্য (সর্বপ্রথম সৃষ্টি নবীর নূর) এমন আকীদা পোষণ করা বৈধ নয়। যেহেতু তা কোন একটাও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। *(দুরুসুশ শায়খ আলবানী ৪/৩)*

বলা বাহুল্য, এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, যাতে মনে করা হয়,

'আমার মুর্শিদেরি নূরের ধারায়,
কুল্ মাখলুকাত সৃষ্টি হল-
আরশ-কুসী, লাওহ ও কলম
তাঁরই নূরে সৃষ্টি হল।---'

'ছিল নবীর নুর পেশানীতে, তাই ডুবল না কিশ্‌তী নুহের
পুড়ল না আগুনে হজরত ইবরাহীম সে নমরুদের,
বাঁচল ইউনোস মাছের পেটে স্মরণ ক'রে নবীর পদ,
দোজখ আমার হারাম হল
পিয়ে কোরানের শিরীন্ শহদ।।'

তিনি কি আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ছিলেন?

বিশ্বনবী মুহাম্মাদর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মতো রক্ত, চর্ম, মাংস ও অস্থির গড়া মানুষ ছিলেন। আমাদের মতো পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল। আমাদের মতো তিনি খেতেন, পান করতেন। সুস্থ-অসুস্থ থাকতেন। বিস্মৃত হতেন, স্মরণ করতেন। বিবাহ-শাদী করেছেন, তাঁর একাধিক স্ত্রী ছিল। তিনি সন্তানের জনক ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। দুঃখ-শোক, ব্যথা ও যন্ত্রণা অনুভব করতেন। তাঁর প্রস্রাব-পায়খানা হত এবং তা অপবিত্র ছিল। তাঁর নাপাকীর উযূ-গোসলের প্রয়োজন হত। *(তিরমিযী ২৪৯১নং)* জীবিত ছিলেন, ইন্তিকাল করেছেন। মানুষের সকল প্রকৃতি ও প্রয়োজন তাঁর মাঝে ছিল।

তিনি 'বাশার' ছিলেন। বাশার হলো আশরাফুল মাখলূকাত। সুতরাং 'বাশার' শব্দে কোন তুচ্ছার্থ নেই। তার পরেও তিনি ছিলেন 'সাইয়্যিদুল বাশার।'

তিনি ও সকল নবীই মানুষ ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} (٩١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি, যখন তারা বলে, 'আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই অবতীর্ণ করেননি।' *(আন্‌আম ঃ ৯১)*

{قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ} (١١) إبراهيم

অর্থাৎ, তাদের রসূলগণ তাদেরকে বলল, '(সত্য বটে) আমরা তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করে থাকেন। *(ইব্রাহীম ঃ ১১)*

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (١١٠) سورة الكهف

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য।' *(কাহফ ঃ ১১০)*

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (٦) سورة فصلت

অর্থাৎ, বল, আমি তো কেবল তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি (অহী) প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য (মাত্র) একমাত্র উপাস্য। *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৬)*

{وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} (٣٤) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্বে কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? *(আম্বিয়া ঃ ৩৪)*

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنْ الأَرْضِ يَنْبُوعاً (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ

فَتُفَجِّرَ الأَنهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَؤُه قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً (٩٣) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللّهُ بَشَراً رَسُولاً (٩٤) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ مَلَكاً رَسُولاً} (٩٥) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তারা বলল, 'কখনই আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। অথবা তোমার খেজুরের কিংবা আঙ্গুরের এক বাগান হবে যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত ক'রে দেবে নদী-নালা। অথবা তুমি যেমন বলে থাকো, সেই অনুযায়ী আকাশকে খন্ড-বিখন্ড ক'রে আমাদের উপর ফেলবে অথবা আল্লাহ ও ফিরিশ্তাদেরকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। অথবা তোমার একটি স্বর্ণনির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে; কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনো বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ না করবে; যা আমরা পাঠ করব।' বল, 'পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো শুধু একজন মানুষ, একজন রসূল মাত্র।' যখন মানুষের নিকট পথ-নির্দেশ এল, তখন তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন হতে এই উক্তিই বিরত রাখল যে, 'আল্লাহ কি একজন মানুষকে রসূল ক'রে পাঠিয়েছেন?' বল, 'ফিরিশ্তারা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত, তাহলে অবশ্যই আমি আকাশ হতে ফিরিশ্তাকেই তাদের নিকট রসূল ক'রে পাঠাতাম। *(বানী ইস্রাঈলঃ ৯০-৯৫)*

{وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا}

অর্থাৎ, ওরা বলে, 'এ কেমন রসূল, যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে! তার নিকট কোন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করা হল না কেন; যে সতর্ককারীরূপে তার সঙ্গে থাকত? *(ফুরক্বানঃ ৭)*

মহান আল্লাহ তার জবাবে আরো বলেছেন,

{وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا} (٢٠) سورة الفرقان

অর্থাৎ, তোমার পূর্বে আমি যে সব রসূল প্রেরণ করেছি, তারা সকলেই তো আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? তোমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর সম্যক দ্রষ্টা। *(ফুরক্বানঃ ২০)*

নবীর মানুষ হওয়া এবং মানব-জাতিভুক্ত হওয়াকে মহান আল্লাহ একটি অনুগ্রহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ} (١٦٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাসীদের প্রতি তাদের নিজেদের মধ্যে হতে রসূল প্রেরণ ক'রে

অনুগ্রহ করেছেন। সে (নবী) তার আয়াতগুলি তাদের নিকট আবৃত্তি ক'রে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়। আর অবশ্যই তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল। *(আলে ইমরান ঃ ১৬৪)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, আমি আদমী, আদম-সন্তান, আমি একজন মানুষ মাত্র, আমি তোমাদের মতোই মানুষ।

একদা ফজরের নামায শুরু করে সাহাবাগণকে ইঙ্গিত করলেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে অপেক্ষা কর। অতঃপর তিনি বাড়ি প্রবেশ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হয়ে এলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। অতঃপর নামায শেষ করে বললেন,

(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا).

আমি একজন মানুষই। আমি অপবিত্র ছিলাম। (গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম। *(আহমাদ ২০৪২০নং)*

একদা নামায পড়তে গিয়ে তিনি ভুল ক'রে চার রাকআতের জায়গায় পাঁচ রাকআত পড়ে ফেললেন। সালাম ফিরার পরে তাঁকে সে ব্যাপারে বলা হলে দু'টি সহু সিজদা ক'রে বললেন,

(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي).

"আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে মনে পড়িয়ে দিয়ো।" *(বুখারী ৪০১, মুসলিম ৫৭২নং)*

একদা তিনি সাহাবাদেরকে দেখলেন, তাঁরা খেজুর মোছার পরাগ-মিলন সাধন করছেন; অর্থাৎ, মাদা গাছের মোছা নিয়ে মাদী গাছের মোছার সাথে বেঁধে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, "আমার মনে হয় ঐরূপ করাতে কোন লাভ নেই। ঐরূপ না করলেও খেজুর ফলবে।" তাঁর এ মন্তব্য শুনে সাহাবাগণ তা ত্যাগ করলেন। কিন্তু খেজুর ফলার সময় দেখা গেল, খেজুর পরিপুষ্ট হয়নি; ফলে তার ফলনও ভালো হয়নি। তিনি তা দেখে বললেন, "কী ব্যাপার, তোমাদের খেজুরের ফলন নেই কেন?" তাঁরা বললেন, যেহেতু আপনি পরাগ-মিলন ঘটাতে নিষেধ করেছিলেন, সেহেতু তা না করার ফলে ফলন কম হয়েছে। তিনি বললেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ : قَالَ اللَّهُ، فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ.

"আমি তো তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। আর ধারণা ভুল হয়, ঠিকও হয়। কিন্তু আমি যখন বলি, 'আল্লাহ বলেছেন' তখন কখনই আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলব না।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, মুসলিম ৬২৭৬নং ভিন্ন শব্দে)*

মানুষের অনুমান হিসাবে তিনি তাঁদেরকে এ কথা বলেছিলেন। আর এটা নবুঅতের ক্ষেত্রে কোন অসম্পূর্ণতা নয়, ত্রুটিও নয়। নবীর জন্য চাষী না হওয়া, কামার বা ছুতোর না হওয়া কোন দোষের নয়।

একদা রাত্রি বেলায় মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সতীনদের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করলে মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন, "আয়েশা! তোমাকে তোমার শয়তান ধরেছে।" আয়েশা বললেন, 'আপনার কি শয়তান নেই?' তিনি বললেন,

« مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلاَّ لَهُ شَيْطَانٌ ».

অর্থাৎ, এমন কোন আদম-সন্তান (আদমী বা মানুষ) নেই, যার শয়তান নেই।

আয়েশা বললেন, 'আর আপনি হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আর আমিও। তবে

আমি তার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দুআ করেছি, তাই আমি নিরাপদ থাকি।" *(বাইহাক্বী ২৫৫২, হাকেম ৮৩২, ইবনে হিব্বান ১৯৩৩, ইবনে খুযাইমা ৬৫৪নং)*

তিনি বলেছেন,

(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا).

"আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা (বিবাদ করে) ফায়সালার জন্য আমার নিকট আসো। হয়তো তোমাদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় অধিক বাক্‌পটু। আর আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি। সুতরাং আমি যদি কাউকে তার (মুসলিম) ভাইয়ের হক তার জন্য ফায়সালা করে দিই, তাহলে আসলে আমি তার জন্য আগুনের টুকরা কেটে দিই।" *(বুখারী ২৪৫৮, মুসলিম ৪৫৭২নং)*

« أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِىَ رَسُولُ رَبِّى فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ».

"অতঃপর হে লোক সকল! শোনো, আমি একজন মানুষ মাত্র, শীঘ্রই (আমার নিকট) আমার প্রতিপালকের দূত আসবেন এবং আমি (আল্লাহর নিকট যাওয়ার জন্য) তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটি আল্লাহর কিতাব, যাতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তা মযবুত ক'রে ধারণ কর।" *(মুসলিম ৬৩৭৮নং)*

তিনি (মা-আয়েশা) আরো বলেন, তিনি ﷺ অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ ছিলেন; স্বহস্তে কাপড় পরিষ্কার করতেন, দুধ দোহাতেন এবং নিজের খেদমত নিজেই করতেন। অন্যান্য পুরুষরা যেমন নিজেদের বাড়ীতে কাজ করে, অনুরূপ তিনি ﷺও তাঁর কাপড়ে তালি লাগাতেন এবং জুতো সিলাই করতেন। *(সহীহ আদাবুল মুফরাদ ১/২ ১৫, সহীহুল জামে' ৯০৬৮)*

«اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً».

আমি একজন মানুষ মাত্র। সুতরাং যে কোনও মুসলিমকে আমি কষ্ট দিয়েছি, মেরেছি অথবা গালি দিয়েছি, তা তুমি তার জন্য রহমত ও পবিত্রতা বানাও, এমন নৈকট্য বানাও, যার দ্বারা সে কিয়ামতের দিন তোমার নৈকট্য লাভ করতে পারে। *(মুসলিম ৬৭৮১, আহমাদ ২/৪৪৯, সিঃ সহীহাহ ৮৩নং)*

পক্ষান্তরে কোন মানুষই তাঁর মতো (সমান) নয়। আমরা তাঁর মতো মানুষ নই। আমরা মানব, কিন্তু তিনি মহামানব। আমরা সাধারণ মানুষ, কিন্তু তিনি অসাধারণ মানুষ।

আমরা সম্মানে তাঁর মতো নই। রাজাও মানুষ মেথরও মানুষ। তা বলে উভয়ে কি মর্যাদায় সমান হতে পারে? সাধারণ মানুষদের ভিতরেই কত ভেদাভেদ বর্তমান। সুতরাং তিনি সৃষ্টিগত দিক থেকে 'মানুষ' হলেও মানে-সম্মানে, স্বভাবে-চরিত্রে, দোষে-গুণে তাঁর মধ্যে ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন ঃ-

(১) তিনি নবী, তাঁর উপরে অহী অবতীর্ণ হতো। আমাদের মধ্যে কেউ তা নয়, হতেও পারে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (١١٠) سورة الكهف

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য।' *(কাহফঃ ১১০)*

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (٦) سورة فصلت

অর্থাৎ, বল, 'আমি তো কেবল তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি (অহী) প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য (মাত্র) একমাত্র উপাস্য।' *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৬)*

(২) অতিপ্রাকৃত বিষয়ে কেউই তাঁর মতো নয়। তিনি একটানা রোযা রাখতেন। সাহাবীগণ তাঁর মতো রাখতে চাইলেন। তিনি বললেন,

(إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي).

'(এ বিষয়ে) তোমরা আমার মতো নও। আমি তো রাত্রি অতিবাহিত করি, আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান।' *(বুখারী ৭২৯৯, মুসলিম ২৬২৬, মিশকাত ১৯৮৬নং)*

আমাদের শরীর ঘর্মাক্ত হলে দুর্গন্ধ বের হয়। আর তাঁর শরীরের ঘাম ছিল আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ আতর।

একদা তিনি উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হলে উম্মে সুলাইম সেই ঘাম জমা করতে লাগলেন। তিনি জেগে উঠে তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার উম্মে সুলাইম?' বললেন, 'আপনার ঘাম। আমাদের সুগন্ধিতে মিশিয়ে দেব। আর তা হবে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি।' *(মুসলিম ৬২০১নং)*

আমাদের চুল, থুথু অথবা ব্যবহৃত কাপড় ইত্যাদিতে কোন বর্কত নেই। মহানবী ﷺ-এর তা ছিল।

আমরা আমাদের পিছনে কী আছে দেখতে পাই না। তিনি বিশেষ ক'রে নামাযে সামনে যেমন দেখতেন, তেমনি পিছনেও দেখতেন। একদা এক নামাযের সালাম ফিরে তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের রুকূ ও সিজদাকে পরিপূর্ণরূপে আদায় কর। সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, আমার নিকট তোমাদের রুকূ, সিজদাহ ও বিনয়-নম্রতা অস্পষ্ট নয়। আমি আমার পিঠের পিছন থেকে দেখতে পাই, যেমন সামনে দেখতে পাই। *(আহমাদ ৯৭৯৬, বুখারী ৪১৮, মুসলিম ৯৮৬, হাকেম ১/৩৬১, ইবনে খুযাইমা ৪৭৪, মিশকাত ৮৬৮নং)*

আমরা ঘুমালে এক প্রকার মারাই যাই। আর তিনি ঘুমালে তাঁর চক্ষু ঘুমাতো, কিন্তু অন্তর সজাগ থাকতো।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান ও অন্যান্য মাসে (তাহাজ্জুদ তথা তারাবীহ) ১১ রাকআতের বেশী পড়তেন না। প্রথমে চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্নই করো না। তারপর (আবার) চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে প্রশ্নই করো না। অতঃপর তিন রাকআত (বিত্র) পড়তেন। (একদা তিনি বিত্র পড়ার আগেই শুয়ে গেলেন।) আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি বিত্র পড়ার পূর্বেই ঘুমাবেন?" তিনি বললেন,

« يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِى ».

"আয়েশা! আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায়; কিন্তু অন্তর জেগে থাকে।" *(বুখারী ১১৪৭, মুসলিম ১৭৫৭নং)*

তাঁর চক্ষু নিদ্রাভিভূত হতো, কিন্তু হৃদয় নিদ্রাভিভূত হতো না। *(বুখারী ৮৫৯, ১১৪৭, মুসলিম ১৭৫৭, ১৮২৬, আবূ দাউদ ২০২, তিরমিযী ৪৩৯, নাসাঈ ১৬৯৭নং)*

আমরা চেষ্টা করলে অবাস্তব ভেল্কি বা যাদু দেখাতে পারি, কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন

অলৌকিক কত মু'জিযা।

ওঁরা বলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তিনি যে বাশার, তা তো আমরা অস্বীকার করছি না। আর বাশারিয়াত প্রমাণ হলেই তাঁর নূরিয়াত খতম হয়ে যায় না। আসলে তিনি ছিলেন নূরী বাশার।'

আমরা বলি, আগে দেখি চেয়ার গড়, তারপরে তার নকশা কর। আগে এ কথা প্রমাণিত হোক যে, তিনি নূর থেকে সৃষ্টি, তারপর না হয় মানা যাবে তিনি নূরী-বাশারী। প্রমাণ থাকলে এ কথা মানতে কারো কোন বাধা থাকতেই পারে না।

সাময়িকভাবে ফিরিশ্তা মানুষের আকার ধারণ করেছেন। সুতরাং মহানবী ﷺ বাশার হওয়া সত্ত্বেও নূরী থাকবেন না কেন? উপমান ও উপমেয় একই শ্রেণীর না হলেও তর্কের খাতিরে আমাদের মানতে কোন বাধা নেই, যদি তাঁর নূরী হওয়ার কথা সঠিক প্রমাণিত হয়।

এ বিষয়ে আরবী কবি শারফুদ্দীন বুসেরীর এ কথা বড় ইনসাফপূর্ণ ও দলীলভিত্তিক। তিনি বলেছেন,

فمبلغ العلم فيه أنه بشر .... وأنه خير خلق الله كلهم

অর্থাৎ, তাঁর ব্যাপারে শেষ জ্ঞাতব্য এই যে, তিনি হচ্ছেন মানুষ। আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহর সারা সৃষ্টির সেরা।

পক্ষান্তরে এ কথা স্ববিরোধী ও ভ্রান্ত যে, 'বাশার হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাশারিয়াতের সকল গুণ মুক্ত।' *(নূরে মুজাস্সাম ২ ১৬পৃঃ)*

আমাদেরকে যেমন মনে রাখতে হবে যে, রাজা ও মুচি-মেথর অবশ্যই সমান নয়, তেমনি এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, রাজা ও রাজাধিরাজও সমান নয়। যাতে আমরা যেন 'সাইয়্যিদুল বাশার' মহানবী ﷺ-কে 'খালেকুল বাশার'-এর মর্যাদায় একাকার করে না দিই।

তিনি বলেছেন,

((لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)).

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিস্টানরা (ঈসা) ইবনে মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী ৩৪৪৫, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৯৭নং)*

তিনি ও আল্লাহর আরশ

'আল্লাহর আরশ তাঁর মুত্তাকা---আরাম কেদারা। (তার মানে ইজি-চেয়ার।)'

এর দলীল? শেখ সা'দীর এই উক্তি,

حبيب خدا اشرف انبياء   كه عرش مجيدش بود متكا

অর্থাৎ, খোদার হাবীব, নবীকুল শিরমণি, মহান আরশ হলো যার আরাম কেদারা। *(নূরে মুজাস্সাম ২৬৭পৃঃ)*

এ কবিতা নিযামিয়া মাদ্রাসার প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্ররা ফারসী কবিতা-পুস্তিকায় পাঠ করে থাকে। সালাফী আকীদার মাদ্রাসাগুলোতেও পড়ানো হয় সূফী লেখকদের বই-পুস্তক। ফলে সালাফী আলেমদের আকীদা-গাছেও আলোক-লতার মতো পরগাছার আধিপত্য থাকে। অনেকে সেসব কথা পড়িয়ে যান, কিন্তু তর্জমার পরে তার উপর কোন মন্তব্য করেন না বা

অমূলক আকীদার খন্ডন করেন না। সূফীবাদী আকীদার বিদআতী গজল শুনেও মাথা হিলান, আকীদার সংশোধন করেন না।

কিন্তু যাঁরা কুরআন পাঠ করেন, তাঁরা জানেন। সর্বসৃষ্টির ঊর্ধ্বে হল কুরসী, তার উপর আরশ। আরশে আছেন মহান আল্লাহ। তিনিই মহান আরশের অধিপতি। তিনি বলেছেন,

{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (٥) سورة طـه

অর্থাৎ, পরম দয়াময় আরশে সমাসীন। *(ত্বা-হা ঃ ৫)*

{فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} (١٢٩) التوبة

অর্থাৎ, অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলে দাও, 'আমার জন্য তো আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি, আর তিনি হচ্ছেন অতি বড় আরশের মালিক।' *(তাওবাহ ঃ ১২৯)*

{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} (٢٢) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে বহু উপাস্য থাকত, তাহলে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং ওরা যে বর্ণনা দেয়, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান। *(আম্বিয়া ঃ ২২)*

{قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٨٦) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ} (٨٧)

অর্থাৎ, জিজ্ঞেস কর, 'কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি?' তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না।' *(মু'মিনূন ঃ ৮৬-৮৭)*

{فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ} (١١٦) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, মহিমান্বিত আল্লাহ; যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সম্মানিত আরশের অধিপতি তিনি।' *(মু'মিনূন ঃ ১১৬)*

{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} (٢٦) سورة النمل

অর্থাৎ, আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি মহা আরশের অধিপতি। *(নাম্‌ল ঃ ২৬)*

{سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ} (٨٢) سورة الزخرف

অর্থাৎ, ওরা যা আরোপ করে, তা হতে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী পবিত্র ও মহান। *(যুখরুফ ঃ ৮২)*

{قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَّبْتَغَوْاْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً } (٤٢) سورة الإسراء

অর্থাৎ, বল, তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে আরো উপাস্য থাকত, তবে তারা আরশ অধিপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার উপায় অন্বেষণ করত। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৪২)*

{رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ} (١٥)

অর্থাৎ, তিনি সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় আদেশসহ ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন (কিয়ামত) সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। *(মু'মিন ঃ ১৫)*

{وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ} (١٥) سورة البروج

অর্থাৎ, তিনিই ক্ষমাশীল, প্রেমময়। তিনি আরশের অধিপতি গৌরবময়। *(বুরূজঃ ১৪-১৫)*

মহান আল্লাহর আরশে তাঁর নবী ﷺ-কে বিনা দলীলে কীভাবে শরীক করা যায়, প্রিয় পাঠক তা একবার ভেবে দেখবেন। একজন ফারসী কবির উক্তিও কি দলীলরূপে পেশ করার যোগ্য?

শুধু তাই নয়, আমাদের বাংলার কবিও তাঁকে আরশে আল্লাহর পাশে বসিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

'নবীর মাঝে রবির সম
আমার মোহাম্মদ রসুল।
দীনের নকীব খোদার হবিব
বিশ্বে নাই যাঁর সমতুল।
পাক আরশে পাশে খোদার
গৌরবময় আসন যাঁহার,
খোশ নসীব উম্মত আমি তাঁর
পেয়েছি অকূলে কূল।'

এই সঙ্গীতে অতিরঞ্জনের আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়। পাক আরশে আল্লাহর পাশে নবী ﷺ-কে গৌরবময় আসন দিয়ে তাঁর সম্মান বৃদ্ধি করা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু তাতে মহামহিমান্বিত আল্লাহর সম্মান ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

শাফাআতের সুদীর্ঘ হাদীসে আমরা জানি, সুপারিশের অনুমতি নিতে মহানবী ﷺ আরশের নিচে নিজ প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হবেন। আর এটাই তাঁর বিশাল মর্যাদা। তিনি বলেছেন, "তারা সবাই আমার কাছে এসে বলবে, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি আখেরী নবী। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী (ভয়াবহ) দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করছি।'

(فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ).

তখন আমি চলে যাব এবং আরশের নীচে আমার প্রতিপালক (রব্ব আয্যা ও অজাল্লা)র জন্য সিজদাবনত হব। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের জন্য আমার হৃদয়কে এমন উন্মুক্ত ক'রে দেবেন, যেমন ইতোপূর্বে আর কারো জন্য করেননি। অতঃপর তিনি বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' তখন আমি মাথা উঠিয়ে বলব, আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক!' এর প্রত্যুত্তরে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বলা হবে, 'হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে ডান দিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও। এই দরজা ছাড়া তারা অন্য সব দরজাতেও সকল মানুষের শরীক।' *(বুখারী ৪৭১২, মুসলিম ৫০১নং)*

সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে কিয়ামতে মাক্বামে মাহমূদ দান করবেন এবং বেহেশ্তে 'অসীলা' নামক সর্বোচ্চ স্থান দান করবেন। আর সর্বোচ্চ বেহেশ্ত 'জান্নাতুল ফিরদাউস'-এর উপরে আছে আল্লাহর মহা আরশ। আরশের পাশে তিনি কাউকে স্থান দেবেন না। প্রতিপালকের শান অতি মহান। নবীর শান সেখানে পৌঁছতে পারে না। তাঁর

সমকক্ষ, সমতুল, শরীক, সঙ্গী ও সাথী কেউ নেই।

এই শ্রেণীরই এক গপে বক্তা বাগদাদের পরিবেশ ঘোলাটে করে রেখেছিলেন। আর মানুষ বক্তাদের চটকদার বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁদেরকেই সমাজের আমীর ও মুফতী মানে। বক্তা তাঁর ওয়াযে বলেছিলেন,

{عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا} (٧٩) سورة الإسراء

অর্থাৎ, আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৭৯ আয়াত)*

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে তাঁর আরশে বসাবেন!

সমসাময়িক কালের ইমাম মুফাস্সিরে কুরআন ত্বাবারী বাগদাদে আগমন করলে হকপন্থীরা তাঁকে সে কথার সত্যতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি শুনে অবাক হলেন এবং কঠোর ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তিনি তাঁর বাসার দরজায় লিখে দিলেন,

سُبْحَانَ مَنْ لَيسَ لَهُ أَنِيس ... وَلاَ لَهُ فِي عَرْشِهِ جَلِيس

অর্থাৎ, পবিত্র আল্লাহ, যাঁর কোন সঙ্গী নেই এবং তাঁর আরশে তাঁর কোন বসার সাথী নেই।

এ কথা শুনে ও লেখা দেখে উক্ত বক্তার অন্ধ ভক্তরা ভাবে, এ কথা নবীর শানে গুস্তাখী ও বেআদবী। এতে তাঁর মান ও শানকে ছোট করা হয়েছে। সুতরাং তারা উত্তেজিত হয়ে ইমামের বাসার উপর পাথর মারতে শুরু করে। এমনকি তাঁর দরজায় পাথরের ছোট পাহাড় জমে যায়। পরবর্তীতে পুলিশের সাহায্যে তাঁকে ও তাঁর বাসাকে বিপদমুক্ত করা হয়। *(তাহযীরুল খুওয়াস মিন আহাদীসিল কুসস্বাস, সুয়ূতী, ঈযাহুদ দালীল ১/৩২, আল-ওয়াফী ফিল অফিয়াত ১/২৬৭)*

মহানবী ﷺ 'আল্লাহর আরশ-সঙ্গী' শুধু তাই নয়, এক মীলাদী দাবী করে যে, মি'রাজের রাতে আল্লাহপাক তাঁর নবীকে জুতা-সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়!

'সুবহানাকা হাযা বুহতানুন আযীম।' বিনা দলীলে এত বিশাল কথা বলার স্পর্ধা হয় কী করে জানি না। একজনের তা'যীম বৃদ্ধি করতে গিয়ে যে তাঁর উপর-ওয়ালার তা'যীম একাকার হয়ে যায়, তার হুঁশও কি হয় না তাদের? নাকি অতিভক্তির শারাব পান করে মাতাল হয়ে যা খুশী তাই বলা যায়?

আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বাংলার কবি নবী ﷺ-কে আরশে আল্লাহর বসার সাথী নয়, বরং আরশ-ওয়ালাই বানিয়ে দিয়েছেন। যিনি আরশে 'আল্লাহ' হয়ে ছিলেন, তিনিই 'নবী' হয়ে মদীনায় এলেন! তাও আবার পথ ভুলে!!

'আরশ হতে পথ ভুলে এ এল মদিনা শহর,
নামে মোবারক মোহাম্মদ, পুঁজি 'আল্লাহু আকবর।'

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৩৯ নং

জানি না, কবি এ ধারণা কোত্থেকে পেয়েছেন? নিশ্চয় মীলাদ শুনে অথবা মীলাদী বই পড়ে এ ধারণা পেয়েছেন।

শুধু তাই নয়। কবি তো আহমদের মীমের পর্দা তুলে আহাদ দেখতে পেয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

'আহ্মদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ মন।

আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন।'

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৩৫ নং

সুতরাং আসলে 'দীনের নকীব খোদার হবিব' আল্লাহর পাশে জায়গা পাবেন, নাকি স্বয়ং তিনিই আল্লাহ তা কবি নিজেই জানতেন না।

আর আমাদের উচিত নয়, কবিদের আবেগপ্রসূত কাল্পনিক কথায় কান দিয়ে নিজেদের ঈমান-আকীদা নষ্ট করা।

মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন,

{وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَى أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ} (٢٢٦) سورة الشعراء

অর্থাৎ, কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরা। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সকল বিষয়ে কল্পনাবিহার করে থাকে? এবং তা বলে, যা করে না। *(সূরা শুআরা ২২৪-২২৬ আয়াত)*

হয়তো-বা কবি সূফীবাদীদের এই বর্ণনায় কান দিয়ে খ্রিস্টানদের মতো স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক বানিয়ে ফেলেছেন।

বিদআতী মীলাদীরা বয়ান ক'রে থাকে, জিবরীল ﷺ পর্দার আড়াল থেকে অহী গ্রহণ করতেন। একদা সেই পর্দা সরে গেলে তিনি দেখলেন, নবী ﷺ-ই তাঁকে অহী প্রদান করছেন! তা দেখে জিবরীল ﷺ বললেন, 'মিনকা অ ইলাইকা!' অর্থাৎ, আপনার নিকট থেকে আপনার প্রতিই!

গাম্মারী বলেন, 'আল্লাহর লানত হোক সেই ব্যক্তির উপর, যে কুরআন-বিরোধী এই গল্পটি তৈরি করেছে। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (٥٢) سورة الشورى

অর্থাৎ, এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কী, ঈমান কী। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর। *(শূরা ঃ ৫২)*

{نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ} (١٩٤) سورة الشعراء

অর্থাৎ, বিশ্বস্ত রূহ (জিব্রাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। *(শুআ'রা ঃ ১৯৩- ১৯৪) (দ্রঃ মুরশিদুল হায়ের ১০পৃঃ)*

তাঁর পারলৌকিক জীবন

যে মারা যায়, সে দেহত্যাগ ক'রে এ জগৎ ছেড়ে আর এক জগতে চলে যায়। আর সে জগতের সাথে এ জগতের কোন যোগাযোগ থাকে না। সে মধ্যজগৎ থেকে ইহজগতের কোন কিছু শুনতে পায় না। সে জগৎ ও এ জগতের মাঝে আছে যবনিকা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ

قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (١٠٠) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রেরণ কর। যাতে আমি আমার ছেড়ে আসা জীবনে সৎকর্ম করতে পারি।' না এটা হবার নয়; এটা তো তার একটা উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। *(মু'মিনূন ঃ ৯৯-১০০)*

পরন্তু সে জগতে আম্বিয়াগণের আত্মা সর্বোচ্চ স্থানে আ'লা ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করে। শহীদগণের রূহ সবুজ পাখীর বেশে আরশে ঝুলন্ত লণ্ঠনে স্থান পায়। *(মুসলিম ১৮৮৭নং)* এবং জান্নাতে ইচ্ছামত পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। আওলিয়া ও সালেহীনদের রূহও পাখীর বেশে জান্নাতের গাছে গাছে অবস্থান করে। *(আহমাদ ৩/৪৫৫, ইবনে মাজাহ ১৪৪৯নং)* আর কাফেরদের রূহ সিজ্জীনে অবস্থান করে।

মানুষ যেমন ঘুমন্ত অবস্থায় জাগ্রত পৃথিবীর কোন অবস্থা জানতে পারে না, কারো ডাক বা আহবানের শব্দ শুনতে পায় না, অথচ স্বপ্নে আনন্দে অথবা নিরানন্দে বিছানায় অবস্থান করে, ঠিক তদ্রূপই মৃত ব্যক্তি মধ্য জগতে বাস করে ইহজগতের কোন অবস্থা জানতে পারে না। এ জগতের কারো ডাক বা শব্দ শুনতে পায় না। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ} (٨٠) سورة النمل

অর্থাৎ, নিশ্চয় তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না, আর বধিরকেও তোমার আহবান শোনাতে পারবে না; যখন ওরা পিছন ফিরে চলে যায়। *(সূরা নাম্ল ৮০ আয়াত)*

{فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ} (٥٢) سورة الروم

অর্থাৎ, নিশ্চয় তুমি মৃতকে তোমার কথা শোনাতে পারবে না এবং বধিরকেও তোমার আহবান শোনাতে পারবে না; যখন ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়। *(সূরা রূম ৫২ আয়াত)*

{إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } (١٤) سورة فاطر

অর্থাৎ, তোমরা তাদেরকে আহবান করলে তারা তোমাদের আহবান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদেরকে যে অংশী করছ তা ওরা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। আর সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)র ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না। *(সূরা ফাত্বির ১৪ আয়াত)*

{وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ}

অর্থাৎ, সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; আর তুমি মৃতকে শোনাতে পার না। *(ঐ ২২ আয়াত)*

তবে বদর যুদ্ধে মৃত কাফেরদেরকে অধিক লাঞ্ছিত করার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহ তাদেরকে নবী করীম ﷺ-এর ডাক শুনিয়েছিলেন। *(বুখারী ১৩৭০নং, মুসলিম ২৮৭৩নং)* আর এটা ছিল তাঁর মু'জিযা।

আবার মৃতকে দাফন করার পর যখন মৃতের রূহ ফিরিয়ে প্রশ্নের জন্য তাকে বসানো হয় এবং লোকেরা ফিরে আসতে শুরু করে, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়। *(বুখারী ১৩৩৮, মুসলিম ২৮৭০নং)* এ শুধু বিশেষ অবস্থায় আল্লাহর হিকমত বিশেষ।

কবর যিয়ারতে গিয়ে কবরবাসীদেরকে সালাম দেওয়া হয়, তারা জীবিত আছে এই জ্ঞানে নয় অথবা তারা সালামের উত্তর দেবে এই উদ্দেশ্যে নয়; বরং তাদেরকে ঐ সালাম তাদের

জন্য এক প্রকার শান্তি প্রার্থনার দুআ। এ থেকে এ ধারণা করা ঠিক নয় যে, তারা সালাম শুনতে পায় এবং জবাবও দেয় অথবা তারা এ জগতের সব কথা জানতে-বুঝতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ} (١٥٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে মৃত বল না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। *(বাক্বারাহঃ ১৫৪)*

হ্যাঁ, তাঁরা জীবিত, কিন্তু তাঁদের সে জীবনের কথা উপলব্ধ ও অনুভবযোগ্য নয়। যেহেতু সে জীবন এ জীবনের মতো নয়।

'তিনি মৃত নন, পর্দা নিয়েছেন।' তা যদি সত্য হয়, তাহলে সাহাবাগণ কোনদিন পর্দার আড়াল থেকে কোন অভাব-অভিযোগের কথা জানালেন না কেন? আর সে পর্দা যদি সূরা মু'মিনূনের ১০০নং আয়াতে উল্লিখিত পর্দা হয়, তাহলে সে পর্দা সে জগৎ থেকে এ জগৎকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে।

মহানবী ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর দেহ কবরে অক্ষত অবস্থায় আছে। কেউ সালাম দিলে সেই সালাম ফিরিশ্তা তাঁর কাছে পৌঁছে দেন, আর তখন তাঁর মাঝে তাঁর 'রূহ'কে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি সালামের জবাব দেন। তিনি বলেছেন,

((مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ))

"যে কোন ব্যক্তি যখন আমার উপর সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ আমার মধ্যে আমার আত্মা ফিরিয়ে দেন, ফলে আমি তার সালামের জবাব দিই।" *(আবূ দাউদ ১৭৭৯নং)*

কিন্তু এর ধরন আল্লাহই জানেন। তাঁর দেহে রূহ থাকে না। অতঃপর যথাসময়ে তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি সালামের জবাব দেন। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, তাঁর জবাব কেউ শুনতে পায়।

যেমন তিনি সরাসরি সালাম শুনতে পান না। ফিরিশ্তার মাধ্যমে তা পৌঁছানো হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ে নিয়ো না। তোমরা (যেখানে থাক, সেখান হতেই) আমার উপর দরূদ পড়। যেহেতু (ফিরিশ্তার মাধ্যমে) তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" *(আবূ দাউদ ২০৪২, সহীহুল জামে' ৭২২৬নং)*

তিনি আরো বলেন,

(إِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় পৃথিবীতে আল্লাহর ভ্রাম্যমাণ ফিরিশতাদল আছেন, তাঁরা আমার উম্মতের নিকট থেকে আমাকে সালাম পৌঁছিয়ে থাকেন। *(আহমাদ ৪২১০, নাসাঈ ১২৮২, ইবনে হিব্বান ৯১৪, হাকেম ৩৫৭৬, দারেমী ২৭৭৪, ত্বাবারানী ১০৫২৯, সিঃ সহীহাহ ২৮৫৩নং)*

বলা বাহুল্য, তিনি সরাসরি দরূদ ও সালাম শোনেন না। তাঁর মসজিদে মাইকে পঠিত দরূদ ও সালামও নয়। নির্দিষ্ট ফিরিশ্তার মাধ্যমে তাঁকে শোনানো হয়।

সুহাইল বলেন, একদা (নবী ﷺ-এর নাতির ছেলে) হাসান বিন হাসান বিন আলী আমাকে কবরের নিকট দেখলেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেই সময় তিনি ফাতেমার বাড়িতে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। আমি উপস্থিত হলে তিনি বললেন, 'এসো খানা খাও।' আমি বললাম, 'খাবার ইচ্ছা নেই।' অতঃপর তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার যে, আমি তোমাকে

কবরের পাশে দেখলাম?’ আমি বললাম, ‘নবী ﷺ-কে সালাম দিলাম।’ তিনি বললেন, ‘যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সালাম দেবে।’ অতঃপর তিনি বললেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ে নিয়ো না। তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে নিয়ো না। তোমরা যেখানেই থাক, সেখান থেকেই আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকট (ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে) পৌঁছে যায়। আল্লাহ ইয়াহুদকে অভিশাপ করুন। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে।” (এ ব্যাপারে এখানে) তোমরা এবং উন্দুলুসের লোকেরা সমান।’ *(সুনান, সাঈদ বিন মানসূর, আহকামুল জানায়েয, আলবানী ২২০পৃঃ)*

অর্থাৎ, কবরের পাশে অবস্থান ক’রে ও স্পেনের উন্দুলুসে অবস্থান ক’রে দরূদ ও সালাম পেশ করা একই সমান। ফিরিশ্‌তাই তা তাঁকে পৌঁছিয়ে থাকেন।

কিন্তু হাদীসে আছে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلاَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلاَتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا.

অর্থাৎ, জুমআর দিন আমার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ কর। কারণ ঐ দিন উপস্থিতির দিন। সেদিন ফিরিশ্‌তা উপস্থিত থাকেন। আর কেউ আমার প্রতি দরূদ পাঠ করলে তার শেষ না করা পর্যন্ত তা আমার উপর পেশ করা হয়ে থাকে।

আবূ দারদা বললেন, ‘আর মৃত্যুর পর?’ তিনি বললেন,

(وَبعْدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ ، فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ).

অর্থাৎ, মৃত্যুর পরও। অবশ্যই মহান আল্লাহ মাটির উপর নবীগণের দেহ খাওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর নবী জীবিত, তিনি রুযীপ্রাপ্ত হন। *(ইবনে মাজাহ ১৬৩৭নং, এর সনদ দুর্বল)*

অন্য এক হাদীসে আছে,

(الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ).

অর্থাৎ, নবীগণ কবরে জীবিত নামায পড়েন। *(আবূ য়্যা’লা ৩৪২৫, বায্যার ৬৮৮৮, সিঃ সহীহাহ ৬২২নং)*

কিন্তু যদি কেউ ধারণা করে যে, কবর বলতে মাটির ঘর এবং সেখানে তাঁরা নামায পড়েন, ওঠা-বসা করেন, সেখানে তাঁরা এ জগতে বাস করার মতো জীবনধারণ করেন, তাহলে তা ভুল। বাস্তবতা, বিবেক ও স্পষ্ট দলীল তার প্রতিকূল। বরং কবর ও বারযাখ এক গায়বী জগৎ। সে জগতের বাস্তবতা ও প্রকৃতত্ত্ব আমাদের অজানা। যেহেতু সে জীবন হল প্রতিপালকের নিকটে। বিধায় সে জীবন এ মাটির ঘরে নয়।

শহীদগণের জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (١٦٩) آل عمران

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। *(আলে ইমরান ঃ ১৬৯)*

মাসরূক (রঃ) বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ (বিন মাসঊদ ﵁)কে এই আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ‘শোন! আমরাও এ বিষয়ে (নবী ﷺ-কে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "তাদের (শহীদদের) আত্মাসমূহ সবুজ পক্ষীকুলের দেহ মধ্যে অবস্থান করবে। ঐ পক্ষীকুলের অবস্থানক্ষেত্র হল (আল্লাহর) আরশে ঝুলন্ত দীপাবলী। তারা বেহেশ্তে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে বেড়াবে। অতঃপর পুনরায় ঐ দীপাবলীতে ফিরে এসে আশ্রয় নেবে।

একদা তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, 'তোমরা কি (আরো) কিছু কামনা কর?' তারা বলল, 'আমরা আর কী কামনা করব? আমরা তো বেহেশ্তে যেখানে খুশী সেখানে বিচরণ করে বেড়াচ্ছি!' (আল্লাহ) অনুরূপভাবে তাদেরকে তিনবার প্রশ্ন করলেন। অতঃপর যখন তারা দেখল যে, কিছু না চাইলে তাদেরকে ছাড়াই হবে না, তখন তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কামনা এই করি যে, আপনি আমাদের আত্মাসমূহকে আমাদের নিজ নিজ দেহে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার রাহে দ্বিতীয়বার নিহত হয়ে আসতে পারি।'

অতঃপর আল্লাহ যখন দেখবেন যে, তাদের আর কোন প্রয়োজন (কামনা বা সাধ) নেই তখন তাদেরকে স্ব-অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম ১৮৮৭নং)*

নবীগণের জীবন, বারযাখী জীবন। যা শহীদগণের জীবনের উর্ধ্বে। কিন্তু সে গায়বী জীবনের প্রকৃতত্ব মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তবে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সে জীবন কোনভাবেই পার্থিব এ জীবনের মতো নয়।

মহানবী ﷺ যদি পার্থিব এ জীবনের মতো পর্দার আড়ালে থাকতেন, তাহলে সাহাবাগণ তাঁর কাছে বহু বিপদাপদ ও মতানৈক্যে তাঁর কবরের পাশে গিয়ে অভিযোগ জানাতেন, পরামর্শ নিতেন, দুআ চাইতেন, সঠিক পথনির্দেশ চাইতেন ইত্যাদি।

কিন্তু না, তাঁরা তা করেননি। তাঁরা জানতেন, তিনি এ জগৎ ছেড়ে বারযাখী জগতে 'রাফীকে আ'লা'র কাছে চলে গেছেন। তাঁর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই তো উমার বিন খাত্ত্বাব অনাবৃষ্টির সময় তাঁর কাছে না গিয়ে তাঁর চাচা আব্বাস ﷺ-এর কাছে এসে দুআর আবেদন জানিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছিলেন। *(বুখারী ১০১০, ৩৭১০নং)*

সুতরাং যারা বিশ্বাস করে যে, মহানবী ﷺ তাঁর কবরে আমাদের মতোই জীবিত আছেন, তিনি পানাহার করেন, এমনি স্ত্রী-মিলনও করেন (!), *(মারাক্বিউল ফালাহ দ্রঃ)* তাদের এ বিশ্বাস কুবিশ্বাস ও ভ্রান্ত।

বলা বাহুল্য, সঠিক বিশ্বাস হল, তাঁর বারযাখী জীবন ও তাঁর নামায পড়া ও সালামের উত্তর দেওয়ার প্রকৃতত্ব আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। তবে তা আমাদের এ জগতের কথা নয়।

সুতরাং যারা বলে, 'তাঁরা এমন এক জীবনের অধিকারী হয়ে থাকেন যাতে ইহজীবন ও পর জীবনের মধ্যে মৃত্যুর কোন প্রাচীর নেই, সবই একাকার যদিও মৃত্যু প্রকাশ্যত তাঁদেরকে এক লোক হতে আর এক লোকে স্থানান্তরিত করে। এটাই তাঁদের হায়াত-ই-জাবেদানী, এটাই তাঁদের মহা সফলতা ও মহান পুরস্কার!

এরাই---এ চার শ্রেণীর মকবুল বান্দারাই (সম্ভবতঃ আম্বিয়া, সিদ্দীকীন, শহীদান ও সালেহীনগণ) নেককারদের রফীক---সাথী। মৃত্যুর আগে ও পরে এঁরা মানুষের কল্যাণ সাধনে সতত তৎপর থাকেন। দৃষ্টির অন্তরালে থেকে তাঁরা রফীকসুলভ যাবতীয় (?) কাজই করে থাকেন!' (নূরে মুজাস্সাম ১০০পৃঃ)

তাদের কথা ভিত্তিহীন ও আবেগবশে লাগামহীন উক্তি।

অনুরূপ সূফীবাদীদের আরো উক্তি ঃ-

'তিনি অফাতের পর জীবদ্দশার মতই আলম-ই-মুল্‌ক ও আলম-ই-মালাকূতে বিচরণের ক্ষমতায় ক্ষমতাবান।'

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পার্থিব জীবনের অবস্থা এবং অফাতের পরের অবস্থার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তিনি সব অবস্থায় তাঁর উম্মতকে দেখছেন, তাদের যাবতীয় অবস্থা, তাদের যাবতীয় নিয়ত, তাদের যাবতীয় দৃঢ় সংকল্প, তাদের দিলের যাবতীয় চিন্তা জানেন ও চিনেন। তা তাঁর নিকট দিবালোকের মত সুস্পষ্ট এবং কোনক্রমেই কোন অস্পষ্টতা নেই।' (তার মানে মহান আল্লাহর মতোই তিনিও সর্বজ্ঞাতা অন্তর্যামী!)

'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের আমল দেখে থাকেন, উম্মতের গুনাহ মাফ করে দেয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে ইস্‌তিগফার করে থাকেন, তাদের বালা-মুসীবত দূর করার জন্য দোয়া করে থাকেন, বরকত দেয়ার জন্য পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেড়ান। কোন নেককার উম্মত মারা গেলে তার জানাযায় উপস্থিত হয়ে থাকেন। এ সমস্ত হলো আলম-ই-বরযখ।' *(আরও দ্রঃ ঐ ১০৫-১০৭পৃঃ, এ মর্মে তাঁর 'আশ্‌-শাহিদ' নামের আলোচনা পঠিতব্য)*

'আম্বিয়া-ই-কিরামকে আল্লাহ এমন রূহানী শক্তি ইনায়েত করেছেন যে, মৃত্যু তাঁদের নিকট একটি পর্দামাত্র; তাঁরা ঐ পর্দা উঠিয়ে আখিরাতে চলে যান অথচ তাঁদের শক্তি প্রয়োগে কোন পরিবর্তন ঘটে না।' *(ঐ ১১৫পৃঃ)*

শ্রদ্ধেয় পাঠক! নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, সাহাবাগণ এমন আকীদা রাখলে নিশ্চয় তাঁরা সেই 'ক্ষমতা' বা 'শক্তি' দ্বারা উপকৃত হতেন। কিন্তু কই? মনে হয়, তাঁরা এ খবর জানতেন না, যে খবর সুফীপন্থী উলামারা জেনে বসে আছেন।

মোটের উপর কথা এই যে,

মহানবী ﷺ-এর অফাত হয়েছে। তিনি ইহকাল ছেড়ে পরকালে গমন করেছেন।

তিনি বারযাখী জীবনে জীবিত আছেন, সে জীবনের প্রকৃতত্ব অনুভব ও অনুমান করা যায় না।

এ জীবনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। ইন্তিকালের পর এ জগতের কারো কোন উপকার তিনি করতে পারেন না।

তিনি 'মরে মাটি হয়ে গেছেন', এ কথা বলা অবশ্যই হাদীস-বিরোধী। আর তুচ্ছার্থে তা বলা এবং অবজ্ঞা ভরে 'মৃত্যু' শব্দ প্রয়োগ করাও মহানবী ﷺ-এর শানে বেআদবী। সুতরাং সাবধান!

তাঁর প্রস্রাব-পায়খানা কি পাক?

অতিরঞ্জনকারীরা বয়ান করে থাকেন, তাঁর প্রস্রাব-পায়খানা পাক ও খোশবুদার ছিল। 'তাঁর প্রস্রাব-পায়খানা যমীন ফেটে খেয়ে ফেলত এবং ঐ জায়গা হতে মেশক-আম্বরের খোশবু বের হতো।'

'হযরত উম্মে আয়মন (রা) তাঁর খাদেমা ছিলেন। একবার শীতের রাতে তিনি পেশাব করে একটা পাত্রে খাটিয়ার নিচে রেখে দেন। প্রভাতে উম্মে আয়মন দৌলত খানায়ে নবুওয়াত (নবী করীম ﷺ-এর বাড়ি) পরিষ্কার করতে এসে দেখলেন খাটিয়ার নিচে অতি

খোশবুদার শরবত রাখা। তিনি তা শরবত জ্ঞানে পান করে ফেলেন। এটা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন---এটা পেশাব ছিল। ঐ পেশাব খাওয়ার ফলে তাঁর সাত পুরুষ কুরআনের হাফেয ছিল।' (নূরে মুজাস্‌সাম ২০০পৃঃ)

এবার হাদীসের বর্ণনা প্রনিধান করুন,

عَن أم أَيمن قَالَت : «بَات رَسُول الله ﷺ فِي الْبَيْت ، فَقَامَ من اللَّيْل ، فَبَال فِي فَخَّارة ، فَقُمْتُ وَأَنا عطشى لم أشعر مَا فِي الفَخَّارة ، فشَربت مَا فِيهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ لي : يَا أم أَيمن ، أريقي مَا فِي الفخارة . قلت : وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ شربتُ مَا فِيهَا ، فَضَحِك رَسُول الله ﷺ حتَّى بَدَت نَوَاجِذه ، ثمَّ قَالَ : إنَّه لَا يَيْجَعَنَّ بَطْنك بعده أبدا» .

উম্মে আইমান কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠলেন এবং একটি মাটির পাত্রে পেসাব করলেন। অতঃপর আমি পিপাসার্ত অবস্থায় ঘুম থেকে উঠলে বুঝতে পারলাম না পাত্রে কী ছিল। সুতরাং আমি তাতে যা ছিল পান করে ফেললাম। সকাল হলে তিনি আমাকে বললেন, "হে উম্মে আইমান! পাত্রে যা আছে, তা ঢেলে ফেলে এসো।" আমি বললাম, 'সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য-সহ প্রেরণ করেছেন! তাতে যা ছিল, আমি তো তা পান করে ফেলেছি।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন এবং তাতে তাঁর পেষক দাঁত বের হয়ে পড়ল। অতঃপর তিনি বললেন, "এর পর তোমার পেটে কোন দিন ব্যথা-বেদনা হবে না।" *(হিল্‌য়াহ)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

كان لرسول الله ﷺ فخارة يبول فيها فكان إذا أصبح يقول: يا أم أيمن صبي ما في الفخار. فقمت ليلة وأنا عطشى فغلطت فشربت ما فيها، فقال النبي ﷺ: يا أم أيمن صبي ما في الفخارة. فقلت: يا رسول الله قمت وأنا عطشى فشربت ما فيها. قال: إنك لن تشتكي بطنك بعد يومك هذا أبدًا.

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি মাটির পাত্র ছিল, তাতে তিনি পেসাব করতেন। সকাল হলে বলতেন, "উম্মে আইমান! পাত্রে যা আছে ঢেলে ফেলে এসো।" একদা রাত্রে আমি পিপাসার্ত অবস্থায় উঠলে ভুল ক'রে আমি পাত্রে যা ছিল পান করে ফেললাম। অতঃপর (সকালে) নবী ﷺ বললেন, "উম্মে আইমান! পাত্রে যা আছে ঢেলে ফেলে এসো।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি পিপাসার্ত অবস্থায় উঠে তাতে যা ছিল, তা পান করে ফেলেছি।' তিনি বললেন, "আজকের এই দিনের পর তোমার পেটে আর কোন দিন অসুখ হবে না।" *(ইতহাফুল খিয়ারাহ ৬৪৫৫নং)*

অনুরূপ উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবার দাসী উম্মে ইউসুফ বারাকাহ নামের এক মহিলা তাঁর পাত্রে রাখা প্রস্রাব পান করেছিল। তিনি তাকে বলেছিলেন, "তুমি জাহান্নাম থেকে বাঁচার একটা বেড়া বানিয়ে নিলে।"

কিন্তু প্রথমতঃ এ সকল বর্ণনা সনদসূত্রে সহীহ ও শুদ্ধ নয়।

দ্বিতীয়তঃ খোশবুদার শরবত বাড়ির মালিকের অনুমতি ছাড়া কোন দাসী পান করতে পারে না।

তৃতীয়তঃ তিনি প্রস্রাব-পায়খানার পর পানি অথবা মাটির ঢেলা ব্যবহার করতেন। *(বুখারী-*

মুসলিম) তা পবিত্র হলে ধোয়া বা মোছার প্রয়োজন হতো না।

পেশাব-পায়খানা পাক ও খোশবুদার হলে তা ফেলতে বলতেন না। সাহাবাগণ তাঁর চুল, থুথু ও উযূর পানি নেওয়ার মতো আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

আসলে তিনি আদমের সন্তান ছিলেন। আর আদম-সন্তানের প্রস্রাব-পায়খানা অপবিত্র, এটাই মৌলিক বিধান। অবশ্য কোন সহীহ দলীল অন্য কথা বললে, তা ভিন্ন কথা। এখানে বিশ্বাসের মর্মমূলে মহানবী ﷺ-কে ছোট করা বা বড় করার ব্যাপার নয়; ব্যাপার হল সহীহ দলীলের। বিনা দলীলে তাঁর কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা বিশ্বাসের মহামারী।

তাঁর দেহ ছিল মুবারক বা বর্কতময়। কিন্তু তিনি অপবিত্র হতেন। আর তার জন্য গোসল করতেন।

একদা ফজরের নামায শুরু করে সাহাবাগণকে ইঙ্গিত করলেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে অপেক্ষা কর। অতঃপর তিনি বাড়ি প্রবেশ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হয়ে এলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। অতঃপর নামায শেষ করে বললেন,

(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا).

আমি একজন মানুষই। আমি অপবিত্র ছিলাম। (গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলাম।) *(আহমাদ ২০৪২০নং)*

তিনি নামাযের জন্য উযূ করতেন। মহান আল্লাহ তাঁকে আম নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,

{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (٤) سورة المدثر

অর্থাৎ, তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। *(মুদ্দাষ্‌যির ঃ ৪)*

আর তাতে তাঁর রিসালত ও নবুঅতের শানে কোন প্রকার আঘাত লাগে না। কারণ তিনি মানুষ। আর মানুষের প্রকৃতি তাঁর মাঝে থাকা স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক কিছু থাকলে তার সহীহ দলীল আছে।

অনুরূপভাবে বর্ণনা করা হয় যে, আলী, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর, মালেক বিন সিনান, হাজাম আবূ ত্বাইবাহ ﷺ প্রভৃতি সাহাবাগণ মহানবী ﷺ-এর রক্ত পান করেছেন। তাঁদের জন্যও বলা হয়েছে, তাঁর রক্ত তাঁদের পেটে যাওয়ার কারণে তাঁদেরকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

কিন্তু সেসব ঘটনাও সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত নয়। সহীহ প্রমাণ থাকলে মানতে কোন বাধা নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থুথু দ্বারা তাবার্রুকের কথা সকলেই মানে, তাঁর চুল বা পরিহিত কাপড় দ্বারা বর্কত গ্রহণের কথা সকলেই মানে, তাঁর দেহের ঘামকে আতর ও আরোগ্য বলে সবাই মানে। যেহেতু সে সবের সহীহ দলীল আছে। আর সে সব কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

ভালোবাসার প্রতি সুবিশ্বাস ভালো, কিন্তু তাতে অতিরঞ্জন ভালো নয়। প্রিয়পাত্রের প্রতি ভক্তি রাখা ভালো, কিন্তু অতিভক্তি নিশ্চয়ই ভালো নয়।

তিনি আল্লাহর রহস্য

তিনি আল্লাহর রহস্য, আল্লাহ ও তাঁর হাবীবের মধ্যে বিদ্যমান আছে নিবিড়তা। রাসূলুল্লাহ ﷺ হলো আল্লাহ তাআলার আসমা-ই-হুস্‌না ও সিফাৎ-ই-কামালিয়াতের ছায়া।

শুধু তাই নয়, বরং তিনি আল্লাহরই ছায়া। তাঁর মাখলুকাতের অভীষ্ট সিদ্ধর জন্য কিবলা ও মহল!

তিনি তাঁকে প্রকাশ করেছেন নিজ আকৃতিতে!

তিনি আল্লাহর সমূহ তাজাল্লী বিকাশের স্থল! ইত্যাদি। *(নূরে মুজাস্সাম ১২০-১২১পৃঃ)*

তিনি আল্লাহ তাআলার জামাল ও জালালের ছায়া!

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ইরাদা-ই-আযালী ছিল যে, নিজ হাবীবকে রাহমানের সুরতে বিভূষিত করবেন; সেহেতু তিনি আদম (আঃ)-কে রাহমানের সুরতে বিভূষিত করে সৃষ্টি করলেন। আল্লাহ জাল্লা শানুহ তাঁর হাবীবকে রাহমানের সুরতে প্রকাশ করলেন; ফলে তিনি হয়ে গেলেন সিফাত-ই-জামালিয়া ও হালালিয়ার (?) অভিব্যক্তি! *(ঐ ৩৯৩পৃঃ)*

কোন্ যুক্তিতে? আদমকে রহমানের আকৃতিতে সৃষ্টি করলে তো সমগ্র মানবমন্ডলীই তাঁর ছায়া হয়। কেবল তাঁর হাবীবই কেন?

এই সকল অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তি সূফীপন্থী আলেমদের কিতাবে পাওয়া যায়। যার কোন শরয়ী দলীল নেই।

মহান আল্লাহ রাঊফ ও রাহীম। তাঁর হাবীবও রাঊফ ও রাহীম। তিনি খালেক, ইনি মাখলূক। এ কথার দলীল রয়েছে কুরআনে। তা মানতে কারো বাধা নেই।

কিন্তু মহান আল্লাহ আওয়াল, আখের, যাহের, বাত্বেন (আদি, অন্ত, ব্যক্ত ও গুপ্ত), তাঁর হাবীবও তাই।---এ কথার দলীল কোথায়? আবেগে লিখিত কোন সূফীর মনগড়া দরূদ দিয়ে স্পষ্টতই এ কথা প্রমাণিত হতে পারে? কক্ষনও না।

সূফীবাদীদের উক্ত দাবী থেকে স্পষ্ট হয় যে, মহান আল্লাহর আকৃতি মানুষের মতো। যেহেতু তিনি আদমকে নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন! অথচ এমন আকারবাদীদের ধারণা খন্ডন ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(শূরাঃ ১১)*

ওরা হয়তো বলবে, হাদীসে আছে,

(خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَن).

অর্থাৎ, আল্লাহ আদমকে রহমানের আকারে সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু এ হাদীস সহীহ নয়; বরং হাদীসটি মুনকার। *(দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ আলবানী ১১৭৫-১১৭৬নং)*

পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে আছে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ).

"তোমরা (কোন মানুষকে) মারলে চেহারায় মারা থেকে বিরত থেকো। কেননা, আল্লাহ আদমকে তাঁর আকারে সৃষ্টি করেছেন।" *(আহমাদ ৭৩২৩, মুসলিম ৬৮-২১নং)*

এই হাদীস পড়েও অনেকে ধারণা করে যে, আদমকে আল্লাহ তাঁর নিজ আকার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। যেহেতু এখানে 'তাঁর আকারে' বলতে আদমের আকারকেই বুঝানো হয়েছে। সর্বনাম নিকটতম বিশেষ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর যেহেতু অন্য হাদীসে এসেছে যে,

(خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنْ

الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ).

অর্থাৎ, আল্লাহ আদমকে তার আকারে সৃষ্টি করেছেন, যার দৈর্ঘ্য হল ষাট হাত। সুতরাং যখন তাঁকে সৃষ্টি করলেন, তখন বললেন, 'তুমি যাও এবং ঐ যে ফিরিশ্তামন্ডলীর একটি দল বসে আছে, তাদের উপর সালাম পেশ কর। আর ওরা তোমার সালামের কি জবাব দিচ্ছে তা মন দিয়ে শুনো। কেননা, ওটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তান-সন্ততির সালাম বিনিময়ের রীতি।' সুতরাং তিনি (তাঁদের কাছে গিয়ে) বললেন, 'আসসালামু আলায়কুম'। তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আসসালামু আলাইকা অরাহমাতুল্লাহ'। অতএব তাঁরা 'অরাহমাতুল্লাহ' শব্দটা বেশী বললেন। যারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, তাদের প্রত্যেকে হবে তাঁর আকারের (ষাট হাত)। তখন থেকে এ যাবৎ সৃষ্টি (মানুষের দৈর্ঘ্য) কম হয়ে আসছে।" *(বুখারী ৬২২৭, মুসলিম ৭৩৪২নং)*

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, 'তাঁর আকারে' বলতে আদমের নিজস্ব আকারকেই বুঝানো হয়েছে। যেহেতু পরবর্তীতে সেই আকারের ব্যাখ্যাও বলে দেওয়া হয়েছে।

তাঁর নিজস্ব আকার ও সৃষ্টি-পদ্ধতি ভিন্ন। তাঁকে মায়ের পেটে তাঁর সন্তানদের মত অন্য আকারের পর্যায়সমূহ অতিক্রম করতে হয়নি। বরং মহান আল্লাহ তাঁকে সরাসরি পরিপূর্ণ 'মানব' আকার সৃষ্টি ক'রে তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গতঃ জ্ঞাতব্য যে, মহান আল্লাহর আকার আছে। কিন্তু তা কেমন, তা কেউ জানে না। মহানবী ﷺ সে আকার স্বপ্নে দর্শন করেছেন। মু'মিনরা জান্নাতে মহান আল্লাহর দীদার লাভ করবে।

তাঁর দেহের ছায়া ছিল কি?

তিনি নূর হতে সৃষ্ট বলেই তাঁর দেহের ছায়া ছিল না। ওদের দাবী, ইবনে আব্বাস ؓ নাকি বলেছেন,

(لم يكن لرسول الله ﷺ ظل، ولم يقم مع شمس قط، إلا غلب ضوءه ضوء الشمس، ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوءه ضوء السراج).

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন ছায়া ছিল না। তিনি যখনই রোদে খাড়া হতেন, তখনই তাঁর আলো রোদের আলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিত। আর তিনি যখনই কোন প্রদীপের সামনে খাড়া হতেন, তখনই তাঁর আলো প্রদীপের আলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিত।

তার মানে তাঁর নূর দৃশ্যমান ছিল। কিন্তু তার কোন সহীহ প্রমাণ নেই। বরং যয়ীফ প্রমাণ দিয়েই এই ধারণাকে বাতিল করা যায়।

একদা মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় সিলাই করছিলেন। হঠাৎ সুচটি তাঁর হাত থেকে পড়ে যায়। অন্ধকারে তিনি তা খুঁজে পেলেন না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাসায় এলে তাঁর চেহারার আলোক-রশ্মিতে সুচটি দৃষ্ট হল। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হেসে উঠলেন। নবী ﷺ বললেন, "ওহে হুমাইরা! হাসলে কেন?" তিনি ঘটনা খুলে বললেন। *(হিলয়্যাহ, আবু নুআইম, ইবনে আসাকির ৩/৩১০)*

এ হাদীসে কেবল তাঁর চেহারার আলোর কথা বলা হয়েছে। পরন্তু এ হাদীসও সহীহ নয়।

অনেকে বলে তাঁর দাঁতের আলোতে ঘর উজ্জ্বল হয়ে যায়। কিন্তু বর্ণনায় তা নেই।

একবার রাত্রে এক ব্যক্তিকে তিনি কবরে রাখলেন। রাতের অন্ধকারে তাঁর জন্য প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল। *(মিশকাত ১৭০৬নং, যয়ীফ)*

তাঁর দেহে বা চেহারায় আলো থাকলে বাতি জ্বালানোর প্রয়োজন ছিল কি?

একবার বাসায় তাঁর বাতি নিভে গেলে তিনি 'ইন্না লিল্লাহি----' পড়লেন। তা শুনে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'বাতি নিভাও কি মসীবত?' তিনি বললেন, "যে জিনিসই মু'মিনকে কষ্ট দেয়, তাই হল মসীবত।" *(ইবনুস সুন্নী, যয়ীফ)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'নবী ﷺ ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, তখন দরজা বন্ধ করে দিতেন, পানির মশক বন্ধ করে দিতেন, পাত্রের পানি ঢেলে দিতেন এবং বাতি নিভিয়ে দিতেন।' *(আল-আদাবুল মুফরাদ ১২০নং, যয়ীফ)*

উক্ত হাদীসগুলি থেকেও বুঝা যায়, তাঁর বাসায় বাতির প্রয়োজন হতো। বিধায় তাঁর দেহের সেই আলো ছিল না, যার কথা ইবনে আব্বাস নাকি বলেছেন।

পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়, মহানবী ﷺ-এর দৈহিক কোন আলো ছিল না। যেমনঃ-

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সামনে ঘুমাতাম এবং আমার পা দুটি তাঁর কিবলাতে থাকত। অতঃপর যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন আমাকে হাত দ্বারা স্পর্শ করে ইঙ্গিত করতেন। আমি পা গুটিয়ে নিতাম। আবার কিয়ামে গেলে আমি পা মেলে দিতাম। আর গৃহসমূহে তখন বাতি থাকত না।' *(বুখারী ৩৮২, মুসলিম ১১৭৩নং)*

তিনি স্পর্শ করে ইঙ্গিত করার কারণ বলেছেন, ঘরে বাতি ছিল না। ফলে অন্ধকারে তিনি বুঝতে পারেননি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় যাবেন। নচেৎ হাত দিয়ে তাঁর পা স্পর্শ করার প্রয়োজন হতো না। বিধায় মহানবী ﷺ-এর দেহের কোন আলো ছিল না।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আরো বলেন, 'এক রাত্রে আমি নবী ﷺ-কে বিছানায় পেলাম না। আমি (অন্ধকারে) হাত দিয়ে হাতড়াতে লাগলাম। কিছু পরে আমার হাত তাঁর দুই পায়ের তেলোয় পড়ল, তখন তা খাড়া অবস্থায় ছিল এবং তিনি সিজদা অবস্থায় ছিলেন। *(মুসলিম ১১১৮নং)*

কালোবর্ণের একজন মহিলা অথবা যুবক মসজিদ ঝাড়ু দিত। হঠাৎ সে মারা গেলে সাহাবীগণ তাকে রাতারাতি দাফন করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সকালে দেখতে পেলেন না। সুতরাং তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, 'সে মারা গেছে।' তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন?" তাঁরা যেন তার ব্যাপারটাকে নগণ্য ভেবেছিলেন, বললেন, 'রাত ছিল তাই চাইলাম না। অন্ধকারও ছিল, তাই আপনাকে কষ্ট দিতে চাইলাম না।' তিনি বললেন, "আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও।" সুতরাং তাঁরা তার কবরটি দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি তার উপর জানাযা পড়লেন। *(বুখারী ১২৪৭, মুসলিম ২২৫৯নং)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসেছিলাম। (আব্বা) আবূ বাক্র তাঁর জন্য ছাগলের একটি ঠ্যাং হাদিয়া পাঠালেন। আমরা তা ঘরের অন্ধকারে কাটলাম।' বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনাদের কি বাতি ছিল না?' উত্তরে তিনি বললেন, 'বাতি জ্বালাবার তেল থাকলে আমরা তা ভক্ষণ করতাম।' *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩২৭৬নং)*

মোট কথা অতিরঞ্জনকারীদের এ অতিশয়োক্তি সঠিক নয় যে, মহানবী ﷺ-এর দেহে আলো ছিল এবং তাঁর দেহের ছায়া ছিল না।

মহানবী ﷺ-এর দেহ-মুবারক উজ্জ্বল ছিল। আর তার মানে এই নয় যে, তাতে দৃশ্যমান আলো ছিল। তাঁর মুখমন্ডল ছিল চাঁদের মতো। আর তার মানে এই নয় যে, তাতে চাঁদের মতোই জ্যোৎস্না বিচ্ছুরিত হতো। তাঁর চেহারা সূর্যের মতো ছিল। আর তার মানে এই নয় যে, তা হতে রৌদ্রের মতো আলো বিকীর্ণ হতো।

ঐ দেখুন না, একজন কবি আবেগবশে লিখেছেন,

بها قبة خضراء في رونق الضحى .... تلئلأ نوراً فوق بدر مكمل

'ঐ শহরে সবুজ গম্বুজ উজ্জ্বলরূপ নিয়া বিদ্যমান আছে, যাহা পূর্ণিমার চন্দ্র হইতে অধিক দীপ্ত।' *(মওলানা আযীযুল হক সাহেবের বাংলা বোখারী শরীফ ৫ম খন্ডের ভূমিকার ৩পৃঃ)*

অনুবাদে কিন্তু 'যুহা' শব্দের অনুবাদ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নচেৎ অর্থ দাঁড়াবে, 'ঐ শহরে সবুজ গম্বুজ পূর্বাহ্নের উজ্জ্বলরূপ নিয়া বিদ্যমান আছে, যাহা পূর্ণিমার চন্দ্র হইতে অধিক দীপ্ত।'

একই সাথে সবুজ গম্বুজকে চাশ্তের সময়কার ঔজ্জ্বল্যের সাথে এবং পূর্ণেন্দুর দীপ্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

কিন্তু আসলেই কি তাই? মদীনার মসজিদে নববীর যিয়ারতে গেলে দেখবেন, এটা অতিশয়োক্তি। রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থে উক্ত উপমা দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে গম্বুজ ঐরূপ উজ্জ্বল বা দীপ্ত নয়।

আরো কিছু ভিত্তিহীন আকীদা

(১) "যখন আমাকে মি'রাজে উর্ধ্বে উন্নীত করা হলো, আমি এমন কোন আসমান অতিক্রম করিনি কিন্তু তাতে আমার নাম অংকিত দেখতে পেলাম---মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" *(বাযযার)*

হাইষামী বলেছেন, 'এর সনদে রয়েছে আব্দুল্লাহ বিন ইব্রাহীম আল-গিফারী। এ হলো দুর্বল রাবী।' *(মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১৪২৯৭নং)* ইমাম শাওকানী বলেছেন, 'ঐ রাবী হলো হাদীস-নির্মাতা।' হাদীস গড়ে তার সনদ জুড়ে সমাজে প্রচলিত করে। অতএব এটি জাল হাদীস। *(আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূআহ ১/৩৩৩)*

(২) "বেহেশ্তে এমন কোন গাছ নেই যাতে পাতা আছে, কিন্তু তার প্রতি পাতার উপর অংকিত রয়েছে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" *(হিলইয়া)*

কিন্তু আবু নুয়াইম এটাকে 'গারীব' (বিরল বা দুর্বল) হাদীস বলেছেন। *(ঐ ৩/৩০৪)* হাইষামী বলেছেন, 'এর সনদে রয়েছে আলী বিন জামীল রাক্কী। এ হলো দুর্বল রাবী।' *(মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১৪৩৮৩নং)* অতএব এ হাদীসও সহীহ নয়।

(৩) "তিনি আরশের পায়াসমূহে ঐ কলেমা অংকিত দেখতে পেলেন এবং প্রতি আসমানের উপর অর্থাৎ সাত আসমানের উপর, বেহেশ্তসমূহের উপর এবং তাতে যা আছে সব কিছুর উপর; এর বালাখানাসমূহের উপর, প্রকোষ্ঠসমূহের উপর, হুর-ই-ঈনের কণ্ঠসমূহের উপর, তূবা ও সিদরাতুল মুনতাহাতে যত পত্র আছে সমূদয় পত্রের উপর, পর্দাসমূহের প্রান্তে প্রান্তে এবং ফেরেশ্তাকুলের নয়ন যুগলের মধ্যবর্তী স্থানসমূহের উপর।"

(ইবনে আসাকের, যুরকানী)

এটি কা'ব আহবার থেকে বর্ণিত। তিনি---দেখতে পেলেন, তিনি হলেন আদম ﷺ। এটি রসূল ﷺ-এর হাদীস নয়। এটিকে 'আষার' বলা হয়। 'কেহ বলেন, এটা ইসরাঈল শ্রেণীভুক্ত। কেহ বলেন, মাওজু।' আর তাঁদের কথাই ঠিক। *(আস্-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ ১/৩৫৬)* আর তা হলে তা প্রত্যাখ্যানযোগই। এ মর্মে অন্য বর্ণনা থাকলেও তা সহীহ নয়। বিধায় তা কোন কাজের নয়। শূন্যের পাশে হাজারো শূন্য আসলেও তার মূল্য শূন্যই থাকে।

(৪) "সুলাইমান বিন দাউদ (আ)-এর আংটির নক্শা ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" *(তিবরানী)*

হাইষামী বলেছেন, হাদীসটিকে ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন। আর তার সনদে রয়েছে মুহাম্মাদ বিন মাখলাদ রুআইনী, সে অত্যন্ত দুর্বল রাবী। *(মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৮-৭২৭নং)*

অন্য এক সূত্রে অনুরূপ হাদীসের বর্ণনা-সূত্রে রয়েছে শায়খ বিন আবী খালেদ। ইবনে আদী বলেছেন, 'এ বাতিল হাদীস বর্ণনা করে।' ইবনে হিব্বান বলেছেন, 'কোন অবস্থাতেই সে হুজ্জত নয়।' ইবনুল জাওযী বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীস সহীহ নয়।' *(মাওযূআত ১/২০১)*

ইমাম যাহাবী বলেছেন, 'সে (শায়খ) হাদীস তৈরি করে বলে অভিযুক্ত। এ হাদীসটি তাঁর অনেক বাতিল হাদীসের একটি।' *(মীযান ৩/৩৯২)*

আল্লামা আলবানী বলেছেন, 'হাদীসটি মাওযূ (মনগড়া)।' *(সিঃ যয়ীফাহ ৭০৩নং)*

(৫) "আল্লাহ ঈসা (আ)-এর প্রতি অহী করলেন---নিশ্চয় আমি আরশকে পানির উপর সৃষ্টি করলাম। অতঃপর তা দুলতে থাকল। অনন্তর আমি তার উপর লিখে দিলাম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অতঃপর তা স্থির হয়ে গেল। *(হাকেম, সহীহ বলেছেন)*

এটিও কিন্তু আষার। ইবনে আব্বাস ﷺ-এর কথিত উক্তি বলে বর্ণিত। আষারটির সনদকে হাকেম 'সহীহ' বলেছেন। কিন্তু ইমাম যাহাবী তার টীকায় বলেছেন, 'আমার ধারণা, সাঈদের নামে এটা গড়া উক্তি।'

মুহাদ্দিস আলবানী বলেছেন, 'মনগড়া উক্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ- থেকে এর কোন ভিত্তি নেই।' *(সিঃ যায়ীফাহ ২৮০নং)*

লাখনবী বলেছেন, 'এর সনদে রয়েছে উমার ও ইবনে আওস, জানা যায় না, সে কে?' *(আল-আষারুল মারফূআহ ১/৪৪)*

(৬) একটি বৃক্ষ মহানবী ﷺ-কে শতবার তওয়াফ করেছিল।

তাঁর মুখের লালা লবণাক্ত বা কটু পানিকেও সুস্বাদু পানীয় করে দিত।

তাঁর বগলের লোম ছিল না।

তিনি সারা জীবন একবারও হাই তোলেননি।

কখনো তাঁর স্বপ্নদোষ হয়নি।

তাঁর প্রস্রাব-পায়খানা যমীন ফেটে খেয়ে ফেলত এবং ঐ জায়গা হতে মেশক-আম্বরের খোশবু বের হতো।

তিনি পাথরের উপর চলতে গেলে পাথর গলে যেতো ও কদম মুবারকের দাগ পড়ে যেত।

তাঁর মুখমন্ডলে গাছপালার ছায়া প্রতিবিম্বিত হতো।

কিন্তু শুধু গাছপালার ছায়া কেন? প্রতিবিম্বিত হলে সম্মুখস্থ সব কিছুর ছবি প্রতিবিম্বিত

হওয়ার কথা।

আসলে এ সব কিছু দলীলহীন দাবী। এ সব অতিরঞ্জিত গুণাবলীতে মহানবী ﷺ-এর মর্যাদা বৃদ্ধি হয় ঠিকই, কিন্তু দলীলবিহীন এমন আকীদা তাঁর ব্যাপারে রাখা উচিত নয়, যাতে শির্ক অথবা বাড়াবাড়ি হয়ে বসে।

আরো কিছু অতিরঞ্জিত বিশ্বাস

মহানবী ﷺ আদমী ও মাটির তৈরি মহামানব ছিলেন। তিনি নূরের সৃষ্টি ছিলেন না।

তাঁর মাঝে মহামানবের অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক বহু গুণ ছিল, যা সহীহ দলীলভিত্তিক হলে বিশ্বাস করা জরুরী। সহীহ দলীলভিত্তিক না হলে বিশ্বাস করা বৈধ নয়।

অতিরঞ্জিত দলীলহীন বহু বিশ্বাস আমাদের সমাজের বহু মানুষের মাঝে প্রচলিত। তাঁরা বিনা দলীলে তা বিশ্বাস করে অথবা অচল দলীল দেখিয়ে নিজেদের বিশ্বাসকে সচল করতে চায়। কেউ তা না মানলে তাকে গালাগালি করে। আর এ কথা সত্য যে, যখন মানুষের বল হারিয়ে যায়, দলীল খুঁজে পায় না, তখনই সে গালি ব্যবহার করে। অথচ সভ্য আলেমের জন্য এ কাজ মোটেই সমীচীন নয়।

দলীলহীন অস্বাভাবিক কিছু বিশ্বাস পাঠকের খিদমতে উদ্ধৃত হল ঃ-

আল্লাহর নবী ﷺ-এর এক গোছা কেশ জিবরাঈলের ছয় শত পালক অপেক্ষাও শ্রেয়।

যে কাপড়ে তাঁর ঘাম লাগত, সে কাপড় আগুনে জ্বলত না।

তাঁর কথা বলার কালে নূর ঝরত। তাঁর দাঁতের আলোতে সুইও কুড়ানো যেত।

উহুদ যুদ্ধে তাঁর ক্ষরিত রক্ত হবে হুর-ই-ঈনের গন্ডদেশের রক্তিমা।

ঐ রক্ত যমীনে পড়লে কিয়ামত অবধি তাতে কোন তৃণ গজাতো না।

তাঁর ভগ্ন দানদান জিবরাঈল নিজের জন্য আল্লাহর গযব হতে মুক্তিদাতারূপে চেয়েছিলেন।

তাঁর লেবাস ও কেশরাশির উপর ধূলাবালি পড়ত না।

তাঁর কাপড় বা দেহের উপর মাছি বসত না। বসলেও তৎক্ষণাৎ মরে যেত।

তাঁর পদযুগলে কখনো ধুলোবালি লাগত না। পাথরে পা রাখলে পাথর নরম হয়ে যেতো।

উম্মে সুলাইম তাঁর ঘাম শিশিতে ভরে রাখতেন। তাঁর ঘামের খোশবূ এত তীব্র ছিল যে, শিশির মুখ খুলে গেলে সারা মদীনা আতরের খোশবুতে আমোদিত হয়ে যেত। কোন দুলহানের মাথায় ঐ ঘামের খোশবু লাগালে তার সাত পুরুষ পর্যন্ত ঐ খোশবু থেকে যেত।

তিনি যে জায়গায় ইস্তিনজা করতেন, সে জায়গা হতে খোশবু আসত। প্রস্রাব-পায়খানা যা হতো, যমীন গ্রাস করে ফেলত।

উম্মে আইমান তাঁর সুবাসিত প্রস্রাব শরবত মনে করে খেয়েছিলেন। এর বর্কতে তাঁর সাত পুরুষ পর্যন্ত কুরআনের হাফেয হয়েছিল।

আরো কত কী! (দ্রঃ নূরে মুজাস্সাম ২১৯-২২১পৃঃ)

এ সকল বিশ্বাস কোন সহীহ দলীল ছাড়া কেবল আবেগ বশে করলে আকীদায় গলদ অনুপ্রবেশ করে। সুতরাং তাওহীদের পতাকাবাহী সাবধান!

অনুরূপ মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে রাহমানের সূরতে বাশার রূপে আবির্ভূত করেছেন---এমন বিশ্বাস ভ্রান্ত। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (শূরা ঃ ১১)
এ বিভ্রান্তির নিরসন দেখুন 'তিনি আল্লাহর রহস্য' শিরোনামে।

গায়বী খবর

ইলমে গায়ব বিনা কোন অসীলা বা মাধ্যমে গুপ্ত অদৃশ্য বা ভূত-ভবিষ্যতের খবর জানাকে বলে। এরূপ জ্ঞান কোন সৃষ্টির মধ্যে নেই। একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই এ বিষয়ে সম্যক্ পরিজ্ঞাত। আল্লাহর রসূল ﷺ এমন গায়েব জানতেন না। যদি কেউ বিশ্বাস রাখে যে, এই ইলমে গায়ব বা গায়বী খবর জানার ক্ষমতা মহানবী ﷺ-এরও ছিল, তাহলে সে মুশরিক এবং কুরআন-বিরোধী।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (٣٤) سورة لقمان

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকটেই আছে কিয়ামত (সংঘটিত হওয়ার) জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। *(লুক্বমান ঃ ৩৪)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ : لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ).

অর্থাৎ, গায়বের চাবিকাঠি হল পাঁচটি, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। কেউ জানে না যে, কাল কী ঘটবে। কেউ জানে না যে, জরায়ুতে কী আছে। কেউ জানে না যে, সে আগামী কাল কী অর্জন করবে। কেউ জানে না যে, কোন্ ভূমিতে তার মৃত্যু ঘটবে। এবং কেউ জানে না যে, বৃষ্টি কখন আসবে। *(বুখারী ১০৩৯নং)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ} (٥٩) سورة الأنعام

"তাঁর নিকটেই গায়বের চাবি, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না।" *(আনআম ঃ ৫৯)*

{وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ فَانْتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ}

"তারা বলে, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয়নি কেন? সুতরাং তুমি বলে দাও, 'অদৃশ্যের খবর শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন। অতএব তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।" *(ইউনুস ঃ ২০)*

{وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا

تَعْمَلُونَ} (١٢٣) سورة هود

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে, সুতরাং তুমি তাঁর উপাসনা কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক উদাসীন নন।" *(হূদ ঃ ১২৩)*

{وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٧٧) سورة النحل

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং কিয়ামতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়; বরং তার চেয়েও সত্বর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" *(নাহল ঃ ৭৭)*

{قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (٢٦) سورة الكهف

"তুমি বল, তারা কতকাল ছিল আল্লাহই জানেন, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের (গায়বের) জ্ঞান তাঁরই।" *(কাহফ ঃ ২৬)*

আবূ হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

"যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট উপস্থিত হয়ে সে যা বলে, তা সত্য মনে (বিশ্বাস) করল, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ (কুরআনের) প্রতি কুফরী করল।" *(আহমাদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫৯৩৯নং)*

যেহেতু কুরআন বলেছে,

{قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} (٦٥)

"বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে, তা ওরা জানে না।" *(নামল ঃ ৬৫)*

আর ঐ গণক-বিশ্বাসী ধারণা করে যে, গণক গায়বের খবর জানে।

এ গেল আমভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো গায়েব না জানার কথা। তাতে সকল নবী শামিল এবং নবীকুল শিরোমণি ﷺ ও শামিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (٥٢) سورة الشورى

"এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না কিতাব কী, ঈমান কী। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর---।" *(শূরা ঃ ৫২)*

মহান আল্লাহ শেষনবী ﷺ-কে বলতে আদেশ করেছেন,

{قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ} (٥٠) سورة الأنعام

"বল, আমি তোমাদের এ বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে। অদৃশ্য (গায়বী

বিষয়) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই এবং তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্তা। আমার প্রতি যা অহী (প্রত্যাদেশ) হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।” *(আনআম ঃ ৫০)*

{قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (١٨٨) سورة الأعراف

“বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত আমার নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি গায়বের খবর জানতাম, তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।” *(আ’রাফ ঃ ১৮৮)*

{قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ} (٩) سورة الأحقاف

বল, ‘আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আর আমি জানি না যে, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে; আমি আমার প্রতি যা অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয় শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।’ *(আহক্বাফ ঃ ৯)*

{قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (٢٥) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا} (٢٧) سورة الجن

“বল, আমি জানি না, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোন দীর্ঘ মিয়াদ স্থির করবেন। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত; সে ক্ষেত্রে আল্লাহ রসূলের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন।” *(জ্বিন ঃ ২৫-২৭)*

তিনি তাঁর নবী ﷺ-কে পূর্বযুগের কিছু ইতিহাস জানিয়ে বলেছেন,

{تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} (٤٩) سورة هود

“এ সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করেছি; যা এর পূর্বে তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানত না।” *(হূদ ঃ ৪৯)*

অতঃপর আল্লাহর সম্মানিত আব্দ্ ও রসূলের জবানী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

((وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ)).

“আমি আল্লাহর রসূল। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমার জানা নেই যে, আমার ও তোমাদের সাথে কী ব্যবহার করা হবে।” *(বুখারী ২৬৮৭নং, আহমাদ ৬/৪৩৬)*

« مَا أَدْرِى أَتُبَّعٌ لَعِينٌ هُوَ أَمْ لاَ وَمَا أَدْرِى أَعُزَيْرٌ نَبِىٌّ هُوَ أَمْ لاَ ».

“আমি জানি না যে, তুব্বা অভিশপ্ত কি না এবং আমি জানি না যে, উযাইর নবী কি না।” *(আবূ দাঊদ ৪৬৭৬নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, “আমি জানি না যে, যুল-ক্বারনাইন নবী কি না এবং আমি জানি না যে, দন্ডবিধির প্রয়োগ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি না।” *(সিঃ সহীহাহ ২২১৭নং)*

« لاَ تُخَيِّرُونِى عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِى أَمْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ ».

"মূসার উপর আমাকে প্রাধান্য দিয়ো না। যেহেতু কিয়ামতের দিন মানুষ মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আমি সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠে দেখব, মূসা আরশের পায়াসমূহের একটি পায়া (অন্য এক বর্ণনা মতে আরশের এক প্রান্ত) ধরে আছেন। অতএব জানি না যে, তিনি মূর্ছিত হয়েছিলেন অথবা (আল্লাহকে দেখতে চাওয়ার সময় তূর পাহাড়ে) মূর্ছিত হওয়ার বিনিময়ে তিনি মূর্ছিত হননি।" *(বুখারী ২৪১১, মুসলিম ৬৩০২নং)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ যখন বৃষ্টি-সম্ভাবনাময় মেঘ দেখলে অগ্র-পশ্চাৎ হয়ে হাঁটাহাঁটি করতেন। অতঃপর বৃষ্টি হলে শঙ্কামুক্ত হতেন। একদা আমি বললাম, ('আপনি এমন শঙ্কাগ্রস্ত হন কেন? লোকেরা তো মেঘ দেখলে খোশ হয়।') তিনি বললেন,

وَمَا أَدْرِيْ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٢٤) سورة الأحقاف

"জানি না, হয়তো-বা তাই হতে পারে, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, অতঃপর যখন তাদের উপত্যকার দিকে তারা মেঘ আসতে দেখল, তখন তারা বলতে লাগল, 'ওটা তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে।' (হূদ বলল,) 'বরং ওটাই তো তা, যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ; এক ঝড়, যাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। *(আহক্বাফ ঃ ২৪, তিরমিযী ৩২৫৭, ইবনে মাজাহ ৩৮৯১, সিঃ সহীহাহ ২৭৫৭নং)*

একদা জিবরীল ﷺ তাঁকে কিয়ামত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন,

((مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ)).

"এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত জিজ্ঞাসক অপেক্ষা অধিক অবগত নয়।" *(বুখারী, মুসলিম ৮, আবূ দাউদ ৪৬৯৫, তিরমিযী ২৬১৩, মিশকাত ২নং)*

এক বিবাহ-আসরে রসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতে কতকগুলি ছোট ছোট বালিকা (মার্জিত) গীত গাচ্ছিল। এক ছত্রে তারা বলল, 'আমাদের মাঝে এমন নবী আছেন, যিনি আগামী কালের খবর জানেন।' তা শুনে তিনি বললেন,

(لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ).

"এটা বলো না, পূর্বে যা বলছিলে তাই বল।" *(বুখারী ৫১৪৭, মুসলিম ৩১৪০ নং)*

প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র চরিত্রে কলঙ্ক রটলে তিনি মর্মাহত হলেন। গায়বের খবর জানলে রটা খবরে তিনি কর্ণপাত করতেন না। অতঃপর পবিত্রতার সাক্ষ্য নিয়ে সূরা নূরের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হলে নিঃসন্দেহে তিনি বুঝলেন যে, আয়েশা পবিত্রা। *(বুখারী ২৬৬১, মুসলিম ২৭৭০নং)*

তিনি স্ত্রী যয়নাবের নিকট প্রত্যহ মধু পান করতেন। সপত্নী আয়েশা ও হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) পরামর্শ করলেন যে, তাঁদের নিকট তিনি এলে প্রত্যেকেই তাঁকে বলবেন, 'আপনার নিকট মাগাফীর (এক প্রকার গাছ হতে নিঃসৃত মিষ্ট আঠালো রস)এর গন্ধ পাচ্ছি। আপনি মাগাফির খেয়েছেন।' বললেনও তাই। তিনি তাঁদের এ কথায় বিশ্বাস করে (যয়নাবের নিকট) মধু খাওয়া হারাম করলেন। যার উপর আয়াত অবতীর্ণ হল,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١)

"হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশী করার জন্য তা অবৈধ করছ কেন?" *(তাহরীম ঃ ১, বুখারী ৫২৬৭নং)*

সুতরাং তিনি গায়েব জানলে স্ত্রীদের কথায় হালালকে হারাম করতেন না।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

{وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} (٣) التحريم

"স্মরণ কর, নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল। অতঃপর তার সে স্ত্রী তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। নবী এ বিষয়ে তার সে স্ত্রীকে কিছু বলল এবং কিছু বলল না। নবী যখন তা তাকে জানাল, তখন সে বলল, 'আপনাকে কে অবগত করল?' নবী বলল, 'আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক্ অবগত।" *(তাহরীম ঃ ৩)*

আল-কুরআনের এই বর্ণনা থেকেও বুঝা যায় যে, তিনি গায়েব জানতেন না। যেহেতু যিনি গায়বের খবর জানেন এবং সব খবর রাখেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা অনর্থক যে, 'আপনাকে কে অবগত করল?' বা 'আপনি কীভাবে জানলেন?'

হিজরতের সফরে তিনি রাহবার সাথে নিয়েছিলেন। গায়বের খবর জানলে তার দরকার হতো না।

৬ষ্ঠ হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় চৌদ্দশ সাহাবায়ে কিরাম সহ উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করেন। কিন্তু মক্কার সন্নিকটে হুদাইবিয়া নামক স্থানে কাফেররা নবী করীম ﷺ-কে বাধা দেয় এবং তাঁকে উমরাহ করা থেকে বিরত রাখে। তিনি উষমান ؓ-কে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে মক্কায় পাঠান। যাতে তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা ক'রে তাদেরকে মুসলিমদের উমরাহ করার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু উষমান ؓ-এর মক্কা গমনের পর তাঁর শহীদ হওয়ার গুজব রটে যায়। তাই নবী ﷺ উষমান ؓ-এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামদের কাছে 'বাইআত' (শপথ) গ্রহণ করেন। যেটাকে 'বায়আতে রিযওয়ান' বলা হয়। পরে এ গুজব ভুল প্রমাণিত হয়। মহানবী ﷺ গায়বের খবর জানলে তা হতো না।

এক সফরে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র হার হারিয়ে গেল। একদল সাহাবার খোঁজাখুঁজির পরও তা পাওয়া গেল না। অবশেষে কুচ করার সময় উটের নিচে তা পাওয়া গেল। তিনি গায়েব জানলে অনর্থক খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট করতেন না।

তবুক অভিযানে তাঁর এক উট নিরুদ্দেশ হল। যায়দ বিন নুসাইব মুনাফিক বলল, 'মুহাম্মাদ নবী হওয়ার দাবী ক'রে আসমানের খবর বলে দেয়, অথচ তার উট কোথায়, তা তার জানা নেই!' তিনি বললেন, "এক ব্যক্তি এই কথা বলে। আল্লাহর কসম! তিনি যা জানান, তা ব্যতীত আমার অন্য কিছু জানা নেই। *(আসাহহুস সিয়ার ৩২৪পৃঃ)*

অনুরূপভাবে তিনি গায়েব জানলে বি'রে মাউনায় ৭০ জন কারী শহীদ হতেন না এবং তাঁর অন্যান্য সকল বিপদ থেকে বাঁচার পথ পূর্বেই জানতে পারতেন।

তিনি যদি গায়বী খবর জানতেন, তাহলে কোন কোন সিদ্ধান্ত মহান আল্লাহর ইচ্ছা বা

বাস্তবের বিপরীত হতো না। যেমন বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে, জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে, এক ইয়াহুদীকে চোর সাব্যস্ত করার ব্যাপারে, খেজুরের পরাগ-মিলন সাধন করার ব্যাপারে ইত্যাদি।

তিনি গায়ব জানতেন না বলেই বিচারের সময় সতর্ক করে বলেছেন,

(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا).

"আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা (বিবাদ করে) ফায়সালার জন্য আমার নিকট আসো। হয়তো তোমাদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় অধিক বাক্‌পটু। আর আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি। সুতরাং আমি যদি কাউকে তার (মুসলিম) ভাইয়ের হক তার জন্য ফায়সালা করে দিই, তাহলে আসলে আমি তার জন্য আগুনের টুকরা কেটে দিই।" *(বুখারী ২৪৫৮, মুসলিম ৪৫৭২নং)*

এতদ্ব্যতীত আরো বহু পাক্কা দলীলের ভিত্তিতেই আহলে সুন্নাহ উপরোক্ত আক্বীদাহ রাখে। তাই ফাতাওয়া কাযীখান (৪/৪৬৯)তে বলা হয়েছে, 'ইলমে গায়েবের দাবীদার কাফের।' শারহে ফিকহে আকবার (১৮৪পৃঃ)তে বলা হয়েছে, 'আম্বিয়াগণ গায়েবের খবর জানতেন না।' দুর্রে মুখতার (১/১৭) এবং মুক্বাদ্দামাহ হিদায়াহ (১/৫৯)তে বলা হয়েছে, 'ইলমে গায়েব আল্লাহ ছাড়া আর কোন মখলূকের নেই।'

পক্ষান্তরে গায়েব জানা নবুঅতের পরিপূরক কোন অংশ বা বিষয় নয়। তিনি গায়েব জানতেন না বললে তাঁর মর্যাদা ও নবুঅতের কোন প্রকার হানি হয় না। যেহেতু গায়েব জানা একমাত্র আল্লাহর গুণ ও বৈশিষ্ট্য। তাই তাতে কোন ফিরিশ্তা, নবী, অলী বা অন্য কেউ শরীক নয়। সেহেতু এই আকীদা প্রমাণ ও পোষণ করা এবং বিশ্বাস রাখা মহানবী ﷺ-এর প্রতি কোন প্রকার বেয়াদবি নয়। তাঁর মান ও শান হ্রাস করা নয়। বরং তাঁর ও তাঁর নির্দেশের প্রতি যথার্থ আদব এবং আল্লাহর তাওহীদের উপর পূর্ণ ঈমান।

পক্ষান্তরে যদি কেউ কোন অসীলার মাধ্যমে কোন অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ ক'রে থাকে, তবে তা গায়ব জানা নয়। অতএব যদি কেউ ফিরিশ্তার সাহায্যে (আম্বিয়াগণের জন্যই নির্দিষ্ট) অদৃশ্য বা ভূত-ভবিষ্যতের খবর বলে থাকেন, তবে তা ইলমে গায়েব নয়।

এমন খবর, যা আসলে গায়বের, কিন্তু অহী মারফৎ নবীকে জানানো হয়েছে। এমন অনেক গায়বী খবর তিনি জানতেন। যেহেতু তা তাঁকে জানানো হয়েছে।

নবীগণের অহী সাধারণতঃ ৬ প্রকার হয়ে থাকে। আর তার মধ্যে যে কোন একটি উপায়ে তাঁরা গায়বের খবর জেনে থাকেন।

১। সত্য স্বপ্ন ঃ স্বপ্নের মাধ্যমে নবীকে কোন বিষয় জানিয়ে দেওয়া হতো।

২। জিবরীল দেখা না দিয়ে অদৃশ্য অবস্থান থেকেই নবীর অন্তরে কোন বিষয় প্রক্ষিপ্ত হতো।

৩। জিবরীল মানুষের আকৃতি ধারণ করে সরাসরি নবীর সাথে কথা বলতেন।

৪। অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় ঘন্টার শব্দের মতো 'টুনটুন' শব্দ হতো। নবীর শরীর ভারী ও ঘর্মসিক্ত হতো।

৫। নবী কোন কোন সময় জিবরীলকে তাঁর সৃষ্টিগত আকৃতিতে দর্শন করতেন।

৬। পর্দার অন্তরাল থেকে মহান আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন। *(বাংলা আর্রাহীকুল মাখতূম ১৩৩-১৩৪পৃঃ দ্রঃ)*

অদৃশ্য বা গায়বের খবর আল্লাহই জানেন, তবে তিনি উপর্যুক্ত কোন অসীলায় কাউকে জানালে, তিনি তা জানতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء} (١٧٩) سورة آل عمران

"অপবিত্র (মুনাফিক)কে পবিত্র (মু'মিন) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, আল্লাহ সে অবস্থায় বিশ্ববাসিগণকে ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা আল্লাহর (নিয়ম) নয়। অবশ্য (তার জন্য) আল্লাহ তাঁর রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।" *(আলে ইমরান ঃ ১৭৯)*

{عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا} (٢٧) سورة الجن

"তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে তিনি রসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন।" *(জ্বিন ঃ ২৬-২৭)*

{وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا} (١١٣)

"আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না, তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর তোমার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।" *(নিসা ঃ ১১৩)*

{ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} (٤٤) سورة آل عمران

"এ অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা তোমাকে অহী (ঐশীবাণী) দ্বারা অবহিত করছি। তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন মারয়্যামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে নেবে (তা দেখার জন্য) তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল এবং যখন তারা (এ ব্যাপারে) বাদানুবাদ করছিল, তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না।" *(আলে ইমরান ঃ ৪৪)*

{تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} (٤٩) سورة هود

"এটা হচ্ছে অদৃশ্য সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার কাছে অহী (প্রত্যাদেশ) মারফত পৌঁছিয়ে দিচ্ছি, ইতিপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার সম্প্রদায় জানত। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম সংযমশীলদের জন্যই।" *(হূদ ঃ ৪৯)*

{ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ } (١٠٢)

"এটা অদৃশ্য লোকের সংবাদ যা তোমাকে আমি অহী দ্বারা অবহিত করছি; ষড়যন্ত্রকালে যখন তারা মতৈক্যে পৌঁছে ছিল, তখন তুমি তাদের নিকট ছিলে না।" *(ইউসুফ ঃ ১০২)*

জ্ঞানের সাগর মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত বহু 'গায়বী খবর' জানতেন এবং জানাতেন। সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর তিনি সংক্ষিপ্ত কথায় প্রকাশ ক'রে গেছেন। ভূত-ভবিষ্যতের অনেক খবর তিনি প্রশ্নের উত্তরেও বলতেন। তিনি যে খবরই দিয়েছেন তা সূর্যবৎ সত্যরূপে ঘটেছে, বাস্তবে বর্তমানে ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে।

ইসরা’ ও মি’রাজ ভ্রমণের পরে মুশরিকরা তা মিথ্যা মনে ক’রে সত্যতার প্রমাণ চেয়ে তাঁকে বায়তুল মাক্বদেসের নকশা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি মক্কা থেকেই তার ছবি দেখে পূর্ণরূপ বর্ণনা দিয়েছিলেন।

বদর যুদ্ধের পূর্বেই কোরাইশদলের কার কোথায় বধ্যভূমি হবে, তার নাম ও স্থান চিহ্নিত করেছিলেন। *(মিশকাত ৫৮৭১নং)*

খায়বারের এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁকে আমন্ত্রিত করে বিষ-মিশ্রিত মাংস খেতে দিয়েছিল, তা তিনি জানতে পেরেছিলেন। *(মিশকাত ৫৯৩১নং)*

মুসলিমদের গুপ্ত রহস্য ও যুদ্ধ-প্রস্তুতি সম্বলিত এক গোপন পত্র সহ এক মহিলা মুশরিকদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে যাচ্ছিল, তার খবর জানিয়ে সাহাবা পাঠিয়ে তা প্রতিহত করেছিলেন।

মুতা অভিযানে জা’ফর ও যায়দের ﷺ শহীদ হওয়ার সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেউ ফিরে আসার পূর্বেই মদীনায় অবস্থান করেই সকলকে জানিয়েছিলেন। *(বুখারী ৩৬৩০নং)*

একজন মুজাহিদের জন্য বলেছিলেন যে, সে জাহান্নামী। সাহাবাগণ খবর নিয়ে দেখেন, সে আত্মহত্যা করে মারা যায় এবং তার ফলে সে জাহান্নামী হবে।

তাঁর ইন্তিকালের পর আহলে বায়তের মধ্যে ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র প্রথম মৃত্যু হবে, তা তিনি জানিয়েছিলেন।

তিনি পূর্বেই বলেছিলেন, আম্মারকে এক বিদ্রোহী গোষ্ঠী হত্যা করবে। তাই ঘটেছে।

উষমান ﷺ-এর ফিতনার বিষয়ে যা বলেছিলেন, তাই ঘটেছে।

হাসান বিন আলী ﷺ-এর হাতে মুসলিমদের বিরাট দুই দলের মাঝে শান্তি স্থাপন হওয়ার খবরও সত্য ঘটেছে।

ইত্যাকার বহু বিষয়ের ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের খবর তিনি জেনেছিলেন ও জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ সব কিছু অহী (জিবরীল, স্বপ্ন বা ইলহাম) মারফৎ।

এ বিষয়ে মোট কথা হল, তিনি গায়ব জানতেন না। গায়ব জানা মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। তবে তাঁকে জানানো বহু গায়বের খবর তিনি জানতেন। এটা তাঁর বিশাল মর্যাদা।

স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

তাঁর কবরের মর্যাদা

তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর কবরের মর্যাদা অবশ্যই সকল কবরের মর্যাদা অপেক্ষা বেশি। কিন্তু আবেগময় অতিরঞ্জনকারীরা বলেন,

بها مرقد المولى الكريم محمد ...... يفوق على العرش المعلى ويعتلي

‘সেই গম্বুজের ভিতরই রহিয়াছে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের শয্যাস্থান---তাঁহার শয্যার ভূখন্ডের মর্যাদা আরশ অপেক্ষা অধিক।’ *(মওলানা আযীযুল হক সাহেবের বাংলা বোখারী শরীফ ৫ম খন্ডের ভূমিকার ৩পৃঃ)*

যদিও অনুবাদে ‘আল-মাওলাল কারীম’, ‘আল-মুআল্লা’ ও ‘য়্যা’তালী’ শব্দগুলির অনুবাদ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আসল অনুবাদ হবে, ‘সেই গম্বুজের ভিতরই রহিয়াছে মাওলা কারীম মুহাম্মাদ (স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম)এর শয্যাস্থান---তাঁহার শয্যার ভূখন্ডের মর্যাদা সুউচ্চ আরশ অপেক্ষা অধিক ও উচ্চ।’

সাধারণ মানুষেও অনুমান করতে পারে যে, মহান আল্লাহ আরশে আছেন। যে আরশকে মহান আল্লাহ 'আযীম', 'কারীম' ও 'মাজীদ' বলেছেন, যে আরশের উপর তিনি সমাসীন, সে আরশের মর্যাদাকে সেই কবর থেকে ছোট করা, যে কবরে মহানবী ﷺ শয়ন করে আছেন। এমন আবেগাপ্লুত প্রশংসায় কি মহান আল্লাহকে ছোট করা হয় না?

আবেগে ও প্রেমের উচ্ছৃঙ্খল ভাষায় জীবন-সঙ্গিনীকে 'জান-প্রাণ' অনেক কিছু বলা যায়, তা বলে প্রশংসা করতে করতে তাকে 'মাতাজান' বলা যায় না। সব কিছুর একটা সীমা আছে। প্রশংসারও সীমা থাকা দরকার।

কা'ব আল-আহবার ﷺ বলেছেন, 'এমন কোন দিন উদয় হয় না, যখন সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা অবতরণ না করেন; তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর-ই-আত্‌হারকে পরিবেষ্টন করে ফেলেন; তাঁরা পক্ষসমূহ (বিস্তারের উদ্দেশ্যে) মারতে থাকেন, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত আরজ করতে থাকেন। যখন সন্ধ্যা হয়, তাঁরা (আসমানে) আরোহণ করেন এবং তাঁদেরই সমসংখ্যক (অর্থাৎ সত্তর হাজার) নতুন ফেরেশ্‌তা অবতরণ করেন; অতঃপর তাঁরা ঐ কাজই করে থাকেন, যা পূর্ববর্তীরা করেছেন। এ ধারায় তাঁদের অবতরণ, সালাত প্রেরণ ও পুনঃ আসমানে আরোহণ চলতেই থাকবে যাবত দ্বিতীয় শিঙা ফুৎকারের পর যমীন তা হতে বিদীর্ণ না হয়ে যায়। তখন বহির্গত হবেন কবর হতে আর সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা তাঁকে নিয়ে হাশর মাঠের প্রতি চলবেন।' *(দারেমী)*

উক্ত আষারে মহানবী ﷺ-এর কবর এবং তাঁর প্রতি দরূদ পড়ার মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয়। সাহাবীর বর্ণনায় কিন্তু তেমন অতিরঞ্জন নেই, যেমন পরবর্তী সূফীপন্থীরা করে থাকে।

অনেকে তাঁর কবরের তাওয়াফ করে। অনেকে মা আয়েশার বাসার রেলিং ছুয়ে মুখ-বুক মাসাহ করে অথবা হাত চুম্বন করে, রেলিং-এর সাথে গাল বা বুক-পেট লাগায়, অনেকে ফিরার সময় কবরকে পিছন করে না। অনেকে কবরকে সামনে করে নামায পড়ে। যাদের মনে শির্ক-বিদআতের ভূত বাসা বেঁধে আছে, তারা আরো অনেক কিছু করে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী ﷺ-এর যথার্থ সম্মান করার তওফীক দিন এবং অতিরঞ্জনকারীদের অত্যুক্তি থেকে আমাদের ঈমান ও আকীদাকে নির্মল রাখুন। আমীন।

তাঁকে কি সিজদা করা যায়?

ভক্তদের অবস্থা এমনও হয় যে, ভক্তির আতিশয্যে ভক্তিভাজনকে সিজদা করতে চায়। এক মহিলা উর্দু কবি বলেছেন,

"গার তুঝে সিজদা কারুঙ্গী তো 'কাফের' কাহেঙ্গে লোগ,
লেকিন কোন সোচতা হ্যায়, তুঝে দেখনে কে বা'দ?"

এমনটা হয় বলেই মুশরিকদের মাঝে সিজদার প্রচলন আছে। কেউ মনে করে তার ভক্তিভাজন স্বয়ং ভগবান। আবার কেউ মনে করে তিনি ভগবানের ছায়া, ভগবানের সমতুল।

পূর্ববর্তী নবীদের কারো কারো শরীয়তে 'তা'যীমী সিজদা' বৈধ ছিল। যেমন ইউসুফ ﷺ নিজ পিতামাতাকে সিজদা করেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদী শরীয়তে তা হারাম হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ

إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (٣٧) سورة فصلت

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র । তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; বরং সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব) কর। *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৭)*

সুলাইমান নবীর সঙ্গী পাখি হুদহুদ বলেছিল,

{وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ} (٢٤) سورة النمل

অর্থাৎ, আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদাহ করছে। শয়তান ওদের নিকট ওদের কার্যাবলীকে সুশোভন করেছে এবং ওদেরকে সৎপথ হতে বিরত রেখেছে, ফলে ওরা সৎপথ পায় না।' *(নাম্‌ল ঃ ২৪)*

মুসলিমদের প্রথম নির্যাতিত দলটি হাবশায় হিজরত করলে তাঁদের সন্ধানে সেখানকার বাদশার কাছে উপঢৌকন-সহ কুরাইশ আম্র বিন আস ও উমারাহ বিন অলীদকে প্রেরণ করল। তারা বাদশার কাছে গিয়ে তাঁকে সিজদা করল এবং একজন ডানে ও অন্যজন বামে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলতে লাগল, 'আমাদের কিছু পিতৃব্য-পুত্র আপনার রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং আমাদের ও আমাদের দ্বীন থেকে বৈমুখ হয়েছে।'

বাদশা বললেন, 'কোথায় তারা?'

তাঁরা আনীত হলে জা'ফর তাঁদের তরফ থেকে প্রতিনিধি হয়ে বাদশার সম্মুখে এসে সালাম করলেন, সিজদা করলেন না। লোকেরা বলল, 'কী ব্যাপার তোমার? তুমি বাদশাকে সিজদা করলে না কেন?'

তিনি বললেন, 'আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করি না।'

বাদশা বললেন, 'সে কী?'

তিনি বললেন, আল্লাহ আমাদের নিকট একজন রসূল পাঠিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে সিজদা না করি, নামায পড়ি, যাকাত দিই----।' *(সঃ সীরাহ নববিয়্যাহ ১৬৫পৃঃ)*

ভক্তির কারণেই কোন কোন সাহাবী মহানবী ﷺ-কে সিজদা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাথে সাথে তিনি নিষেধ করে জানিয়ে দিয়েছেন, 'আল্লাহ ছাড়া সিজদা হারাম।'

আব্দুল্লাহ বিন আবী আউফা ﷺ বলেন, "মুআয যখন শাম (দেশ) থেকে ফিরে এলেন তখন নবী ﷺ-কে সিজদা করলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "একি মুআয?" মুআয বললেন, 'আমি শাম গিয়ে দেখলাম, সে দেশের লোকেরা তাদের যাজক ও পাদ্রীগণকে সিজদা করছে। তাই আমি মনে মনে চাইলাম যে, আমরাও আপনার জন্য সিজদা করব।' তা শুনে তিনি বললেন "খবরদার! তা করো না। কারণ, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সিজদা করতে কাউকে আদেশ করতাম, তাহলে মহিলাকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। সেই সত্তার শপথ; যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে! মহিলা তার প্রতিপালক (আল্লাহর) হক ততক্ষণ আদায় করতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার স্বামীর হক (অধিকার) আদায় করেছে। (স্বামীর অধিকার আদায় করলে তবেই আল্লাহর অধিকার আদায় হবে, নচেৎ না।) এমন কি সে যদি (সফরের জন্য) কোন বাহনে আরোহিণী

থাকে, আর সেই অবস্থায় স্বামী তার দেহ-মিলন চায় তাহলে স্ত্রীর, 'না' বলার অধিকার নেই।" *(ইবনে মাজাহ ১৮৫৩, আহমাদ ৪/৩৮১, ইবনে হিব্বান ৪১৭১, হাকেম ৪/১৭২, বায্যার ১৪৬১, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২০৩নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, কাইস বিন সা'দ বলেন, আমি হীরাহ গেলাম। সেখানকার লোকেদেরকে দেখলাম, তারা তাদের সর্দারকে সিজদা করছে। তাই আমি (মনে মনে) বললাম, 'রাসূলুল্লাহ সিজদার বেশি হকদার।' অতঃপর নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, 'আমি হীরাহ গেলাম। দেখলাম, সেখানকার লোকেরা তাদের সর্দারকে সিজদা করছে। সুতরাং আপনি হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সিজদার বেশি হকদার।' তিনি বললেন,

(أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟)

"কী রায় তোমার, আমার কবরের পাশ দিয়ে গেলে তুমি কি তা সিজদা করবে?"

আমি বললাম, 'না।'

তিনি বললেন,

(فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ).

"তোমরা তা করো না। যদি আমি কাউকে অপরজনকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে মহিলাদেরকে আদেশ করতাম, তারা যেন তাদের স্বামীকে সিজদা করে। যেহেতু আল্লাহ তাদের উপর (তাদের স্বামীদের বহু) অধিকার রেখেছেন।" *(আবূ দাঊদ ২১৪০নং)*

মহানবী ﷺ সাহাবী কাইস বিন সা'দকে এই বলে সতর্ক করেছেন যে, যার পরিণাম হল মৃত্যু এবং ঠিকানা হল কবর, যে মারা যাবে ও যাকে দাফন করা হবে, সে সিজদার যোগ্য নয়। একমাত্র সিজদার হকদার হলেন তিনি, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, যাঁর কোন মৃত্যু নেই। *(তাকবিয়াতুল ঈমান আরবী ১৫১পৃঃ)*

আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, মদীনার আনসারদের এক লোকের বাড়িতে একটি সেচক উট ছিল। হঠাৎ করে সে তার পিঠে কাউকে চড়তে দিচ্ছিল না। সে বাড়ির লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আমাদের একটি উট আছে, তার দ্বারা আমরা পানি তুলে জমি সেচ করি। এখন তাকে ব্যবহার করা কঠিন হয়ে গেছে। সে আমাদেরকে তার পিঠেও চড়তে দেয় না। ক্ষেতের ফসল ও খেজুর গাছে সেচ দেওয়ার সময় হয়েছে। (কী করা যায়?)

নবী ﷺ সাহাবাগণকে বললেন, "চলো দেখে আসি।" সুতরাং তাঁরা গিয়ে বাগানে প্রবেশ করলেন। উটটি তার এক প্রান্তে ছিল। নবী ﷺ তার দিকে অগ্রসর হলেন। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ও এখন কুকুরের মতো হয়ে আছে। আমাদের ভয় হচ্ছে, ও আপনাকে আক্রমণ করবে।' তিনি বললেন, "ও আমার কোন ক্ষতি করবে না।"

সুতরাং উটটি যখন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর দিকে তাকিয়ে দেখল, তখন তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর সামনে সিজদায় পতিত হল! রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কপালে ধরলে সে সবচেয়ে শান্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি তাকে কাজে প্রবেশ করালেন।

এ ঘটনা দর্শন করে সাহাবাগণ তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ একটি পশু, যার জ্ঞান-বুদ্ধি নেই, সে আপনাকে সিজদা করছে! আর আমরা তো জ্ঞান-বুদ্ধি রাখি। সুতরাং আমরা আপনাকে সিজদা করার বেশি হকদার।'

তিনি বললেন,

(لاَ يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلَحَ أَنْ يَسْجُدَ بَشَرٌ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عُظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسَ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ).

"কোন মানুষের জন্য কোন মানুষকে সিজদা করা সঙ্গত নয়। কোন মানুষের জন্য কোন মানুষকে সিজদা করা সঙ্গত হলে আমি মহিলাকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে। যেহেতু তার উপর স্বামীর বিশাল অধিকার রয়েছে। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, স্বামীর পা থেকে মাথার সিঁথি পর্যন্ত যদি এমন ঘা থাকে, যাতে রক্ত-পুঁজ ঝরে পড়ছে, অতঃপর তা যদি স্ত্রী চাটে, তবুও তার অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে না। *(আহমাদ ১২৬১৪, নাসাঈ, বাযযার, সঃ তারগীব ১৯৩৬নং)*

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহর পরে মহানবী ﷺ-এর মর্যাদা। তবুও তিনি স্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি। তাঁকেই সিজদা করতে হবে এবং তাঁরই জন্য যাবতীয় ইবাদত নিবেদন করতে হবে। নবী ﷺ-এর জন্য তার কিছু নিবেদন করলে তা শির্ক হবে।

অনুমেয় যে, তাঁর কবর সিজদা করা যদি শির্ক হয়, তাহলে অন্যান্যের মাযারকে সিজদা করা কী হতে পারে?

তাঁকে কি অসীলাহ মানা যায়?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٣٥)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(মায়িদাহ ঃ ৩৫)*

যে অসীলায় তিনি রাজী হন; সমস্ত মুফাস্‌সিরগণের মতে সেই অসীলার অর্থ আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য, নেক আমল ও মহব্বত। *(তফসীর ইবনে কাষীর ২/৫২, যাদুল মাসীর ২/৩৪৮, তফসীর সা'দী ২/২৮৫, আদ্দুর্রুল মানষূর ৩/৭১, সঃ তাঃ ১/৩৪০, তাফসীরুল মানার ৬/৩৬৯)*

কাউকেও জান্নাত লাভের অসীলা বা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের অসীলা মানা এবং তার কাছে প্রার্থনা করা বা তার উপর ভরসা রাখা শির্ক। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ﷺ-কেও সেই অসীলা মানা যাবে না।

দুআর ক্ষেত্রেও সরাসরি আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। কারো অসীলায় দুআ করা বৈধ নয়। তবে দলীলের ভিত্তিতে ৩ প্রকার অসীলায় দুআ করা বৈধ ঃ-

১। মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অসীলা।

২। নিজের নেক আমলের অসীলা।

৩। কোন জীবিত নেক ব্যক্তির নিকট দুআর আবেদন জানিয়ে দুআর অসীলা।

মহানবী ﷺ-এর কাছে দুআর আবেদন জানিয়ে তাঁর দুআর অসীলায় অনেক সাহাবী প্রার্থনা করে উপকৃত হয়েছেন। তবে তাঁর ইন্তিকালের পরে তাঁর কবরের কাছে গিয়ে কেউ তাঁকে অসীলা মানেননি। উমার ؓ তাঁর ইন্তিকালের পরে তাঁর জীবিত চাচা আব্বাস ؓ-এর

দুআর অসীলায় বৃষ্টি-প্রার্থনা করেছেন।

পক্ষান্তরে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর অসীলায় আদম নবী ﷺ-এর ক্ষমা-প্রার্থনার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, আদম যখন পাপ করেন, তখন তিনি বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! মুহাম্মাদের অসীলায় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও।' আল্লাহ বললেন, 'হে আদম! তুমি মুহাম্মাদকে চিনলে কীভাবে, অথচ আমি এখনো তাকে সৃষ্টিই করিনি? আদম বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যখন আমাকে তোমার হাত দিয়ে সৃষ্টি কর এবং আমার মাঝে তোমার রূহ ফুঁকো, তখন আমি মাথা তুলে দেখি, আরশের পায়ায় লেখা আছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। তখন আমি জানি যে, তুমি তোমার নামের পাশে সেই ব্যক্তির নামই যোগ করেছ, যে তোমার সবচেয়ে প্রিয়তম সৃষ্টি।' আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাকে ক্ষমা ক'রে দিলাম। আর মুহাম্মাদ না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টিই করতাম না।' *(হাকেম প্রমুখ, সিঃ যয়ীফাহ ২৫নং)*

উক্ত হাদীসটি জাল ও গড়া হাদীস। পক্ষান্তরে আদম-হাওয়ার পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার দুআ আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি, তাঁরা বলেছিলেন,

{رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٢٣) الأعراف

অর্থাৎ, তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' *(আ'রাফ ঃ ২৩)*

অসীলাহ মানে মাধ্যম। আমরা মহানবী ﷺ-কে অসীলাহরূপে পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করি না। আমরা দুআতে যে 'অসীলাহ' চাই তার অর্থ জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা। আর তা মহানবী ﷺ-এর জন্য প্রার্থনা করার ফলে লাভ হবে তাঁর শাফাআত বা সুপারিশ।

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে,

« إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِىَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِى إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِىَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ ».

"তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন (আযানের উত্তরে) মুআয্যিন যা কিছু বলবে, তোমরাও ঠিক তাই বলবে। তারপর আযান শেষে আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে তার প্রতি আল্লাহ দশটি রহমত নাযেল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'অসীলা' প্রার্থনা করবে। কারণ, 'অসীলা' হচ্ছে জান্নাতের এমন একটি স্থান, যা সমস্ত বান্দার মধ্যে কেবল আল্লাহর একটি বান্দা (তার উপযুক্ত) হবে। আর আশা করি, আমিই সেই বান্দা হব। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য (আমার) সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।" *(মুসলিম ৮৭৫নং)*

আযান শোনার পর তাঁর জন্য 'অসীলা' প্রার্থনা করার দুআ শিখিয়ে দিয়েছেন মহানবী ﷺ। তিনি বলেছেন,

(مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

"যে ব্যক্তি আযান শুনে (আযানের শেষে) এই দুআ বলবে, অর্থাৎ, হে আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু! মুহাম্মাদ ﷺ-কে তুমি অসীলা (জান্নাতের এক উচ্চ স্থান) ও মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ।

সে ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।" *(বুখারী ৬১৪নং)*

সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, মহানবী ﷺ আমাদের পরিত্রাণের অসীলা বা মাধ্যম নন, তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য সুপারিশকারী।

তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা

আমরা নামাযের প্রত্যেক রাকআতে বলি,

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}

অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। *(সূরা ফাতিহা)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إذَا سَأَلْتَ فَاسأَل الله ، وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ)).

অর্থাৎ, যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। *(আহমাদ ২৬৬৯, তিরমিযী ২৫১৬, ত্বাবারানী, হাকেম ৬৩০৩, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৯৫নং)*

তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর অসীলা ধরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করাও বৈধ নয়। এ কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, যার কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে, তার মধ্যে ৩টি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। অন্যথা একটি শর্ত অবিদ্যমান থাকলে তার কাছে সে সাহায্য চাওয়া শির্ক হবে।

১। যার কাছে সাহায্য চাওয়া হবে, তাকে এ জগতে জীবিত থাকতে হবে।

সুতরাং যাঁরা মধ্য জগতে বা আল্লাহর কাছে জীবিত আছেন অথবা এ জগতের দেহত্যাগ করেছেন বা মারা গেছেন, তাঁদের কাছে চাওয়া বৈধ নয়। বারযাখী বা কবর-জগৎ থেকে কেউ এ জগতের ফরিয়াদ বা ডাক শুনতে পায় না, সে কথাও যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

২। যার কাছে সাহায্য চাওয়া হবে, তাকে উপস্থিত থাকতে হবে।

সুতরাং এ জগতে জীবিত থাকলেও যদি কেউ সামনে উপস্থিত না থাকে, তাহলে তার কাছেও সাহায্য-প্রার্থনা করা বৈধ নয়।

৩। যে সাহায্য চাওয়া হবে, তার তা দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে।

যে জিনিস কেবল আল্লাহই দিতে পারেন, সে জিনিস অন্যের কাছে চাওয়া শির্ক হবে।

সুতরাং মহানবী ﷺ-এ কাছে কবির মতো এমন চাওয়া বৈধ নয়।

'ইয়া মুহাম্মাদ, বেহেশ্‌ত হতে
খোদায় পাওয়ার পথ দেখাও।

এই দুনিয়ার দুঃখ থেকে
এবার আমায় নাজাত দাও।' *-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৪১ নং*

এ ছত্রে সরাসরি নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্বোধন ও আহবান করা হয়েছে এবং যে দুটি জিনিস প্রার্থনা করা হয়েছে, সে দুটি জিনিসই দান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। পথ দেখানো তাঁর জীবদ্দশার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তাঁর জীবনাবসানের পর বেহেশ্ত হতে মানুষকে পথ দেখানো আর সম্ভব নয়। তিনি বলে গেছেন, "মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়।" *(মুসলিম)* সুতরাং তিনি মধ্য জগৎ থেকে তবলীগের কাজ জারী রাখবেন কীভাবে?

আর দুঃখ থেকে নাজাত দেওয়া তাঁর কাজ নয়। এ কাজ একমাত্র মহান আল্লাহর। সুতরাং এ চাওয়া তাঁর নবীর কাছে চাওয়া শির্ক।

বৈধ নয় তাঁর কবরের কাছে উপস্থিত হয়ে কোন প্রকার আরজি পেশ করা। কারণ সুখ-দুঃখের যাবতীয় আরজি শুনেন চিরঞ্জীব মহান আল্লাহ। তিনিই তা মঞ্জুর করে থাকেন। তাঁর নবী ﷺ না আরজি শুনেন, আর না-ই তা মঞ্জুর বা কবুল করে থাকেন। এ জগৎ থেকে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি এ জগতের কোন কিছু জানতে-শুনতে পারেন না। তিনি মধ্য জগতে বিশেষ জীবনে জীবিত আছেন এবং সেখানে মহান আল্লাহর নিকটে রুযীপ্রাপ্ত হচ্ছেন। সেই জীবন আমাদের নিকট অনুভূত নয়।

আর মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ} (١٧)

অর্থাৎ, আর যদি আল্লাহ তোমাকে ক্লেশদান করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত আর কেউ তার মোচনকারী নেই। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ করেন, তাহলে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। *(আন্আমঃ ১৭)*

মহান আল্লাহর নির্দেশ,

{قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا} (٢١) سورة الجن

"(হে নবী!) বল, 'আমি তোমাদের অপকার অথবা উপকার কিছুরই মালিক নই।' *(জ্বিনঃ ২১)*

সাহাবাগণ এ কথা জানতেন। তাই তাঁরা ইষ্টানিষ্টের মালিক কেবল আল্লাহকেই মানতেন। তাই ইন্তিকালের পর তাঁরা সরাসরি তাঁর কাছে তো চান-ই নি। পরন্তু তাঁর অসীলায়ও দুআ করেননি। যেমন এ কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানো

তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ানোকে তিনি নিজ জীবদ্দশায় সাহাবাদের দন্ডায়মান হওয়াকে পছন্দ করতেন না। তিনি এটাও পছন্দ করতেন না যে, তিনি বসে থাকুন, আর লোকেরা তাঁর তা'যীমে দন্ডায়মান থাকুক।

আবূ উমামাহ رضي الله عنه বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, "তোমরা দাঁড়ায়ো না; যেমন অনারব (পারস্যের) লোক তাদের বড়দের তা'যীমে উঠে দাঁড়ায়।" *(আবূ দাউদ ৫২৩০, ইবনে মাজাহ ৩৮৩৬নং, হাদীসটির সনদ যয়ীফ; কিন্তু অর্থ সহীহ, দেখুনঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৩৪৬নং, অবশ্য সহীহ হাদীসে নামাযের ভিতরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।)*

আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন, "ওঁদের (সাহাবাদের) নিকট রসূল ﷺ অপেক্ষা অন্য কেউ অধিক প্রিয় (ও শ্রদ্ধেয়) ছিল না। কিন্তু ওঁরা যখন তাঁকে দেখতেন, তখন তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। কারণ এতে তাঁর অপছন্দনীয়তার কথা তাঁরা জানতেন।" *(আহমাদ ১২৩৪৫, তিরমিযী ২৭৫৪নং)*

প্রিয় রসূল ﷺ বলেছেন,

(مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).

"যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোক তার জন্য দন্ডায়মান হোক, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" *(মুসনাদে আহমাদ ১৬৯১৮, আবূ দাউদ ৫২২৯, তিরমিযী ২৭৫৫নং)*

আবূ মিজলায বলেন, একদা মুআবিয়া বের হলেন। সেখানে আব্দুল্লাহ বিন আমের ও আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর বসে ছিলেন। তাঁকে দেখে ইবনে আমের খাড়া হয়ে গেলেন এবং ইবনে যুবাইর বসে থাকলেন। তিনি উভয়ের মধ্যে বেশি মোট ছিলেন। মুআবিয়া বললেন, নবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ عِبَادُ اللَّهِ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ).

অর্থাৎ, যে এ কথায় খুশী হয় যে, আল্লাহর বান্দারা তার জন্য দন্ডায়মান হোক, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামের ঘর বানিয়ে নেয়। *(বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ৯৭৭নং)*

খলীফা মুতাঅক্কিল আহমাদ বিন আদ্‌ল প্রমুখ উলামাগণকে ডেকে তাঁর বাসা-বাড়িতে সমবেত করলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের কাছে এলে আহমাদ বিন আদ্‌ল ছাড়া সকলে তাঁর জন্য উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুতাঅক্কিল উবাইদুল্লাহকে বললেন, 'এ লোক আমাদের বায়আত সঠিক মনে করে না।'

উবাইদুল্লাহ (ওযর পেশ করে) বললেন, 'অবশ্যই হে আমীরুল মু'মিনীন! আসলে উনার চোখে সমস্যা আছে।'

আহমাদ শুনে বললেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার চোখে কোন সমস্যা নেই। (আমি আপনাকে দেখেছি।) কিন্তু আমি আপনাকে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্ত করেছি। (তাই উঠে দাঁড়াইনি।) নবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোক তার জন্য দন্ডায়মান হোক, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।"

এ হাদীস শোনার পর মুতাঅক্কিল আহমাদের পাশে এসে বসে গেলেন। *(সিঃ সহীহাহ ১/৩৫৬)*

উক্ত হাদীসসমূহ হতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে প্রবেশের সময় তার জন্য লোকেরা প্রত্যুত্থান করুক এ কথা পছন্দ ও কামনা করে, সে জাহান্নাম প্রবেশের সম্মুখীন হয়। সাহাবায়ে কিরাম ﷺ রসূল ﷺ-কে অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁকে দেখলে উঠে দন্ডায়মান হতেন না। কারণ তাঁর জন্য উঠে দন্ডায়মান হওয়া তাঁর নিকট যে অপছন্দনীয়---তা তাঁরা জানতেন।

বলা বাহুল্য, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি বা তা'যীম প্রকাশের জন্য এমন কিছু করা বৈধ নয়, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ অথবা যাতে শির্কের আবিলতা আছে।

মহানবী ﷺ-এর কবরের পাশে দাঁড়ানো এবং দাঁড়িয়ে যিয়ারত করা ও সালাম-দরূদ পড়া নিষিদ্ধ নয়। যেহেতু কবর যিয়ারত এইভাবেই বিধেয়। তবে দুআর সময় কিবলামুখী হওয়া

বিধেয়।

অন্যান্য স্থানে তাঁকে সামনে উপস্থিত ভেবে দাঁড়ানো বৈধ নয়। বৈধ নয় দরূদ পাঠের জন্য 'কিয়াম' করা।

আমরা আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করি। সেই দরূদ, যা তিনি সাহাবায়ে কেরামগণকে শিখিয়ে গেছেন এবং পরবর্তী অনুগামীগণ যে দরূদ তাঁর উপর পাঠ করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করার সময় 'কিয়াম' করা (দন্ডায়মান হওয়া) সাহাবা ও তাবেঈনদের আমল নয়।

মীলাদীরা মনে করে যে, মহানবী ﷺ তাদের মীলাদে উপস্থিত হন। আর তার মানেই হল, দুনিয়ার কোন্ দেশে কোন সময়ে মীলাদ হচ্ছে, তা তিনি জানতে পারেন এবং একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় মীলাদ হলেও তিনি একই সময়ে সকল জায়গাতেই উপস্থিত হতে পারেন। অর্থাৎ তিনি গায়েব জানেন এবং একই সময়ে একাধিক জায়গায় বিরাজমান হতে পারেন। তাদের যুক্তিকে ১০ জায়গায় ১০টি বা তারও বেশী আয়না রেখে প্রত্যেক আয়নায় যেমন আকাশের সূর্য বা চাঁদকে দেখা যায়, তেমনি তাঁর উদাহরণ।

কিন্তু আমরা জানি যে, তিনি হাযির-নাযির নন। (ইল্ম সহ) হাযির ও নাযির তো মহান আল্লাহ। তিনি কোন মহফিলে (ইন্তিকালের পর) উপস্থিত হন না। উম্মতি যে যেখান থেকেই দরূদ ও সালাম পাঠ ও পেশ করে, নির্দিষ্ট ফিরিশ্তা সেই দরূদ আল্লাহর নবীর কাছে পৌঁছিয়ে থাকেন।

অভ্যাসগতভাবে মীলাদের শেষে লোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে যায় (কিয়াম করে)। কেননা, তাদের অনেকের বিশ্বাস যে, রসূল ﷺ মীলাদ অনুষ্ঠানে (এর শেষে?) উপস্থিত হন। অথচ এমন বিশ্বাস স্পষ্ট অলীক। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (١٠٠) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, ওদের (পরলোকগত ব্যক্তিদের) সম্মুখে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বারযাখ (ইহকাল ও পরকালের মাঝে এক যবনিকা) থাকবে। *(সূরা মু'মিন ১০০ আয়াত)*

অর্থাৎ, তাঁরা সারা বিশ্বে বিরাজমান হতে পারেন না।

তাছাড়া এ কথা থেকে বুঝা যায়, মীলাদীরাও গায়েব জানে। তা না হলে আল্লাহর রসূল ﷺ কখন হাযির হচ্ছেন---তা জানবে কী করে? আর মীলাদের শেষে উপস্থিত হওয়ার পশ্চাতে কি কোন যুক্তি থাকতে পারে? আর রসূল ﷺ-ই বা জানবেন কী করে যে, অমুক জায়গায় মীলাদ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং অমুক সময়ে তা শেষ হচ্ছে? আল্লাহর নবী ﷺ তো গায়েব জানতেন না। তিনি ইন্তিকালের পর তিনি বা তাঁর রূহ তো কোন স্থানে হাযির হতে পারে না। আর তিনি মীলাদের শেষেই বা উপস্থিত হবেন কেন? পক্ষান্তরে তাঁর গায়েব জানা অথবা হাযির-নাযির জানা অথবা ইন্তিকালের পরে বারযাখ ছাড়া ইহজগতের অন্য কোথাও হাযির হওয়াতে বিশ্বাস রাখা তো শির্ক ও কুফ্‌রী। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

কিয়ামে দরূদের যে শব্দছন্দ তা শুনে মনে হয় যে, তা 'মেড ইন্ ইন্ডিয়া।' নবীর শানে সালাম পাঠাতে আরবীতে 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' বলা হয় না। বলা হয়, 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু' যেমন আমরা নামাযের 'আত্-তাহিয়্যাত'-এ পাঠ করে থাকি। অনেকে বলে থাকেন যে, আসলে উপমহাদেশের একজন অতিরিক্ত নবীভক্ত আলেম ছিলেন। যিনি নাকি নবীর ধ্যানে কখনো কখনো কল্পনায় তাঁকে যেন সামনেই আসতে

দেখতেন। আর তাই তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে ঐ সালাম পেশ করতেন। অতঃপর তাই পরবর্তীতে তাঁর ছাত্ররা ওস্তাদের দেখাদেখি 'কিয়াম'রূপ বিদআত প্রচলিত করেন।

সুতরাং তা যদি সত্য হয়, তাহলে তা সকলের জন্য পালনীয় বিধেয় বা ভালো আমল কী করে হতে পারে? যেটা উপমহাদেশে তৈরী, সেটা কি শরীয়তের পালনীয় কিছু হতে পারে?

অন্য এক মতে তাক্বীউদ্দীন সুবকী শাফেয়ীর এক ছাত্র মহানবী ﷺ-এর শানে লিখা একটি না'ত (প্রশংসামূলক কবিতা) পাঠ করলে আবেগে উঠে দাঁড়িয়ে যান। আর তাঁর দাঁড়ানো দেখে তাঁর ছাত্ররা সকলে দাঁড়িয়ে যান। আর তারপর শুরু হয় কিয়ামের এই রীতি।

যদি তাই হয়, তাহলে একজনের অতিভক্তি ও আবেগে কৃত আমল তো আর নিয়মিত পালনীয় শরীয়ত হতে পারে না।

প্রকাশ থাকে যে, কারো সহযোগিতার জন্য অথবা বসাবার জন্য উঠে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ কিয়ামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইন্তিকালের পর তাঁর ইস্তিগফার

কোন পাপ করার পর তাঁর কবরের পাশে এসে তাঁকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে অনুরোধ করলে তা কি তিনি করেন? তিনি কি কবর থেকে এ জগতের কথা শুনতে পান?

যে মারা যায়, সে এ জগৎ ছেড়ে আর এক জগতে চলে যায়। আর সে জগতের সাথে এ জগতের কোন যোগাযোগ থাকে না। সে মধ্যজগৎ থেকে ইহজগতের কোন কিছু শুনতে পায় না। সে জগৎ ও এ জগতের মাঝে আছে যবনিকা।

বিধায় মহানবী ﷺ কারোর আবেদনে তার জন্য ইস্তিগফার করতে পারেন না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا} (٦٤) سورة النساء

অর্থাৎ, যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম ক'রে (পাপ করে) ছিল, তখন যদি তারা তোমার নিকট আসত ও আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুরূপে পেত। *(নিসাঃ ৬৪)*

তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা তো আল্লাহর কাছেই করতে হয় এবং কেবল তাঁর কাছে করাই জরুরী ও যথেষ্ট। কিন্তু এখানে বলা হল যে, হে নবী! তারা তোমার কাছে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তুমিও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এটা এই জন্য যে, তারা বিবাদের ফায়সালা গ্রহণের জন্য অন্যের শরণাপন্ন হয়ে রসূল ﷺ-এর অসম্মান করেছিল। এটা দূর করার জন্য তাঁর কাছে আসার তাকীদ করা হয়।

ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য কারো রসূল ﷺ-এর নিকট আসা এবং তার জন্য তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনা করার কথা তাঁর পার্থিব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর তিরোধানের পর এই শ্রেণীর ক্ষমাপ্রার্থনা বা তাঁর অসীলায় দুআ করা আর সম্ভব নয়।

এ মর্মে তফসীর ইবনে কাষীরে বর্ণিত উতবীর গল্পটি ভিত্তিহীন আজগুবি গল্পমাত্র। তিনি লিখেছেন,

একদল লেখক, তাঁদের মধ্যে আবূ নাস্র বিন আস্-সাব্বাগ স্বীয় 'আশ্-শামেল' পুস্তকে

উৎবীর প্রসিদ্ধ গল্পটি নকল করেছেন। উৎবী বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমাধির পার্শ্বে বসেছিলাম। এমন সময় সেখানে এক বেদুঈনের আগমন ঘটে। সে বলে, আস্-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহর এ উক্তি শুনেছি,

{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا} (٦٤) سورة النساء

অর্থাৎ, যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম ক'রে (পাপ করে) ছিল, তখন যদি তারা তোমার নিকট আসত ও আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করত এবং রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালুরূপে পেত। *(নিসা ঃ ৬৪)*

তাই আমি আপনার সামনে স্বীয় পাপের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও প্রতিপালকের কাছে আপনার সুপারিশ কামনা করছি। অতঃপর সে নিম্নের কবিতাটি পাঠ করে,

يا خيرَ من دُفنَت بالقاع أعظُمُه ... فطاب منْ طيبهنّ القاعُ والأكَمُ

نَفْسي الفداءُ لقبرٍ أنت ساكنُه ... فيه العفافُ وفيه الجودُ والكرمُ

অর্থাৎ, হে ঐ সবের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি, যাদের অস্থিসমূহ প্রান্তরে প্রোথিত হয়েছে এবং সেগুলির সুবাসে প্রান্তর ও পর্বত সুরভিত হয়েছে।

সে কবরের জন্য আমার প্রাণ কুরবান হোক, যে কবরে আপনি অবস্থানরত। ওতে রয়েছে পবিত্রতা, দানশীলতা ও মর্যাদা।

অতঃপর বেদুঈন চলে যায় এবং আমার চোখে নিদ্রা চেপে বসে। আমি স্বপ্নে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলছেন, "হে উতবী! ঐ বেদুঈনের কাছে যাও এবং সুসংবাদ জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" *(বাংলা ইবনে কাষীর ৫ পারা ৪৬৫-৪৬৬পৃঃ)*

এ গল্পটি ইমাম নাওয়াবী তাঁর 'মাজমূ' কিতাবে (৮/২১৭)তে এবং 'ঈযাহ' কিতাবের ৪৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। সেখানে কবিতার আরো দুটি ছত্র বেশি রয়েছে,

أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته ... على الصراط إذا ما زلت القدم

وصاحباك فلا أنساهما أبداً ... مني السلام عليكم ما جرى القلم

অর্থাৎ, আপনি সেই সুপারিশকারী, যাঁর সুপারিশ আশা করা যায় পুলসিরাতে যখন পা পিছলে যাবে।

আর আপনার দুই সঙ্গী, যাঁদেরকে আমি কখনই ভুলব না। আমার তরফ থেকে আপনাদেরকে সালাম যাবৎ কলম জারি থাকে।

কিন্তু ইবনে কাষীর এ গল্পের প্রশংসা করেননি। বরং কেবল নকল করেছেন, যেমন তাঁর তফসীরে বহু অশুদ্ধ ইসরাঈলী বর্ণনা নকল করেছেন। আফসোস! তা যদি তিনি না করতেন।

বলা বাহুল্য, সে গল্প একটি ভিত্তিহীন স্বপ্নভিত্তিক বর্ণনা। তা দলীল বানিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর সুপারিশ কামনা বা তাঁকে অসীলা বানানোর বৈধতা প্রমাণ করা আদৌ ঠিক নয়।

যেহেতু তা কোন হাদীস নয়, কোন সাহাবীর 'আষার' নয়, কোন তাবেঈর কাহিনী নয়। দুর্বল সনদে বর্ণিত একটি কেচ্ছামাত্র। তা তওহীদ ও আকীদার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দলীল মনে করা মোটেই বৈধ নয়। পরন্তু তা সহীহ হাদীসের আকীদা ও সাহবায়ে কিরাম ﷺ-

এর আমলের পরিপন্থী।

দ্বীন ও আকীদার বিষয়ে পাক্কা দলীল ছাড়া এঁর-ওঁর গল্প, কাশ্‌ফ ও স্বপ্নের উপর নির্ভর করা জ্ঞানী মুসলিমের কাজ নয়।

মীলাদুন্নাবী

মহানবী ﷺ-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে মীলাদীরা তাঁর জন্মদিন পালন করে। অথচ প্রচলিত পালন করার রীতি ইসলামে নেই।

মহান আল্লাহ আমাদের দ্বীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন তাঁর নবীর জীবদ্দশাতেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (নেয়ামত) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। *(সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন,

« مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ».

“যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কার করে, সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।” *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ৪৫৮৯)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

« مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ».

“যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে, যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।” *(মুসলিম ৪৫৯০নং)*

ইসলামে পালনীয় ঈদ হল মাত্র দুটি; ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা। তৃতীয় কোন ঈদ ইসলামে নেই। মহানবী ﷺ নবুয়তের ২৩ বছর কাল নিজের জীবনে কোন বছর নিজের জন্মদিন পালন করে যাননি। কোন সাহাবীকে তা পালন করার নির্দেশও দেননি। তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের জন্ম-মৃত্যু উপলক্ষ্যে কোন আনন্দ অথবা শোকপালন করে যাননি।

তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর চারজন খলীফা তাঁদের খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয়ভাবে অথবা একাকী নবীদিবস পালন করে যাননি। অন্য কোন সাহাবী বা আত্মীয়ও তাঁর প্রতি এত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আনন্দ প্রকাশ অথবা মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে শোক পালন করেননি। তাঁদের পরেও কোন তাবেঈ অথবা তাঁদের কোন একনিষ্ঠ অনুসারী অথবা কোন ইমাম তাঁর জন্ম কিংবা মৃত্যুদিন পালন করার ইঙ্গিত দিয়ে যাননি। সুতরাং তা যে নব আবিষ্কৃত বিদআত, তা বলাই বাহুল্য।

সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদ (নবীদিবস) আবিষ্কার করেন ইরাকের ইরবিল শহরের আমীর (গভর্নর) মুযাফ্‌ফারুদ্দীন কূকুবুরী ঠিক হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ৬০৪ (মতান্তরে ৬২৫) হিজরীতে। মিসরে সর্বপ্রথম চালু করে ফাতেমীরা; যাদের প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর বলেন, “(ফাতেমী শাসকগোষ্ঠী) কাফের, ফাসেক, পাপাচার, ধর্মধ্বজী, ধর্মদ্রোহী,

আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) অস্বীকারকারী ও ইসলাম অস্বীকারকারী মাজূসী ধর্ম-বিশ্বাসী ছিল।" *(আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ' ১১/৩৪৬)*

মীলাদের সময় তারা বিভিন্ন খানকাহে গান-বাজনার আসর বসাত। কোন কোন বছরে মুহার্রম ও সফর থেকেই মীলাদের আনুষ্ঠানিক মৌসম শুরু করে দিত। সেই উপলক্ষ্যে গরু-ছাগল যবাই করে খানা দেওয়া হত। কবি, গায়ক ও মীলাদপাঠক হুজুরদের সরগরম ভিড় জমে উঠত।

মীলাদ উপলক্ষ্যে মিথ্যা কাহিনী, গল্প ও কবিতা (না'ত-গজল) তৈরী করা হত। বহু হুজুর তার সপক্ষে বই লিখে তাদের সহযোগিতাও করেছিলেন। সর্বপ্রথম আবুল খাত্তাব নামক এক হুজুর 'আত্-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন নাযীর' নামক বই লিখে শাহ মুযাফ্ফারের খিদমতে পেশ করলে তিনি তাঁকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর 'আল-হাবী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মীলাদের আবিষ্কারক শাহ মুযাফ্ফার একদা এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেন। সেই ভোজ আয়োজনে ছিল পাঁচ হাজার ভোনা বকরী, দশ হাজার মুরগী, একশত ঘোড়া, এক লক্ষ মাখন এবং হালোয়ার ত্রিশ হাজার পাত্র। সূফীদেরকে সেই অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে গজল-গীতের অনুষ্ঠান চালু হয়; যা যোহর থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত চালানো হয়। আর সেই অনুষ্ঠানে নাচনে-ওয়ালাদের সাথে তিনি নিজেও নাচেন!

অতঃপর সরকারের ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে উলামাদের ত্রুটি হলে মীলাদ একটি ধর্মীয় রূপ ধারণ করে নেয়। নবীকন্যা ফাতেমার কেউ না হয়েও 'ফাতেমী' নাম নিয়ে এবং উক্ত শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ লোকের মন লুটে তারা রাজত্ব করে গেছে।

কথিত আছে যে, মাওসেলের অধিবাসী উমার বিন মুহাম্মাদ

নামক এক ব্যক্তি নাকি খুবই আশেকে রসূল ও আল্লাহর অলী ছিলেন। তিনি রসূল ﷺ-এর ভালবাসায় একান্ত অনুরাগের বশে এ মীলাদ তথা রসূল ﷺ-এর জন্ম-বৃত্তান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনায় ব্রতী হন। বিখ্যাত সীরাতে শামী গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করা হয়েছে। *(দেখুনঃ ছহীহ মাকছুদে মু'মেনীন ৩৬৯পৃঃ)*

অথচ মীলাদ পালন করা নবী ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার সঠিক পরিচয় নয়। এই ভালোবাসা বা মহব্বত শুধু দরূদ পাঠে বা (মনগড়া) মীলাদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয় না। বরং এই মহব্বতের জন্য একান্ত জরুরী তাঁর ইত্তেবা ও অনুসরণ করা। তাঁর আদর্শে আদর্শবান হওয়া। তাঁর যাবতীয় আদেশাজ্ঞা যথাসাধ্য পালন করা এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)* তাঁর জন্মদিনে উৎসব করে আনন্দ উপভোগ করে নয়; বরং তিনি যে জন্য বা যার জন্য জন্ম নিয়েছিলেন, তা বরণ ও পালন করে আনন্দ উপভোগ করা।

এতে যে সব বয়ান করা হয়, তার অধিকাংশ অতিরঞ্জন ও শির্ক বা বিদআত। এমন সব কাহিনী বলা হয়, যার কোন সহীহ সনদ নেই।

(ক) যেমন

"আল্লাহ তাঁর নিজ নূর (জ্যোতির) এক মুষ্ঠি ধারণ করে তার উদ্দেশ্যে বলেন, 'তুমি মুহাম্মাদ হয়ে যাও।"

"আল্লাহ প্রথম যা সৃষ্টি করেন তা হল তোমার নবীর নূর, হে জাবের!"

নূরে মুহাম্মাদী হতে আরশ-কুসী, বেহেশ্ত-দোযখ, আসমান-যমীন যাবতীয় সব কিছুই সৃষ্টি।

আদম সৃষ্টির ৭০ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহপাক নিজ নূর থেকে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মুআল্লায় লটকে রাখেন।

আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন।

একদা নবী ﷺ জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে জিবরীল! আপনার বয়স কত বছর হবে?' জিবরীল বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জানি না। তবে চতুর্থ পর্দায় (আসমানে) একটি নক্ষত্র উদয় হয় প্রতি ৭০ হাজার বছরে একবার। আর আমি সেই নক্ষত্রটিকে ৭২ হাজার বার উদয় হতে দেখেছি।' নবী ﷺ বললেন, 'আমার রবের ইয্যতের কসম! আমিই ছিলাম সেই নক্ষত্র!'

গাম্মারী বলেন,

وهذا كذب قبيح، قبّح الله من وضعه وافتراه.

অর্থাৎ, এ কথা জঘন্য মিথ্যা। যে এ কথা তৈরি করেছে ও গড়েছে, আল্লাহ তার মুখমন্ডল বিকৃত করুন। *(মুরশিদুল হায়ের ১০পৃঃ)*

আরো মনগড়া হাদীস যেমন ঃ-

"আমি গুপ্ত ধন-ভান্ডার ছিলাম।"

"আদম যখন ত্রুটি করে বসলেন, তখন তিনি বললেন, 'হে প্রতিপালক! আমি মুহাম্মাদের অসীলায় প্রার্থনা করছি আমাকে ক্ষমা করে দাও----।"

যে রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাতৃগর্ভে আগমন করলেন, আল্লাহ তাআলা এ রজনীতেই জীবজন্তু দ্বারা তাঁর আগমন বার্তা কুরায়েশদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কুরায়েশদের প্রতিটি জীবজন্তু বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় তাঁর আগমনের সুসংবাদ তাদের নিকট বলেছিল।

ঐ রাতে দুনিয়ার যত বাদশাহ ছিল তাদের সিংহাসনগুলো উল্টিয়ে পড়ে গিয়েছিল, তাদের রসনাগুলো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ঐ দিন তারা কথা বলতে সক্ষম হয়নি। স্থল ও জলের জীব-জন্তুগুলো পরস্পর পরস্পরকে তাঁর গর্ভের স্থিতির শুভ সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিল। দুনিয়ার এমন কোন ঘর বা জায়গা বাকী ছিল না যে, তাঁর নূর সে ঘর বা জায়গায় প্রবেশ করেনি।

নবী ﷺ-এর ভূমিষ্ঠকালে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া, ইমরান তনয়া মারয়্যাম ও বেহেশ্তী হুরীগণ উপস্থিত হয়েছিলেন। রেশমী বস্ত্র আসমান-যমীনে বিলম্বিত হয়েছিল। ফিরিশ্তাগণ মানুষের বেশে রৌপ্যের বদনা হাতে উপস্থিত ছিলেন। জমরুদ পাথরের চক্ষুবিশিষ্ট, ইয়াকুত পাথরের পক্ষবিশিষ্ট পাখীর ঝাঁক এসেছিল---ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তিনি সিজদায় পতিত ছিলেন। শাহাদত অঙ্গুলি আসমানের দিকে উত্তোলিত ছিল।

তাঁর জন্মের সময় মক্কার 'বাত্বহা' (বালুময় উপত্যকা) ভূমি আনন্দে উদ্বেল হয়ে নর্তন করেছিল। কেসরা প্রাসাদের সৌধচূড়াগুলো ভেঙে পড়েছিল, প্রাচীন পারসীক যাজকমন্ডলীর উপাসনাগারগুলোতে যুগ যুগ ধরে প্রজ্জ্বলিত হয়ে আসা অগ্নিকুন্ডগুলো নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল, বোহায়রা পাদরীগণের সরগরম গীর্জাগুলো নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল এবং তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কা'বাগৃহের ৩৬০টি মূর্তি ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল।

দুধমা হালীমার ঘরে ঃ তাঁকে মূর্তির ঘরে নিয়ে যাওয়া হলে মূর্তিগুলো সিজদায় পড়ে গেল।

তাঁর দোলনা দোলাত ফেরেশ্তারা। চাঁদ তাঁর সাথে কালাম করত। তিনি যেদিকে ইশারা করতেন, চাঁদ সেদিকেই ঝুঁকে যেত।

তিনি এক দিনে এক মাসের বাড়া বাড়তেন, (তাহলে এক মাসে ৯০০ দিনের অর্থাৎ, প্রায় আড়াই বছরের বাড়া বাড়ার কথা। কিন্তু পরে পরে বলা হয়েছে,) এক মাসে এক বছরের বাড়া বাড়তেন। দুই মাসের কালে তিনি বসা শুরু করলেন।

দুধ-মাতা হালীমার ঘরে থাকাকালে বকরীতে তাঁকে সিজদা করত, চুমা দিত।

যে জায়গায় তিনি পা রাখতেন, সবুজ ঘাসে আস্তীর্ণ হয়ে যেত।

এ সব দলীলহীন অতিভক্তির বয়ান। এই শ্রেণীর আরো কথা আবেগ বশে বলা যায়, কিন্তু দলীল না থাকলে আবেগের কোন দাম থাকে না।

এর চাইতে বড় আবেগময় ছিল আমার এক মীলাদী ছাত্র। আমার ইসলামিক সেন্টারের নিয়মিত দর্সে উপস্থিত হতো। একদিনকার বিষয় ছিল মহানবী ﷺ-এর জন্ম বিষয়ক মসলা-মাসায়েল। আমি বললাম, 'মানুষের মতো তাঁর স্বাভাবিক নিয়মে জন্ম হয়েছিল।'

সে রেগে উঠে চোখ-মুখ লাল ক'রে বলে উঠল, 'এমন বলা বেআদবী!'

অনেকে তাকে ধমক দিলেও আমি তাকে বললাম, 'তা কেন?'

সে বলল, 'অত বড় একজন নবীর জন্য আপনি বলছেন ঐ নোংরা জায়গা দিয়ে তাঁর জন্ম হয়েছে!'

আমি বললাম, 'তাহলে আপনি বলুন, তাঁর জন্ম কীভাবে হয়েছে?'

সে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলল, 'হয়তো মুখ দিয়ে হয়েছে।'

আমি বললাম, 'এটা তো আপনার ভক্তিগদ্গদ ধারণাপ্রসূত কথা। কিন্তু বাস্তবের ব্যাপারে অতি ভক্তির আবেগ ও ধারণা কোন কাজে লাগে না। কোন দলীল থাকলে বলুন।'

সে কিছুদিন মাদ্রাসায় পড়েছে ঠিকই, কিন্তু আলেম ছিল না। মুখ ভার ক'রে বলল, 'দলীল আমার জানা নেই।'

এইভাবেই আবেগে অনুমানে অনেক এমন কথা বলা হয়, যা দলীলহীন অবাস্তব। পক্ষান্তরে সহীহ দলীলপুষ্ট অবাস্তব মেনে নিতে ঈমানদারদের কোন বাধা থাকতে পারে না।

(খ) তিনি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

এ ব্যাপারে যে সকল হাদীস বর্ণনা করা হয়, তার একটিও শুদ্ধ নয়। *(সিঃ যয়ীফাহ ৬২৭০নং)*

সঠিক হল, 'আরবের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সপ্তম দিনে তাঁর খাতনা করা হয়। *(ইবনে হিশাম ১/১৫৯, আর্রাহীকুল মাখতূম বাংলা ১০২পৃঃ)*

শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকা! মীলাদুন্নাবী পালন করার কোন দলীল নেই। তবুও মীলাদীরা অনেক মনগড়া দলীল পেশ করে আস্ফালন করে থাকে, তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

(১) 'যার নিন্দায় কুরআনের একটি সূরা আছে, সেই আবূ লাহাব পবিত্র জন্মের খবর শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ক্রীতদাসী সুওয়াইবাকে হাতের দুই অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে আযাদ করে দেয়। অতঃপর তার মৃত্যুর পর কোন ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে (!) জিজ্ঞাসা করল, তুমি কী অবস্থায় আছ? সে বলল, আমি দোযখে আছি। তবে প্রতি সোমবার রাত্রিতে আমার আযাব কমিয়ে দেওয়া হয়। আমি এ দুই আঙুল হতে পানি চুষে খাই।'

ইমাম হায্‌রী নয় ইমাম জায্‌রীর নকল করা এ বর্ণনার কোন ভিত্তি নেই। তবুও তা স্বপ্নের খবর। জানা নেই, যে স্বপ্ন দেখেছিল, সে মুসলিম ছিল, না কাফের?

পরন্তু কাফেরের পক্ষ থেকে কোন আমল পরকালে উপকারী নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا} (٢٣) سورة الفرقان

"আমি ওদের কৃতকর্মগুলির প্রতি অভিমুখ ক'রে সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা (স্বরূপ নিষ্ফল) ক'রে দেব।" *(ফুরক্বান ঃ ২৩)*

{ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (٨٨)

"এ আল্লাহর পথ নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ দ্বারা পরিচালিত করেন, তারা যদি অংশী স্থাপন (শির্ক) করত, তাহলে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হত।" *(আনআম ঃ ৮৮)*

{وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٤٧)

"যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলে, তাদের কার্য নিষ্ফল হবে। তারা যা করবে তদনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে।" *(আ'রাফ ঃ ১৪৭)*

{مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ} (١٧) سورة التوبة

"অংশীবাদীরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী (অবিশ্বাস) স্বীকার করে, তখন তারা আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন হতে পারে না। ওরা এমন যাদের সকল কর্ম ব্যর্থ এবং ওরা জাহান্নামেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।" *(তাওবাহ ঃ ১৭)*

{أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا} (١٠٥)

"ওরাই তারা যারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে; ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোন ওজন রাখব না।" *(কাহফ ঃ ১০৫)*

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

"তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর অংশী স্থির কর, তাহলে অবশ্যই তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত।" *(যুমার ঃ ৬৫)*

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ} (٣٢) سورة محمد

"যারা অবিশ্বাস করে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হবার পর রসূলের বিরোধিতা করে, তারা কখনই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করবেন।" *(মুহাম্মাদ ঃ ৩২)*

তাহলে অগ্নি-শিখাবিশিষ্ট দোযখের বাসিন্দা আবূ লাহাবের ঐ খুশীর আমল কীভাবে পরকালে কাজে দিল?

পক্ষান্তরে ইতিহাস-গ্রন্থসমূহে প্রসিদ্ধ যে, আবূ লাহাব সুওয়াইবাকে নবী ﷺ-এর হিজরতের পরে স্বাধীন করেছিল। *(আল-ইস্তীআব, ইবনে আব্দিল বার্র ১/ ১২)*

প্রত্যেক বছর তাঁর জন্মদিনে দাস-মুক্ত ক'রে সে খুশী সাহাবা, তাবেঈগণের কেউ পালন করেননি। সুতরাং আবূ লাহাবের সে সুন্নতকে জিন্দা করা কি মুসলিমদের জন্য বিধেয় হতে পারে?

(২) ওদের দাবী, তাঁর জন্মরাত্রি শবেকদর অপেক্ষা উত্তম।

অথচ শবেকদর হল হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। *(সূরা ক্বাদর ঃ২)*

মহানবী ﷺ-এর চল্লিশ বছর বয়সের পর তাঁকে এ কথা জানানো হয়। কিন্তু সে রাত অপেক্ষা তাঁর জন্মরাত্রি শ্রেষ্ঠ, সে কথা তিনি জানিয়ে যাননি।

গায়বী বিষয়ে আকেলের ঘোড়া ছুটিয়ে হকের নাগাল পাওয়া যায় না। শরীয়ত বিবৃতি না দিলে, কী শ্রেষ্ঠ আর কী শ্রেষ্ঠতম, তা জানার উপায় থাকে না।

অনুরূপ শবেকদরের কথা আমরা জানি, তাতে কী আমল করতে হয়, তাও আমাদের জানা। কিন্তু মহানবী ﷺ-এর জন্মরাত্রিতে কী আমল করতে হয়, তাও জানতে পারি না। মনগড়া আমল ছাড়া শরীয়তের বয়ান মিলে না। সুতরাং তা বিদআত বৈ কী?

শরীয়তে প্রসিদ্ধ যা, তা আমরা মানতে বাধ্য। মহান আল্লাহ ফিরিশ্তাদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ ফিরিশ্তা নির্বাচন করেছেন, মানব-জাতির মধ্যে রসূলগণকে এবং তাঁদের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ-কে মনোনীত করেছেন। কালামের মধ্যে কুরআনকে নির্বাচিত করেছেন। পৃথিবীর বুকে মসজিদসমূহকে নির্বাচিত করেছেন। দিনসমূহের মধ্যে জুমআর দিনকে এবং রাত্রিসমূহের

মধ্যে শবেকদরের রাত্রিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সুতরাং আমাদের উচিত, সেই সকল বস্তু, ব্যক্তি ও সময়-কালকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া, যে সকল বস্তু, ব্যক্তি ও সময়-কালকে মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ-এর জন্ম রাত্রে হয়নি, বরং হয়েছে সোমবার দিনে। তাহলে শবেকদরের রাত্রি অপেক্ষা তাঁর জন্মরাত্রিকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার কোন প্রাসঙ্গিকতাই নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সোমবার দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন,

« ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ».

"ওটি এমন একটি দিন, যেদিন আমার জন্ম হয়েছে, যেদিন আমি (নবীরূপে) প্রেরিত হয়েছি অথবা ঐ দিনে আমার প্রতি (সর্বপ্রথম) 'অহী' অবতীর্ণ করা হয়েছে।" *(মুসলিম ২৮০৪নং)*

পরন্তু শবেকদরের রাত্রি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাত্রির কথা সহীহ হাদীসে এসেছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব আমলের দিক দিয়ে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ لَيْلَةً أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْضِ خَوْفٍ لَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ).

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক রাত্রির কথা বলে দেব না, যা শবেকদর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? (এমন রাত্রি যাতে) কোন মুজাহিদ প্রতিরক্ষার কাজে ত্রাসভরা স্থানে পাহারা দেয়, সম্ভবতঃ সে নিজ পরিবারে ফিরে আসে না। *(হাকেম, সিঃ সহীহাহ ২৮১১নং)*

এ মর্যাদা এ জন্য যে, এই মুজাহিদ শুধু নিজেকে নয়, বরং রাত্রি জাগরণ করে দেশের মুসলিমদের নিরাপত্তা রক্ষা করে। আর শবেকদর জাগরণকারী কেবল নিজের মুক্তির জন্য আমল করার চেষ্টা করে।

(৩) দলীলহীন দাবী হল, ঈদে মীলাদুন্নাবীই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ।

মহানবী ﷺ মদীনায় আগমন করলে দেখলেন, মদীনাবাসীরা দুটি ঈদ পালন করছে। তা দেখে তিনি বললেন, "(জাহেলিয়াতে) তোমাদের দুটি দিন ছিল, যাতে তোমরা খেলাধূলা করতে। এক্ষণে ঐ দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদেরকে দুটি উত্তম দিন প্রদান করেছেন; ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন।" *(সহীহ আবূ দাঊদ ১০০৪, নাসাঈ ১৫৫৫নং)*

সুতরাং পালনীয় ঈদ ইসলামে দুটিই। এ হল মহানবী ﷺ-এর নির্ধারণ। এর চাইতে শ্রেষ্ঠ ঈদের কথা মহানবী ﷺ কতৃক বর্ণিত হয়নি; না দিনের কথা, আর না তাতে পালনীয় আমলের কথা।

কিয়াস ও অনুমান করে শরীয়তের কোন ইবাদত নির্ধারণ হয় না। মর্যাদা আন্দাজ করে নিজেদের তরফ থেকে কোন বিষয়কে ছোট-বড় করা যায় না। বরং শরীয়ত যেমন বলে, যাকে যে মর্যাদা দেয়, তার সেই মর্যাদাই বিশ্বাস করতে হয়, তার কমও না, তার বেশিও না।

ছোট বাচ্চাদেরকে ইংরেজী পড়াতে গেলে অনেক সময় প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, b-u-t (বাট) হয়, কিন্তু p-u-t (পুট) কেন হবে? এর উত্তরে যা বলতে হয়, তাই বলা যায় শরীয়তের ক্ষেত্রে। শরীয়তের উপরে নিজেদের আকেলের চাকা চালালে শরীয়ত ভেদ করে বিদআতে পড়তে হয়।

ইবাদত করা ও কবুলের দুটি শর্ত ঃ ইখলাস ও তরীকায়ে মুহাম্মাদী।

মহানবী ﷺ-এর জন্মদিবসকে ঈদ মেনে নিলেও তা পালন করার পদ্ধতি কী?

ঈদুল ফিত্‌র পালন করার পদ্ধতি তিনি বলেছেন। ঈদের তকবীর পাঠ কর, বেজোড়

খেজুর খেয়ে ঈদগাহে যাও। যথানিয়মে দুই রাকআত নামায পড়, খোতবা শোন ইত্যাদি।

ঈদুল আযহা পালন করার পদ্ধতি তিনি বলে গেছেন। ঐ দিনের অতিরিক্ত আমল হল কুরবানী কর।

কিন্তু ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করার পদ্ধতি কী? এ সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ পালনের ব্যাপারে তরীকায়ে মুহাম্মাদী কী?

যদি মহানবী ﷺ রোযা রেখে জন্মদিন পালন করেছেন, তাহলে সোমবারে রোযা রেখে সাপ্তাহিক সে ঈদ পালন না করে বৎসরান্তে একবার সোমবার ছাড়া অন্য দিনেও সে ঈদ পালন করা হয়, কোন্ ভিত্তিতে, কার পদ্ধতিতে?

(৪) 'মুসলমানদের জন্য বৎসরে দুটি ঈদই সীমাবদ্ধ নয়। বরং হাদীস শরীফে আল্লাহর রসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, জুমার দিনও মুসলমানদের জন্য ঈদ। এমনকি এ দিনকে আল্লাহর নিকট ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বলে অভিহিত করেছেন। *(ইবনে মাজাহ)* আর জুমআর দিনকে ঈদ হিসাবে ঘোষণা করার একটি কারণ হল, এ দিনে হযরত আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। *(মিশকাত)* সুতরাং আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করার কারণে যদি জুমার দিন ঈদ হয়, তাহলে যে মহান রাসূল ﷺ-কে সৃষ্টি না করলে হযরত আদম সৃষ্টি হতেন না, সেই দয়ালু রহমতে আলম নবীর দুনিয়ায় আগমনের দিনকে ঈদ হিসাবে পালন করা যাবে না কেন?'

এই জন্য যাবে না যে, জুমআর দিন সাপ্তাহিক ঈদ হিসাবে স্বীকৃতি ও অনুমোদন পেয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে সোমবার বা ১২ই রবীউল আওয়াল সে স্বীকৃতি বা অনুমোদন পায়নি।

দুই ঈদ ছাড়া কেবল জুমআর দিনই ঈদ নয়, বরং আরো অন্য দিনকেও ঈদ বলা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَهِىَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ».

অর্থাৎ, আরাফাতের দিন, কুরবানীর দিন, তাশরীকের (৩ দিন, যুলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারীখ) আমাদের ঈদ হে মুসলিমগণ! আর তা হল পান-ভোজনের দিন। *(আহমাদ ১৭৩৭৯, আবূ দাঊদ ২৪২১, তিরমিযী ৭৭৩, নাসাঈ ৩০০৪, দারেমী ১৭৬৪, হাকেম ১৫৮৬নং)*

আর তার মানে এই নয় যে, আমরাও সেই অনুমানে ঈদ রচনা করব। রচনা করার অধিকার আমাদের নেই। যেহেতু দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তাতে সংযোজন করার অনুমতি কারো নেই।

ইবনে মাজেশূন বলেন, আমি ইমাম মালেক (রঃ)কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন বিদআত রচনা করে এবং তা পুণ্যের কাজ মনে করে, সে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ রিসালতের খিয়ানত (আল্লাহর প্রত্যাদেশ প্রচারে বিশ্বাসঘাতকতা) করেছেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।" অতএব সেদিন যা দ্বীন ছিল না আজও (নতুনভাবে) তা দ্বীন নয়। *(আল ই'তিসাম ১/৪৯)*

শরীয়ত ঈদুল ফিত্বর ও আযহা ছাড়া জুমআর দিন, আরাফার দিন, যুল-হজ্জের ১১, ১২, ১৩ তারীখের দিনগুলিকে 'ঈদ' বলে ঘোষণা দিয়েছে এবং সেই ঈদ কীভাবে পালন করতে হবে, তারও নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু সোমবার বা ১২ রবীউল আওয়ালকে 'ঈদ' বলে ঘোষণা দেয়নি,

বিধায় আমরা নিজেদের তরফ থেকে ঘোষণা দিয়ে তা 'ঈদ' বলে পালন করতে পারি না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٢١) سورة الشورى

অর্থাৎ,এদের কি এমন কতকগুলি অংশী (উপাস্য) আছে, যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ এদেরকে দেননি? চূড়ান্ত ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে তো ফায়সালা হয়েই যেত। নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারীদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। *(শূরা ঃ ২১)*

আর মহানবী ﷺ বলেন,

« مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ».

"যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কার করে, সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ৪৫৮৯)*

(৫) 'ঈদ মানে যা ফিরে ফিরে আসে। ঈদে মীলাদুন্নাবীও ফিরে ফিরে আসে। অতএব তা আমাদের জন্য ঈদ হবে না কেন?'

উত্তর ঃ ফিরে এলেই ঈদ হয় না, ঈদ হওয়ার শরয়ী অনুমোদন চাই।

বছরের সকল দিনই তো ফিরে ফিরে আসে। কত শত গুরুত্বপূর্ণ দিন সাপ্তাহিক ও বাৎসরিক হিসাবে ঘুরে-ফিরে আসে, আর তার মানেই কি আমরা তাকে 'ঈদ' মেনে নেব?

পরন্তু নির্দিষ্ট করে বলা যায় না যে, কোন্ তারীখে তাঁর জন্মদিন ছিল? অনেকের মতে রবীউল আওয়াল মাসের ২, ৮, ৯ বা ১০ তারীখ তাঁর জন্মদিন ছিল। পক্ষান্তরে ১২ তারীখে তাঁর মৃত্যুদিন ছিল নিঃসন্দেহে। তাতে কোন প্রকার মতভেদ নেই। তাহলে সন্দেহহীন মৃত্যুর দিনে সন্দিগ্ধ জন্মদিন পালনের যৌক্তিকতা কোথায়?

(৬) 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর নিয়ামত ও রহমতপ্রাপ্তির শুকরিয়া স্বরূপ আনন্দ উৎসব (?) করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} (٥٨) سورة يونس

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, 'এ হল আল্লাহরই অনুগ্রহ ও করুণায়; সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা তারা যা (পার্থিব সম্পদ) সঞ্চয় করছে তা হতে অধিক উত্তম।' *(ইউনুস ঃ ৫৮)*

আর আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের মধ্যে রসূল ﷺ-ই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। সুতরাং ঐ নিয়ামতপ্রাপ্তির দিনে শুকরিয়া হিসাবে কেন আমরা ঈদ পালন করব না?'

কেন করব না? যেহেতু ঈদ পালন করাতে আল্লাহ-আল্লাহর রসূলের কোন নির্দেশ নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর নিয়ামত ও রহমতপ্রাপ্তির শুকরিয়া স্বরূপ আনন্দ উৎসব করতে নির্দেশ দেননি।

আনন্দিত বা খোশ হতে বলেছেন। উৎসব করতে বলেননি। উৎসব আনন্দপূর্ণ বা জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানকে বলে। মহান আল্লাহ আনন্দের অনুষ্ঠান করতে বলেননি। এটা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ ও তাঁর নামে মিথ্যা প্রচার। আর নিশ্চয়ই তার পরিণাম ভালো নয়।

তারপরেও কথা আছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর নিয়ামত ও রহমতপ্রাপ্তির শুকরিয়া স্বরূপ

আনন্দ উৎসব করতে নির্দেশ কতবার দিয়েছেন?

আনন্দ উৎসব কোন্ দিন ও কখন করতে বলেছেন?

কীভাবে করতে বলেছেন?

আছে কি উক্ত আয়াতে এ সবের উত্তর? নিশ্চয় সে সব উত্তর মনগড়া দিতে হবে এবং মনগড়াভাবে সেই 'আনন্দ উৎসব' করতে হবে। আর সেটাই হবে বিদআত।

আমরা অবশ্যই মানি মহানবী ﷺ বিশাল নিয়ামত ও রহমত। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } (١٠٧) سورة الأنبياء

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি।" *(আম্বিয়াঃ ১০৭)*

আর আমরা অবশ্যই সে নিয়ামত ও রহমত নিয়ে আনন্দিত। সদা-সর্বদা আনন্দিত। তাঁরই বদৌলতে সুপথ পেয়েছি তাই আনন্দিত। তাঁরই বদৌলতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করব ইন শা-আল্লাহ, তাই তো আমরা আনন্দিত। তা বলে সেই নিয়ামত ও রহমতপ্রাপ্তির আনন্দ প্রকাশ করার কোন নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ নেই।

শরীয়তের একটি ব্যাপক উক্তিকে কোন দিন-ক্ষণের সাথে নির্দিষ্ট করলে নিশ্চয় সেটা বড় দুঃসাহসিকতার কথাই বটে।

মুনাজাতীরা যেমন বলে, 'ফরয নামাযের পর জামাতী মুনাজাত না করলে নিকৃষ্ট অবস্থায় জাহান্নাম যেতে হবে।' কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকারে আমার উপাসনায় বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। *(মু'মিনঃ ৬০)*

মীলাদীরা যেমন বলে ওয়াহাবীরা দরুদ পড়ে না। (তার মানে কিয়াম করে না ও মনগড়া দরূদ পড়ে না।) অতএব তারা কুরআন মানে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٥٦)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর। (দরূদ ও সালাম পেশ কর।) *(আহ্যাবঃ ৫৬)*

নিজেরা না বুঝে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপায়! যে জায়গা দখল করে, সে জায়গার দলীল পেশ না করতে পেরে, সাধারণী জায়গার দলীল পেশ করে!

'এ হল তাঁরই অনুগ্রহ ও করুণায়; সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা তারা যা (পার্থিব সম্পদ) সঞ্চয় করছে তা হতে অধিক উত্তম।'

অনুগ্রহ ও করুণার কথা কি নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে?

তবুও উলামাগণ বলেন, উক্ত আয়াতে যা নিয়ে আনন্দিত হতে বলা হয়েছে, তা পূর্বোক্ত আয়াতে স্পষ্ট করা আছে। মহান আল্লাহ তার পূর্বে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} (٥٨) يونس

অর্থাৎ, হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণা সমাগত হয়েছে। তুমি বলে দাও, 'এ হল আল্লাহরই অনুগ্রহ ও করুণায়; সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা তারা যা (পার্থিব সম্পদ) সঞ্চয় করছে তা হতে অধিক উত্তম।' *(ইউনুসঃ ৫৭-৫৮)*

উলামায়ে সলফ উক্ত আয়াতে খুশীর বিষয় কুরআনকেই বুঝেছেন। যেহেতু 'প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণা' হল আল-কুরআনই।

ইবনে জারীর ত্বাবারী তাঁর তফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, "তুমি বলে দাও, 'এ হল আল্লাহরই অনুগ্রহ ও করুণায়; সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা তারা যা সঞ্চয় করছে, তা হতে অধিক উত্তম।"

মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! যারা তোমাকে ও তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ কুরআনকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তাদেরকে (বল, আল্লাহরই অনুগ্রহ) হে লোক সকল! যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, তা হল ইসলাম। তিনি তোমাদের জন্য বিবৃত করেছেন এবং তার প্রতি আহবান করেছেন। (এবং তাঁরই করুণা) যার দ্বারা তোমাদের প্রতি করুণা করেছেন। সুতরাং তিনি তোমাদের প্রতি তা অবতীর্ণ করেছেন, অতঃপর তোমরা তাঁর কিতাবের যা জানতে না, তা শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তার দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীনের প্রতীকসমূহকে দৃশ্যমান করেছেন। আর তা হল কুরআন। (সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা তারা যা সঞ্চয় করছে, তা হতে অধিক উত্তম।) আল্লাহ বলেন, সেই ইসলাম যার দিকে তিনি তাদেরকে আহবান করেছেন এবং সেই কুরআন যা তিনি তাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, তা দুনিয়ার সম্পদ ও ধনভান্ডার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। *(তফসীর ত্বাবারী ১৫/১০৫)*

মুফাস্‌সির কুরতুবী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ('এ হল আল্লাহরই অনুগ্রহ ও করুণায়; সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।'

আবূ সাঈদ খুদরী ও ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, 'আল্লাহর অনুগ্রহ হল কুরআন এবং তাঁর রহমত হল ইসলাম।'

উভয় সাহাবী কর্তৃক আরো বর্ণিত যে, 'আল্লাহর অনুগ্রহ হল কুরআন এবং তাঁর রহমত হল এই যে, তিনি তোমাদেরকে আহলে কুরআন বানিয়েছেন।'

হাসান, যাহ্হাক, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর অনুগ্রহ হল ঈমান এবং তাঁর করুণা হল কুরআন।' প্রথম উক্তির বিপরীত। *(তফসীর কুরতুবী ৮/৩৫৩)*

ইবনে কাষীর (রঃ) লিখেছেন, মহান আল্লাহ তাঁর সম্মানিত রসূলের প্রতি যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তার মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি ইহসানী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, (হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ এসেছে) অর্থাৎ, অশ্লীল কর্মাবলী থেকে বাধাদানকারী এসেছে। (এবং অন্তরের রোগের নিরাময় এসেছে) অর্থাৎ, অন্তরে যে সন্দেহ ও সংশয় আছে, তার নিরাময়। আর তা হল তাতে যে কালিমা ও অপবিত্রতা আছে তার দূরকারী। (এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণা সমাগত হয়েছে।) অর্থাৎ, তার দ্বারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে লাভ হয় হিদায়াত ও রহমত।

কিন্তু এই লাভ অর্জন করবে কেবল তার প্রতি বিশ্বাসীরা, তাকে সত্যজ্ঞানকারীরা এবং

তাতে যা আছে, তাতে দৃঢ় প্রত্যয়ীরা। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا} (٨٢) الإسراء

অর্থাৎ,আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। *(বানী ইস্রাঈল ৪ ৮২)*

তিনি আরো বলেছেন,

{قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ} (٤٤) سورة فصلت

অর্থাৎ, বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারস্বরূপ। এরা এমন যে, যেন এদের বহু দূর হতে আহবান করা হয়। *(হা-মীম সাজদাহ ৪ ৪৪)*

মহান আল্লাহ বলেছেন, (তুমি বলে দাও, 'এ হল আল্লাহরই অনুগ্রহ ও করুণায়; সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা তারা যা সঞ্চয় করছে, তা হতে অধিক উত্তম।') অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সমাগত হয়েছে, তাই নিয়ে তাদের খুশী হওয়া উচিত। যেহেতু তা তারা যা (পার্থিব সম্পদ) সঞ্চয় করছে, তা হতে অধিক উত্তম। *(তফসীর ইবনে কাযীর ৪/২৭৫)*

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেছেন, "তুমি বলে দাও, 'এ হল আল্লাহরই অনুগ্রহ ও করুণায়; সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা তারা যা (পার্থিব সম্পদ) সঞ্চয় করছে, তা হতে অধিক উত্তম।"

'আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর করুণা'র ব্যাখ্যায় সলফদের উক্তিসমূহের কেন্দ্রবিন্দু হল এই যে, তা হল ইসলাম ও সুন্নাহ।' *(তফসীর ইবনুল কাইয়েম ১/৩৬৮)*

সালাহুদ্দীন ইউসুফ সাহেব উক্ত আয়াতের তফসীরে বলেছেন, 'আনন্দ' বা 'খুশি' বলা হয় ঐ অবস্থাকে, যা কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জনের ফলে মানুষ নিজ মনে অনুভব করে। মু'মিনগণকে বলা হচ্ছে যে, এই কুরআন আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত, এ অনুগ্রহ লাভ করে মু'মিনগণের আনন্দিত হওয়া উচিত। এর অর্থ এই নয় যে, (আনন্দ-উৎসব করবে।) আনন্দ প্রকাশ করার জন্য জালসা-জলুস ক'রে, আলোকসজ্জা বা অন্য কোনরূপ অপচয়ের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করবে। যেমন বর্তমানের বিদআতীরা উক্ত আয়াত দ্বারা 'নবীদিবস' ইত্যাদি অভিনব বিদআতী অনুষ্ঠান বৈধ হওয়ার কথা প্রমাণ করতে চায়। *(আহসানুল বায়ান)*

বলা বাহুল্য, সলফদের কেউই উক্ত আয়াতের ফযল ও রহমতের ব্যাখ্যায় নবী ﷺ-কে বুঝাননি। পরবর্তীতে কেউ তা বুঝাতে এলে সে ধারণা করে যে, সলফগণ ঐ আয়াতের অর্থ বুঝেননি। অথচ এ খলফদের খলীফা তা বুঝে ফেলেছে, যা সলফগণ বুঝেননি!

পরন্তু আম অর্থে সকলের উচিত মহানবী ﷺ-কে নিয়েও খুশী হওয়া। কিন্তু সে খুশীর ধরন তাঁর জন্মদিন পালন করে আনন্দ-উৎসব করা নয়। বরং তাঁকে মনে-প্রাণে ভালোবেসে খুশী হতে হবে।

তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করতে হবে।

তাঁর সুন্নাহ ও তরীকা আঁকড়ে ধরে খুশী হতে হবে।

সুন্নাহ-বিরোধী ও তাঁর তরীকার পরিপন্থী যাবতীয় বিদআত থেকে দূরে থাকতে হবে।

তাঁর নির্দেশিত পদ্ধতিতেই যাবতীয় ইবাদত ও ঈদ পালন করতে হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ».

"তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক'রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী ২৬৭৬নং)*

এই হল তাঁকে নিয়ে আনন্দিত হওয়ার পদ্ধতি।

এই হল তাঁকে ভালোবাসার রীতি।

এই হল তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার নীতি।

এই হল তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে মহান প্রতিপালকের ভালোবাসা পাওয়ার পথ।

(৭) 'হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে কারীম ﷺ নিজেই মীলাদুন্নাবীর শুকরিয়া হিসাবে প্রতি সোমবার রোযা পালন করেছেন। সুতরাং আমরা কেন মীলাদুন্নাবী পালন করব না?'

উত্তর ঃ এই জন্য করব না, যেহেতু রাসূলে কারীম ﷺ করেননি, করতে বলেননি। তিনি মীলাদের খুশীতে রোযা রাখলে রোযা পালন করার পরিবর্তে 'মীলাদুন্নাবী পালন করা' বিধেয় হয় কোন্ যুক্তিতে?

আবূ কাতাদাহ ﷺ বলেন, 'সোমবার রোযা রাখার ব্যাপারে নবী ﷺ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "এটা হল সেই দিন, যে দিনে আমি জন্ম লাভ করেছি এবং আমার উপর সর্বপ্রথম কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "ঐ দিনে আমি (নবীরূপে) প্রেরিত হয়েছি।" *(আহমাদ ৫/২৯৭, ২৯৯, মুসলিম ১১৬২, আবূ দাউদ ২৪২৫নং)*

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঐ রোযা রেখে তিনি স্বীয় জন্মদিন পালন করেছেন। বরং রোযা রাখার কারণ বর্ণনা করে তিনি আরো বলেন, সোম ও বৃহস্পতিবার (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। তাই আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল (তাঁর নিকট) পেশ করা হোক।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১০২৭নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, "প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। আর (ঐ উভয় দিনে) আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে মার্জনা করে দেন যে কোন কিছুকে তাঁর অংশী স্থাপন করে না। তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যার নিজ ভাইয়ের সাথে বিদ্বেষ থাকে; এই দুই ব্যক্তির জন্য (ফিরিশ্তার উদ্দেশ্যে) তিনি বলেন, উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও। উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও।" *(মুসলিম ২৫৬৫ নং, প্রমুখ)*

অতএব কেবল ১২ই রবীউল আওয়াল মীলাদ পাঠ ও নানা প্রকার পানভোজনের মাধ্যমে নবীদিবসের আনন্দ উৎসব করে নয়; বরং তাঁর সুন্নত মোতাবেক তাঁর জন্মদিন প্রত্যেক সোমবারে (এবং অনুরূপ বৃহস্পতিবারে) রোযা রেখে (না খেয়ে) নবী ﷺ-এর মহব্বত প্রকাশ করতে হবে। আমাদের সেই ব্যক্তির মতো স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়, যে নবীর হালোয়া খাওয়ার দিনে কেবল হালোয়া বানিয়ে খায়। কিন্তু নবীর জিহাদে দাঁত ভাঙ্গলে হালোয়া খেয়েছিলেন। অথচ এ দাঁত ভাঙ্গার বেলায় নেই, শুধু হালোয়া খাওয়ার বেলায় আছে! তাঁর

সুন্নাহ পালন করার বেলায় নেই, তাঁর জন্মদিনে আনন্দ করার বেলায় আছে। ঐ কুসন্তানদের মতো, যারা মাতৃভক্তির পরিচয় দিতে 'মাতৃদিবস' পালন করে এবং বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে ফি বছর মাতাকে পুষ্পস্তবক নিবেদন করে আসে!

ওরা যে দিনে নবী-দিবস পালন করে ১২ই রবীউল আওয়াল, সেদিনে মহানবী ﷺ রোযা পালন করেননি। তিনি তা করলেও মীলাদীদের জন্য প্রচলিত 'ঈদে মীলাদুন্নাবী' পালন করা বিধেয় হতো না, বরং বিধেয় হতো সেই রোযা পালন করাই।

যদি মেনেই নিই যে, মীলাদুন্নাবী পালন করে রাসূলে কারীম ﷺ সোমবার রোযা পালন করেছিলেন, তাহলে তার অর্থ হল, প্রতি সপ্তাহে ঈদে মীলাদুন্নাবী পালন করতে হবে। যেখানে মহানবী ﷺ বছরে ৫১/৫২টি মীলাদুন্নাবী পালন করে গেলেন, সেখানে মাত্র ১টি মীলাদুন্নাবী কেন?

এটা কি শরীয়তের উপর গা-জোরামি নয়?

এটা কি হাজী-পুকুরের দলীল দেখিয়ে গাজী-পুকুর দখল করার মতো কাজ নয়?

এটা কি বউয়ের নিকাহ-নামা দেখিয়ে শালীকে নিয়ে সংসার করার মতো কান্ড নয়?

মহানবী ﷺ-এর জন্মদিন পালন করে তাঁর প্রতি ভালোবাসার পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্য হলে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করে ভালোবাসা প্রকাশ করার মূল্য অনেক বেশি। তাঁর সুন্নাহ পালন করে প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রেখে খুশী করার মর্যাদা অনেক বেশি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (٣١)

বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(আলে ইমরান ঃ ৩১)*

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٧) الحشر

রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। *(হাশ্‌র ঃ ৭)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١)

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" *(হুজুরাত ঃ ১)*

রসূল ﷺ প্রতি সোমবার রোযা রেখে মীলাদুন্নাবী পালন করেছেন। সুতরাং যদি কেউ সেই দলীল পেশ করে বছরে একবার বিতর্কিত ১২ই রবীউল আনন্দোৎসব করে, তাহলে কি এ বিষয়ে রসূল ﷺ-এর সামনে অগ্রণী হওয়া হল না? আল্লাহর ভয় কোথায় থাকল? 'ভয় করিবার শক্তি দাও দয়াময়।'

(৮) ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, মহানবী ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশূরার দিনে রোযা পালন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কী এমন দিন যে, তোমরা এ দিনে রোযা রাখছ?" ইয়াহুদীরা বলল, 'এ এক উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে তাদের শত্রু থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন।

তাই মূসা এরই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই দিনে রোযা পালন করেছিলেন। (আর সেই জন্যই আমরাও এ দিনে রোযা রেখে থাকি।)'

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "মূসার স্মৃতি পালন করার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে আমি অধিক হকদার।" সুতরাং তিনি ঐ দিনে রোযা রাখলেন এবং সকলকে রোযা রাখতে আদেশ দিলেন। *(বুখারী ২০০৪, মুসলিম ১১৩০নং)*

বুঝা গেল, মুক্তির মতো নিয়ামতের শুকরানা আদায়ের জন্য কোন দিনকে নির্দিষ্টভাবে পালন করা যায়। মহানবী ﷺ-এর আগমন আমাদের জন্য বড় নিয়ামত, তাই তাঁর আগমনের দিনে শুকরিয়া জানাতে মীলাদুন্নাবী পালন করলে দোষ কোথায়?

উত্তর ঃ ঐ একই কথা। রোযা রেখে শুকরিয়া আদায় বিধেয়। আনন্দ-উৎসব করে নয়। তাছাড়া মহানবী ﷺ মূসা নবীর জন্মদিন পালন করেননি। সুতরাং তাতেও মীলাদুন্নাবীর দলীল নেই।

যদি পরিত্রাণের দিন পালন করার মতো কোন নবীর জন্মদিন পালন করা বিধেয় হতো, তাহলে নিশ্চয় মহানবী ﷺ আশূরার মতো সেই দিনকেও পালন করতেন বা করার নির্দেশ দিয়ে যেতেন।

তিনি বলেছেন,

"জান্নাতের নিকটবর্তীকারী এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে করতে আদেশ করিনি এবং জাহান্নামের নিকটবর্তীকারী এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে করতে নিষেধ করিনি।" *(হাকেম ২/৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭/৬৭)*

"আমি এমন কোন জিনিস তোমাদেরকে আদেশ করতে বাদ দিইনি, যা তোমাদেরকে বেহেশ্তের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূর করতে পারে এবং এমন কোন জিনিস তোমাদেরকে নিষেধ করতে বাদ দিইনি, যা তোমাদেরকে দোযখের নিকটবর্তী ও বেহেশ্ত্ থেকে দূর করতে পারে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৭/২৯৯, মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ)*

"এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে আদেশ করিনি, অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তা আদেশ করেছেন এবং এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি, অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তা নিষেধ করেছেন।" *(বাইহাক্বী ৭/৭৬)*

তিনি আরো বলেছেন, "আমার পূর্বে যে নবীই ছিলেন, তাঁর দায়িত্ব ছিল যে, তিনি তাঁর উম্মতকে সেই কাজ বাতলে দেবেন, যা তিনি তাদের জন্য কল্যাণময় জানবেন এবং তাদেরকে সেই কাজ থেকে সতর্ক করবেন, যা তিনি তাদের জন্য অকল্যাণময় জানবেন।" *(মুসলিম, আহমাদ ২/১৯১)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক নবীর জন্য জরুরী যে, তিনি তাঁর উম্মতকে সেই কাজ বাতলে দেবেন, যা তিনি তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো বলে জানবেন।" *(আল-ইহকাম ১/৯০)*

সুতরাং এ কথা কীভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, মীলাদুন্নাবী পালন করা ভালো আমল এবং তা সর্বশ্রেষ্ঠ ঈদ। অথচ তিনি উম্মতকে সে ব্যাপারে কোন নির্দেশ দিয়ে গেলেন না। পরন্তু তিনি সতর্ক করে গেলেন, 'নব-রচিত কর্মাবলী থেকে দূরে থাকো। নব-রচিত কর্ম বিদআত। প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামের পথ।'

(৯) আনাস رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ নবুঅতের পর নিজের পক্ষ থেকে আকীকা করেছেন।

(বাইহাক্বী ১৯০৫৬, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৯৯৪নং)

অথচ এ কথাও বর্ণিত আছে যে, তাঁর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব তাঁর জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করেছেন। আর আকীকা বারবার করা হয় না। সুতরাং বুঝা যায় যে, নবী ﷺ শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্যই পুনর্বার নিজের তরফ থেকে আকীকা করেছিলেন। যেহেতু মহান আল্লাহ তাঁকে 'রাহমাতুল লিল-আলামীন' রূপে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। যেমন তিনি নিজের উপর দরূদ পড়তেন। বলা বাহুল্য, আমাদেরও সেই শুকরিয়া প্রকাশ করা কর্তব্য, যে শুকরিয়া তিনি জ্ঞাপন করেছেন। আমাদেরও জন্য বিধেয় তাঁর জন্মদিনে সেই শুকরিয়া প্রকাশ করা, দান-খয়রাত করা, আরো অন্য ইবাদত করা।

আজব দলীল মীলাদীদের!

কিন্তু এ কথা কি প্রমাণিত যে, জাহেলী যুগে আকীকা---তাও আবার জন্মের সপ্তম দিনে বিধেয় ছিল? আব্দুল মুত্ত্বালিব নবী ﷺ-এর তরফ থেকে যে আকীকা করেছিলেন, তাও কি সহীহভাবে প্রমাণিত?

অতঃপর জাহেলী যুগের সেই আমল কি ইসলামে গণ্য হয়েছে? নাকি নবী ﷺ যে আকীকা দিয়েছেন তা আসলে জাহেলী যুগের আকীকা গণ্য নয় বলে দিয়েছেন? তাহলে তাঁর সে আকীকা শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য ছিল না। বিধায় তা মীলাদুন্নাবীর দলীলযোগ্য নয়।

আর শুকরিয়া স্বরূপ ছিল মেনে নিয়ে সে কাজ মীলাদুন্নাবীর দলীল মনে করলেও কি আসলে তা দলীল হতে পারে?

তিনি জীবনে একবার আকীকার একটি বা দুটি ছাগল যবেহ করে শুকরিয়া আদায় করলে আমাদের জন্য কি প্রত্যেক বছর মীলাদুন্নাবীর উৎসব-উদ্যাপন করা বিধেয় হতে পারে?

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ রাত্রির একাংশে (নামাযে) এত দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা ফুলে ফাটার উপক্রম হয়ে পড়ত। একদা আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এত কষ্ট সহ্য করছেন কেন? অথচ আপনার তো পূর্ব ও পরের গুনাহসমূহকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়েছে।' তিনি বললেন,

« يَا عَائِشَةُ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ».

"আমি কি শুকরগুযার বান্দা হব না?" *(বুখারী ৭৩০৪, মুসলিম ৪৮৩৭নং)*

তিনি রাত্রির একাংশ জেগে ইবাদত করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন, তাহলে আমাদেরও কি সেই শুকরিয়া প্রকাশের জন্য মীলাদুন্নাবী পালন করতে হবে?

এ সব কোন্ শ্রেণীর দলীল? এ সব আসলে ঐ হাজী-পুকুরের দলীল দেখিয়ে গাজী-পুকুর দখল করার মতো দলীল।

মীলাদুন্নাবী পালন করা যদি উম্মতের জন্য বিধেয়ই হতো, তাহলে তিনি কি এ মর্মে কোন নির্দেশ দিয়ে যেতেন না? যেমন তিনি ঈদুল ফিত্বর, ঈদুল আযহা, জুমআর ঈদ, আরাফাত ও তাশরীকের ঈদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তেমন নির্দেশ দিয়ে গেলে কি এমন নকল দলীলের প্রয়োজন পড়ত?

তিনি কি তাহলে নির্দেশ দিতে ভুলে গেছেন, নাকি গোপন করে গেছেন?

আল্লাহর কসম! কক্ষনই তা নয়। আসলে 'মানুষ হল সর্বাধিক বিতর্ক-প্রিয়।' *(কাহফ ঃ ৫৪)*

(১০) কুরআনে আছে, ঈসা ﷺ নিজের জন্মদিনে সালাম বা শান্তির কথা বলেছেন। আর তার মানে জন্মদিন পালন করা যাবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا} (٣٣) سورة مريم

অর্থাৎ, আমার প্রতি শান্তি, যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি ও যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব।' (মারয়্যাম ঃ৩৩)

এটাও মীলাদের কোন দলীল নয়। কারণ প্রথমতঃ ঈসা ﷺ-এর শরীয়ত আমাদের শরীয়ত নয়।

দ্বিতীয়তঃ তাতে জন্মদিন পালন করার কথা বলা হয়নি। তাতে জন্মদিনে দুআ করার কথাও বলা হয়নি। আসলে তাতে যা বলা হয়েছে, তা হল এই ঃ-

মুফাস্সির ত্বাবারী (রঃ) বলেছেন, 'আমার প্রতি শান্তি---' অর্থাৎ, যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করি, সেদিনে আল্লাহর পক্ষ থেকে শয়তান ও তার লশকর থেকে আমার জন্য নিরাপত্তা, যাতে তারা সেই ক্ষতি না করতে পারে, যে ক্ষতি অন্যান্য সদ্য-ভূমিষ্ঠ শিশুদের ক'রে থাকে এবং খোঁচা মেরে থাকে। সেদিনেও চক্ষু-দর্শনের ভয়াবহতা থেকেও আমার নিরাপত্তা, যেদিন আমি মৃত্যুবরণ করব। এবং যেদিনকার ভয়ানক অবস্থা দর্শনে লোকেরা আতঙ্কিত হবে, পুনরুত্থানের দিনের সেই আতঙ্ক থেকেও আমার নিরাপত্তা। *(তফসীর ত্বাবারী ১৮/১৯৩)*

মুফাস্সির কুরতুবী (রঃ) বলেন, 'যেহেতু তাঁর তিন অবস্থা ঃ দুনিয়ার জগতে জীবিত অবস্থা, কবর জগতে মৃত অবস্থা এবং আখেরাতের জগতে পুনরুত্থিত অবস্থা। এই তিন অবস্থাতেই তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে।' *(তফসীর কুরতুবী ১১/১০৫)*

ইবনে কাষীর (রঃ) বলেন, 'তাঁর পক্ষ থেকে এ কথার প্রমাণ যে, তিনি আল্লাহ আয্যা অজাল্লার বান্দা। তিনি আল্লাহর সৃষ্টির এক সৃষ্টি, তিনিও সারা সৃষ্টির মতো জীবন ধারণ করবেন, মারা যাবেন এবং পুনরুত্থিত হবেন। তবে তাঁর জন্য সেই সব অবস্থায় শান্তি ও নিরাপত্তা থাকবে, যে সব অবস্থা বান্দাসমূহের জন্য সবচেয়ে ভীষণ কঠিন প্রমাণিত হবে।' *(তফসীর ইবনে কাষীর ৫/২৩০)*

তৃতীয়তঃ তাতে মৃত্যু-দিবস ও পুনরুত্থান-দিবসেও সালামের কথা বলা হয়েছে। তাহলে তাও পালন করা বিধেয় ধরে নিতে হবে।

আসলে এটাও ঐ শ্রেণীর লোকেদের দলীল, যারা বলে কবরের উপর মসজিদ বানানো যাবে। কারণ সূরা কাহফের ২১নং আয়াতে আসহাবে কাহ্ফের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "এভাবে আমি লোকেদেরকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল তখন অনেকে বলল, 'তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর।' তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল, 'আমরা তো নিশ্চয়ই তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করব।" *(কাহফ ঃ ২১)*

তাদের মতো দলীল, যারা বলে নারী-নেতৃত্ব হারাম নয়। কারণ মহান আল্লাহ কুরআনে এক নেত্রী রানীর কথা বলেছেন, যার নাম ছিল বিলকীস। *(সূরা নাম্ল)*

(১১) এর পরেও মীলাদীরা বলে, হযরত আবূ বাক্র ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মীলাদুন্নাবী উপলক্ষ্যে এক দিরহাম খরচ করবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।' অন্য বর্ণনা মতে, 'সত্তর হজ্জের সওয়াব পাবে।'

হযরত আলী ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মীলাদুন্নাবীকে সম্মান করবে, সে ঈমানের সাথে

মৃত্যুবরণ করবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

যেন মনে হচ্ছে মীলাদুন্নাবী নবুঅত ও খিলাফাতে রাশেদাহ ও ইসলামের স্বর্ণযুগে প্রসিদ্ধ ছিল। অথচ মীলাদ ফাতেমীদের নব-আবিষ্কৃত বিদআত; যেমন পূর্বেই প্রতিপাদিত হয়েছে। তাহলে এমন উক্তি মনগড়া নয় তো কী? মীলাদীদের বানানো বলেই ইচ্ছামতো সওয়াবের কথা উল্লেখ করে খুলাফায়ে রাশেদীনের উক্ত সাহাবীদ্বয়ের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পাকা দলীল যখন না থাকে, তখন মানুষ জেতার উদ্দেশ্যে কোন্ দলীল না পেশ করে। হাজী-পুকুর বাঁচাতে গাজী-পুকুরের দলীল পেশ করে। নকল বা জাল দলীল নিয়ে আসে। উর্দু প্রবাদে বলে, 'ডুবতে হুয়ে কো তিনকে কা সাহারা।' মানুষ যখন ডুবতে বসে এবং বাঁচার কোন অসীলা না পায়, তখন সামনে খড়-কুটা ভাসতে দেখলে তাই ধরে বাঁচার চেষ্টা করে। মীলাদীদের সেই অবস্থা।

মীলাদুন্নাবীর পাক্কা বা আসল দলীল থাকলে কক্ষনো তারা এই শ্রেণীর অচল দলীলের সাহারা নিতো না। আল্লাহ তাঁদেরকে হিদায়াত করুন। আমীন।

কবি নজরুল ও মীলাদুন্নাবী

'দেখ আমিনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইস্‌লাম দোলে
কচি মুখে শাহাদতের
বাণী সে শোনায়।।'

'কুল-মখ্‌লুকে আজি ধ্বনি ওঠে, "কে এল ঐ",
কলেমা শাহাদতের বাণী ঠোঁটে, "কে এল ঐ",
খোদার জ্যোতিঃ পেশাণীতে ফোটে, "কে এল ঐ",
আকাশ গ্রহ তারা প'ড়ে লুটে--- "কে এল ঐ",
পড়ে দরূদ ফেরেশ্‌তা, বেহেশ্‌তে সব দুয়ার খোলে।।'

'আনন্দে গাহিয়া ফেরে
ফেরেশ্‌তা হুর গেলেমান;
এলো কে, কে এল ভূলোকে
দুনিয়া দুলিয়া উঠিল পুলকে।।
তাপীর বন্ধু পাপীর ত্রাতা,
ভয়-ভীত পীড়িতের শরণ-দাতা,
মূকের ভাষা নিরাশার আশা
ব্যথায় শান্তি, সান্ত্বনা শোকে---
এ এল কে ভোরের আলোকে।।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা সবে
ঝুঁকে প'ড়ে কুর্নিশ করে নীরবে।

হেরে আমিনার কোলে
খোদার সাথী দোলে দোলে রে।।'

'নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া
কে এলো মক্কায় আমিনার কোলে।
ফাগুন-পূর্ণিমা-নিশিথে যেমন
আসমানের কোলে রাঙা-চাঁদ দোলে।।
'কে এলো কে এলো' গাহে কোয়েলিয়া,
পাপিয়া বুল্‌বুল্‌ উঠিল মাতিয়া,
গ্রহতারা ঝুঁকে' করিছে কুর্ণিশ,
হুর-পরী হেসে পড়িছে ঢলে।।
জিন্নাতের আজ খোলা দরওয়াজা পেয়ে
ফেরেশ্‌তা আম্বিয়া এসেছে ধেয়ে,
তহরীমা বেঁধে ঘোরে দরুদ গেয়ে
দুনিয়া টলমল, খোদার আরশ টলে।।
এল রে চির-চাওয়া, এল আখেরে-নবী
সৈয়দে মক্কী-মদনী আল্‌-আরবী,
নাজেল হয়ে সে-যে ইয়াকুত-রাঙা ঠোঁটে
শাহাদতের বাণী-আধো-আধো বোলে।।'

'আমিনার কোলে নাচে হেলে দুলে,
শিশু নবী আহমদ রূপের লহর তুলে।
রাঙা মেঘের কাছে ঈদের চাঁদ নাচে
যেন নাচে ভোরের আলো গোলাব গাছে।
চরণে ভোমরা গুঞ্জরে গুল্‌ ভুলে।।
খুশীর ঢেউ লাগে আর্শ ও কুর্শীর পাশে,
হাততালি দিয়ে হুরী সব বেহেশ্‌তে হাসে,
সুখে উঠে কেঁপে দুনিয়া চরণ-মূলে।।'

'খোদার হবিব হলেন নাজেল খোদার ঘর ঐ কাবার পাশে।
ঝুঁকে পড়ে আর্শ কুর্শী, চাঁদ সুরয তাঁয় দেখতে আসে।।
ভেঙে পড়ে মূরত মন্দির, লা'ত মানাত, শয়তানী তখ্‌ত,
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র উঠিছে তকবীর আকাশে।।
খুশীর মউজ তুফান তোরা দেখে যা মরুভূমে,
কোহ-ই-তূরের পাথরে আজ বেহেশ্‌তী ফুল ফুটে হাসে।।'

শ্রদ্ধেয় পাঠক! এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উক্ত ভক্তি-গীত ও আবেগময়

কবিতাসমূহে দলীলহীন বহু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। কবি নজরুলের বিভিন্ন বই-পুস্তকে এই শ্রেণীর আরো কবিতা পাবেন তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব বিষয়ক চিন্তা-ফসলে। সুতরাং বিশ্বাস করার আগে সত্যকে যাচাই করে নেওয়া কর্তব্য প্রত্যেক মু'মিন-মুসলিমের।

তাঁর পিতা-মাতা

তাঁর পিতামাতার জন্য অনেকে অনর্থক প্রশ্ন করেন, তাঁরা জান্নাতী, না জাহান্নামী? জানি না, এ প্রশ্নের উত্তর জেনে তাঁদের কী লাভ।

যাঁরা আবেগময়, তাঁরা চোখ বন্ধ করে বলতে পারেন, তাঁরা জান্নাতী। তাঁরা ইসলামের পূর্বে শির্কের অবস্থায় মারা গেছেন বললে অনেকে বলেন, 'তাঁদেরকে জীবিত করে মুসলমান করা হয়েছিল। ফলে তাঁরা জান্নাতী।'

দলীল থাকলে তো সেটাই মনঃপূত শেষ ফায়সালা হতো। কিন্তু তাঁর দলীল কোথায়?

মাতৃগর্ভে থাকতে পিতা মারা যান। ছয় বছর বয়স হলে মাতা ইন্তিকাল করেন। তারা ইসলামের সময়কাল পাননি। তাহলেও কি তাঁরা দোষী হবেন?

ইচ্ছাময় আল্লাহর ইচ্ছা কী, তা কে বলবে? ইব্রাহীম নবীর পিতা জাহান্নামী। কত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারবেন না। আমাদের নবীর পিতামাতা কী? সে প্রশ্নের উত্তরে কেবল দু'টি হাদীস পেশ করব। বাকী ইল্ম সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট।

আল্লাহর রসূল ﷺ একবার মায়ের কবর যিয়ারতে গেলেন। সঙ্গে কিছু সাহাবাও ছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি কেঁদে উঠলেন। সাহাবাগণ কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নিকট আম্মার (আব্বার) কবর যিয়ারতের এবং ইস্তিগফারের (ক্ষমা প্রার্থনা করার) অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ তাঁদের জন্য ইস্তিগফারের অনুমতি দিলেন না। *(মুসলিম ২৩০৩নং)*

বলা হয় যে, তাঁর উপর কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হল,

{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (١١٣) سورة التوبة

অর্থাৎ, অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয়; যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, তাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। *(তাওবাহ ঃ ১১৩)*

আল্লাহর রসূল ﷺ এর মনে প্রশ্ন জাগল যে, ইব্রাহীম ﷺ তো তাঁর পিতার জন্য (মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও) ইস্তিগফার করেছিলেন। আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর এল,

{وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ } (١١٤) سورة التوبة

"ইব্রাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং তা (ইস্তিগফার) তাকে দেওয়া আল্লাহর একটি প্রতিশ্রুতির জন্য সম্ভব হয়েছিল। অতঃপর যখন এ তার নিকট সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন ইব্রাহীম তার সম্পর্কে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল কোমল হৃদয় ও সহনশীল।" *(তাওবাহ ঃ ১১৪, তফসীর ইবনে কাষীর ২/৩৯৩)*

একদা এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার (মৃত) পিতা কোথায় (জান্নাতে না জাহান্নামে)?' তিনি বললেন, "জাহান্নামে।" অতঃপর সে যখন (মন খারাপ ক'রে) ফিরে যেতে লাগল, তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন,

« إِنَّ أَبِى وَأَبَاكَ فِى النَّارِ ».

"আমার পিতা এবং তোমার পিতা জাহান্নামে।" *(মুসলিম ৫২১নং, দ্রঃ সিঃ সহীহাহ ২৫৯২নং)*

কতিপয় অভিযোগ ও তার জবাব

অভিযোগ, 'বর্তমান জামানায় লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শান ও মান কমাবার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছে। তাদের ইসলামের দাবি ও মুসলমানী নাম কোন কাজেই আসবে না। তারা বলে থাকে---তিনি একজন মহা মানব, না তিনি অতি মানব, না মানবীয় দুর্বলতা হতে মুক্ত। ইত্যাকার বহু কথা বলে থাকে ও লিখে থাকে।'

'এরা (দুশমনে রাসূল) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সানা সিফত দেখে, তাযীম ও তাক্রীমের কথা শুনে, কুরআন ও হাদীসে তাঁর গুণাগুণ উল্লেখ দেখে তখন তাদের চক্ষু কপালে উঠে যায় ও বলে থাকে এটা বিদআত, এটা শির্ক।' (নূরে মুজাস্সাম ৬৭-৬৮পৃঃ)

'রসূলের দুশমনরা এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে একে একে অস্বীকার করে চলেছে। তাদের উদ্দেশ্য তাঁর শান ও মান লাঘব করা এবং তাঁকে বিশ্বের চক্ষুতে হেয় করা।' (ঐ ২২৪পৃঃ)

সূফী-বিরোধীরা রসূলের দুশমন কেন হবে? 'তিনি নূরের তৈরি নয়' বললে তাঁর সম্মানের কোন্ ক্ষতি হয়? তারা বিশ্বাস করে না এই জন্য যে, তার কোন সহীহ দলীল নেই। তাঁর অতিরিক্ত সম্মান চায় না, তা নয়। সহীহ দলীলে যদি থাকত, তাঁর কেশদাম রক্তরাগমণি থেকে, চক্ষু প্রবাল থেকে, নাসিকা স্বর্ণ থেকে, কর্ণ হীরা থেকে, দন্ত রৌপ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে, জ্যোৎস্নার সাথে চন্দন মাখিয়ে রঙধনু থেকে রঙ এনে তাঁর গায়ে মাখানো হয়েছে, তাহলে তারা শতখুশীর সাথে বিশ্বাস করত। আনন্দের সাথে সে সব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করত। যেমন তাঁর দেহের ঘাম সর্বশ্রেষ্ঠ আতর ছিল, তাঁর থুথু, ব্যবহৃত পানি ইত্যাদিতে বর্কত ও আরোগ্য ছিল, এ সব কথা বয়ান করে থাকে।

যদি কেউ বলে, 'আমার নবী পৃথিবীর সকল ভাষা জানতেন, বাংলাও জানতেন।' তাহলে আহলে সুন্নাহর তা বিশ্বাস করতে কোন বাধা ছিল না, যদি তার কোন দলীল থাকত। যেমন সুলাইমান নবী ﵇ পাখি ও পিঁপড়ের ভাষা বুঝতেন বলে তারা বিশ্বাস করে, কারণ তার দলীল আছে। *(সূরা নাম্ল ঃ ১৬)*

আহলে সুন্নাহ রসূলের দুশমন নয়, শির্ক ও অতিরঞ্জনের দুশমন। যে শির্ক ও অতিরঞ্জন করতে মহানবী ﷺ নিষেধ করে গেছেন। আহলে সুন্নাহ সহীহ সুন্নাহর অনুসারী। যারা যাঁর সুন্নাহর অনুসারী, তারা তাঁর দুশমন হয় কী করে? এটা কি স্পষ্ট অপবাদ নয়?

মেনে নিলাম সূফীরা আশেকে রসূল, রসূলের বড় ভক্ত। ভক্তি থাকা ভালো, কিন্তু অন্ধভক্তি ভালো নয়। আর সাধারণতঃ 'অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ' হয়।

আরো অভিযোগ যে, 'ওয়াহ্হাবী দল তাঁর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাঁকে লোক চক্ষুতে হেয় করার মানসে মনগড়া ও কাল্পনিক দলীল (?) দ্বারা প্রচার করে চলেছে

যে, তিনি মাটির সৃষ্টি, তিনি একজন সাধারণ মানুষ, তিনি অতি মানব নন এবং মানবীয় দুর্বলতা হতেও মুক্ত নন, তিনি নূরের সৃষ্টি নন এবং নূরী বাশারীও নন।' (ঐ ১৬পৃঃ)

দূর ছাই! নবীর প্রতিও আবার কেউ হিংসা করে? ওয়াহাবী-বিদ্বেষী ছাড়া আবার অন্য কেউ এই শ্রেণীর হাস্যকর অপবাদ তাদের প্রতি আরোপ করতে পারে?

জ্ঞানী পাঠক! আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করবেন, কাদের দলীল মনগড়া ও কাল্পনিক? এ যেন উল্টা চোর গৃহস্থকে ডাঁটে! আরবীতে বলে,

رَمَتْنِيْ بِدَائِهَا وَانْسَلَّتْ.

কাদের দলীল কুরআন-হাদীস সমৃদ্ধ? আর কাদের দলীল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়াহ, রওযাতুল আহবাব, যাখায়ের ইত্যাদি মীলাদী গ্রন্থ?

মীলাদী কিতাবের অসংখ্য কাল্পনিক কাহিনীগুলো কোন্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে? এ সব বিতর্কিত আবেগী বিষয়সমূহে কবে 'ইজমা' (সর্ববাদিসম্মতি বা ঐকমত্য) হয়েছে? নাকি একটি জামাআতের কয়েকটি আলেমের কোন বিষয়ে ঐক্যমত হলেই 'ইজমা' হয়ে যায়?

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রঃ)এর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ, 'কেউ কেউ এ আকীদা পোষণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হায়াতুন্নবী (?) নন। তিনি মরে মাটি হয়ে গিয়াছেন। বস্তুতঃ এটা তাঁর প্রতি তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

'কিতাবুত তাওহীদে' মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদী লিখেছেন যে, কায়েস ইবন সায়াদ হতে বর্ণিত আছে; তিনি বলেছেন ঃ আমি 'জিরা' শহরে গেলাম; দেখতে পেলাম লোকজন তাদের নেতাকে সিজ্দা করে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিই সিজদা পাবার অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি আমার কবরের পাশ দিয়ে যাও, তুমি কি আমাকে দেখতে পাবে; তুমি কি (তাকে) সিজ্দা করবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ তোমরা (তা) করো না। (আবূ দাউদ) তোমরা লক্ষ্য কর নবী করীম ﷺ নিজ কবরে মাটি হয়ে থাকবেন বলে সিজদা না করার ওজর পেশ করলেন।

সুন্নী জামায়াতের আলিমগণ তার উক্তির জবাবে বলেন ঃ হে মালাউন! কি প্রকারে তুই 'আমার কবর' অর্থ তিনি তাঁর কবরে মাটি হয়ে থাকবে করলি; তুই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অসত্যারোপ করলি। তাঁর সম্বন্ধে এ প্রকার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছিস? তুই কি তাঁর এ হাদীস শুনিস্ নি---"নিশ্চয়ই আল্লাহ যমীনের জন্য নবীগণের দেহ ভক্ষণকে হারাম করে দিয়েছেন এবং আল্লাহর নবীগণ জিন্দা, তাঁদেরকে রিযিক দেয়া হয়ে থাকে।" (ঐ ১০৯পৃঃ)

প্রিয় পাঠক! আপনি যদি শায়খ নাজদী (রঃ)এর বই পড়ে থাকেন, তাহলে জানবেন যে, কিতাবুত তাওহীদ বা অন্য কোন কিতাবে ঐ শ্রেণীর কোন কথা নেই। বরং উক্ত মন্তব্য তো দূর কী বাত, তাঁর কোন পুস্তিকায় আমরা উক্ত হাদীসই উল্লিখিত পেলাম না। সুতরাং জানি না, নূরে মুজাস্সাম-ওয়ালার এটা 'সফেদ অপবাদ' দিয়ে গায়ের ঝাল ঝাড়া কি না।

আবূ দাউদের উক্ত হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ-

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟ قَالَ قُلْتُ

لَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ (د) ٢١٤٠

অনুবাদের সাথে মিলিয়ে দেখে নিন, 'জীরা' নয় 'হীরা' শহর।

أرأيت এর অনুবাদ করা হয়েছে, 'তুমি কি আমাকে দেখতে পাবে?' অথচ তার তর্জমা হবে ما رأيك (তোমার কী রায়?) বা أخبرني (আমাকে বল।)

ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রঃ) ঐ হাদীস জানতেন, যাতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ যমীনের জন্য নবীগণের দেহ ভক্ষণকে হারাম করে দিয়েছেন।"

তিনি তাঁর 'মাজমুআতুল হাদীস আলা আবওয়াবিল ফিক্হ' নামক পুস্তকের ১৫৭৯ নম্বরে উক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

বলা বাহুল্য, 'তোমরা লক্ষ্য কর নবী করীম ﷺ নিজ কবরে মাটি হয়ে থাকবেন বলে সিজদা না করার ওজর পেশ করলেন।'---এ উক্তি তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে লানত করা ছাড়া কিছু নয়। 'তুই-তোকারি' করে একজন আলেমের অসম্মান প্রদর্শন ধৃষ্টতা বৈ আর কী হতে পারে?

অভিযোগ, মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্হাবের উক্তির অনুরূপ উক্তি ইসমাঈল দেহ্লভীর 'তাকভীয়াতুল ঈমানে' রয়েছে ঃ আমিও একদিন মরে মাটিতে মিশে যাব। (এটা হাদীসের উর্দু তর্জমা বলে অনুমিত হয় অথচ এ মর্মে কোন হাদীসই নেই।)

শ্রদ্ধেয় পাঠক! আমাদের কাছে যে 'তাক্বিয়াতুল ঈমান' উর্দু পুস্তিকা রয়েছে, তার ৯২ পৃষ্ঠায় ঐ সিজদার হাদীসের ব্যাখ্যায় লেখা আছে,

يعني ايك نه ايك دن مين بهي فوت هو كر آغوش لحد مين جا سوؤن كا بهر مين سجده كي لائق نه هوؤن كا. سجده كي لائق تو وهي باك ذات هي، جو لا زوال هي.

অর্থাৎ, একদিন না একদিন আমিও মৃত্যুবরণ করে কবরের বুকে গিয়ে শয়ন করব। সুতরাং আমি সিজদার উপযুক্ত থাকব না। সিজদার উপযুক্ত তো সেই পাক সত্তা, যিনি অবিনশ্বর।

এর পাদটীকায় লেখা আছে, 'আম্বিয়া-এ-কিরামের দেহসমূহকে মৃত্তিকা ভক্ষণ করে না। হাদীসে আছে, "আল্লাহ তাআলা যমীনের জন্য নবীগণের দেহ ভক্ষণকে হারাম করে দিয়েছেন।" উদ্দেশ্য এই যে, যাকে মৃত্যু গ্রাস করতে পারে, সে সিজদার হকদার থাকে না।'

উক্ত পুস্তিকার আরবী অনুবাদের ১৫১ পৃষ্ঠায় ঐ হাদীসের নিচে ঐ একই কথা লেখা হয়েছে,

وقد نبه رسول الله صلى الله عليه و سلم قيس بن سعد رضي الله عنه على أن من كان مآله الموت ومصيره إلى القبر يموت فيدفن لا يستحق السجدة إن السجود للحي الدائم الذي لا يموت.

অনুরূপ বলেছেন মিশকাতের ভাষ্যকার 'ত্বীবী' (রঃ),

أي اسجدوا للحي الذي لا يموت ولمن ملكه لا يزول فإنك إنما تسجد لي الآن مهابة وإجلالا فإذا صرت رهين رمس امتنعت عنه.

অর্থাৎ, তোমরা সিজদা কর সেই চিরঞ্জীবকে, যিনি মরণ বরণ করবেন না এবং তাঁকে, যাঁর

রাজত্ব বিলীন হবে না। যেহেতু তুমি এখন আমার মহিমার কারণে ও আমাকে সমীহ ক'রে সিজদা করবে, কিন্তু যখন আমি কবরে বন্দী হয়ে যাব, তখন তুমি তা হতে বিরত হবে। *(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ১০/২০০, আওনুল মা'বূদ ৬/১২৬)*

তাহলে 'আমিও একদিন মরে মাটিতে মিশে যাব'---এ কথা কোথায় রয়েছে? পাঠক আপনি নিজেই তা বিচার করুন।

'হাদীসের উর্দু তর্জমা বলে অনুমিত হয়'। ব্যাখ্যাকে কেউ হাদীস অনুমান করতেও পারে। যেমন 'নূরে মুজাস্‌সাম'-এর ২০৩ পৃষ্ঠায় একটি বাক্যকে হাদীসের বাংলা তর্জমা বলে অনুমিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে, 'হযরত কা'ব-ইবন-মালিক (রা) বলেছেনঃ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرًّا اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّه وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ (رواه البخاري ومسلم)

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারক ঝলমল করত, এমনকি মনে হতো তা এক টুকরা চাঁদ। আমরা সকলেই তা চিনতাম। তাঁর মুখমন্ডলে গাছপালার ছায়া প্রতিবিম্বিত হতো।'

অথচ রেখাচিহ্নিত শব্দাবলী হাদীসের অংশ নয়। কিন্তু হাদীসের তর্জমার সাথেই একই অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করা হয়েছে!

হাদীসটির নকলেও ভুল রয়েছে। হাদীসটি আসলে নিম্নরূপ,

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ

(এই শব্দাবলী সহীহ মুসলিমের ৭১৯২নং)

হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নিল।" *(বুখারী ১১০, মুসলিম ৩নং)*

"যে ব্যক্তি আমার তরফ হতে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে বিশ্বাস করে যে, তা মিথ্যা। তবে সেও মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।" *(সহীহ মুসলিমের ভূমিকা, প্রভৃতি)*

হাদীসে এ কথাও আছে, "বান্দা যখন কোন কিছুকে অভিশাপ করে, তখন সে অভিশাপ আকাশের প্রতি উঠে যায়। কিন্তু তাকে প্রবেশ করতে না দিয়ে আকাশের দরজাসমূহকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে সেখান হতে তা পুনরায় পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। কিন্তু তাকে আসতে না দিয়ে পৃথিবীর দরজাসমূহকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর তা ডানে-বামে বিচরণ করতে থাকে। পরিশেষে কোন গতিপথ না পেয়ে অভিশপ্তের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু (যাকে অভিশাপ করা হয়েছে সে) অভিশপ্ত (সঙ্গত কারণে) অভিশাপযোগ্য না হলে তা অভিশাপকারী ঐ বান্দার দিকে ফিরে যায়।" (অর্থাৎ, নিজের করা অভিশাপ নিজেকেই লেগে বসে!) *(আবূ দাউদ ৪৯০৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৬৯নং)*

সুতরাং যদি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রঃ) ইচ্ছাকৃত মিথ্যারোপ না করেছেন, তাহলে আসলে 'মালউন' কে হবে, তা পাঠক অবশ্যই বুঝতেই পারছেন। পূর্বেই বলেছি, 'কিতাবুত তাওহীদ'-এ কৃত অভিযোগ বর্তমান নেই।

পরন্তু উপর্যুক্ত দুই হাদীসের ভিত্তিতে ওদের হাল দেখুন। জাল হাদীস বা মীলাদী বই থেকে উদ্ধৃত উক্তিকে 'হাদীস' নাম দিয়ে চালিয়ে যে সব ভ্রষ্ট আকীদা সমাজে প্রচার করছে, তার পরিণাম কত ভয়ঙ্কর হবে, তা ভেবে দেখুন!

অবশ্য ওরা সেসব হাদীসকে 'জাল' বলে স্বীকারই করবে না। তা হলে তো আস্ফালনের

গোড়াই কাটা যেতো।

'আল্লাহর খলীফা (?) যে মানুষ, যাঁকে ফেরেশ্‌তা পর্যন্ত সম্মানার্থে সিজদা করলেন, তাঁকে তুচ্ছার্থে ও নিজের অহং প্রদর্শনার্থে কে সর্বপ্রথম বাশার বলল? সে হলো ইবলীস লায়ীন। আল্লাহ তাকে সিজদা হতে বিরত থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে সে বলল ঃ আমি ঐ বাশারকে সম্মান প্রদর্শনকল্পে (?) সিজদা দিবার নই যাকে তুমি (খোদা) সৃজন করলে পচা-গলা হতে কঠিন ঠনঠনি মৃত্তিকা হতে।

কাজেই যারা আম্বিয়ায়ে কিরামকে, বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁদের শান ও মান কমাবার জন্য তুচ্ছার্থে বাশার বলে থাকে, তারা হল ইবলীস লায়ীনের অনুসারী।' (নূরে মুজাস্‌সাম ২০৩-২০৪পৃঃ)

আদমকে তুচ্ছ করার জন্য ইবলীস তার নাম 'বাশার' দেয়নি। বরং ইবলীসের আগে মহান স্রষ্টা আদমকে 'বাশার' বলেছেন। লক্ষ্য করুন, তিনি বলেছেন,

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَال مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُون} (٢٨) سورة الحجر

"স্মরণ কর; যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে বললেন, 'আমি কালো পচা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে 'বাশার' সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।' তখন ফিরিশ্তাগণ সবাই একত্রে সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস করল না। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'হে ইবলীস! তোমার কী হল যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?' সে (উত্তরে) বলল, 'কালো পচা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে যে মানুষ তুমি সৃষ্টি করেছ, আমি তাকে সিজদা করবার নই।" *(হিজ্র ঃ ২৮-৩৩, অনুরূপ দেখুন ঃ স্বাদ ৭১-৭৬)*

আসলে ইবলীসের অহংকারই মূল সমস্যা ছিল। সূফী-বিরোধীদের অহংকার নেই। আর তারা তুচ্ছার্থেও কোন নবীকে 'বাশার' বলে না। সুতরাং তারা ইবলীস লায়ীনের অনুসারী নয়। বরং আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্‌ নবীগণকে 'বাশার' বলেছেন, তাই তারাও 'বাশার' বলে থাকে। অতএব তারা মহান আল্লাহরই অনুসারী। আসলে যারা নবী-রসূল ও আলেম-উলামাকে বিনা দোষে তুচ্ছ করে, গালাগালি করে, তাঁদের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদ আরোপ করে, তারাই শয়তানের অনুসারী।

সূফী-বিরোধীরা বিনা দলীলে তাঁকে 'পরিদৃশ্যমান নূর' বলে না। রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থে 'নূর' বলে। তাহলে উপমান ও উপমেয় কি এক হল?

যারা বিনা দলীলে বাতিলকে হকের সাথে মিশ্রণ করে তারা কী?

মহান আল্লাহ বানী ইস্রাঈলকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

{وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (٤٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-শুনে সত্য গোপন করো না। (বাক্বারাহ ঃ ৪২)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অধিকারসমূহ

অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও কাজে পরিণত করার নাম হল ঈমান। তাই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর যারা সাক্ষ্য দেয়, তাদের উপরে মহানবী ﷺ-এর একাধিক অধিকার এসে বর্তায়। সেই অধিকার আদায় করা তাদের জন্য আবশ্যক হয়। সেই অধিকার আদায়ের মাঝে তাঁর শাফাআত লাভ ও হওযে কওসরের পানি পান করার মাধ্যমে তাঁর বর্কত অর্জনের সৌভাগ্য নসীব হবে।

সেই সকল অধিকার নিম্নরূপ ঃ-

১। তাঁকে আন্তরিকতার সাথে পরম সত্যবাদী বলে জানা, তিনি যা আনয়ন করেছেন, তা সত্য বলে বিশ্বাস করা। তাঁর প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান রাখা। মহান আল্লাহ নিজের প্রতি ও তাঁর সাথে তাঁর নবীর প্রতি ঈমান আনা ও বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দিয়ে বলেছেন,

{فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (٨) سورة التغابن

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। *(তাগাবুন ঃ ৮)*

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}

অর্থাৎ, বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূল নিরক্ষর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা পথ পাও।' *(আ'রাফ ঃ ১৫৮)*

তাঁর প্রতি ঈমান আনার সুফল বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٢٨) سورة الحديد

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; তিনি তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দ্বিগুণ দান করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলাফেরা করবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(হাদীদ ঃ ২৮)*

আর তাঁর প্রতি ঈমান না আনার কুফল বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا} (١٣) سورة الفتح

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আমি সেসব অবিশ্বাসীদের জন্য অবশ্যই জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত ক'রে রেখেছি। *(ফাত্‌হ ঃ ১৩)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

« أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِى وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ».

"মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ সংগ্রাম করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না

তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি ও আমি যা আনয়ন করেছি, তাতে ঈমান আনবে। সুতরাং যখন তারা তা বাস্তবায়ন করবে, তখন ইসলামী হক (অর্থদন্ড ইত্যাদি) ছাড়া তারা নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে সুরক্ষিত ক'রে নেবে। আর (অন্তরের গভীরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে) তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায়।" *(মুসলিম ১৩৫নং)*

সুতরাং তিনি যে মানব-দানবের নবী, সে কথা বিশ্বাস করতে হবে। তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবকে বিশ্বাস করতে হবে। তিনি যা বলেন, তা সত্য বলে জানতে হবে। তাঁর আদর্শকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে একীন করতে হবে।

২। তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ থেকে দূরে থাকা।

এর আদেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ} (٢٠) سورة الأنفال

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর এবং (তার কথা) শ্রবণ করার পরেও তার (আনুগত্য) হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।" *(আনফাল ঃ ২০)*

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٧) الحشر

"রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" *(হাশ্‌র ঃ ৭)*

{قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} (٣٢) سورة آل عمران

"বল, 'তোমরা আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হও। কিন্তু যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসী (কাফের)দেরকে ভালবাসেন না।" *(আলে ইমরান ঃ ৩২)*

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হলে মানুষ কাফের হয়ে যায়।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٣٣) سورة محمد

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করো না।" *(মুহাম্মাদ ঃ ৩৩)*

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হলে মানুষের আমল পন্ড হয়ে যায়।

{وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ} (٩٢)

"তোমরা আল্লাহর অনুসরণ কর ও রসূলের অনুসরণ কর এবং সতর্ক হও। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রসূলের কর্তব্য।" *(মায়িদাহ ঃ ৯২)*

{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} (١٢) سورة التغابن

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমার রসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা।" (তাগাবুন ঃ ১২)

{فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (١) سورة الأنفال

"সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর; যদি তোমরা

বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর।" *(আনফাল ঃ ১)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٥٩) سورة النساء

"হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" *(নিসা ঃ ৫৯)*

উক্ত আয়াত দুটি থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

{وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (١٣٢) سورة آل عمران

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার।" *(আলে ইমরান ঃ ১৩২)*

{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٥٦) سورة النــور

"তোমরা যথাযথভাবে নামায পড়, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর; যাতে তোমরা করুণাভাজন হতে পার।" *(নূর ঃ ৫৬)*

উক্ত আয়াত দুটি থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলে মহান আল্লাহর করুণাভাজন হওয়া যায়।

{وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (٤٦)

"আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর ও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করো না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।" *(আনফাল ঃ ৪৬)*

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে একতা বজায় রাখলে সফল ও বিজয়ী হওয়া যায়।

{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} (٥٤) سورة النــور

"বল, 'আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর।' অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। আর রসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।" *(নূর ঃ ৫৪)*

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলে সুপথ পাওয়া যায়।

{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٥١) سورة النــور

"যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ

করলাম ও মান্য করলাম।' আর ওরাই হল সফলকাম।" *(নূর ঃ ৫১)*

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দ্বিধাহীন আনুগত্য করলে সফলতা অর্জন করা যায়।

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} (٣٦) سورة الأحزاب

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" *(আহযাব ঃ ৩৬)*

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করলে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হতে হয়।

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٦٣) سورة النــور

"সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" *(নূর ঃ ৬৩)*

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করলে বিপর্যয় ও ফিতনা আসে, আযাব আসে, গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। তখন হক ও বাতিল চেনা মুশকিল হয়। খুনী বুঝে না যে, কেন সে খুন করছে এবং যাকে খুন করা হয়, সেও বুঝে না যে, কেন তাকে খুন করা হচ্ছে!

{تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (١٤) سورة النساء

"এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। আর যে আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হয়ে চলবে, আল্লাহ তাকে বেহেশ্তে স্থান দান করবেন; যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ মহা সাফল্য। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তিনি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে, আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা-দায়ক শাস্তি।" *(নিসা ঃ ১৩-১৪)*

{وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} (٢٣) سورة الجن

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।" *(জ্বিন ঃ ২৩)*

{وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا}

"যে কেউই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাঁকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে, তিনি তাকে বেদনায়ক শাস্তি দেবেন।" *(ফাত্হ ঃ ১৭)*

{وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (٦٩) سورة النساء

"যে কেউ আল্লাহ এবং রসূলের আনুগত্য করবে, (শেষ বিচারের দিন) সে তাদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক (নবীর সহচর), শহীদ ও সৎকর্মশীলগণ। আর সঙ্গী হিসাবে এরা অতি উত্তম।" *(নিসা ঃ ৬৯)*

উক্ত আয়াতগুলি থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলে জান্নাত লাভ হবে এবং অবাধ্যাচরণ করলে জাহান্নাম যেতে হবে।

{مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} (٨٠) سورة النساء

"যে রসূলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তাদের উপর তোমাকে প্রহরীরূপে প্রেরণ করিনি।" *(নিসা ঃ ৮০)*

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, রসূলের আনুগত্য করলে আসলে আল্লাহর আনুগত্য করা হয়।

{وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ } (٥٢) سورة النــور

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি হতে সাবধান থাকে, তারাই হল কৃতকার্য।" *(নূর ঃ ৫২)*

{وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (٧١) سورة الأحزاب

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" *(আহযাব ঃ ৭১)*

উক্ত আয়াত দুটি থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলে কৃতকার্য হওয়া যায়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ).

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর আনুগত্য করল এবং যে আমার অবাধ্যতা করল, সে (আসলে) আল্লাহর অবাধ্যতা করল।" *(বুখারী ৭১৩৭, মুসলিম ৪৮৫২নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে; কিন্তু সে নয় যে অস্বীকার করবে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! (জান্নাতে যেতে আবার) কে অস্বীকার করবে?' তিনি বললেন,

(مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى).

"যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে, সেই জান্নাত যেতে স্বীকার করবে।" *(বুখারী ৭২৮০নং)*

৩। তাঁর অনুসরণ করা, তাঁকে নিজের আদর্শ মানা। তাঁর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করা। তাঁর তরীকা অনুযায়ী মহান আল্লাহর ইবাদত করা। তাঁর উক্তিকে সকল মানুষের উক্তির উপর প্রাধান্য দেওয়া।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে,

তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।” *(আহ্যাব ঃ ২১)*

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}

“বল, ‘হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূল নিরক্ষর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা পথ পাও।” *(আ’রাফ ঃ ১৫৮)*

বুঝা গেল, তাঁর অনুসরণ করলে সুপথ লাভ হবে। অনুরূপ তাঁর অনুসরণ করলে মহান স্রষ্টা আমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং আমাদের পাপ মোচন করে দেবেন। তিনি বলেছেন,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٣١)

অর্থাৎ, বল, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ *(আলে ইমরান ঃ ৩১)*

তাঁর সুন্নত যে অনুসরণ করবে না, সে তাঁর দলভুক্ত নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى ».

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। *(বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ৩৪৬৯নং)*

ইমাম সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন,

إن اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَّ تَحُكَّ رَأسَكَ إلاَّ بأثَرٍ فَافْعَلْ.

অর্থাৎ, যদি তোমার সাধ্য হয় যে, কোন আষার (হাদীস) ছাড়া তোমার মাথাও চুলকাবে না, তাহলে তাই কর। *(ফাতহুল মুগীষ ২/৩৬০, আল-জামে’ লিআখলাক্বির রাবী ১/১৪২)*

যেহেতু সুন্নাহর মাঝেই আছে যাবতীয় কল্যাণের মহা ভান্ডার। যে সুন্নাহপন্থী হবে, সে বিদআত থেকে পরিচ্ছন্ন থাকবে। এমন কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকবে, যার কিতাব ও সুন্নাহ থেকে কোন প্রমাণ নেই।

৪। তাঁকে ভালোবাসা; নিজের সন্তান, পিতামাতা, পরিবার-পরিজন, সকল মানুষ ও ধন-সম্পদ এমনকি নিজের জীবন অপেক্ষা তাঁকে বেশি ভালোবাসা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (٢٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, বল, ‘তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে

আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।' *(তাওবাহ ঃ ২৪)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ».

"তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি।" *(বুখারী ১৫, মুসলিম ১৭৮-নং)*

একদা মহানবী ﷺ উমার বিন খাত্তাব ؓ-এর হাত ধরে ছিলেন। উমার ؓ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জীবন ছাড়া সকল জিনিস থেকে আমার নিকট প্রিয়তম। এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "না। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে। যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবন থেকেও প্রিয়তম হতে পেরেছি (ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মু'মিন হতে পারো না)।" উমার ؓ বললেন, 'এক্ষণে আপনি আমার জীবন থেকেও প্রিয়তম।' তখন তিনি বললেন, "এখন (তুমি মু'মিন) হে উমার!" *(বুখারী ৬৬৩২নং)*

তাঁকে ভালোবাসলে ঈমানের মিষ্টতা পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন,

«ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ».

"যার মধ্যে তিনটি বস্তু পাওয়া যাবে, সে ঐ তিন বস্তুর মাধ্যমে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ তার নিকট অন্য সকলের চাইতে প্রিয়তম হবে, (২) কোন ব্যক্তিকে সে ভালোবাসলে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে এবং (৩) আল্লাহ তাকে রক্ষা করার পর সে পুনরায় কুফরীতে ফিরে যেতে এমন অপছন্দ করবে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ১৬, মুসলিম ১৭৪নং)*

মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যায় তাঁর আনুগত্য ক'রে, তাঁর সুন্নাহ অনুসারে জীবন পরিচালনা ক'রে, তাঁকে নিজের আদর্শ মেনে, তাঁর নির্দেশ পালনে কষ্টবরণ ক'রে, তাঁর বাণী প্রচার ক'রে, তাঁর ভালোবাসাকে ভালোবেসে, তাঁর শত্রুকে শত্রু জেনে। তা না হলে সে ভালোবাসার কোন দাম নেই, যা কেবল মৌখিক দাবী। আরবী কবি বলেছেন,

تعصي الإله وأنت تُظْهر حُبَّهُ ... هذا لعمري في القياس بديعُ

لو كان حُبُّكَ صادقاً لأطعته ... إن المُحبَّ لمن يُحِبُّ مُطيعُ

অর্থাৎ, তুমি রাসূলের নাফরমানি করে তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ কর। এটা তো সর্বযুগে এক অদ্ভুত ব্যাপার! তোমার ভালোবাসা যদি সত্য হত, তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর আনুগত্য করতে। কারণ যে যাকে ভালবাসে, সে তার অনুগত হয়। *(আশ-শিফা বিতা'রীফে হুক্বুক্বিল মুস্তাফা ২/৫৪৯)*

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়েম (রঃ) বলেছেন,

شرطُ المحبةِ أن توافِقَ مَنْ تحبُّ ... على محبَّته بلا عصيان

فإذا ادَّعيتَ له المحبةَ مع خلافِكَ ... ما يُحبُّ فأنت ذو بُهتانِ

أتحبُّ أعداء الحبيب وتدَّعي ... حُبّاً له ما ذاك في إمكان

وكذا تُعادي جَاهداً أَحبَابَهُ ... أين المحبَّةُ يا أخا الشيطانِ

অর্থাৎ, ভালোবাসার শর্ত এই যে, তুমি যাকে ভালোবাস, তার অবাধ্যতা না করে তার ভালোবাসায় একমত হবে।

সুতরাং সে যা ভালোবাসে তার বিরোধিতা করে তুমি যদি তার ভালোবাসা দাবী কর, তাহলে তুমি আসলে মিথ্যা দাবীদার।

তুমি কি প্রিয়পাত্রের শত্রুকে ভালোবাসো অথচ তুমি তাকে ভালোবাসো বলে দাবী কর? এটা তো সম্ভব নয়।

অনুরূপ তুমি তার প্রিয়পাত্রদের প্রতি প্রাণপণে শত্রুতা করে যাচ্ছ! কোথায় ভালোবাসা? ওহে শয়তানের ভাই! *(নুনিয়্যাহ, হার্রাসের ব্যাখ্যা-সহ ২/ ১৩৪)*

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যখন কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালোবাসবে, তখন নিশ্চয় সে সেই ব্যক্তি, বস্তু ও বিষয়কে ভালোবাসবে, যে ব্যক্তি, বস্তু ও বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ ভালোবাসবে। যেহেতু যে যাকে ভালোবাসে, সে তার প্রিয় জিনিসকেও ভালোবাসে। এমন না হলে মু'মিনের ঈমান পরিপূর্ণ হয় না।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

« مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ঘৃণা করে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কিছু) প্রদান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই (কিছু প্রদান করা হতে) বিরত থাকে, সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভ করেছে।" *(সহীহ আবু দাঊদ ৩৯১০নং)*

সুতরাং যে ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর আনুগত্য করে, তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষিদ্ধ জিনিস ও কর্ম বর্জন করে, তাঁর আদর্শে আদর্শবান হয়, সকলের কথার উপরে তাঁর কথাকে প্রাধান্য দেয়, তাঁকেই নিজের পীর-মুরশিদ ও অনুকরণীয় ইমাম মানে, তাঁর উপরে দরূদ পাঠ করে, সে ব্যক্তির নবী-প্রীতি খাঁটি সত্য।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (٣١)

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(আলে ইমরান ঃ ৩১)*

কত বড় সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যে তাঁর সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর আমলের জমি সুন্নত-পানিতে সিঞ্চিত হয়েছে। যে তাঁকে সরাসরি না দেখতে পেলেও তাঁর জীবনী ও সুন্নাহ অধ্যয়ন ক'রে মনের চক্ষে তাঁকে দর্শন ক'রে থাকে।

৫। তাঁকে সম্মান দেওয়া, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা। এটা তাঁর প্রাপ্য।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٨) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (٩) سورة الفتح

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাকে সাহায্য কর ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। *(ফাত্হ ঃ ৮-৯)*

তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার এক প্রকার আদবদানের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٣) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٤) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٥) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বল, তার সাথে সেইভাবে উচ্চ স্বরে কথা বলো না; কারণ এতে অজ্ঞাতসারে তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে আল্লাহ-ভীরুতার জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। যারা কক্ষসমূহের পিছন হতে তোমাকে উচ্চ স্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। তুমি বের হয়ে তাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, তাহলে তাই তাদের জন্য উত্তম হত। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(হুজুরাত ঃ ১-৫)*

তাঁর প্রতি ভক্তি ও তা'যীম তাঁর তিরোভাবের পরেও মু'মিনের মনে বদ্ধমূল থাকবে। তাঁর হাদীস ও সুন্নত শোনার সময়, তাঁর নাম ও জীবনী শোনার সময়, তাঁর বাণী প্রচারের সময় এবং তাঁর কথা আলোচনার সময় তাঁর প্রতি আদব থাকবে মুসলিমের বুকে ও মুখে।

৬। তাঁকে সাহায্য করা, তাঁর বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা শুনলে যথোচিত জবাব দেওয়া, তাঁর প্রতি বেআদবকারীদের বেআদবির প্রতিবাদ ও প্রতিকার করা, শাসন-ক্ষমতা হাতে থাকলে তাঁকে গালিদাতার উচিত শাস্তি দেওয়া। যেহেতু এটা তাঁর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দাবী।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٥٧)

"সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হবে সফলকাম।" *(আ'রাফ ঃ ১৫৭)*

পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার শাস্তি রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٦١) سورة التوبة

তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত ক'রে থাকে।' তুমি বলে দাও, 'সে কর্ণপাত তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং মু'মিনদের (কথাকে) বিশ্বাস করে। আর সে তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসী লোকদের জন্য করুণাস্বরূপ। যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়,

তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' *(তাওবাহ ঃ ৬১)*

{إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا} (٥٧)

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তো তাদেরকে ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। *(আহযাব ঃ ৫৭)*

আর যে আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত, সে নিশ্চিতরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا} (٥٢) سورة النساء

"এরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি কখনো তার জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না।" *(নিসা ঃ ৫২)*

৭। তাঁকে বিচারক মানা, তাঁর বিচার ও ফায়সালাকে ঘাড় পেতে মেনে নেওয়া, তাঁর বিচার-ব্যবস্থাকে আদালতে বহাল করা, হাকীম-উকীল ও বাদী-প্রতিবাদী সকলের তাঁর বিচারে সন্তুষ্ট হওয়া।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (٦٥) سورة النساء

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।" *(নিসা ঃ ৬৫)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٥٩) سورة النساء

"হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।" *(নিসা ঃ ৫৯)*

৮। তাঁকে তাঁর যথার্থ মর্যাদা প্রদান করা। তাতে না অবহেলা ও অবজ্ঞা করা, আর না অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করা।

মনে রাখতে হবে যে, তিনি মানুষ, কিন্তু তিনি মহামানুষ। তাঁর মর্যাদা সকল মানুষের উর্ধ্বে। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সকল সৃষ্টির সেরা। তবে তাঁর মর্যাদা কোন বিষয়ে তাঁর প্রতিপালক মহান আল্লাহর সমান নয়। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তিনি নিজের অথবা অপরের উপকার-অপকার কিছুই করতে পারেন না। তিনি মহান আল্লাহর দাস ও প্রেরিত দূত।

আর এ সকল কথা বক্ষমাণ পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

৯। তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٥٦)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও নবীর জন্য

অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর। (দরূদ ও সালাম পেশ কর।) *(আহ্যাব : ৫৬)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

"প্রকৃত কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার কাছে আমি উল্লিখিত হলাম (আমার নাম উচ্চারিত হল), অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।" *(তিরমিযী ৩৫৪৬নং)*

"সেই ব্যক্তির নাক ধূলা-ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে (আমার নাম শুনেও) আমার প্রতি দরূদ পড়ল না।" (অর্থাৎ, 'স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম' বলল না।) *(তিরমিযী ৩৫৪৫নং)*

"যে কোন জনগোষ্ঠী কোন মজলিসে বসে তাতে আল্লাহর যিক্র না করে এবং তাদের নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ না করে, তাদেরই নোকসান (দুর্ভোগ) হবে; আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তো তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং যদি চান তো তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন। *(তিরমিযী ৩৩৮০নং)*

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার দরুন তার উপর দশটি রহমত (করুণা) অবতীর্ণ করবেন।" *(মুসলিম ৮৭৫, আবূ দাউদ ৫২৩, তিরমিযী ৩৬১৪নং)*

"কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সব লোকের চাইতে আমার বেশী নিকটবর্তী হবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমার উপর দরূদ পড়বে।" *(তিরমিযী ৪৮৪নং)*

আমরা সবাই নামাযে তাঁর প্রতি দরূদ পেশ করে থাকি। এ ছাড়া দুআর সময়, মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সময়, আযানের জওয়াব দেওয়ার পর, জানাযার নামাযে, সকাল ও সন্ধ্যায়, জুমআর দিনে, মজলিস থেকে উঠার আগে, খুতবাসমূহে, তাঁর নাম শুনে, বলে ও লিখে, তাঁর কবর যিয়ারতের সময়, ইত্যাদি আরো অন্যান্য সময়ে দরূদ পাঠ করা বিধেয়। *(রাহমাতুল লিল-আ-লামীন দ্রঃ)*

« اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِى الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ».

সমাপ্ত